চৈত্রদিনের ঝরা পাতার পথে

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা-১৩

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

দ্বিতীয় সংস্করণ
চৈত্র, ১৩৩৭

মুদ্রক : শ্রীভবেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস
১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

একদা ফাঁসীর দড়ির ঝুঁকি নিয়ে যখন বিপ্লবী দলে যোগদান করেছিলাম, তখন থেকেই দুঃখ দিয়েছি অনেককে। আত্মীয়, বন্ধু, পড়শী, শুভানুধ্যায়ী এবং সবার উপর বাবা ও মাকে। সে দুঃখের সীমা পরিসীমা নেই! বিপদসঙ্কুল যাত্রাপথ তাঁদের অশ্রুজলে পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে, তাঁদের মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস সৃষ্টি করেছে বৈশাখী ঝড়, তাঁদের বুকভাঙ্গা ক্রন্দনরোলে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে বজ্রনির্ঘোষ!······

সেদিন কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করেই এগিয়ে গিয়েছিলাম সত্য, কিন্তু আজ পরিণত বয়সে সে দিনের হাসি-কান্নাভরা স্মৃতি দু'চোখ ঝাপ্‌সা করে তোলে।

যে সব কথা ঘুণাক্ষরেও বলিনি কাউকে কোনোদিন, আজ সেই অনুচ্চারিত কাহিনীর শুভ্র মালাখানি অঞ্জলি নিবেদন করলাম বাবা ও মার পুণ্য স্মৃতির বেদীমূলে!······

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যাবার পর নানারূপ বিপর্যয়ে পরবর্ত্তী সংস্করণের আশা যখন প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম, এমন সময় এগিয়ে এলেন প্রকাশক বন্ধুবর সুরেশ দাস। শুধু এলেন বললেই যথেষ্ট বলা হলো না। প্রথম সংস্করণে যে সব কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী বলা হয়নি, সেই সব কাহিনীর যতখানি সম্ভব এই সংস্করণে সংযোজন করে পরিবর্দ্ধিত গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে পৃথক্ পৃথক্ নামে প্রকাশের ব্যবস্থা করে ফেললেন। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাই জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স-এর কর্ণধার সুরেশ দাসকে।

প্রথম সংস্করণে গ্রন্থখানির নাম ছিল "তখন আমি জেল-এ" আর দ্বিতীয় সংস্করণে সেই গ্রন্থেরই দুই খণ্ডের নাম দেয়া হলো "চৈত্রদিনের ঝরা পাতার পথে" এবং "দিনগুলি মোর কোথায় গেল।"

নাম কেন পরিবর্ত্তন করা হোল কোনো কোনো সুহৃদ সে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা বলেন "তখন আমি জেল-এ" যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিল, ব্যবসায়িক ভাষায় বলা যায় গুড উইল সৃষ্টি করেছিল। সুতরাং সেই নামটিই অক্ষুণ্ণ রাখলে নামেই অনেকখানি প্রচারকার্য্য হয়ে যেত। প্রথম সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যাবার ফলে যাঁরা কিনতে বা পড়তে পারেননি, তাঁরা গ্রন্থের নামে আকৃষ্ট হয়ে তৎপর হতে পারতেন।

এ হচ্ছে সুহৃদগণের যুক্তি। আমার যুক্তি ভিন্নতর।

আমার "তখন আমি জেল-এ" গ্রন্থকে যাঁরা ভালবেসেছিলেন, নিশ্চয়ই আশা করতে পারি আমার রচনা তাঁদের ভালো লেগেছে। সুতরাং গ্রন্থের নামটাই তাঁদের কাছে প্রথম এবং একমাত্র কথা নয়, গ্রন্থকারের লেখনী সম্বন্ধেও তাঁদের ধারণা উৎসাহব্যঞ্জক। এবং হয়তো সেটাই মুখ্য। তাই যদি হয়, তাহলে পাঠকেরা আকৃষ্ট হবেন গ্রন্থের নামে ততটা নয়, যতটা গ্রন্থকারের নামে।

দ্বিতীয়তঃ, ১৯৪৭ সালে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটেছে। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত আমার রাজবন্দী-জীবনের কাহিনীর বিস্তার শেষ হয়েছে ১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে। সুতরাং এত কাল আগের ইংরেজ রাজত্বকালের একজন বন্দীর কাহিনীর নামকরণে "জেল" শব্দটা ব্যবহারে মন সায় দিচ্ছেনা।

হয়তো কেউ ভুল বুঝতে পারেন যে, এই "জেল-এ" মানে স্বাধীন ভারতের জেল-এ!

তৃতীয়তঃ, "তখন আমি জেল-এ" গ্রন্থের শেষ লাইনে রবীন্দ্রনাথের কবিতার যে অংশটুকু উদ্ধৃত করেছিলাম, তা এই—'চৈত্রদিনের ঝরা পাতার পথে দিনগুলি মোর কোথায় গেল।' আমার গ্রন্থের নামও এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই দিয়েছিলাম "ঝরা পাতার পথে।" কিন্তু মাসিক বসুমতীর সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটক প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের দাবী নিয়েই নাম পরিবর্তন করে দিয়ে বসুমতীতে প্রথম সর্গ প্রকাশের পর আমায় জানিয়েছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্ব নামে ফিরে যাবার সুযোগ পেলাম। প্রিয় কোনো জিনিষের নিজের রাখা নামটি যে অত্যন্ত প্রিয় এবং তার মধ্যে যে একটি সুমধুর আবেগ আছে, তা অস্বীকার করা যায় কি?

তারপর আসল কথা এই যে, এই সংস্করণে গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সংস্কার করা হয়েছে। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত একটানা রাজবন্দী-জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে যেসব ঘটনা প্রসঙ্গত আখ্যায়িকায় অনিবার্য্যভাবেই এসে গেছে, এই সংস্করণে তা বাদ দেয়া হয়নি। বরং আরও যা আসা উচিত ছিল, তাও আনা হয়েছে। যে সব প্রথম সংস্করণে নানা কারণে সন্নিবেশ করা হয়নি। ফলে, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে এবং তাই গোটা গ্রন্থ ভেঙ্গে দু' খণ্ড করতে হলো।

পূর্বেও বলেছি, আবারও বলছি, এই গ্রন্থ কোনো বিপ্লবী দলের ইতিহাস নয় অথবা কোনো বিপ্লবীর আত্মজীবনী নয়। সে যুগের বেঙ্গল ভল্যান্টিয়ার্স (জনপ্রিয় নাম বি ভি) বিপ্লবী দলের অন্যতম কর্মী হিসেবে যে সব বিপজ্জনক ক্রিয়াকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল, তার কিছু কিছু ঘটনা এতে আছে। পরাধীন দেশে যেসব কাহিনী জানবার জন্য কর্তৃপক্ষের উৎসাহ ও প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না এবং যা জানবার ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই তারা পুরোপুরি সাফল্য লাভ করতে পারেন নি, আজ স্বাধীন দেশে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের সেই অজ্ঞাত গুপ্ত কাহিনীর অনেকখানিই বিবৃত করা যায়। পরাধীন দেশে যা রাজদ্রোহিতা বলে গণ্য করা হতো, স্বাধীন ভারতে তাকেই দেশপ্রেম বলে মর্যাদা দেয়া যেতে পারে। স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে বলবার মৌলিক অধিকার আছে বলেই আমার এই রাজবন্দী জীবনের কাহিনীতে যাঁকে সে যুগে যেমন দেখেছি, তাকে ঠিক তেমনিভাবেই চিত্রায়ণের চেষ্টা করেছি। কেউ যদি এজন্য

খুশী হন, আমি কৃতজ্ঞ আর কেউ যদি এতে রুষ্ট হন, তাহলে আমি দুঃখিত। সত্য কথা বলবার অনড় শপথ নিয়েই লেখনী ধরেছিলাম, তাই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্পর্শকাতর মনের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করবার অবসর পাইনি। এমন কি, নিজের প্রতিও নয়। প্রায় সবারই নাম ঠিক ঠিক উল্লেখ করেছি, শুধু দু-একজনের নাম হয়তো এতদিন পর ভুলে গিয়ে অপর নামে উল্লেখ করেছি। মাত্র দু-একটি ক্ষেত্রে অনিবার্য্য কারণেই আসল নাম গোপন করা হয়েছে।

সে যুগের বিপ্লবীরা নারীকে শুধু ভগিনী মনে করতো না, তাকে মাতার ন্যায় ভালবাসতো। কিন্তু দেশমাতাকে ভালবাসতো তারা সবার ওপরে। কোনো যুক্তি, কোনো তর্ক, কোনো হিসেবের বালাই ছিল না তাদের শুধু এই একটি ক্ষেত্রে। শৃঙ্খলভাঙ্গার সংগ্রামে কোনো ষ্ট্র্যাটেজিকেই তারা হেয় মনে করতো না। নারীর প্রতি কদাপি তারা পুরুষের আকর্ষণ অনুভব করতো না সত্য, কারণ দেশ ব্যতীত আর কিছুই ভাববার অবসর ছিল না তাদের। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে পুরুষ-বিপ্লবীর প্রতি নারীর যে আকর্ষণ থাকতে পারে, তাকে দেশের স্বার্থে প্রয়োজন হলে কেন বিপ্লবীরা কাজে লাগাবে না?

আমার এই কাহিনীতে কোথাও কোথাও এমন আকর্ষণের উত্তাপ পাঠকের মনে এসে লাগতে পারে, কিন্তু সবিনয়ে তাঁদের জানাই, ওগুলো জোনাকির ক্ষণদ্যুতি মাত্র, বিপ্লবীর অন্তরের বৈশ্বানরের কাছে একেবারেই নগণ্য ও তুচ্ছ!

ব্যারাক স্কোয়ার কোয়ার্টার্স নং ২০।
পোঃ—বহরমপুর। জেলা—মুর্শিদাবাদ।

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

এক

গাছপালায় ঢাকা ছোট্ট একটি গ্রামে বাবা-মা ভাই-বোন আত্মীয়-প্রতিবেশী নিয়ে একটি সোনার সংসারে নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করছিলাম। অবুঝ শৈশবের গণ্ডী পেরিয়ে কৈশোরে পা দিতে না-দিতেই এল পথের ডাক। কণ্টকাকীর্ণ পথে বেরিয়ে পড়ার উদাত্ত আহ্বান। বেরিয়ে পড়লাম। পেয়ে বসলো পথের নেশায়। এগিয়ে চললাম দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন। অবিরাম, অবিশ্রাম। পশ্চাতে রেখে এলাম সোনার সংসার, ছেড়ে এলাম শৈশব ও কৈশোরের লীলাভূমি আমার ছোট্ট গ্রামখানি, রেখে এলাম বাবা-মা ভাই-বোনের স্নেহ ও ভালবাসা, আত্মীয়জনের প্রীতি ও মমতা, প্রতিবেশীদের দরদ ও সহানুভূতি, সর্ব্বপ্রকার বন্ধন অস্বীকার করে যোজনের পর যোজন এগিয়ে চললাম সঙ্কটসঙ্কুল পথে বেদুঈনের মতো, অন্তরে নিয়ে অটল বিশ্বাস আর বুকে নিয়ে অদম্য সাহস।

স্বপ্নালু কৈশোরের সীমান্ত অতিক্রম করে যখন অপ্রতিরোধ্য যৌবনে পদার্পণ করলাম, সুকঠিন সঙ্কল্প সাধনের দুর্দ্দমনীয় প্রতিজ্ঞায় তখন লাল হয়ে উঠলাম ব্লাষ্ট ফার্নেসের মতো। মনে হলো আমি হারকিউলিস, আমি নীরো। কব্জির জোরে চূর্ণ করে দোব তোমার পরাধীনতার শৃঙ্খল। তোমার স্বর্ণলঙ্কায় যখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে, আমি তখন মোহন বীণায় মূর্ত্ত করে তুলবো খুশীর গজল। তোমার সমাধির বুকে মাথা উঁচু করে উঠবে শৃঙ্খলমুক্তা আমার দেশজননীর স্বর্ণমন্দির।

এমনিভাবে পথের নেশায় যখন পেয়ে বসেছে, দুর্নিবার বেগে যখন এগিয়ে চলেছি ক্রোশের পর ক্রোশ, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল—সেই ফেলে-আসা গ্রামখানির কথা, সেই সোনার সংসার, আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ-পুব কোণের সেই শিউলী গাছটির কথা, যার তলায় একদা সৃষ্টি হয়েছিল শৈশবের কত টুকরো টুকরো উপাখ্যান, কৈশোরের রং-বেরং কত আখ্যায়িকা। ঝরা পাতার পথে ফেলে-আসা সেই নানা রংয়ের দিনগুলি হঠাৎ অন্তরে জাগালো অনির্ব্বচনীয় শিহরণ!

আমার সেই পুরাতন আখ্যায়িকার যবনিকা উত্তোলিত হতে দেখতে পাওয়া গেল, কলকাতায় আমি গা-ঢাকা দিয়ে বাস করছি পুলিশের নাগপাশ এড়াবার

জন্য। আই-বি'র ছদ্মবেশী গুপ্তচর আমাদের কালীঘাটের বাড়ীতে সময়ে ও অসময়ে বহুবার বহু ওজর দেখিয়ে আসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য। কিন্তু বৌদিরা বা বাড়ীর অন্যান্য সবাই প্রতিবারই তাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে জবাব দিয়ে দেন: দ্বিজেন? তা থাকে তো এখানেই। নিজেদের বাড়ী ছেড়ে থাকবে কি মেসে? কিন্তু কি কাজে জানিনে, এই একটু আগে বেরিয়ে গেছে। কি আপনার নাম বলুন না, আর কি দরকার? এলে বলবো'খন।

আগন্তুকদের মধ্যে যিনি তত দড় নন, তিনি হয়তো আমতা আমতা করে সরে পড়েন। আর যিনি পাকা, তিনি ফস্ করে জবাব দেন: বলবেন রবি হালদার এসেছিল। কাল সকালে আমি আবার আসবো। ওঁকে থাকতে বলবেন। ভারী দরকার ওঁকে, অথচ—

বলতে বলতে মুখখানা চিন্তার মেঘে একেবারে কালো করে এক পা-দু' পা করে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন। আশ্চর্য্য, 'কাল সকালে' আর রবি হালদারকে দেখা যায় না। আসেন অপর ব্যক্তি।

দ্বিজেনবাবু বাড়ী আছেন কি?

হয়তো বেরিয়ে আসেন এবার স্বয়ং মেজদা। মেজদা সরকারী চাকুরে। তিনি যে শুধু দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দেন আমায় নেহাৎ রক্তের সম্পর্ক আছে বলে এবং না দিলে অনাহারেই যে আমায় মরতে হবে, এই কথা স্পষ্টভাবে একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে দিয়ে তবে তাঁর চাকরি বজায় রাখতে পেরেছেন।

জিজ্ঞেস করেন: কোথা থেকে আসছেন?

আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে আগন্তুক অকস্মাৎ আমার প্রতি বন্ধুত্বের আবেগে একেবারে গলে পড়েন: বুঝলেন না, দ্বিজেন আমার সেই ছোট-বেলাকার বন্ধু। আর মশাই, চারিদিকে যেমন ধরপাকড় চলছে, পুলিশের টিকটিকি যেমন ঘুরছে চারিদিকে, তাতে করে ওকে একটু সাবধানে থাকতে বলবেন। দিনের বেলা বাড়ীতে না আসাই ভাল।—বলতে বলতে আরো একটু কাছে এগিয়ে এসে তিনি চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে কণ্ঠস্বর সহসা আরো একটু খাটো করে নিয়ে বলেন: আপনার এই সামনের বাড়ীটাকেই বিশ্বাস নেই। কুণ্ডুদের ঐ সেজ ছেলেটাকে কাল দেখছিলাম থানায় ঢুকতে। ওর কি দরকার বলুন তো? আমাদের এসব বাছাধনদের চিনতে আর দেরী হয় না। বুঝলেন?—তা দিনের বেলায় দ্বিজেন আসে না তো?

মেজদা আলীপুর দায়রা জজের আদালতের বিশ বছরের চাকুরে। সেই দায়রা জজ ছিলেন এককালে গার্লিক, এ. এন. সেন প্রভৃতি। ঝানু লোক। আগন্তুকের বক্তৃতায় তাঁর বিন্দুমাত্রও ভাবান্তর ঘটে না। তিনি পুরাতন জবাবেরই পুনরাবৃত্তি করেন: থাকে তো এখানেই। এই তো এতক্ষণ বাড়ীতেই তো ছিল। আপনি আসবার একটু আগেই কোথায় বেরিয়ে গেল। একটু বসবেন কি?—তা দেখুন, ইংরেজের আমরা নুন খাই, বিশ বছর ধরে সরকারী চাকরি করছি। ও যে কি করে, কোথায় যায়, এসব খবর আমি কোন দিনই রাখিনে, রাখবার প্রবৃত্তিও আমার নেই।

অর্থাৎ চাকরি বজায় রাখবার জন্য যে চুক্তিপত্রে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তাঁকে স্বাক্ষর দিতে হয়েছে, আমার বন্ধুটির কাছে বেশ উৎসাহের সঙ্গে তাতেই লিখিত কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করেন মথিলিখিত সুসমাচারের মতো। শুধু তাই নয়। রাজভক্তির আতিশয্যে অকস্মাৎ মেজদা যেন ফেটে পড়েন: আরে মশাই, এই সব হুজুগেরা কি করতে পারবে বলুন তো? স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার কর, ব্যস্, তাহলেই কাজ হবে। তা না করে দু'টো বোমা আর রিভলভার দিয়েই যদি দেশ স্বাধীন করা যেত ইংরেজদের সাগরপারে তাড়িয়ে দিয়ে, তাহলে তো আর ভাবনা ছিল না—কি বলেন, অ্যাঁ?

বলে মেজদা খুব বিজ্ঞের মতো হেসে ওঠেন। আমার বন্ধুর কানে তা বিদ্রূপের মত গিয়ে আঘাত হানে।

হাল ছেড়ে দেবার মতো মুখ করে বন্ধু বলেন: বুঝলেন না, অনেক দিনের বন্ধু তো, তাই সাবধান করে গেলাম। ও যদি এখনো এই বাড়ীতে থেকে যাওয়া-আসা করে সাধ করে হাতকড়ি পরতে চায়, তাহলে আমি আর কি করে ঠেকাই, বলুন?

তা তো বটেই, তা তো বটেই—বলে মেজদা সদর দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে ফিরে আসতেই মেজবৌদি জিজ্ঞেস করেন: কে এসেছিল গো?

মেজদা তৎক্ষণাৎ জবাব দেন: আর একটা টিকটিকি।

এমনি দিবারাত্র আসতেন আমার পরম সুহৃদেরা, আমার শুভানুধ্যায়ীরা আমার সংবাদ সংগ্রহ করে আমায় আপ্যায়িত করবার জন্য।

সেটা ১৯৩১ সাল। কিন্তু উনিশশো একত্রিশ সালের বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিকা সৃষ্টি হয়েছিল ১৯২৮ সালে। তার একটুখানি আভাস এখানে দেওয়া প্রয়োজন।

কংগ্রেসী আন্দোলনের মতই বিপ্লবী আন্দোলনেরও সূত্রপাত, পরিণতি ও সাময়িকভাবে মন্থর হয়ে আসার ইতিহাস আছে। আইন অমান্য আন্দোলনের মতই বিপ্লবী আন্দোলন এক একটি রক্তরাঙ্গা অধ্যায় সৃষ্টি করে রেখেছে ভারতের ইতিহাসে। ঠিক এমনি একটি লাল অধ্যায়ের গোড়াপত্তন হয় সাইমন কমিশন এদেশে আসবার সময় থেকে। যেদিন বোম্বাই বন্দরে তাঁরা জাহাজ থেকে মাটিতে পদক্ষেপ করলেন, সেদিন থেকেই সমগ্র ভারতে কমিশন-বয়কট আন্দোলন এত তীব্র আকার ধারণ করে যে, দিশেহারা ইংরেজ সরকারের আদেশে লাহোরে স্কট সাহেব নির্দ্দয়ভাবে লাঠির আঘাত চালান ভারতের অন্যতম নেতা লালা লাজপৎ রায়ের দেহে। এরই ফলে আহত নেতা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মতিলাল নেহরু ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনেই ভারত তখনকার মতো শান্ত হবে বলে রিপোর্ট প্রকাশ করলেন। সুভাষ ও স্বরাজ্য দলের অপরাপর নেতারা জেল থেকে মুক্তি পেলেন। বেরিয়ে এলেন চট্টগ্রামের সূর্য্য সেনও। কমিশন-বয়কট আন্দোলনে যোগদানকারীদের ওপর তখন চলেছে নির্দ্দয় অত্যাচার। লাহোরে লালা লাজপৎ রায়ের ওপর যে লাঠি চালনা করা হয়েছে, বাংলার বিপ্লবী নেতারা তার আঘাত যেন নিজেদের দেহে অনুভব করলেন। সুভাষের নেতৃত্বে সমস্ত বিপ্লবী দল প্রতিষ্ঠা করলেন ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ আর সেই সঙ্গে সৃষ্টি হলো বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স। ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের পরই এই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স নেতা সুভাষের নির্দ্দেশ অনুসারে বাংলার শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে কুচকাওয়াজ সুরু করে দিল। ঘুমিয়ে-পড়া ঝিমিয়ে-পড়া প্রাণে আশার দেওয়ালি জালিয়ে অনাগত সুদিনের জন্য যারা অধীর আগ্রহে দিন গুনতে থাকে, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স তাদের শুভেচ্ছা ও অকপটতা স্বীকার করে নিয়ে দেশের যুবশক্তির রক্তে সামরিক অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলবার ব্রত গ্রহণ করে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের মুখপাত্ররূপে সুভাষ ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে প্যারালেল গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। বাংলা ও পাঞ্জাবের বিপ্লবী দলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল পূর্ব্বেই। দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের মঞ্চ ও জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়েই ভারতীয় বিপ্লবীরা দেশে বিপ্লব আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হলেন। পাঞ্জাবে প্রতিষ্ঠিত হলো হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাব্লিক্যান পার্টি

আর নওজোয়ান ভারতসভা। সর্দ্দার ভগৎ সিং, চন্দ্রসিং আজাদ ও বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মেজর যতীন দাসের নেতৃত্বে এঁরা শুধু পাঞ্জাবে কেন, সমগ্র ভারতেই সফর করে বেড়াতে লাগলেন। ইংরেজ সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাবার জন্য সর্দ্দার ভগৎ সিং দিল্লীর পরিষদকক্ষে বোমা নিক্ষেপ করে ধরা দিলেন এবং ভীতিহীন বিবৃতিতে যা বললেন, তার মর্ম্মার্থ এই : যে বিপ্লবের ঝড় আসন্ন হয়ে উঠেছে, জনগণের আপাত-নীরবতা যে সেই তুফানেরই উপক্রমণিকা, শেষবারের মতো বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে আমরা সে সম্বন্ধে সতর্ক করে দিচ্ছি মাত্র।

লালা লাজপতের ওপর যে লাঠি চালিয়েছিল, সেই স্কট সাহেবকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে নিহত হলেন সণ্ডার্স সাহেব। লাহোরে সুরু হলো বিখ্যাত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা এবং তার অন্যতম নেতারূপে বাংলা থেকে গ্রেপ্তার হলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মেজর যতীন দাস। লাহোর বোরষ্টাল জেলে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো। মামলার প্রথম দিনের শুনানীকালেই সুরু হলো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্কবিতর্ক, ঝগড়া, অবশেষে চ্যালেঞ্জ। যতীন দাস আমরণ অনশন সুরু করলেন এবং ৬২ দিন পর ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর বেলা ১২টা ৫৫ মিনিটে মহাপ্রস্থান করলেন। মেজর যতীন দাসের শবদেহ সুদূর লাহোর থেকে ট্রেণযোগে কলকাতায় আনিবার অনুমতি দিয়ে ইংরেজ যে কী মহাভ্রম করেছিল সেদিন, তা বর্ণনার অতীত। এক কথায় সমগ্র ভারতের মাটিতে মাটিতে যেন সেই অমর শহীদ লোকান্তরিত দেহ নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন। সতীর দেহ স্কন্ধে নিয়ে পাগলা ভোলা যখন সমগ্র ভারতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে সেই দেহের যে-কোনো অংশ যেখানে পড়েছিল, সেখানেই সৃষ্টি হয়েছিল এক-একটি তীর্থ। ঠিক তেমনি লাহোর থেকে কলকাতা আসার পথে যেন একটি অদৃশ্য যোগসূত্র টেনে দিয়ে গেল সেদিনকার তুফান মেল।

কলকাতায় যতীন দাসের শব নিয়ে যে শোকযাত্রা বেরিয়েছিল, ইংরেজ জাতি কোনোদিন তা ভুলতে পারে না। পাঞ্জাবের সঙ্গে বাংলার অন্তরঙ্গতাই যে সেদিন দৃঢ়তর হয়ে উঠলো, তাই নয়, সমগ্র ভারতের বিপ্লবী দলই সেদিন পেল নতুন উদ্দীপনা, নতুন অনুপ্রেরণা। তাই বাংলার শহরে শহরে, পল্লীতে পল্লীতে সেদিন ছড়িয়ে পড়লো বৈপ্লবিক ইস্তাহার : রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্ব্বনাশের নেশা!

সত্যই সর্ব্বনাশ, তিলে তিলে আত্মাহুতি, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত, রঙীন সম্ভাবনাময় জীবনের ওপর টেনে আনা কালো যবনিকা।······

বিপ্লবীরা আর আত্মগোপন করে থাকতে চাইলো না। কংগ্রেসী আন্দোলনের পাশাপাশি সুরু হলো বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের একটি রেজিমেণ্ট অস্ত্র আইন ও ১৪৪ ধারা অমান্য করে কলকাতা থেকে সুভাষের পৈতৃক গ্রাম কোদালিয়ায় রুট মার্চ্চ করে গেল।

১৯৩০ সাল পড়তে-পড়তেই ৬ই এপ্রিল গান্ধীজী সুরু করলেন ঐতিহাসিক ডাণ্ডি অভিযান। তারপর ১৮ই এপ্রিল হলো চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান। সুভাষ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তখন ছিলেন আলীপুর সেনট্রাল জেলে। সেখানে একদিন কারাসমূহের ইন্সপেক্টর-জেনারেল কর্ণেল সিম্পসন ও জেল-সুপার সোম দত্তের নেতৃত্বে একদল পুলিশ সুভাষ, সেনগুপ্ত, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মেজর সত্য গুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ওপর লাঠি-চালনা করে। বাইরে সমগ্র ভারতে তখন চলছে তীব্রভাবে আইন অমান্য আন্দোলন। এই আন্দোলনে অংশ-গ্রহণকারীদের ওপর যে অথবা যারাই অত্যাচার করেছিল, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের Suicide Squad বেছে বেছে তাকে বা তাদেরকে এক এক করে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে দেবার ব্রত গ্রহণ করে। কলকাতায় টেগার্ট ও গর্ডন সাহেবের নেতৃত্বে পুলিশ নির্ব্বিবাদে অত্যাচার চালাচ্ছিল প্রকাশ্য জনসভায় মহিলাদের ওপরেও। আইন অমান্য আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ঢাকা শহরে যেমন চলছিল পুলিশ সুপার হডসনের তাণ্ডব, তেমনি মেদিনীপুরে চলছিল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ণেল পেডির অমানুষিক অত্যাচার আর সমগ্র বাংলার পুলিশী নৃশংসতার পশ্চাতে ছিল পুলিশের ইন্সপেক্টর-জেনারেল লোম্যানের অদৃশ্য সমর্থন ও সহযোগিতা!

অকস্মাৎ ২৫শে আগষ্ট ডালহৌসী স্কোয়ারে টেগার্ট সাহেবের মোটর গাড়ীর ওপর দু'টি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ২৬শে আগষ্ট জোড়াবাগান আদালত-গৃহে ও ২৭শে ইডেন গার্ডেন পুলিশ ফাঁড়ির ওপর বোমা পড়ে। ২৯শে আগষ্ট লোম্যান হডসনের সঙ্গে যখন ঢাকা মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল পরিদর্শন করছিলেন, তখন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মেজর বিনয়কৃষ্ণ বসু তাঁদের দু'জনকেই গুলীর আঘাতে ভূপাতিত করেন। লোম্যান মারা যান, হডসন বেঁচে থাকেন অর্দ্ধমৃতবৎ। তারপরও চলতে থাকে নানা স্থানে

রাজনৈতিক ডাকাতি ও নরহত্যা। অবশেষে ৮ই ডিসেম্বর কলকাতা শহরে সরকারী দপ্তর রাইটার্স বিল্ডিংস-এ হানা দেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের তিনটি অফিসার—মেজর বিনয় বসু, ক্যাপ্টেন দীনেশ গুপ্ত ও লেফটেন্যান্ট বাদল গুপ্ত। প্রকাশ্য দিবালোকে ডালহৌসী স্কোয়ারের মতো জনবহুল স্থানে রাইটার্স বিল্ডিংস-এর দোতলায় "অলিন্দ যুদ্ধে" প্রাণ হারান কারাসমূহের ইন্সপেক্টার-জেনারেল কর্ণেল সিম্পসন। ২৩শে ডিসেম্বর লাহোরে ইউনিভারসিটি হল-এ পাঞ্জাবের গভর্ণর মণ্টগোমারির ওপর উপর্যুপরি ছ'বার গুলী নিক্ষেপ করেন হরিকিষেণ।

এই প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে এল ১৯৩১ সাল। এর সুরুটা বেশ মন্থর, খানিকটা স্বস্তিজনকও বলা যেতে পারে। ৫ই মার্চ্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হলো। সর্ব্বভারতীয় প্রত্যেকটি নেতা সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন, করলেন না শুধু একজন। তিনি সুভাষ, বাংলার সুভাষ, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের প্রতিষ্ঠাতা-সর্ব্বাধিনায়ক দেশগৌরব সুভাষ। সে কাহিনী পরে বলবো। চুক্তির প্রধান সর্ত্ত অনুযায়ী আইন অমান্য আন্দোলন হলো প্রত্যাহৃত, গভর্ণমেণ্টও এই আন্দোলনের বন্দিগণকে মুক্তি দিতে লাগলেন। বাংলার গভর্ণর তখন স্যার ষ্ট্যানলী জ্যাকসন। অহিংস কংগ্রেসী আন্দোলনের বন্দিগণ মুক্তি পেলেও বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের ভাগ্যে আদৌ কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। কিন্তু একদিকে সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য এবং অপর দিকে বৈপ্লবিক আঘাতের চাপে জর্জ্জর হয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তখন এতখানি মুষড়ে পড়েছিলেন যে, তাঁরা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মারফৎ বক্সা বন্দিশিবিরে আবদ্ধ রাজবন্দী নেতাদের কাছে আপস-আলোচনার প্রস্তাব পাঠাতেও দ্বিধা বোধ করলেন না। রাজবন্দীরা দাবী জানালেন দু'টি: এক, চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের নায়ক ফেরারী সূর্য্য সেনের ওপর থেকে সর্ব্বপ্রকার অভিযোগ প্রত্যাহার এবং দুই, আপস-আলোচনার সময়ে পুলিশের অনুপস্থিতি। গভর্ণমেণ্ট এই দু'টি সর্ত্ত মেনে না নেওয়ায় আপস-আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

গান্ধীজীর সর্ব্বপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ২৩শে মার্চ্চ সর্দ্দার ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসী হয়ে গেল। দেশময় সুরু হলো বিক্ষোভ প্রদর্শন, তেমনি আবার সুরু হলো সরকারী অত্যাচার। কিন্তু সেই অত্যাচারের মধ্যেই ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ণেল পেডি বিপ্লবীর গুলীর

আঘাতে নিহত হন। ৭ই জুলাই ক্যাপ্টেন দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী হয়ে যায়। আলীপুর স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালে যখন দীনেশের বিচার চলছিল, তখন কিছুদিন আলীপুর সেনট্রাল জেলের ১৬নং সেল্‌স্‌-এ তার সঙ্গে আমারও বিচারাধীন আসামীরূপে থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল। বিচার হয়ে গেল, ট্রাইবিউনাল রায় দিলেন, দীনেশকে ফাঁসীর আসামীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট সেল্‌স্‌-এ স্থানান্তরিত করা হলো। দীনেশের সঙ্গে কাটানো সেই কয়েকটা দিনের স্মৃতি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। যথাস্থানে তা বিবৃত করবো। দীনেশের পরই হয় রামকৃষ্ণের ফাঁসী। যে স্পেশাল ট্রাইবিউনাল দীনেশ গুপ্তকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে, আলীপুরের দায়রা জজ গার্লিক ছিলেন তার সভাপতি। ২৭শে জুলাই এজলাসে যখন তিনি কার্য্যরত, সেই সময় কানাই ভট্টাচার্য্য নিঃশব্দে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে রিভলভারের গুলীতে তাঁকে হত্যা করেন।

পুলিশ এবার মরিয়া হয়ে উঠলো। হাতের কাছে যাকে পেতে লাগলো, তাকেই গ্রেপ্তার করতে লাগলো। বাংলা দেশে, বিশেষ করে পূর্ব্ববঙ্গে এমন পরিবার খুঁজে বার করা কঠিন হয়ে উঠলো যা থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে গভর্ণমেণ্ট তাঁর অতিথি করে নেননি। ব্যায়ামাগারে, লাইব্রেরীতে, ক্লাব-গৃহে, কুস্তির আখড়ায়, আড্ডাঘরে সর্ব্বত্র পুলিশ হানা দিয়ে ফিরতে লাগলো। ছাত্রদের মধ্যে যে বক্তৃতা দিতে পারে, যুবকদের মধ্যে যার স্বাস্থ্য ভালো, পাড়ায় যে নেতৃস্থানীয়, তার আর কারার বাইরে থাকবার উপায় নেই। সরকারী চাকুরের ছেলেই হয়তো গ্রেপ্তার হয়ে গেল মহামান্য সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের অভিযোগে। তাঁদের চাকরি নিয়ে যখন টানা-হেঁচড়া পড়ে গেল, তখন অনেকেই আমার মেজদা'র মতোই, স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, একটি বণ্ডে স্বাক্ষর করে রাজভক্তির নতুন করে পরিচয় দিয়ে রক্ষা পেয়ে গেলেন। বহু যুবকের নামে 'হুলিয়া' বেরুলো, অনেকের নামে মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। পথে-ঘাটে, রেস্তোরাঁয়, ট্রামে, বাসে ও ট্রেণে অসংখ্য টিকটিকি বা স্পাই কিলবিল করতে লাগলো। বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার বন্ধনও বুঝি অবিশ্বাস ও আশঙ্কার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল।

সর্ব্বত্র আতঙ্ক ও নিরাশার থমথমে আবহাওয়া! কখন কার ঘাড়ে অকস্মাৎ সরকারী হুকুম এসে খড়্গাঘাত করবে, কে জানে!

দেশের এমনি নিদারুণ সময়ে রাজনীতির সঙ্গে যার সামান্যতম সংস্পর্শ আছে,

সে কি আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? 'হুলিয়া' না বেরুলেও সরকারের একখানা আমন্ত্রণ লিপি যে আমারও নামে লিখিত হয়ে পিওন বুকে বসে আমার প্রতীক্ষা করছে, সেটুকু বোঝবার ক্ষমতা আমার হয়েছিল। তাই পারিবারিক খাতায় আমার নাম থাকলেও লগ্‌ বুকে কখনো আমার স্বাক্ষর পড়তো না।

থাকতাম শহরতলীর এক বন্ধুর বাসায়। ইটের দেয়ালের উপর টিনের চাল-দেওয়া খানচারেক কামরার ছোট একখানা গোটা বাড়ী। বন্ধু নেপাল পড়েন যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে, তাঁর দাদা গোপাল কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষক, ছোট ভাই মনু তখনো স্কুলে পড়ে। বিধবা মা। আর থাকেন একজন সহ-ভাড়াটিয়া। বিধবা মা ও ছেলে। অর্দ্ধেন্দু সেই সকাল আটটায় কোন্ কারখানায় গিয়ে মোটরের নীচে শুয়ে শুয়ে যখন একবার একটি বল্টু আঁটেন ও আর একবার একটি স্ক্রু ঢিলে করেন, তখন জানতেও পারেন না, কখন সকালের উজ্জ্বল রোদ বিকেলের স্নিগ্ধতায় ম্লান হয়ে এসেছে। তারপর সম্মুখের কেমিক্যাল কারখানায় ঢং ঢং করে ছুটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চৈতন্য ফিরে আসে। কালিমাখা দেহ নিয়ে ফিরে আসেন অর্দ্ধেন্দু। মা কিন্তু তাঁর ছেলের সম্বন্ধে যেমন আশাশীলা, তেমনি অর্থের যে তাঁর আদৌ প্রয়োজন নেই, একটি অঙ্গুলি হেলনেই যে তিনি তাঁর হাজরা রোডের স্বামীর গৃহ থেকে ঝগড়াটে ছোট জা-দের ও তাদের ভেড়ুয়া স্বামীদের বহিষ্কৃত করে দিয়ে অর্দ্ধেন্দুকে নিয়ে দিব্য সেখানে চলে যেতে পারেন, একথা দিনের মধ্যে প্রায় একশো বার উচ্চারণ করে থাকেন।

অত্যন্ত কটুভাষিণী হলেও ইনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন আমায়। বন্ধুদের বাড়ী খেলেও প্রায়ই ইনি এটা-ওটা-সেটা করে আমায় একটুখানি পাঠিয়ে দিতেন রন্ধনে তাঁর কৃতিত্বের নমুনাস্বরূপ। খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের মুখে নিজের প্রশস্তি এতখানি গলাধঃকরণ করতে হতো যে, তারপর রন্ধনের শতমুখে সুখ্যাতি না করে আর পথ থাকতো না।

বাড়ীখানার চতুর্দ্দিকে খোলা মাঠ, আম, কাঁঠাল ও নারিকেল গাছে ছাওয়া। একটু দূরে একটা পুকুর, তার তীরে গোটাকয়েক বাতাবী নেবু ও পেয়ারা গাছ। বড় রাস্তা কয়েক শত গজ দূরে।

চাকর বা ঠিকে ঝি আমরা রাখিনি। কারণ ওদের মধ্যেই যে পুলিশের গুপ্তচরের সংখ্যা বেশী। খাওয়া শেষ হলে এঁটো-কাটা সাফ্ করে নিজেরাই পুকুরে যেতাম থালা বাটি নিয়ে।

দিনের বেলা বেরুনো নিষিদ্ধ ছিল। রাত্রে, তাও আবার ট্রামে বা বাসে নয়, সাইকেলে। সাইকেলে চড়লে কেউ আমায় অনুসরণ করছে কিনা, তা সহজে ধরা যায়। মনে করুন, সে যুগের খোলা ময়দান রাসবিহারী এ্যাভিনিউ দিয়ে বেগে সাইকেল চালিয়ে চলেছেন বালিগঞ্জ ষ্টেশনের দিকে। অকস্মাৎ দেখলেন একখানা সাইকেল বা মোটর আপনার পেছন-পেছন ছুটে আসছে। কে এ? কী এর মতলব? পুলিশের স্পাই? অনুসরণ করছে আপনাকে? কুছ পরোয়া নেই! অকস্মাৎ ব্রেক কসে নেমে পড়ুন। হয় সাইকেলখানা রাস্তার গায়ে শুইয়ে রেখে মূত্রত্যাগের ভান করে বসে পড়ুন কিংবা ওখানা ফস্ করে ঘুরিয়ে নিয়ে ঠিক উলটো দিকে যাত্রা করুন। অত শীগ্‌গির মোটর উলটো দিকে ঘুরিয়ে নেওয়া যায় না, আর সাইকেল ঘোরাতে পারলেও জানা গেল কোন্‌খানা ফেউয়ের মতো আপনার পেছনে লেগেছে!

কালীঘাটে আমাদের বাসায় আমি মাঝে মাঝে সংবাদ নিতে যেতাম সত্যি, কিন্তু কখন্ আসবো, যেমন কেউ জানতো না, তেমনি জানতেও চাইতো না থাকবো কতক্ষণ।

এমনিভাবে গা ঢাকা দিয়ে ছিলাম ভালোই, কাজও চলছিল মন্দ নয়। এমন সময় একদিন বাল্যবন্ধু শ্রীপদর পত্র এল গোয়ালন্দ থেকে। গোয়ালন্দ ষ্টীমার কোম্পানীতে সে কয়েক বছর ধরে চাকবি করে, থাকে একা একখানা ফ্লাটে। বেচারা হয়ে পড়েছে দারুণ অসুস্থ। প্রথমতঃ রেলের হাসপাতালে আশ্রয় নিয়ে রোগ সারাবার চেষ্টা করেছে। না পেরে নিয়েছে এক মাসের ছুটি। আর আমায় লিখেছে তাকে দেশের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবার অনুরোধ জানিয়ে। আমারই গ্রামের আমারই পাড়ায় তার বাড়ী।

ছোটবেলাকার বন্ধু, তারপর পীড়িত আর আমায় খুঁজে বার করবার ব্যাপাবে পুলিশের উৎসাহও মনে হলো কতকটা কমে এসেছে। তাই যাওয়াই স্থির হলো।

রওনা হলাম শিয়ালদহ থেকে চট্টগ্রাম মেলে। পরণে খাঁটি সাহেবের পোষাক, কাঁধের ওপর খাঁটি মিলিটারী ওভারকোট আর হাতে বিরাটকায় খাঁটি গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ। ফেল্ট ক্যাপে কপাল ঢাকা। টিকিট আগেই কেনা ছিল, তাই ট্রেণ ছাড়বার ঠিক পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে এই খাঁটি সাহেবটি ট্যাক্সিযোগে ষ্টেশনে এসে সোজা গিয়ে আরোহণ করলেন রিজার্ভ-করা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় এবং

জানালার কাচগুলো তুলে দিয়ে একখানা বিলিতি সিনেমা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে লাগলেন।

ভোর সাড়ে ছ'টায় ছেড়ে চট্টগ্রাম মেল বেলা বারোটায় এসে পৌঁছলো গোয়ালন্দ ঘাটে। এবারে সেকেণ্ড ক্লাস থেকে নেমে এলেন গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে, কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি পরনে, গ্রিশিয়ান স্লিপার পায়ে একজন দর্জিপাড়ার কাপ্তান, দু' আঙুলের মাঝে আলগোছে চেপে ধরে একটি সিগারেট। পেছনে গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ মাথায় কুলি।

পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়া ছিল, তাই দেখা গেল শ্রীপদর প্রেরিত লোক অপেক্ষা করছে। সাবধানে তার পাশ দিয়ে যাবার সময় কাপ্তান অস্ফুটস্বরে বলে গেলেন: আমি ষ্টীমারে ইণ্টার ক্লাসে যাচ্ছি।

সোজা গিয়ে হন্ হন্ করে ষ্টীমারে উঠলে পাছে টিকটিকিদের সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাই অকস্মাৎ পথের মাঝখানে থেমে গিয়ে কাপ্তান কমলালেবুর দরদস্তুর করতে লাগলেন। দুঃখের বিষয় দরে বনলো না। না বনবারই কথা। তাই পাশের দোকান থেকে আর এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিয়ে কাপ্তান সোজা চললেন ষ্টীমারের দিকে।

সন্ধ্যার একটু আগে যখন ষ্টীমার কাদিরপুর ষ্টেশনে এসে থামলো, শ্রীপদ তখন বলে উঠলো: যাক্, এবার নিরাপদে তোকে আনতে পারা গেল। আর যা ছদ্মবেশ নিয়েছিস, তাতে পুলিশের বাবারও সাধ্যি নেই যে, তোকে চিনতে পারে।

কাদিরপুর বিক্রমপুরের মধ্যে একটি ষ্টীমার ষ্টেশন। ভাগ্যকুল গ্রাম এর কাছেই। সেটা অগ্রহায়ণ মাস। বর্ষার জল প্রায় শুকিয়ে এসেছে। বর্ষাকালে বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র জলে জলাকার হয়ে যায়। পাহাড়ের গা বেয়ে পদ্মানদীতে যে ঢল নামে, তার ফলে নদী এতখানি স্ফীতকায় হয়ে ওঠে যে, কূল ছাপিয়ে সেই জলরাশি এসে প্রবেশ করে গ্রামে আর খাল বিল পুকুর ডুবিয়ে দিয়ে, পথঘাট ডুবিয়ে দিয়ে, কোথাও কোথাও প্রায় দশ হাত গভীরতা সৃষ্টি করে। জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধান ও পাটগাছগুলিও দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে উঠে জলের ওপর গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন হাট-বাজারে যেতে হয় নৌকোয়, স্কুলে যেতে হয় নৌকোয়, নৌকোর সাহায্য ব্যতীত এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। কখনো কখনো এই বিপুল জলরাশি সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়ে হাট-বাজারও

ডুবিয়ে দেয়, গৃহস্থের আঙ্গিনায়ও প্রবেশ করে। তখন এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে হয় সাঁকোর সাহায্যে। আশ্বিনের শেষাশেষি এই জলরাশিতে ভাটার টান পড়ে। কার্ত্তিকে পথ-ঘাট শুকিয়ে আসে আর অগ্রহায়ণে জল নেমে গিয়ে আশ্রয় নেয় শুধু খালে, বিলে, ডোবায় ও পুষ্করিণীতে। যাতায়াতে তখন অসুবিধা ও কষ্টের সীমা নেই। কোথাও হাঁটু-প্রমাণ কাদা একটা নরক সৃষ্টি করে রেখেছে, তারপরই হয়তো মাইলখানেক পথ শুকনো খাঁ খাঁ করছে। কোথাও খাল বেয়ে নৌকো চলে যায় হেসেখেলে পাল তুলে, আবার কোথাও এসে অকস্মাৎ একেবারে ডাঙ্গার ওপর উঠে পড়ে।

সংবাদ নিয়ে জানা গেল, নৌকোযোগে আমরা ঘোলঘর পর্য্যন্ত যেতে পারবো। সেখান থেকে আমাদের গ্রাম মাত্র দেড় মাইল। ঘোলঘর পৌছতে আমাদের বেশ রাত হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই, কারণ গ্রামের পথঘাট আমাদের মুখস্থ, আর আমি তো রাত্রেই চাই গ্রামে পৌছতে সবার অলক্ষ্যে, সবার অজ্ঞাতে। শ্রীপদকে রেখে পরদিনই আবার এমনি গভীর রাত্রে গ্রাম ত্যাগ করে ফিরে আসবো কলকাতায়—এই ছিল আমার কর্ম্মসূচী।

দু'ধারে উঁচু পাড়, তার মাঝে ক্ষীণকায় খাল। অন্ধকার রাতে আমাদের নৌকো এগিয়ে চলেছে। ছইয়ের মধ্যে বিছানো বিছানায় শ্রীপদ সটান শুয়ে আছে আর আমি কেরোসিন ল্যাম্পের স্তিমিত আলোয় একখানা বই পড়ছি নিবিষ্টমনে। চোখ দুটো আটকে রয়েছে বইয়ের অক্ষরে, কিন্তু কানদুটো খাড়া রয়েছে বন্যহরিণের মতো। বাইরের সামান্যতম শব্দও যেন না ফসকে যায়। গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগটা পায়ের কাছে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে ল্যাপডগের মতো।

বাইরে নিবিড় অন্ধকার। মাঝে মাঝে দু'একটা ঝিঁঝি পোকার বিকট একঘেয়ে শব্দ শোনা যাচ্ছে আর গাছের ডালে ডালে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য জোনাকির চুমকি। জ্বলছে আর নিভছে। ভিজে মাটির কেমন একটা গন্ধ!

শ্রীপদ যেন অনেকক্ষণ মনে মনে মহলা দিয়ে একসময় গম্ভীর গলায় ডাকলো: দ্বিজেন!

তৎক্ষণাৎ আমি তাকে সংশোধন করে দিয়ে বললাম: দ্বিজেন নয়, বরেন, তপেন, রাম, শ্যাম, যদু, হরি—যা খুশী তাই বল, শুধু দ্বিজেন নয়।

ম্লান হাসি হাসবার চেষ্টা করলো শ্রীপদ: ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু ছাখ, এমনিভাবে আর কতকাল পালিয়ে পালিয়ে থাকবি?

বললাম ঃ যতদিন না ধরা পড়ি।

বন্ধুর কোমল হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো ঃ তা জানি। কিন্তু জ্যেঠাইমা আর জ্যেঠামশায়ের কথা একবার ভেবে গ্যাখ্। পুজোর সময় যখন এসেছিলাম, জ্যেঠামশায় আমায় কত বললেন, কত দুঃখ জানালেন, আর জ্যেঠাইমা তো কেঁদেই আকুল! তাঁদের কত আশা ছিল, তুই বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে আসবি—

বাধা দিতে হলো ঃ মানুষের মনে কত আশাই না বুদ্বুদের মতো ভেসে ওঠে শ্রীপদ, তার কটা পূরণ হয়?

শ্রীপদ দমবার পাত্র নয় ঃ বেশ, তাই যদি বল, তাহলে যে আশা নিয়ে তোমরা এই পথে পা বাড়িয়েছ, সে আশাও তো পূরণ নাও হতে পারে। তোমাদের পথই যে নির্ভুল, এই পথে এগিয়ে গেলেই যে অভীষ্ট লাভ হবেই, এর গ্যারান্টি তোমরা দিতে পারো কি?—শ্রীপদ এবার লজিকের ওপর ভর করে যেন হাইকোর্টে মিঃ জাষ্টিসের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সওয়াল সুরু করলো ব্যারিষ্টার সি. আর. দাশের মতো ঃ যার গ্যারান্টি তোমরা দিতে পারো না, নিশ্চয়ই সে সম্বন্ধে তোমরাই নিশ্চিত নও। আর নিশ্চিতই যদি না হও, তাহলে আমি প্রশ্ন করতে পারি কি, এমনিভাবে অনিশ্চয় ও আলেয়ার পেছনে দেশের যুবকদের টেনে নেবার অধিকার তোমরা কোত্থেকে পেলে? নিজের সম্ভাবনাময় জীবন যেমনি নষ্ট করছো, তেমনি নষ্ট করছো আরও দশজনের। এর জন্য তোমায় কি আমি অভিযুক্ত করতে পারিনে?

চুপ করে গেলাম। জবাব দেবার কিছু নেই বলে নয়, জবাব দেবো না বলে। জানি শ্রীপদ আমায় কতখানি ভালবাসে, আমার মত ও পথের সঙ্গে তার এতটুকুও না মিললেও দূর থেকেই সে তার ভগবানের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা জানায় আমার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের। যে সর্ব্বনাশা পথে আমরা বিচরণ করি, তার কাছে ঘেঁসতেও সে ভয় পায় জানি এবং তার আতঙ্কের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমার কাছে প্রকাশ করতেও তার বাধে না সত্য, কিন্তু তার আদালতী লজিকের অন্তরালে স্ফটিক-স্বচ্ছ হৃদয়ের যে নিরবকুণ্ঠ দরদ উৎসারিত হচ্ছিল, আর একবার নতুন করে তা সর্ব্ব মন নিয়ে অনুভব করলাম।

আমি নীরব থাকলেও আমার বন্ধু নীরব থাকবার পাত্র নয়, বিশেষ করে যখন সে অনুভব করে যে, যুক্তি-বাণে সে আমায় কোণঠাসা করে ফেলছে।

সে জানে যে, পরাজয় আমি মেনে নিতে রাজী আছি শুধু যুক্তির কাছে, ভ্রূকুটি, হুমকি বা অশ্রুজলের কাছে নয়।

কিন্তু শ্রীপদ তার সওয়ালের উপসংহার টানবার আর সুযোগ পেল না। অকস্মাৎ বছিরদ্দী মাঝি লগি হাতে বসে পড়ে ফিসফিস করে বললো: দূরে দারোগার নাওয়ের মতন একখানা নাও দেখা যাইতে আছে। আপনে কর্ত্তা, ঘোমটা দিয়া বসেন আর ল্যাম্পটা দেন নিবাইয়া।—বলেই সে আপন মনে আবার লগি মারতে লাগলো, মুখে বিচিত্র সুরে ধরলো একটি সরস জারিগানের সরসতম কলি:

তোমার লইগা মরলাম
কাঁইন্দা বন্ধুরে,
ডাইকা ডাইকা পলাইয়া
যাও ক্যামনে রে—

ফস্ করে ল্যাম্প ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া হলো। চট্ করে ছইয়ের একদিকে একখানা চাদর ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। শ্রীপদ আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে বোধহয় দুর্গানাম জপ করতে লাগলো। আর আমি গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগটা ভেতরে টেনে নিয়ে একখানা চাদর মাথায় ঘোমটার মতো করে টেনে দিয়ে বেড়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে অকস্মাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না সুরু করে দিলাম।

বছিরদ্দী আমার পুরোনো মাঝি ও সাগরেদ, পুরাতন ভৃত্যেরই মতো। এই সহজ কৌশলে বহুবার আমরা পুলিশের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করেছি। বিশেষ করে রাত্রিবেলা। ওর নৌকো ব্যতীত বিক্রমপুরে বর্ষাকালে আমি এক পাও যেতাম না কোথাও। পুলিশের নৌকোখানি যেই কাছে এসে পড়ে, অমনি বছিরদ্দী অগ্রণী হয়ে দারোগাকে সভক্তি সেলাম নিবেদন করে বলে: কাঁদবো আর কে? আপনার বৌমা কর্ত্তা। বাপের বাড়ী থিকা আসোনের সময় পেরতেক বারই এমন কইরা ফোঁপাইব। বুড়া হইয়া গেল, তবো বাপের বাড়ীর টান গেল না—অ্যাঁ?

দারোগারা সাধারণতঃ এই জাতীয় রসিকতায় বেশ কৌতুক অনুভব করে।

কিন্তু এবার রক্ষা পাওয়া গেল। পাশ দিয়ে গা-ঘেঁসে যে নৌকোখানি বিপরীত দিকে চলে গেল, সেখানা দারোগার নৌকো নয়। গানের সুর থামিয়ে বছিরদ্দী হি-হি করে হেসে উঠলো। বন্ধু শ্রীপদ তখন কম্বলের নীচে ঘেমে

উঠেছে। মাথার বালিশ দু'টো আমি কোল থেকে নামিয়ে রেখে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আবার কেরোসিন ল্যাম্পটি জ্বেলে দিলাম।

পুঁটিমারা খালের এক জায়গায় নৌকো বাঁধলো বছিরদ্দী, বললো: আইসা পড়ছি কর্ত্তা।

প্রথমে নামলাম আমি, তারপর অসুস্থ শ্রীপদকে নামাবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলাম। দেড় মাইল পথ পায়ে হেঁটে যখন বাড়ীতে এসে পেঁাছলাম, তখন রাত বারোটা বেজে গেছে।

দুই

কিন্তু পরদিন রওনা হবার পথে দেখা দিল একটা প্রকাণ্ড অন্তরায়।

দূর সম্পর্কীয় বিলাস কাকার মেয়ে রেণুর সেদিন বিয়ে।

আনন্দোৎসব বা কোন প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় ছ' বছর পূর্ব্বেই চুকে গেছে। তাই গ্রামের বা পাড়ার কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানেই আমাকে পাওয়া যেত না। আত্মীয়জনের বিবাহেও নয়। পুলিশ যেমন করে খুঁজছে আমায়, এমনি অবস্থায় তো এক ঘণ্টা দেরী করাও বিপজ্জনক।—আমার এই যুক্তি দিয়ে সবাইকে শান্ত করে দিলেও কিছুতেই পারলাম না জেদ বজায় রাখতে যখন স্বয়ং রেণু এসে হাত ধরে ফেললো এবং বললো: সবাইকে ফিরিয়ে দিতে পারলেও আমায় পারবে না। তোমায় থাকতে হবে। রাত ন'টার মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর রওনা হয়ো—আমি আপত্তি করবো না।

সত্যিই রেণু আমার প্রিয় বোনটি। বড়ো-ছোটোর সম্বন্ধ নয়, আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল কি করে জানি না একটা মধুর বন্ধুত্বের বন্ধন। বয়সে ও শিক্ষায় দু'জনে সমপর্য্যায়ের নই বলেই বোধ হয় আমাদের মধ্যে নীরস ফর্মালিটির অস্তিত্ব ছিল না।

রাজী হতে হলো এবং আগুনের মত সেই খুশীর সন্দেশ মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানেই যেন অধিকতর উদ্দীপনা ও উৎসাহ দেখা দিল এবং আমাকেই জড়িয়ে পড়তে হলো তার সঙ্গে। রান্না কে করবে, কি কি রান্না হবে, কোথায় বরযাত্রীরা এসে বসবেন, কিভাবে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো হবে, কতজন বরযাত্রী আসবেন, তাঁরা সবাই মাংসাশী কি না, তারপর বরপক্ষের

দাবীমত জিনিষপত্র কেনা হয়েছে কি না, কোথায় বিবাহ-সভার আয়োজন হবে, কে সম্প্রদান করবেন, পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছে কি না, আলো কোথায়, বাইরের ঠাণ্ডা ঠেকিয়ে রাখবার মত পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সামিয়ানা এসেছে কি না—এমনি হাজারো ব্যাপারে মাথা গলিয়ে ও বিলি-ব্যবস্থা করে অঘ্রাণের শীতের মধ্যেই যখন পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম স্নানের জন্য, তখন পড়ন্ত রোদের আভা বটগাছের মাথায় চিকচিক করছে।

উপবাসী রেণু এসে আমায় চোখ রাঙিয়ে গেল : আর যদি একটি মিনিটও দেরী কর, তাহলে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি দাদা!

দুপুরের খাওয়া শেষ হলো বেলা চারটেতে। রেণুর শুকনো মুখখানা দেখে জিজ্ঞেস করলাম : তুই কি পরম নিষ্ঠাবতীর মতো বিয়ে করছিস নাকি রে?

কেন?

না খেয়ে মুখখানা গেছে শুকিয়ে, এ তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।

ইস্ জানো কিনা তাই। এমনি উপোস তোমাকেও একদিন করতে হবে জেনো।

হা হা করে হেসে উঠলাম : সে একদিন আমার জীবনে আসবে না রে।

এখনই এত বিরাগ? কত আর বয়েস হয়েছে, একুশ? না হয় হলেই আমার চাইতে তিন বছরের বড়, তবুও তোমার চাইতে অনেক বেশী বুঝি, জানো?

বল, কি কি বুঝতে পেরেছ?

মুচকি হেসে রেণু বলতে লাগলো : জানি একজনকে ভালবাসতে তুমি। মনে মনে তাকেই বিয়ে করবার পুরোপুরি ইচ্ছে ছিল, শুধু একবার সাধিলেই—কিন্তু হায়, কেউ আর সাধলো না। তাই না দাদা?

দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা।—বলে উঠে ওর বেণী ধরতে যাবো, এমন সময় ওর দাদা গণেশ এসে বললো : দাদা, কারিগর-বাড়ী থেকে যে ডে লাইটটা আনা হয়েছে, তেল ভরতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে সেটা থেকে তেল চুঁইয়ে পড়ে। এখন কি করা যায়?

বাধা পড়লো। গণেশকে সঙ্গে করে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসেই গুরুদাসের সঙ্গে দেখা : দাদা, বরযাত্রীদের ঘরে আরো একখানা শতরঞ্চি না হলে সবটা ঢাকছে না।

চল যাচ্ছি।—বলে এদেরকে নিয়ে পশ্চিম-বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। রেণুদের বাড়ী থেকে পশ্চিম-বাড়ীর দূরত্ব বেশী না হলেও রাস্তার একটা বাঁক ঘুরে যেতে হয়। অত্যন্ত উৎকণ্ঠা নিয়ে সেই বাঁকটি পেরিয়ে যেই দু'পা এগিয়েছি, অমনি দেখি সম্মুখে একজন একান্ত অপরিচিত ভদ্রলোক, সঙ্গে পাড়ার কতকগুলো ছোট ছেলে!

ওদের মধ্যেই একজন বলে উঠলো: এই তো উনি, ওঁরই নাম দ্বিজেন গাঙ্গুলী।

আগন্তুক যেন বেশ ঘাবড়ে গেলেন। দু' একবার কেসে গলাটা বৃথাই ঝাড়বার চেষ্টা করে, পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বৃথাই বার করে আবার তা পকেটে ভরে, অনেক দ্বিধা ও সঙ্কোচের বাধা অতিক্রম করবার চেষ্টা করে প্রশ্ন করলেন: আপনার নাম দ্বিজেনবাবু?

হ্যাঁ! কেন বলুন তো? কোথা থেকে আসছেন আপনি?

আবার সেই জড়তা: দেখুন, আমি, মানে আপনার কাছেই এসেছি। আপনি অবশ্য আমায় চেনেন না—কি করে চিনবেন বলুন। তা আমি আসছি শ্রীনগর থেকে।—চলুন, আপনার বাড়ীতে যাই, সেখানেই বরং—

ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেও কাটখোট্টা স্বরে প্রশ্ন করলাম: আপনার প্রয়োজন কি বলুন না?

না—তা প্রয়োজন বিশেষ কিছুই নয়। তা দেখুন, আমাদের কি দোষ বলুন! আমরা হুকুমের চাকর বই তো নয়। মানে—

চারিদিকে যেমন লোক জমে গেছে, তেমনি একেবারে থমথমে ভাব! সবার কপালেই কুঞ্চন-রেখা, চোখে নিদারুণ বিরক্তি। একই প্রশ্ন তখন সবার মনে মনে জলন্ত লৌহ-শলাকা চালিয়ে ফিরছে: তবে কি—

এই 'তবে কি'র জবাব তিনি অনেকক্ষণ আমতা-আমতা করে যা জানালেন, তার মর্মার্থ এই: আমাকে গ্রেপ্তার করা হলো। কাল ঢাকা থেকে পুলিশ-সুপার এসেছিলেন থানা পরিদর্শনে। তিনি বলে গেছেন যে আমি যে চট্টগ্রাম মেলে রওনা হয়েছি, সে সংবাদ তিনি পেয়েছেন। সুতরাং এই মুহূর্তে আমাকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

পুলিশ সুপারের এই হুকুম তামিল করতেই এসেছেন রাজেনবাবু—থানার দ্বিতীয় অফিসার।

স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল যে, গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ শিয়ালদহে অপেক্ষমান স্পাই-পুঙ্গবদের শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে পারেনি। যদিও বা সংশয় ছিল, তাও একটি প্রশ্নেই রাজেনবাবু দূর করে দিলেন: বাড়ী যাবেন না? চলুন। অবশ্য আপনার জামাকাপড় বদলে নেবার জন্য, আমার বিশেষ কিছুই প্রয়োজন নেই। সার্চ্চ করবার আদেশ যখন দেয়নি—শুধু আপনার নাকি একটা গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ—সেটাই শুধু একবার, মানে—

দেখতে হবে, তা চলুন না। ঐ তো আমার বাড়ী।

ইতিমধ্যে দু'জন হিন্দুস্থানী পুলিশকে দেখলাম এসে হাজির। দেখলাম তারা মালকোছা এঁটে ধুতি পরে তার ওপরেই ছোট সাইজের খাকি প্যাণ্ট চাপিয়ে দিয়েছে, বোতামগুলো তখনো এঁটে দেয়নি। আর দু'হাতে লাল পাগড়ীর সুদীর্ঘ কাপড়টা মাথায় পাগড়ী নয়, ফাট্‌কার মতো করে কোনরকমে জড়িয়ে নিচ্ছে।

আসামী ধরবার বেলায় বিশেষ করে স্বদেশী আসামীর ক্ষেত্রে কী সব কৌশল অবলম্বন করলে কাজটা সহজ ও ক্ষিপ্র হয়ে আসে, সে সব মূল্যবান শিক্ষা এদের সমাপ্ত হয়েছে। তাই আমাদের পাড়ায় প্রবেশ করবার পূর্ব্বে রাজেনবাবুর মতই নিজেদের পোষাক এরা লুকিয়ে রেখেছিল স্কন্ধে লম্বমান ঝোলার মধ্যে। পাছে লাল পাগড়ীর শুভাগমন কেউ দেখতে পেয়ে সংবাদটি সোজা আমায় পৌছে দেয়, পাছে আসামী তাদের মূঢ়তার সুযোগ নিয়ে ভেগে যায়, তাই তারা সরকারী তকমা ছেড়ে এসেছিল সিভিল পোষাকে। এখন দূর থেকে যখন বুঝতে পেরেছে যে, কাজ হাসিল হয়েছে, তখন পোষাক পরে জবরদস্ত হয়ে তারা এসে হাজির।

কিন্তু, আমার আসবার খোশ-খবর কালকে যেমন উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল, তেমনি আমার মহাপ্রস্থানের দুঃসংবাদটি সমস্ত আয়োজনটাই যেন ম্লান করে দিল!

ডে লাইটের তলাটা ফুটো হয়েছে, না একেবারেই ভেঙ্গে গেছে, গণেশ তা ভালো করে মনেই করতে পারলো না আর গুরুদাস যে কেন আমায় ডাকতে এসেছিল, সে কথা ভুলেই গেছে! রাজেনবাবু আমার গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগটির পরীক্ষাকার্য্য শেষ করে বিলাস কাকার বৈঠকখানাতে এসে বসতেই চারিদিক থেকে তাঁকে ছেলে বুড়ো ও মেয়েরা মহিলারা একেবারে ছেঁকে ধরলেন।

বিলাস কাকা পাড়ার অন্যান্য কাকাদের প্রতিনিধিস্বরূপ, বয়সে নয়, অভিজ্ঞতায় ও বুদ্ধিতে। তিনি বললেন : দেখুন, আজ আমার মেয়ে রেণুর বিয়ে। গ্রামের দূরের কথা, পাড়ার কোনো শুভ কাজে, এমন কি আত্মীয়জনের কাজেও দ্বিজেনকে পাওয়া যায় না। কারণ, ও যে কবে ও কখন এখানে আসবে আর বিনা নোটিশে কখনই বা ফস্ করে কোথায় চলে যাবে, তা দেবা ন জানন্তি। আজ বোধহয় রেণুরই ভাগ্যগুণে ও অকস্মাৎ এসে হাজির। চলেই যাচ্ছিল, রেণুই হাতেপায়ে ধরে ওকে নিরস্ত করেছে। এমনি শুভদিনের আনন্দে আপনি এসে বাধা সৃষ্টি করে বসলেন ?······

মর্মভেদী সংবাদটি ছেড়ে দেবার পর এক ঘণ্টা অতিক্রম হয়েছে। সুতরাং রাজেনবাবু হারানো সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন। ধীর শান্ত স্বরে তিনি যুক্তি দিয়ে নিজের অসহায় অবস্থার কথা বর্ণনা করলেন : দেখুন, বিশ্বাস করুন, এমন দিনে আসছি জানতে পারলে অন্ততঃ আমি এই নির্মম কাজের ভার নিতাম না। আমিও আপনাদেরই মত সামাজিক লোক, আমারও বাড়ীতে এমনি বিবাহাদি হয়ে থাকে। কিন্তু জানেন তো পরের চাকরি করি আর সে চাকরিই হচ্ছে অত্যন্ত নিরানন্দদায়ক। তাই আপনাদের বাধা সৃষ্টি করতে এসে আমিও কম দুঃখ পাচ্ছি না। কিন্তু আমার অসহায় অবস্থার কথাটা আপনারা একবার বিবেচনা করে দেখুন।

বলে তিনি করুণ দৃষ্টি একবার সভায় চতুর্দিকে বুলিয়ে নিলেন। কালু কাকা তাঁর কালো দাঁড়িতে হাত বুলোচ্ছেন, অশ্বিনী কাকা ধোঁয়া না বেরুলেও ভুড়ুক ভুড়ুক করে হুঁকো টেনে চলেছেন, বৃদ্ধ ও বধির অখিল কাকা কিছু শুনতে না পেলেও সবই বুঝতে পেরে একবার এর মুখের দিকে, আর একবার ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখছেন, দেবেন কাকা এসব ব্যাপারে চিরকালই অগ্রণী, তাই বিলাস কাকার ব্রীফ নিয়ে যেন তাঁর পাশে অপেক্ষা করছেন সওয়ালের পয়েণ্টগুলো ঠিক ঠিক ধরিয়ে দেবার জন্য। অতুল কাকা পুজো-অর্চনা নিয়েই থাকেন। তাই অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে এক পার্শ্বে বসে সবই শ্রীলোকনাথের হাতে তুলে দিয়ে স্বস্তিলাভের চেষ্টা করছেন।

কাকাদের ফাঁকে ফাঁকে প্রস্তুত হয়ে এসে বসেছে তাঁদের ছেলেরা, যুবকের দল, প্রয়োজন হলে জামার আস্তিন গুটিয়ে নিতে। জানালার ঝাঁপগুলো ঠেলে দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন কাকীমা, পিসিমা, মাসীমার দল ও তাঁদের মেয়েরা।

সমুখের প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হয়েছে কারিগর-বাড়ীর রমজান, ইলিয়াস, রেজা আলী, সিরাজ প্রভৃতি। বছিরদ্দী ব্যাটাও কোথা থেকে সংবাদ পেয়ে এসেছে এবং পুলিশকে সর্ব্বদাই ডোণ্ট কেয়ার ভাব দেখাবার জন্য বেস কেয়ারফ্রি-ভাবে এর ওর সঙ্গে হাসি তামাসা করে বেড়াচ্ছে।

আমার বাবাও এসেছেন এবং ঘটনার পরিণতি দেখাই যে শুধু তাঁর উদ্দেশ্য, তা প্রমাণ করবার জন্য একটি চেয়ারে বসে হাঁটুর ওপর হাঁটু তুলে দিয়েছেন আর হাতে ধরে রেখেছেন স্বহস্তে নির্ম্মিত নিম গাছের ডালের একটি যষ্টি। তাঁর বিশ্বাস, নিমের ডাল হাতে থাকলে মানুষের কোনো অমঙ্গলই আসতে পারে না। অদ্ভুতভাবে নীরব তিনি, এই সব আলাপ আলোচনার সঙ্গে তাঁর যেন কোনো সম্বন্ধ নেই। পুত্রকে তিনি চেনেন, খুব ভালোভাবেই জানেন; তাই রেণুর বিবাহে আমায় হারিয়ে সবাই অজস্র দুঃখ পেলেও আমার মনে যে তার প্রতিধ্বনি মিলবে না, সে সংবাদ তিনি রাখেন।

আসেনি বন্ধু শ্রীপদ আর আসেননি আমার মা। শ্রীপদ অসুস্থ, জ্বরের প্রকোপটা বেশ বেড়ে গেছে। আর মা এই বিদায়দৃশ্য সইতে পারবেনা বলে আর এদিকে আসেননি।

তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে। আর দু'টো ঘণ্টা পরেই বিয়ের লগ্ন। আসন্ন সেই উৎসবের প্রাক্কালে যেন একটি শোকসভা বসেছে।

কালু কাকা বললেন: কিন্তু রাজেনবাবু, ধরুন আমরা যদি সবাই মিলে আপনাকে লিখে দিই যে, কাল সকাল নয়টার মধ্যে আমরা দ্বিজেনকে থানায় পৌঁছে দোব, তাহলেও কি পারেন না ওকে আজ রেখে যেতে?

বিলাস কাকা অকস্মাৎ যেন একটা পথ খুঁজে পেলেন: মনে করুন না, ওর সঙ্গে আপনার আজ দেখাই হয়নি, ওকে বাড়ী পাননি কিংবা আপনাদের আসবার সংবাদ পেয়ে পূর্ব্বাহ্নেই ও সরে পড়েছে, তাহলে? অবশ্য, আমি বলছি না ওকে একেবারেই পাননি বলে রিপোর্ট দিয়ে নিজের চাকরি খারাপ করুন। কাল সকালে আপনিই আবার আসুন না সদলবলে। আমরা কথা দিচ্ছি, ও বাড়ীতে থাকবে এবং থানায় যাবে আপনাদের সঙ্গে।

এ যে কত বড় ঝুঁকি সেটা মনে মনে উপলব্ধি করে রাজেনবাবু আর একবার কেসে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন: দেখুন, আবারো বলি, আপনাদের দুঃখে আমি দুঃখ অনুভব করছি। কিন্তু দ্বিজেনবাবুকে পেয়েও পাইনি বলে

কি ভাবে ডায়েরী লিখবো বুঝতে পারছি না। আর, এই খবরটি ঘূর্ণাক্ষরেও ওপরে গিয়ে পড়লে শুধু যে চাকরি যাবে তাই নয়, জেলও হয়ে যাবে। তারপর কালকে ওঁকে পাঠিয়ে দেবার কথা। কোন্ আইনে আমি এমনি অদ্ভুত জামিন দিতে পারি বলুন? বিশেষ করে উনি তো আর আমাদের প্রিজনার নন। আই বি-র হুকুমে আমরা ওঁকে নিতে এসেছি। আই বি চীজটি যে কী বস্তু, তা তো আপনাদের অজানা নেই। ওরা ছেলেকে পর্য্যন্ত ধরিয়ে দিতে দ্বিধা করে না। · এমনি অবস্থায়—মানে,—

মানে প্রাঞ্জল হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আমার যেতে হবে। সে আমি জানি দু'ঘণ্টা পূর্ব্বেই যখন শ্রীমান্ রাজেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে গেছে, তখনই।

তথাপি আত্মীয়েরা, পড়শীরা এ গ্রামের লোকেরা বহু যুক্তির অবতারণা করলেন, বহু অনুরোধ জানালেন, যুবকেরা অজস্র বিতর্কের সৃষ্টি করলো এবং সমবেত মহিলা ও দর্শকেরা নীরবে জানালো তাদের অকুণ্ঠ বিক্ষোভ। কিন্তু settled fact কার্জ্জন সাহেবের বেলায় unsettled হলেও শ্রীনগর থানার দ্বিতীয় অফিসার রাজেনবাবুর বেলায় তা হতে পারলো না। বিনয়ের ও সমবেদনার পরকাষ্ঠা দেখালেও আসামীকে হাতছাড়া করবার প্রস্তাব তাঁর অন্তর স্পর্শ করলো না।

তার পরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সভা ছত্রভঙ্গ হয়ে জনসমাবেশে পরিণত হলো। কারু মুখে কথা নেই। সন্ধ্যার অন্ধকারে মনে হতে লাগলো যেন অজস্র প্রেতাত্মা কালো ছায়া ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আকাশেও এক ফালি কৃষ্ণাষ্টমীর চাঁদ। সে স্তিমিত দ্যুতিতে অন্ধকার আদৌ দূর হয়নি। তারাগুলোও তৈলহীন প্রদীপের মত মিট্‌মিট্ করছে। ডে লাইটের একটিও জ্বালা হয়নি তখনো। বরযাত্রীদের ঘর তখনো অন্ধকার।

রাজেনবাবুর পাশাপাশি আমি এগিয়ে চললাম। পশ্চিম-বাড়ীর বাঁকটার পাশে আসতেই মধুসূদন হাতে একটুকরো কাগজ গুঁজে দিয়ে গেল। খুলে দেখবার অবকাশ হলো না।

বরযাত্রীদের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় গুরুদাসকে খানিকটে উপদেশ দিলাম কি ভাবে ওঁদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে।

ধোপা-বাড়ী এসে পড়লো। এর পরই সদর রাস্তা। পশ্চাতে চেয়ে দেখলাম কয়েকটি লণ্ঠন হাতে দীর্ঘ নীরব শোকযাত্রা। কাকারা সবাই আছেন,

কাকীমারাও আছেন, পাড়ার ছেলেমেয়েরা আছে, কারিগর-বাড়ীর মুসলমানেরাও আছে, সবাই আছে! সবার উদ্দেশ্যেই যুক্তকরে প্রণাম জানিয়ে যখন সদর রাস্তায় পড়লাম, তখন অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল, বাবাকে তো যেন দেখতে পেলাম না এঁদের মধ্যে, আর মাকে······

অবাধ্য পুত্রের অবিমৃষ্যকারীতাকে দূর থেকেই হয়তো তাঁরা ধিক্কার জানাচ্ছেন। ঘরকে তুচ্ছ ক'রে যে পথে বেরিয়ে গেছে, ঘরের জাগ্রত দেবদেবীর স্নেহাশীর্ব্বাদ পাবার যোগ্যতা তার কোথায়? কিংবা হয়তো তা নয়। দুজনেই হয়তো দোতলায় বাবার ঘরে মহাদেবের মূর্ত্তির সম্মুখে বসে নীরবে অশ্রুমার্জ্জনা করছেন. ভগবান এই বে-হিসাবী পথিকের মঙ্গল করুন।······

একটু পরেই দেখা গেল বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে বাংলার হাজারো রাজবন্দীদের একজন আর তাকে ঘিরে সাবধানে চলেছে বৃটিশ সরকারের একজন এজেণ্ট ও তার দু'জন সহচর।

কারো মুখে রা নেই।

তিন

আশ্চর্য্য, পুঁটিমারা খালের ঠিক যেখানটায় মাত্র দু'দিন পূর্ব্বে গভীর রাত্রে অসুস্থ শ্রীপদকে আমি হাত ধরে নৌকো থেকে নামিয়েছিলাম, আজ ঠিক সেখানটাতেই অপেক্ষা করছে দারোগার নৌকোখানি। আর ওঠবার সময় রাজেনবাবু সত্যিসত্যিই নৌকো থেকে একখানা হাত প্রসারিত করে দিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন : হাত ধরে উঠুন। পড়ে যাবেন না যেন।

জায়গাটির কথা ভোলবার নয়। কারণ এর অনতিদূরেই বড় আকারের যে একখানা এক-মাল্লাই নৌকো ডোবানো দেখে গিয়েছিলাম, আজও সেখানা তেমনি গলা ডুবিয়ে যেন আমার যাত্রাপথের পানে চেয়ে রয়েছে। বিক্রমপুরে বর্ষা শেষ হয়ে এলে নৌকোগুলো দিয়ে তখন মাছ ধরা হয়। প্রথমে কতকগুলো জাবনা বা ধানগাছের খড় নৌকোর খোলে বিছিয়ে দেওয়া হয়। তারপর মাঝারা সাইজের গাছের কতকগুলো ডাল নৌকোর মধ্যে গুঁজে দিয়ে ওখানা খালে, বিলে অথবা পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয় একেবারে গভীরতম স্থানে। দিন পনেরো পর দড়ি ধরে টেনে নৌকোখানি ঝটিতি ভাসিয়ে তোলা হয়। জাবনা ও ডালের পাতাগুলো নৌকোর খোলে জমায়েৎ হয়ে মাছের চমৎকার আস্তানা তৈরী করে। ছোট ছোট মাছ, যথা ; কৈ, পুঁটি, ট্যাংরা, খলসে, টাকি, পাবতা প্রভৃতি ওতে প্রচুর পাওয়া যায়। অর্থাৎ বর্ষাকালের বাহন নৌকোকে বিক্রমপুরে শীতকালে মৎস্যশিকারে নিয়োগ করা হয়। এমনি একখানা নৌকো দু'দিন পূর্ব্বে যেখানটায় যেভাবে দেখে গিয়েছিলাম, আজও দেখি সেখানা তেমনি ভাবেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে।

নৌকো শ্রীনগরের পানে রওনা হলো। র‍্যাপারটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে বসলাম। রাজেনবাবু পাশেই বসলেন আর আমার দেহরক্ষীদের একজন ছইয়ের সম্মুখে আর একজন পশ্চাতে ঘাঁটি আগলে রইলো।

কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল যেন ভাল করে ঠাওরই করতে পারছিলাম না। বরং, বরযাত্রী ও জনবহুল আলোকোজ্জ্বল বিবাহসভায় কোথায় আমি গ্রহণ করবো একচ্ছত্র নেতার ভূমিকা, হাঁকডাকে ও বচন-বিন্যাসে কোথায় আমি অগ্রাণের শীতল ও মন্থর রাত্রি উত্তপ্ত ও সরগরম করে তুলবো,

ত্রুটিহীন বিলিব্যবস্থার জন্য কোথায় আমার উদ্দেশ্যে বর্ষিত হবে অজস্র স্তুতিবাণী, আর কোথায় বন্দী আমি, একাকী নিঃশব্দে চলেছি কারাগারের পথে।...... ছইয়ের সাথে ঝোলানো একটি ময়লা হারিকেন লণ্ঠন মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে আর কানে ভেসে আসছে জলের ছল্‌ছল্‌ একটানা শব্দ।

কে জানে, কারিগর-বাড়ীর ফুটো ডে লাইটের পরিবর্ত্তে মজুমদারদের লাইটটা আনা হয়েছে কি না, বরযাত্রীদের ঘরে আরো একখানা সতরঞ্চির ব্যবস্থা করা গেল কি না, গণেশ গুরুদাস নৃপেন ভূপেন পাড়ার ছেলেরা সবাই মিলে শুভ কাজটা যাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে যায়, কে জানে সেদিকে ওরা দৃষ্টি দিয়েছে, না এখনো ভাবছে যে, দ্বিজেনদা' যখন এসেছেন ও রয়ে গেছেন, তখন আর ভাবনা নেই, নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ না করে বরং মরণি পিসিমার সঙ্গে একটু খাতির জমাবার চেষ্টা করা যাক্, যদি ভাঁড়ারের চাবিটা পাঁচ মিনিটের জন্যও পাওয়া যায়। হাঁসাড়া গ্রামের বিখ্যাত ময়রা সুরেনের ওখান থেকে দই ও সন্দেশ এসেছে যে।

একটা অদ্ভুত চিন্তায় সমস্ত মন কেমন যেন কালো হয়ে গেল! হয়তো আলো জ্বালা হয়নি, বরযাত্রীদের ভালো করে অভ্যর্থনা জানানো হয়নি, বিলাস কাকার সঙ্গে বরকর্ত্তার হয়তো সামান্য ব্যাপার নিয়ে দারুণ বচসা বেধে গেছে, একটা বিশ্রী উত্তেজনাকর আবহাওয়ায় বিবাহসভা একেবারে ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়েছে, হয়তো রেণুই শেষ পর্য্যন্ত ঘোষণা করে দিয়েছে যে, সে বিয়ে করবে না।

চলে আসবার সময় মা বার বার আমার বিছানাটা আমার সঙ্গেই দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ভাবলেন, শোবার কষ্টটা অন্ততঃ বাঁচবে। কিন্তু মাথার বালিশ দুটো সঙ্গে করে পুলিশের খাঁচায় এসে প্রবেশ করা যে কতখানি বিপজ্জনক, মা তার কী জানেন? তাই বালিশ দুটিকে এড়িয়ে নিয়ে এসেছি শুধু একখানা সুজনী ও মশারি। রাজেনবাবুও রাজার হুকুমটুকুই শুধু তামিল করেছেন, তল্লাসী করেছেন শুধু আমার বিরাটাকার গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগটি, সামান্য মাথার বালিশের মধ্যে যে একটা রিভলভার থাকতে পারে, সে বুদ্ধি তাঁর হুকুম-তামিল-করা মাথায় আসবে কোত্থেকে?

তাকিয়ে দেখলাম, শ্রীমান্ রাজেন একটা সিগারেট প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। আমার নীরবতায় তাঁর সহানুভূতি জাগ্রত হলো: কী

unpleasant কাজ, একবার ভেবে দেখুন দ্বিজেনবাবু। আর এই শালা আই বি-দের জ্বালায় আমাদের হয়েছে আরও মুস্কিল! আমরা মশাই, চোর-বদমায়েস নিয়েই ব্যস্ত, এর মধ্যে আবার ভদ্রলোকের ছেলেদের নিয়ে টানাটানির কাজটা আমাদের ওপর ঠেলে দিস্ কেন? তোদের প্রিজনার, তোরাই এসে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যা না। আর ওদের গ্রেপ্তারেরও কোনো মাথা মুণ্ডু নেই। যাকে খুশী ধরলেই হলো, সাক্ষ্যপ্রমাণ তো আর হাজির করতে হবে না আদালতে, নইলে হাঙ্গামা যে কত, বাছাধনরা ভালো করে টের পেতেন।—বুঝলেন না, কাজ দেখাতে হবে তো, তাই।

অর্থাৎ, আমার গ্রেপ্তারের একমাত্র কারণ যে ঢাকা শহরের গোয়েন্দা বিভাগ, এ কথাটা তিনি বার বার আমায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন।

আমি কোনো উৎসাহই প্রকাশ করলাম না। কারণ আই বি হোক বা থানাই হোক, পুলিশকে আমরা সাপের মত খল ও বিশ্বাসঘাতক মনে করতাম। সুবিধে ও সুযোগ পেলেই যে এরা ফণা উদ্যত করবে ও দংশনেও লজ্জা পাবে না, এ সত্য আমাদের জানা ছিল। বাপ ছেলেকে ধরিয়ে দিয়ে মোটা পুরস্কার লাভ করেছে, বন্ধু বন্ধুর সর্ব্বনাশ সাধন করেছে, এমনি অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। তাই আমাদের নীতিই ছিল চুপ করে থাকা! বেফাঁস একটি-মাত্র কথা কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে বেরিয়ে এসে যে কী বিপর্যয় বাধিয়ে দিতে পারে, দলের বৈপ্লবিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার পথে কী পর্ব্বতপ্রমাণ বাধার সৃষ্টি করতে পারে, তা আমাদের জানা আছে।

কিন্তু, আমি নিরুত্তর থাকলেও রাজেনবাবু আদৌ নিরুৎসাহ বোধ করলেন না। তাঁর কণ্ঠ অনেকটা এ্যাপোলজীর মতো শোনাতে লাগলো: তারপর বললাম বড়বাবুকে যে, আপনি নিজে যান, দ্বিজেনবাবুকে আমি চিনি না, কোনদিন দেখিনি; আর সম্রাটের এত বড় একজন শত্রু, এঁকে তো আপনারই অভ্যর্থনা জানানো উচিত,—কিন্তু শুনলেন না। বড় হলে যা হয়, তাঁর কোন্ আত্মীয়ার আজ বিয়ে, সেই শেখরনগর গ্রামে। ব্যস্, তিনি চলে গেলেন। ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন, তিনি নিজে আজ একটি বিয়েতে বেশ ফুর্ত্তি করছেন, আর আপনাকে কিনা এমনি একটি বিয়ে থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হলো।

চট্ করে একটা সুযোগ পাওয়া গেল। থানার অফিসারদের মধ্যে

চাকরিগত রেষারেষি একটুআধটু থাকেই জানি। এই রেষারেষির সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক বন্দীদের অনেক সময়ই অনেক রকম সুবিধে এসে যায়। তাই সর্ব্বদাই আমরা এদের ঝগড়া বা ঈর্ষা জিইয়ে রাখি নিজেদের কাজে লাগাবার জন্য। বললাম: অনেক দেখেছি রাজেনবাবু। থানার বড় দারোগা সহকর্ম্মীদেব যে কী ঘৃণা করে, তাদের সঙ্গে প্রভু-ভৃত্যের মতো কী বিশ্রী ব্যবহার করে তা আর আপনি আমায় কি বলবেন। নিজের ঘরে দরজা ভেজিয়ে বসে ওরা চোরেব তলপীদারদের কাছ থেকে মোটা ঘুষ নিয়ে হয়তো অনায়াসে আপনার ফাইলের একটা নির্ঘাত conviction-এর মামলাই দিল ফাঁসিয়ে। বন্ধ হয়ে গেল আপনার reward আর promotion মাঝখান থেকে পুলিশসাহেবের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে জান কাবার। তাই না?

যা বলেছেন, দ্বিজেনবাবু।—বলে রাজেনবাবু আরো একটু ভালো করে বসে এবার বড় দারোগার শ্রাদ্ধ করতে যেন এগিয়ে এলেন। আমার ওসব কাহিনী শোনবার আদৌ ধৈর্য্য ছিল না, মাঝে মাঝে শুধু হুঁ'হ্যাঁ করে রাজেন-বাবুর উৎসাহ-প্রদীপের সলতেটা উস্‌কিয়ে দিচ্ছিলাম মাত্র। রাজেনবাবুর মুখে খই ফুটতে লাগলো।······

রাত প্রায় এগারোটায় এসে আমাদের নৌকো শ্রীনগর থানার ঘাটে ভিড়লো। থানার পুব দিকে এই ঘাট। খালের জল অনেক নীচে নেমে যাওয়ায় বাঁধানো ঘাটটার শেষে মাটি বেরিয়ে পড়েছে।

থানার বারান্দায় এসে উঠতেই বন্দুকধারী সিপাই এগিয়ে এসে মিলিটারী কায়দায় অভিবাদন জানালো। থানা একেবারে নীরব বলা যায়। উত্তর দিকের ব্যারাকে আলো জ্বালিয়ে কোন সিপাই তুলসীদাসের দোঁহা বিচিত্র সুরে পাঠ করছে, আর দক্ষিণ-পুব কোণের পোষ্টমাষ্টারের বাসায় একটি শিশুর বিরামহীন ক্রন্দন শোনা যাচ্ছে।

বড় দারোগা শেখরনগর থেকে ফিরে এসে শয্যাগ্রহণ করেছেন, থানার অন্যান্য কর্ম্মীরা সবাই যাঁর যাঁর বাসায় ফিরে গেছেন, থানার বারান্দায় এক লম্বা টেবিলের উপর ওভারকোট বিছিয়ে দু'টি সিপাই নিদ্রামগ্ন। এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করে রাজেনবাবু বললেন: চলুন আমার বাসায়, থাবেন।

তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বললাম: বলেন কি, তাহলে বড়বাবু আপনারই নামে ডায়েরী করে রাখবে। চাকরিটি খোয়াবেন।

রাজেনের পৌরুষে ঘা লাগল বুঝি ঃ রাখুন মশায়, ডায়েরী আমিও করতে পারি। আমিও থানার সেকেণ্ড অফিসার। প্রত্যেক সপ্তাহে আমারও confidential report পৃথক্ ভাবে এস পি-র অফিসে যায়।—আসুন।

অতএব রাজেনবাবুর পশ্চাতে থানার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। নৈশ প্রহরীর সম্মুখে আমার বক্রোক্তি ও রাজেনবাবুর উচ্ছ্বাসে এটা স্পষ্ট বোঝা গেল যে, থানায় স্পষ্ট দু'টি দল আছে বড়বাবু ও মেজবাবুর। সেজো ও ন'দেরও কি এক-আধজন স্তাবক নেই? খুশী হলাম। Divide and Rule—এ তো ইংরেজদেরই প্রথম নীতি এবং সফল নীতি।......

খেতে বসে বেশ তৃপ্তি পাওয়া গেল। ছেলে মেয়ে রাজেনবাবুর ক'জন কে জানে, এত রাতে হয়তো তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। দেখলাম রাজেনবাবুর স্ত্রী অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে অতীব উপাদেয় সরস খাদ্যগুলি একই সাইজের প্রায় আধ ডজন বাটিতে সাজিয়ে দিয়ে গেলেন। শুধু পোনা মাছ আর মুরগীর মাংসই নয়, আবার কয়েক রকমের পিঠেও। নাম বোধ হয় তার একটারও জানি নে, কিন্তু খেতে সবগুলোই চমৎকার।

আহারের পর এল পান, পান খাইনে শুনে আবার এল ভাজা মসলা। তারপর রাজেনবাবু বললেন ঃ কী করবো বলুন, হাতপা বাঁধা। নইলে আজ এখানেই আপনার শোবার ব্যবস্থা করে দিতাম। ঐ গারদে কি কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে থাকা সম্ভব?

এবার কিন্তু রাজেনবাবুর অকপটতায় আর সন্দেহ রইলো না। লোকটা সত্যই নেহাৎ গোবেচারা গোছের। জিজ্ঞেস করলাম ঃ কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, বাড়ীতে আপনি আগেই বলে গিয়েছিলেন আমার খাবার কথা। তা—ভালই করেছিলেন। কিন্তু খাবার ঝুঁকি নেয়া এক কথা, আর শোবার ঝুঁকি নেয়া একেবারে সাংঘাতিক। আমি কি আপনার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছি? কাজ নেই রাজেনবাবু, আমায় নিয়ে বড়বাবুর সঙ্গে আর ঝগড়া বাধিয়ে দরকার নেই। আরে মশাই, থানার হাজতে বেশ থাকা যাবে'খন।—চলুন।

রাজেনবাবু তবু দমবার পাত্র নন। বাড়ী থেকে বেশ ভালো বিছানা মশারি ও লেপ নিয়ে এসে নিজে হাজতের মধ্যে প্রবেশ করে পরিপাটি করে শয্যা রচনা করে দিলেন, তারপর আর একবার বড়বাবুর শ্রাদ্ধ করে ও আমায় অজস্র সমবেদনা ও দুঃখ জানিয়ে রাত্রির মত বিদায় নিয়ে গেলেন।

থানার হাজতটি কিন্তু একটু ভিন্ন রকমের। থানার ঘরখানা টিনের, তার মাঝখানকার বড় ঘরের মাঝে মোটা সোটা কাঠের চৌকো শিকের তৈরী একটি খাঁচা। খাঁচার মাথায় থানার পুরোনো ডায়েরী, রেজিষ্টার ও অন্যান্য অজস্র খাতাপত্র একেবারে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। ধূলোয় যে তা ভর্ত্তি, তাই নয়, তার মধ্যে ইঁদুরের আস্তানা। তারপর কাঠের শিক বলেই আছে তার জোড়া আর সেই জোড়ার ফাঁকে বাসা বেধে আছে অসংখ্য ছারপোকা।

একটু পরেই তা বেশ টের পেতে লাগলাম। ঘুম ভেঙ্গে গেল। খোলা দরজার বাইরে বারান্দায় বন্দুকধারী প্রহরী সম্পূর্ণ সজাগ। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আজ বুঝি ও একটু বিশেষরকম সচেতন। বাইরে অজস্র জ্যোৎস্না আর তেমনি ঘন কুয়াসা। উজ্জ্বল পশ্চাৎপটের সম্মুখে সিপাইয়ের শিল্যুট দেহখানা নড়াচড়া করছে।

······বিবাহ সভায় কিন্তু নিশ্চয়ই এখন আলোর ছড়াছড়ি—ডে লাইটগুলো সব জ্বালানো হয়েছে, বরযাত্রীদের বসবার ঘরখানা সুদৃশ্য সতরঞ্চি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে, আদরআপ্যায়ন চলেছে, খুশীতে উজ্জ্বল নরনারী হাঁকডাক করছে, সামিয়ানার নীচে হচ্ছে রেণুর শুভদৃষ্টি!······বরের চোখদুটিতে আলোর প্রতিবিম্ব, আর রেণুর? তার দুটি চোখে কী চক্চক্ করছে? দুটি মুক্তা? দুই বিন্দু অশ্রু?
······আবার ঘুমোতে চেষ্টা করলাম।

······জানি, আমার অভাবে কোনো অনুষ্ঠানেরই কোনরূপ ত্রুটি হবে না, খুশীতে মশগুল সবাই অন্ততঃ আজকের রাতের জন্য আমার অভাবের কথা ভুলে যাবে, হাসি-পরিহাস ও আনন্দ কলরবে বাসর ঘর মুখরিত হয়ে উঠবে, ফুল-ছড়ানো দুগ্ধফেননিভ শয্যায় এলিয়ে পড়ে রেণু নন্দনকাননের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠবে! ······নবজীবনের রোমাঞ্চকর সূচনায় একবারও কি তার দাদার কথা মনে পড়বে না? আনন্দের পানপাত্রখানি তার কি সত্যিই কাণায় কাণায় ভরে উঠবে?······আবার ঘুমোতে চেষ্টা করলাম।

সকাল বেলায় রাজেনবাবুর বাড়ী থেকে এল চা ও মুড়ি। থানা সরগরম হয়ে ওঠবার পূর্ব্বেই একখানা ছোট নৌকোয় আমায় রওনা হতে হলো লৌহজং অভিমুখে। গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ যাবার পথে লৌহজং একটি ষ্টীমার-ষ্টেশন। সেখানে সকাল দশটার মধ্যেই ঢাকা মেলষ্টীমার এসে পৌঁছে যায়। সেই ষ্টীমার ধরে আমায় যেতে হবে নারায়ণগঞ্জে, তারপর ট্রেণে ঢাকা।

এবার আমায় নিয়ে চললেন একজন সহকারী দারোগা, নাম সীতানাথ সেনগুপ্ত।

নৌকো শ্রীনগরের গণ্ডী পেরিয়ে মাঠে পড়তেই অকস্মাৎ অত্যন্ত নীরসভাবে প্রশ্ন করে বসলেন ঃ আপনার নাম ?

এই নাটকীয় প্রশ্নে লোকটার ওপর আমার ভারী বিরক্তি এল। আমি জানি, ওরই সঙ্গে আছে একখানা কমাণ্ড সার্টিফিকেট, যাতে লেখা আছে ঠিক কোন্ সময় কি নামের কাকে নিয়ে ও ঢাকা রওনা হলো। তারপর সকাল বেলা একজন বিপ্লবী বন্দীকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব গ্রহণ করে শ্রীমান্ যে একটিবারও সেই বন্দীর নাম জেনে নেবার আগ্রহ প্রকাশ করেনি, এ কথা কি বিশ্বাসের যোগ্য ?

তথাপি আমার নাম আর একবার উচ্চারণ করলাম। শুনেই ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা বড় মনিব্যাগ বার করে ফেললেন এবং তার একটি প্রকোষ্ঠ থেকে ছোট্ট এক টুকরো কাগজ বার করে আমার চোখের সামনে মেলে ধরে বললেন্ ঃ এই দেখুন। দেখলাম তাতে পেন্সিলে স্পষ্টভাবে লেখা ঃ দ্বিজেন গাঙ্গুলী।

ব্যাপার কি ? ভ্রূ কুঁচকে মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। লোকটি বেশ মুরুব্বিয়ানা হাসি হেসে আবার সেই কাগজের টুকরোটি মনিব্যাগে ভরে রেখে দিয়ে বললেন ঃ বলবো সব পরে। নৌকো আরও খানিকটে যাক্ আগে। দেখুন কি অদ্ভুত ব্যাপার, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, সাক্ষাৎ নেই, আমার নামও আপনি জানেন না, অথচ আপনার নাম লেখা একখানা কাগজ স্থান পেয়েছে আমার ব্যাগে। কি করে তা বলছি সব। দাঁড়ান, আরও একটু এগিয়ে যাই।

কৌতূহল দারুণ বেড়ে গেল। লোকটি তো বেশ সাসপেন্স সৃষ্টি করতে পারে! আমাদের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এঁকে আমি খুব সন্দেহের চক্ষে দেখতে লাগলাম। ভাবলাম, এ হয়তো একটি আস্ত ঘুঘু। নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে কথা আদায়ের চেষ্টা করবে। তাই জিহ্বার ওপর অধরের কঠিন বাধা চেপে ধরলাম।

এবারও যথারীতি দু'জন সিপাই এসেছে এবং যথারীতি তারা স্থান নিয়েছে ছইয়ের সম্মুখে ও পশ্চাতে।

অগ্রহায়ণের সকাল। ভারী মিঠে সকালের রোদ। দু'পাশের উঁচু পাড়ের কোথাও সরষে ফুল অজস্র ফুটে রয়েছে, কোথাও বা কলাইয়ের বন। সরু খালে জলও তেমন গভীর নয়, তাই মাঝি লগি মেরেই দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

সীতানাথ কৌতূহল সৃষ্টি করেই থেমে গিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন আমিই হয়তো এবার তাগাদা জানাব রহস্যভেদের জন্য। কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্ত করা আমাদের পক্ষে আদৌ কঠিন কাজ নয়। তাই বেশ দিব্যি বসে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সীতানাথ বোধহয় অনেকক্ষণ আমার দিক থেকে কোনো প্রশ্ন আসে কি না, তার জন্য অপেক্ষা করে করে একেবারে হতাশ হয়ে উঠলেন। তারপর একসময় বলে উঠলেন : গণেশ বোসকে চেনেন? গণেশ বোস? আপনাদের গাঁয়ের কালাচাঁদ দাসের বোনের জামাই? ডেকেছিলেন নাকি তাকে কোন দিন সেরাজদীঘা মেইল ডাকাতির জন্য? অকস্মাৎ তিন দিনের বৃষ্টির ফলে শুকনো মাঠ আবার জলে ভেসে যাওয়ায় সেই কাজটি স্থগিত রাখতে হলো।— আচ্ছা, আরো জিজ্ঞেস করি, তন্তর গ্রামের 'সীতা' নাটকাভিনয় আপনার দেখতে যাবার কারণ কি? রাজদিয়া গাঙ্গুলী-বাড়ীর পাশেই কোন্ পণ্ডিতের বাড়ীতে আপনার কে বন্ধু আছেন? মধুসূদন কি তাঁর নাম?

একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। সেই মুহূর্তে নৌকোর ওপর একটা বজ্র-পতনেও বোধহয় এতটা বিস্মিত হতাম না।...... লোকটি তো সত্যিই অনেক সংবাদ রাখে এবং এমন সব গূঢ় ও মারাত্মক সংবাদ রাখে, যা ঘুণাক্ষরেও এর কানে আসবার কথা নয়। আমি অবাকবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম সীতানাথের মুখের পানে, শুধু উচ্চারণ করলাম : গণেশ বোস?

হ্যাঁ।—সোৎসাহে সীতানাথ বলতে লাগলেন : মনে পড়ে মাস দুয়েক আগে একসঙ্গে এদিকে কয়েকখানা গ্রামের প্রায় পঁচিশখানা বাড়ীতে তল্লাসী হয়েছিল? আপনার বাড়ী, হাঁসাড়ার শান্তি সোমের বাড়ী, শেখরনগরের সুবোধ গুহের বাড়ী, তন্তরের সুবোধ চক্রবর্তীর বাড়ী—এমনি আরও অনেক বাড়ী। তল্লাসী দলের সঙ্গে আমি আপনার বাড়ী তল্লাসী করতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে আই বি-র লোক ছিল। সংবাদ ছিল, আপনার বাড়ীতে অনেকগুলো রিভলভার আছে—বিপ্লবীদের অস্ত্রাগার। মাটি খুঁড়ে একেবারে লাঙল চালাবার মতো করে এসেছিলাম। রিভলভার তো দূরের কথা, আপনার এক টুকরো হাতের লেখাই পাওয়া গেল না।

বললাম : তাহলে বাজে খবরের ওপর নির্ভর করে পরিশ্রমটা আপনাদের মাটি হলো বলুন ?

সীতানাথ তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন : নিশ্চয়ই নয়। কাজ আমাদের হাঁসিল হয়ে গেল। কারণ গণেশ বোসের হাতে যে চিঠিখানা আপনি সুবোধ গুহকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, সেখানা সে দু'দিন নিজের বাড়ীতেই রেখে দিয়েছিল। তল্লাসী করে সেখানা হস্তগত করা গেল আর অন্যান্য তল্লাসীগুলো তো শুধু লোক-দেখানো।

আমার বিস্ময়ের সীমা রইলো না : মানে ?

মানে অতি সহজ। গণেশ বোসকে বাঁচাতে হবে। চিঠির সংবাদ সে পূর্ব্বেই দিয়ে গেছে। কিন্তু চিঠিখানা যদি তল্লাসীর ছুতোয় হস্তগত করা যায়, তাহলে গণেশকে আপনাদের সন্দেহ করবার কারণ থাকবে না আর কাজে-কাজেই আরও অনেক কাল শ্রীমান্ আপনাদের অনেক গুপ্ত সংবাদ বয়ে নিয়ে এসে আমাদের বড়বাবুর কানে ঢালতে পারবে। সুতরাং—

সীতানাথের কোনো কথাই আর আমার কানে যাচ্ছিল না। সত্যিই কী সাংঘাতিক লোক এই গণেশ! মনে পড়লো কিছুদিন পূর্ব্বে সত্যি তাকে আর শেখরনগরের সুবোধ গুহকে আহ্বান করা হয়েছিল মারাত্মক একটি কাজে, যাতে হত্যার প্রয়োজন ছিল আর তা দিনেদুপুরে ও রামদা দিয়ে। সবই ঠিক ছিল, সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল সম্পূর্ণ, শেষমুহূর্ত্তে সংবাদ এল যে, নির্ব্বাচিত স্থানটিতে অকস্মাৎ বর্ষার জল এসে পড়েছে। মনে পড়লো, কাজটি হলো না বলাতে সুবোধের অপেক্ষা গণেশই যেন ভারী মুষড়ে পড়লো, এই একটি ডাকাতি দ্বারাই যেন সে গোটা দেশটাকে স্বাধীন করে ফেলতো—এমনি ভাব! তারপর সে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করতে লাগলো একখানা চিঠির জন্য। যতই আমি তা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতে লাগলাম, ততই সে চেপে ধরতে লাগলো একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে। সুবোধ গুহের প্রেরিত অতি বিশ্বাসী কর্ম্মী, বার বারই সে অনুরোধ জানাতে লাগলো সুবোধ বাবুকে লিখে দিতে যে, যে কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা হলো না, পরে হবে। নইলে সুবোধদা' মনে করতে পারেন যে, সে হয়তো ভয়ে এই কাজে আমার এখানেই আসেনি।

নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি যে চার লাইন লিখে দিয়েছিলাম, আজও স্পষ্ট মনে পড়ে : 'সে কাজ হলো না। জল এসে পড়েছে। হলে আবার জানাবো।

পরশু আপনার বাড়ীতে যাবো দুপুরে। না খেয়ে কিন্তু ফিরবো না। খাবার ঠিক রাখবেন।'

বেশ বুঝতে পারলাম এই চিঠিখানাই পুলিশের হাতে পৌঁছেছে। আর গণেশ বোসই হচ্ছে সরকারী গোয়েন্দা। কিন্তু এই সব সংবাদ যথাস্থানে পাঠাই কি করে? তারপর শুধু এই সংবাদই নয়। আমার যে দু'টো বালিশ বাড়ীতে রেখে এসেছি, সে দু'টোরও তো একটা সদ্গতি করা একান্ত প্রয়োজন। যাচ্ছি তো জেলে। চক্রব্যূহের মতো এর আছে অতি সহজ অসংখ্য প্রবেশ-পথ, কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ কোথায়?

অকস্মাৎ সীতানাথের কণ্ঠ কানে এল: দ্বিজেনবাবু, আমার বাড়ী বরিশালে। আমার কাকার নাম করলেই আপনি চিনতে পারবেন। প্রেসিডেন্সী জেলে তিনিও একজন রাজবন্দী। এটা একটা বিচিত্র এ্যাকসিডেন্ট বলা যায় যে, কাকার মতো প্রেসিডেন্সী জেলে না গিয়ে ভাইপো আজ শ্রীনগর থানার সহকারী দারোগা! তাই রাজবন্দীদের আমি চিনি। দেশের জন্য তাঁরা কতখানি আত্মত্যাগ করেছেন অন্তরে আমি তা উপলব্ধি করি। তাই প্রথমেই যেদিন গণেশ বোস এসে বড়বাবুর ঘরে বসে ফিস ফিস করে আপনার সম্বন্ধে একটা কাহিনী বিবৃত করছিল, পাশের ঘরে বসে কান পেতে আমি শুনছিলাম তা। সেদিন এই কাগজখানায় আপনার নাম লিখে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম আপনাদের বাড়ীর দিকে গেলে আপনাকে সব বলে আসবো। গেলাম বটে তল্লাসী পরোয়ানা নিয়ে, কিন্তু কোথায় আপনি?

কথা বলতে পারলাম না। লোকটা শুধু আমার নয়, আরও অনেকের, একটা গোটা বিপ্লবী দলের যে কতখানি উপকার করলো, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। দুর্দ্ধর্ষ বৃটিশসিংহের বিবরে যে এমনি ধারালো-দাঁত ইঁদুর বাস করে, সে সংবাদ নিশ্চয়ই এস পি-র কানে আজও যায়নি! একবার মনে হলো, লৌহজং যাবার পথে এই পুলিশের নৌকোতে বসেই সীতানাথকে recruit করে ফেলি, তাহলে বোধহয় দলের পরম কল্যাণ সাধন করা হবে। আবার ভাবলাম, অতটা না এগিয়ে এর হাত দিয়েই একটা সংবাদ পাঠাবার চেষ্টা করি ছোট ভাই রঞ্জলালের কাছে, কিংবা বিপদভঞ্জন অথবা খগেনের কাছে। কিন্তু একদিনের মধ্যে মাত্র দু'এক ঘণ্টা আলাপের পরই একজন সহকারী দারোগাকে কি অতখানি বিশ্বাস করা ঠিক হবে? তবে সংবাদগুলো পাঠাই কীভাবে?...

চার

প্রায় সাড়ে দশটায় আমরা এসে পৌঁছোলাম লৌহজং ষ্টেশনে। যথাসময়ে ঢাকা মেলষ্টীমার এল এবং আমরা তাতে চেপে বসলাম।

ষ্টীমারে ভিড় যে খুব বেশী তা নয়। তবে সবাই সতরঞ্চি, চাদর বা মাদুর বিছিয়ে নিয়েছে বলে সমস্ত ডেকটাই যাত্রীতে ভরে আছে বলে মনে হয়। এইসব ষ্টীমারের নীচের তলাটা বেশ নোংরা। বাক্স বা চটের ব্যাগভর্ত্তি মালপত্র থাকে, মাছের ঝুড়ি থাকে, দইয়ের ও ক্ষীরের হাঁড়ি থাকে, ষ্টীমারের দড়াদড়ি লোহা-লক্কড় থাকে। তারপর মাঝখানের সবটাই জুড়ে থাকে কলকব্জা—সেখানটা দারুণ গরম। দু'পাশে সারি সারি ঘর, কোনটা খালাসীদের রান্নাঘর, কোনটা সুখানি ও কোনটা সারেং-এর শয়নকক্ষ, কোনটা মলমূত্রাগার, কোনটাতে বাবুর্চ্চিদের ষ্টোর আর একখানা হচ্ছে কেরাণীর অফিস ও বিশ্রামকক্ষ দুই-ই।

দোতলা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেখানে শুধু যাত্রীদের আস্তানা। মালপত্রের বা রান্নাঘরের ঝামেলা নেই। ইন্টার ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস ও ফার্ষ্ট ক্লাস সব দোতলাতেই। সীতানাথবাবু ও আমি ইন্টার ক্লাসের একটি কামরায় এসে উঠলাম। সীতানাথবাবুর সাদা পোষাক, তাঁর অনুগামী সিপাই দু'জনেরও তাই; সুতরাং আমি যে একজন বন্দী, তা টের পাবারই উপায় ছিল না।

লৌহজংয়ের কাছে পদ্মা অত্যন্ত প্রশস্ত। বর্ষাকালের প্রচণ্ড তোড় এই শীতকালে সামান্য একটু কমেছে হয়তো, কিন্তু তবু অকস্মাৎ দৃষ্টিক্ষেপে বুকের ভিতরটায় একটা ধাক্কা লাগে! পাড়ের দিকে চাইলেই বেশ বোঝা যায়, এখনো দিবারাত্র পাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। একটি হিজল গাছের টিকিটুকু দেখা যাচ্ছে এখনো পাড়ের কাছেই জলের মধ্য থেকে। একটা প্রকাণ্ড বটগাছ তার সংখ্যাতীত ঝুরি সহ বোধহয় সবে উলটে পড়েছে, তাই পদ্মা এখনো তাকে কুক্ষিগত করতে পারেনি। খানকয়েক খড়ের ঘরের আধখানা চালা হাঁটু ভেঙ্গে এখনো দাঁড়িয়ে আছে একটি সম্পূর্ণ গৃহের শেষ চিহ্নস্বরূপ। দণ্ডাদেশ পেয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় তারা যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে! অনেকগুলি ভিটে খালি পড়ে আছে। বাসিন্দারা পূর্ব্বাহ্নেই সব গুছিয়ে নিয়ে হয়তো কোনো নিরাপদ স্থানে গিয়ে আবার নতুন করে ঘর বেঁধেছে।

পদ্মার পাড় এমনি অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ভেঙ্গে পড়ে যে, যারা দেখেনি, তারা তা ধারণাই করতে পারবে না। সন্ধ্যায় যে নদী পুরো দু'শো গজ দূরে ছিল, রাতারাতি তা শুধু যে এই দু'শো গজ মাটি গলাধঃকরণ করতে পারে, তাই নয়, পারে আরো চারশো গজ এগিয়ে যেতে। ফলে সন্ধ্যায় যে গৃহ শিশুদের কলহাস্যে ছিল মুখরিত, যে চায়ের দোকানে ছিল লোকজনের জটলা, সকালবেলায় তার চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকে না। শুধু রাত্রে কেন, দিনের বেলাতেও তাই। নদীর ধারে সকালের মিঠে রোদে এক দল ছেলে ছুটোছুটি করে খেলছে, কখন যে সেখানকার মাটিতে চুলের মতো সরু একটি চিড় দেখা দিল, তারপর সেই প্রকাণ্ড মাটির চাপের তলা দিয়ে জলের তোড় বার বার আঘাত হেনে কখন্ যে তা ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেল, ছেলেরা তা টেরই পেল না। তারপর একসময় অকস্মাৎ গাছপালা ঝোপজঙ্গলসহ ক্রীড়ারত ছেলের দল একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে তলিয়ে গেল নদীর মধ্যে।

পদ্মা নদীর ধারে এমনি মর্ম্মভেদী ঘটনা বিরল নয়। আর নদীর পানে চাইলে দেখা যায় তা যেন অনন্ত সমুদ্রের মতোই সীমাহীন, একেবারে দূরে—বহু দূরে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। সকালের রোদ নদীর এলোপাথাড়ি ঢেউয়ের মাথায় মাথায় চিকচিক করছে সাপের মাথার মণির মতো। দুঃসাহসী দু' একখানা জেলেডিঙ্গি সেই ঢেউয়ের ওপর টাল খেতে খেতে ভেসে চলেছে। পাল-তোলা দু' একখানা পাটের বা ধানের বিরাটকায় নৌকোও দেখতে পাওয়া যায় একখণ্ড তৃণের মতোই ঢেউয়ের ঘায়ে যেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে এগিয়ে চলেছে।

লৌহজং ষ্টেশনে একটি ফ্লাট আছে। সেটি ফ্লাটেই এসে ষ্টীমার লাগে। লোহার শিকলে আটকে রাখা সম্ভব নয় বলে ষ্টীমার থেকে নোঙর ফেলা হয়, তাও আবার একটা নয়, সম্মুখে ও পেছনে দু'টো। ইঞ্জিনহীন ষ্টীমারগুলিকে বলা হয় ফ্লাট, রেলের মালগাড়ীর মতো। এতে বুকিং অফিস আছে, মাল অফিস আছে, কেরাণীদের কোয়াটার আছে, তৃতীয়, মধ্যম ও প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামাগার আছে, তৃতীয় শ্রেণীর জেনানার জন্যও নির্দ্দিষ্ট আছে একটি কক্ষ। নদীর অবস্থা বুঝে ভাসমান ও চলমান এই ষ্টেশন ও প্লাটফরমটি খুশীমত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

সীতানাথবাবুর একটা নেশা আছে দেখা গেল ব্রিজ খেলা। ষ্টীমার ছেড়ে

দেবার আধঘণ্টার মধ্যেই দেখলাম তিনি একদল লোকের সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়ে শুধু যে তাঁদের সতরঞ্চিই দখল করে বসেছেন, তাই নয়, দু'জোড়া তাস নিয়ে তাঁদের ব্রিজ খেলা সুরু হয়ে গেছে। আমি জানি সামান্যই, এর কলাকৌশল তখনো ততটা রপ্ত করতে পারিনি ; তাই পাশে বসে এঁদের খেলার দর্শক হয়ে রইলাম। কিন্তু বুঝতে দেরী হলো না যে, সীতানাথ একজন পাকা খেলোয়াড়। তাঁর হিসাব একেবারে নিখুঁত, তাঁর আক্রমণ একেবারে শাণিত, কাজে কাজেই তাঁর জয় একেবারে অবধারিত। সীতানাথ পর পর জিততে লাগলেন আর আমিও ঘন ঘন উচ্ছ্বাসে তাঁর উৎসাহ সহস্র গুণ বাড়িয়ে দিয়ে তাঁর নেশা লক্ষ গুণ জমিয়ে দিতে লাগলাম।

ব্রিজের নেশায় সীতানাথ যখন একেবারে বুঁদ হয়ে গেছেন, সেই সময় আমি আবেদন জানালাম ঃ সীতানাথবাবু, বসে-বসে আর ভালো লাগছে না। একটু ঘুরে আসি ?

সীতানাথ আকাশ থেকে পড়লেন ঃ বিলক্ষণ। সে কথা আর বলতে !— রামভদ্দর সিং, বাবুর সঙ্গে যাও !

খুশী হতে পারলাম না। সঙ্গে আবার কেউ কেন ? সেই মাথার বালিশ ও গণেশ বোস তখনো আমার মাথায় ঘুরছে। ঢাকা জেলের ফটক পার হবার পূর্ব্বে যেভাবে হোক্ এই সংবাদ দু'টি পাঠাতে হবে। ভাবছিলাম, ষ্টীমারে ঘুরে একবারটি দেখবো চেনা লোক মিলে যায় কি না। কিন্তু রামভদ্দর 'স্বদেশীর' সঙ্গে কাউকে কথা কইতে দেখলে যে ওর আদৌ 'ভদ্দর' থাকবে না ! যাই হোক, কপাল ঠুকে সেই হিন্দুস্থানী দেহরক্ষীকে নিয়েই নীচে নেমে এলাম ও ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ফন্দী আঁটলাম, এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে রামভদ্দরকে একেবারে বিরক্ত করে তুলবো ! তাই তৃতীয় শ্রেণীর সিঁড়ি দিয়ে নেমে আবার প্রথম শ্রেণীর সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। ষ্টীমারের একেবারে সম্মুখভাগে ছড়ানো ইজিচেয়ারগুলোর একখানায় বসেই আবার উঠে পড়লাম। একেবারে পশ্চাতের সেকেণ্ড ক্লাসে ভোজনালয়ে ঢুকে নদীর দিকে বৃথাই দৃষ্টি প্রসারিত করে মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপরই এসে দাঁড়ালাম দোকানের সম্মুখে। বৃথাই এটা-ওটার দাম জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। তারপরই পাশের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গিয়ে ইঞ্জিনের পাশে দাঁড়িয়ে কলকজার কর্ম্মব্যস্ততা নিরীক্ষণ করতে প্রবৃত্ত হলাম। সারাক্ষণই

আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেমন খুঁজে বেড়াচ্ছিল একটি পরিচিত মুখ, রামভদ্দরও তেমনি সারাক্ষণই পশ্চাতে লেগেছিল একটি ফেউয়ের মতো !

কি যে করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙবার উপক্রম হয়ে এসেছে। নারায়ণগঞ্জ পৌছোবার পূর্ব্বে এই সংবাদ দু'টি যেভাবে হোক আমায় পাঠাতে হবেই। যদি প্রয়োজন হয়, রামভদ্দরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রেলিং-এর পাশে এনে উলটিয়ে জলে ফেলে দিতে হবে এবং তারপর আমাকেই নিঃশব্দে পেছনে গিয়ে পদ্মায় নামতে হবে। দলের নিরাপত্তার চাইতে আমার জীবনের মূল্য বেশী নয় !······

সংকল্প প্রায় এঁটে ফেলেছিলাম এবং তা সাধনের জন্যই রামভদ্দরকে নিয়ে ষ্টীমারের পশ্চাৎ দিকে এগিয়ে চললাম একেবারে প্রস্তুত হয়ে। প্রথমে রামভদ্দর, তারপর আমি। মোটা শিকলের সঙ্গে যেখানে হালখানা ঝোলানো রয়েছে, সেখানেই দোব ওকে ঠেলে ফেলে, তারপর একটা বয়া নিয়ে নিজে নীরবে নেমে যাবো। স্থিরপদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি, এমন সময় অকস্মাৎ এক 'দেশওয়ালা ভাই'-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রামভদ্দরের। লোকটা বোধহয় ঢাকা যাচ্ছে। আর্মপুলিশে কাজ করে। কাঁধের ওপর বি-এ-পি পেতলের ব্যাজ আঁটা।—ব্যস্, দু'জনে জমে গেল। বালিয়া জেলার কথা, নকরির কথা আব তার সঙ্গে খৈনি। সীতানাথ আর কত বড় নেশাখোর ?

বললাম ঃ সিপাইজি, আমি একটু ঘুরে আসি ততক্ষণ ?

আমার সভক্তি আবেদনে বালিয়া জেলার নরপুঙ্গবের পৌরুষ জেগে উঠলো। তাচ্ছিল্যভরে নিজেই যুক্তি দেখালো ঃ যান, বাবু যান। আরে, ইষ্টিমার ছোড়িয়ে তো আপনি আর বাহিবে যাইতে পারবেন না। কী হোবে একলা একটুখন ঘুমে বেড়াইলে।—যান, যান। তবে তুরন্ত ঘুমে আসবেন, হ্যাঁ ?—বলে রামভদ্দর তার গোঁফে একটি চাড়া লাগালো।

কিন্তু কি করা যেতে পারে ? সুযোগ তো পেলাম, কিন্তু চেনা লোক কোথায় পাই ? ঘুরতে লাগলাম আবার যদি পাওয়া যায়। অকস্মাৎ ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। ষ্টীমারের কেরাণীর ঘরের মধ্যে দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখি সুধীরবাবু খুব নিবিষ্ট মনে মোটা বাঁধানো খাতায় কি লিখছেন। একটু ভাবলাম কি করা যায়। তারপর সম্মুখে ও পশ্চাতে একবার তাকিয়ে নিয়ে সটান তাঁর ঘরে ঢুকে ধপ্ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

সুধীরবাবু রীতিমত চমকে উঠলেন : আরে, দ্বিজেনবাবু যে! কোথায় চললেন? নারায়ণগঞ্জে?

ঢাকাত্তে।—বলেই ফিসফিস করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম এবং তৎক্ষণাৎ দু'খানা চিঠি লেখার কাগজ ও দু'টো খাম চাইলাম। সুধীরবাবু আই. জি. এন. ও আর. এস. এন. কোম্পানীর নামছাপানো ব্রাউন রংয়ের দু'টুকরো কাগজ আর তাদেরই ব্যবহার্য্য ব্রাউন রংয়ের দু'খানা খাম দিলেন। কলম তাঁর মোটা, লিখতে দেরী হবে বলে পেন্সিল তুলে নিলাম। বন্ধু শ্রীপদর কাছে যে চিঠিখানা ঐ অত বড় ঝুঁকি নিয়ে খস খস করে লিখে দিয়েছিলাম, সেখানা সে আজো সযত্নে রেখে দিয়েছে :

ভাই, তোমায় অসুস্থ রেখে এসে আমার মন যে কত খারাপ হয়ে আছে, ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারি না। তারপর চলে আসবার সময় তোমার সাথে দেখাটা করেও আসতে পারলাম না। কত দিনের জন্যে চললাম, একমাত্র ভগবানই জানেন। আমার কথা যাতে না ভুলে যাও, সেজন্য আমার মাথার বালিশ দু'টি (যা আমি কলকাতা থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম) তুমি নিয়ো। মাকে এই পত্র দেখালেই তিনি তোমায় বালিশ দু'টি দিয়ে দেবেন। প্রতিদিন রাত্রে শোবার সময়ও একবারটি আমার বালিশে মাথা রেখে আমার কথা তোমার মনে পড়বে। আজ এইখানে বিদায়!

বন্ধু শ্রীপদর কল্যাণে বহুবার গোয়ালন্দ গেছি; তাই ষ্টীমারের প্রায় সব কেরাণীদের সঙ্গেই আমাব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল এত বেশী যে, চেনা কেউ গেলে আমার আর টিকিট কেনাই লাগতো না। সুধীরবাবু সেই চেনার দলের একজন।

চিঠি দু'খানা সাবধানে সুধীরবাবুর হেপাজতে দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে দু'চার পা যেতেই দেখি দেহরক্ষী রামভদ্দর দোতলা থেকে নামছে। আমায় দেখেই বলে উঠলো : আরে বাবু, আপনাকে ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে পা বেথা হইয়ে গেল। কুথা গেছিলেন?

একেবারে চোখ দু'টো কপালে তুলে ফেললাম : কোথায় আবার? এইখানে দাঁড়িয়ে ইঞ্জিন দেখছিলাম। তারপর সেখানে গিয়ে দেখি আপনি নেই। তাই আমিও খুঁজছি আপনাকে। চলুন, ওপরে যাই।

'আপনি' সম্বোধনের ফল একেবারে হাতে-হাতে পাওয়া গেল। বত্রিশটি

ঝক্‌ঝকে সাদা দাঁত দেখিয়ে রামভদ্দর হেসে উঠলেন এবং সুড়সুড় করে আবার ওপরে উঠতে লাগলেন!

নারায়ণগঞ্জে নেমেই ট্রেণ আর সেই ট্রেণে সোজা ঢাকায় এসে পৌঁছলাম বেলা আড়াইটেতে। ষ্টেশন থেকে সোজা গিয়ে উঠতে হলো আই বি অফিসে। আই বি অফিস তখন ছিল আদালতের কাছেই কোথাও।

রাজেন সরকার অবশ্য তাঁর এস পি-র হুকুম তামিল করেছেন মাত্র, আমায় সোজাসুজি রাজবন্দী করা হবে, না অন্য কোনো মামলায় জড়িয়ে দিয়ে একেবারে ফাঁসাবার চেষ্টা করা হবে, তা তিনি জানতেন না বটে, কিন্তু আমি আশঙ্কা করছিলাম গোয়েন্দা বিভাগ আপ্রাণ চেষ্টা করবে আমার কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্য। নেহাৎ না পারলে হয়তো রাজবন্দীই করে দেবে।

কারণ অনেক কথাই পুলিশ তখন জানতো না আর তাদের অজানা কথার স্তূপ বেড়েই চলেছিল দিনের পর দিন। ২১শে আগষ্ট ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলে ঢাকা বিভাগীয় পুলিশ কমিশনার মিঃ এ. ক্যাসেল্‌স্‌ রিভলভারের গুলীতে আহত হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার তত্ত্বাবধায়ক পুলিশ ইন্সপেক্টার আসানুল্লা চট্টগ্রাম শহরে ৩০শে আগষ্ট নিহত হন। সেপ্টেম্বর মাসে হিজলী বন্দিশিবিরে গুলী চালানোর ফলে রাজবন্দী সন্তোষ ও তারকেশ্বর নিহত হন। ২৮শে অক্টোবর ঢাকা শহরের বুকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডুর্নোকে গুলী করা হয়। পরদিনই কলকাতায় ইয়োরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্সকে গুলী করার চেষ্টা করা হয়। এ ছাড়া অনেকগুলো রাজনৈতিক ডাকাতিও সংঘটিত হয়।

এতগুলো হত্যা, হত্যার প্রচেষ্টা ও ডাকাতির পশ্চাতে কারা তৎপর, কি ভাবে তারা কাজ করছে, কি তাদের সর্ব্বনাশা কর্ম্মপন্থা, তাদের দলের নেতাদের নাম কি, এসব অমূল্য কথার একটিও তো জানা নেই গোয়েন্দা বিভাগের। তাই প্রস্তুত হয়ে ইন্সপেক্টার সাহেবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। সীতানাথ কোথায় চলে গেলেন জানি না।

এলেন ইন্সপেক্টার যোগিনী বসু। কথা কিভাবে আদায় করা যায়, সে বিদ্যে তাঁর ভালো করেই জানা আছে, আর এ ব্যাপারে তাঁর নামডাকও খুব। আমার সঙ্গে এই তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ।

কিন্তু ব্যবহার তাঁর একেবারে অদ্ভুত ঠেকলো: এই যে দ্বিজেনবাবু, এসে

গেছেন। বেশীক্ষণ আর আপনাকে আটকে রাখবো না। যদি ইচ্ছে করেন, একটা বিবৃতি দিতে পারেন। সই আপনাকে করতে হবে না, আমিই লিখে নোব। আর যদি না দেন, না দিলেন। দেখবেন, আপনার বন্ধুরা সবাই আছে ওখানে। শান্তি সোম, ভোলা বসাক, বিভূতি চৌধুরী সবাই—বলে যোগিনীবাবু একগাল হাসলেন।

আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললাম: কলকাতার এস বি অফিসেও আমি কখনো কোনো বিবৃতি দিইনি।

যোগিনীবাবু আর অযথা বিলম্ব করলেন না। একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে নিয়ে এলেন আমায় ঢাকা জেলের অফিসে এবং যখন কর্তৃপক্ষের হাতে আমায় বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন তখন অগ্রহায়ণের অপরাহ্ণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

প্রকাণ্ড ঢাকা সেন্ট্রাল জেল। প্রায় দু'হাজার কয়েদী এখানে বাস করে। একেবারে শহরের মাঝখানে বলা যায়। জেলের মধ্য থেকে বাইরের দোতলা ও তেতলা বাড়ীগুলি দেখা যায়।

একজন ডেপুটি জেলার আমার নাম, ধাম, বয়স লিখে নিয়ে একজন সিপাইকে সঙ্গে দিয়ে পাঁচ নম্বর খাতায় নিয়ে যেতে হুকুম করলেন। জেলের সদর দরজা থেকে বেশ খানিকটে দূরে পাঁচ নম্বর খাতা। পাঁচ নম্বর খাতা মানে খাতা নয়, ইয়ার্ড। পাঁচ নম্বর ইয়ার্ড।

ইয়ার্ডে ঢুকতেই অন্যান্য বন্দীরা একেবারে কলরব করে উঠলো: এই যে, তুমিও এসে গেছ দেখছি। ক'দিন ধরেই আমরা বলাবলি করছি তুমিই শুধু বাকি থেকে গেলে কি করে!

কে একজন বলে উঠলো: কেন, ভূর্নোর পরেই কি দ্বিজেনের পালা নাকি?

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

একটি প্রকাণ্ড তিনতলা লাল রংয়ের বাড়ী। নীচের তলায় থাকে আমাদের চাকর, ঠাকুর, ধোপা, নাপিত ও জমাদারের দল। দোতলা আর তেতলায় আমরা। তেতলার 'এ' ব্যারাকে আমার স্থান নির্দ্দিষ্ট হলো।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। জেলের সাধারণ কয়েদীদের দিনের বেলাতেই রাত্রের আহার শেষ করে বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যেই নিজেদের প্রকোষ্ঠে ঢুকে পড়তে হয়। শুধু আমাদের বেলাতেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম। রাত্রি সাড়ে দশটায়

বারো জনের একটি সিপাই দল এসে আমাদের গুনতি করে তালা এঁটে দিয়ে যায়। সন্ধ্যে হতেই কিচেনম্যানেজার নীরেনবাবু এসে জিজ্ঞেস করে গেলেন, রাত্রে আমি কি খাব, ঢাকাই পরোটা, না পোলাউ।

একজনের শোবার মত লোহার একখানা খাটিয়া, তার ওপর পাতা মোটা গদী, তোষক ও সুদৃশ্য সুজনী। সাদা ধবধবে খোলে ঢাকা দু'টি নরম শিয়রের বালিশ আর মাথার ওপর ম্যাঞ্চেষ্টার নেটের সাদা মশারি। পাশের টেবিলে কাচের ডোমআঁটা মোমবাতি।

বিছানায় গা এলিয়ে দেবার আগে কোটটা খুলে ফেললাম। শার্টও। তার পর চশমাটা খুলে কোটের পকেটে রাখতে যেতেই সহসা হাতে ঠেকলো এক টুকরো কাগজ। ওঃ, আমি তো একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। পরশু দিন বাড়ী থেকে রওনা হবার প্রাক্কালে মধুসূদন পশ্চিম-বাড়ীর কোণে এসে আমার হাতে গুঁজে দিয়েছিল এই টুকরোটি। আশ্চর্য্য, তাবপর আর আদৌ মনে পড়েনি এটার কথা। পকেটের কোন্ কোণে উপেক্ষিত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। শ্রীনগরে, আই বি অফিসে বা জেল-গেটে, কোথাও আবার আমার দেহতল্লাসী হয়নি। রেহাই পেয়েছি হয়তো রাজবন্দী বলে। পকেট থেকে টুকরোটি বার করে আলোর সামনে উঁচু করে ধরলাম। এ কি, এ যে রেণুর লেখা চিঠি। রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেললাম ঃ

দাদা,

আমি তোমায় বলেকয়ে রাখলোম বলেই আজ তোমায় ধরা পড়তে হলো। দোষ তাই আমারই। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবে কি না জানি নে, আজকের উৎসবে আনন্দ আর এতটুকু অবশিষ্ট নেই। নেহাৎ আদেশ পালন করবার জন্যই হয়তো আমায় সাজতে হবে ও পিঁড়িতে বসতে হবে।

যাঁরা আমার সম্প্রদান করবেন, তাঁরা কি আদৌ জানতে পারবেন যে, তুমি না থাকাতে আমার দুঃখের আর শেষ নেই?

ইতি

অভাগিনী রেণু

দুঃখের আর শেষ নেই। জানি, রেণু তার মনের কথাই লিখেছে। আর এ-ও জানি, লিখে জানায় না, মুখ ফুটেও কিছু বলে না, শুধু নীরবে নিভৃতে অশ্রুমোচন করে আর মনে মনে আমার কল্যাণকামনায় অদৃশ্য দেবতার পায়ে

মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে রক্তমোক্ষণ করে, আমার এমনি দরদীর সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু সবার আগে জানি, সবার শেষে জানি, সারাজীবন দিয়ে জানি যে, যখন এই মারাত্মক পথে যাত্রা সুরু করেছি, তখন দুঃখ দিতে হবে অনেককে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীকে আর—মাকে বাবাকে। শুধু সর্ব্ব দুঃখের ওপরে থাকবো আমরা, নিজেরা। দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা, দুঃখে যেন করিতে পারি জয়। তাই কারাগারকে মনে করবো খুশীর শীষ্ মহল, ফাঁসীর দড়িকে মনে করবো হাসনুহানার মালা!……

হঠাৎ চমক ভাঙ্গলো। ভোলাবাবু এসে বললেন: চলুন, খেতে যাই। নীরেনবাবুর ঘণ্টা অনেকক্ষণ বেজে গেছে।

নিঃশব্দে তাঁর পশ্চাতে নীচে নেমে এসে খাবার ঘরে প্রবেশ করলাম।

পাঁচ

একুশ বছর বয়সে রাজবন্দী হয়ে জেলে আসার মধ্যে কেমন একটা রোমাঞ্চময় অনুভূতি আছে, বাইরের সাধারণ লোক তা সহজে উপলব্ধি করতে পারবে না। মাত্র এক ঘণ্টার নোটিশে পারিবারিক আনন্দ-কলমুখর শান্তিপূর্ণ গৃহ ছেড়ে চলে এলাম। পশ্চাতে রেখে এলাম বাবা ও মা'র স্নেহের বন্ধন, সমবয়সীদের প্রীতি ও বন্ধুত্বের বন্ধন, গ্রামবাসীর সহযোগিতার বন্ধন—সর্ব্বপ্রকার বন্ধন সম্পূর্ণ অস্বীকার করে স্বচ্ছন্দ মনে চলে এলাম একেবারে জেলে। যাদের বাইরে রেখে এলাম, নিশ্চিত জানি আমার কথা তাদের মনে পড়বে, দৈনন্দিন হাজারো কাজের ফাঁকে অকস্মাৎ আমার স্মৃতি তাদেরকে নিমেষের জন্য হলেও চঞ্চল করে তুলবে, কবে আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে, সেই অনাগত সুদিনের অপেক্ষায় জানি, দিনের পর দিন চলবে তাদের নিরবকুণ্ঠ প্রতীক্ষা, দক্ষিণের কোঠায় প্রবেশ করলেই জানি মায়ের চোখে পড়বে আমার প্রতীক সেই গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগটি আর অমনি এক বিন্দু অবাধ্য অশ্রু তাঁর চোখের কোণে উদ্বেল হয়ে উঠবে! এ-ও জানি, গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্নদের শিক্ষা দান করতে গিয়ে বাবা বার বার আমার অভাব অনুভব করবেন, বার বার তাঁর নিমের লাঠিখানা দু'হাতে চেপে চেপে ধরবেন।

কিন্তু সর্ব্বপ্রকার বন্ধন, সর্ব্বপ্রকার পশ্চাতের টান অস্বীকার করে চলে এসে বাড়ী ও বাহির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে থাকার জন্য যে প্রচণ্ড মনো'বল ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন, সেকালে বিপ্লবীদের তার অনুশীলন করতে হতো। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ছিল আমাদের ইষ্টমন্ত্র: 'কৈ মাছের মতো কাদায় বাস করবি। কিন্তু গায়ে যেন এক ছিটে কাদা না লাগে।' বাবা মা আত্মীয়-পরিজন পড়শী গ্রামবাসী সবাইকে নিয়ে গোটা দেশকেই আমরা জীবনের চাইতে অধিক ভালবাসি সত্য, কিন্তু সে ভালোবাসায় মায়া নেই, দাসখৎ নেই। সেই ভালোবাসাই আমাদের বেহিসাবী করে তোলে, বিঘ্নসঙ্কুল পথে পা বাড়াবার সাহস জোগায়, মৃত্যুকে শ্যামের মত বরণ করে নেবার শক্তি জাগিয়ে তোলে, একেবারে একাগ্র মনে তদ্গতচিত্তে সুনিবিড় ভালোবাসা, শ্রীরাধিকা যেমন করে ভালোবেসেছিল কৃষ্ণকে, কিন্তু তথাপি ভালোবাসার বন্ধন আমরা স্বীকার করি না। যাদের নিয়ে এইমাত্র আমি হাস্যপরিহাসে, গল্পগুজবে একেবারে মশগুল হয়েছিলাম, অপ্রত্যাশিতভাবে এল বিদায় নেবার নোটিশ, তৎক্ষণাৎ সেই অম্লান হাসি নিয়ে, সেই হাল্কা মন নিয়েই বাইরে বেরিয়ে এলাম। যারা ভেতরে রইলো, তাদের পানে ফিরে চাইবারও অবসর নেই আমার, কারণ গ্রেপ্তার করে নিয়ে অত্যাচারী শাসক জানিয়েছে যে আর একটি চ্যালেঞ্জ! সেই চ্যালেঞ্জ আমায় গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের জীবনের একটি অধ্যায়ের সঙ্গে অপর অধ্যায়ের অ-মিল ও অসামঞ্জস্য এত বেশী যে, সাধারণ লোক তার হদিস করতে পারবে কি না সন্দেহ। কলকাতার গা-ঢাকা জীবনের ওপর যবনিকা টেনে দিয়ে এলাম বাড়ীতে, সেখানে পাড়ায় আনন্দে নিজেকে ঢেলে দিয়ে শুরু করলাম আর-এক অধ্যায়। তারপর পুলিশ সুপারের শমন যেতেই পশ্চাৎপট একেবারে মুছে ফেলে দিয়ে শুরু হলো সম্পূর্ণ নতুন এক অধ্যায়। এক-একটি অধ্যায় অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও তা স্বয়ংসম্পূর্ণ ধরে নিতে হবে। ভাড়াটেদের বাসগৃহ পরিবর্ত্তনের মতো। জাঁকিয়ে যেখানে বাস করছিলেন বছরের পর বছর, অকস্মাৎ একদিন সকালবেলা দেখা গেল, তাঁরা চলে যাচ্ছেন পাড়া ছেড়ে চিরদিনের মতো। রান্নাঘরের উনুনও ভেঙে দিয়ে গেছেন।

একুশ বছরের স্বাস্থ্যবান্ কিশোরের মনে বন্ধনজয়ের আনন্দ রোমাঞ্চ সৃষ্টি করবেই তো!

আমাদের ইয়ার্ড বেশ বড়। সম্মুখে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা, খোয়া ছড়ানো। মাঝে মাঝে পুরোনো ছাতিম বা কদম গাছ, তার নীচটা গোল করে শাণ দিয়ে বাঁধানো। তারই এক কোণে সারি সারি বোধহয় চল্লিশটা মলত্যাগের কুঠরী। এই কুঠরীগুলো মুখোমুখি দু'টি সারিতে বিভক্ত, কুড়ি আর কুড়ি। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, এই কুঠরীর সম্মুখ দিকে একেবারে খোলা আর বাকি তিন দিকে আড়াই ফুট উঁচু লোহার শিটের পার্টিশন। ভেতরে দু'পাশে সিমেণ্ট দিয়ে বসানো দু'খানা ইট আর তার মাঝখানে পিচ-লাগানো ছোট বেতের একটি ঝুড়ি! মাথা নীচু করে দু' চারদিন যাতায়াতের পরই আমরা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সাকরেদী করতে অভ্যস্ত হয়ে যাই। তখন মুখোমুখি বসতে যে আমাদের আদৌ অসুবিধে হয় না, শুধু তাই নয়, আমরা অনেক সময় অমনিভাবে বসে নানারকম গল্প-গুজব করি, নানারকম আলাপ-আলোচনা করি, হয়তো একটা গুরুত্বপূর্ণ সভাই করে ফেললাম। তাতে মারাত্মক একটি প্রস্তাবই হয়তো সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো যে, আশুবাবুর নামে সুপারিনটেনডেণ্টের কাছে নালিশ করতে হবে।

ইয়ার্ডের পূব দিকে ফুলের ছোট একটা বাগান। তাতে বাংলা দেশীয় নানা রকম অজস্র ফুল ফোটে। তার পাশেই রান্নাঘর। বিরাট দু'টি চুল্লীতে বিরাটকায় হাঁড়ি-কড়া চাপিয়ে প্রত্যেক বেলায় প্রায় দেড়শো জন রাজবন্দীর আহার্য্য প্রস্তুত করেন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ কিচেনম্যানেজার নীরেন মুখার্জ্জীর তত্ত্বাবধানে হয়তো শেখ রহিমদ্দী, অথবা বাঞ্ছারাম মণ্ডল।

সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত সাধারণ কয়েদীরাই রাজবন্দীদের চাকর, ঠাকুর, ধোপা, নাপিত ও জমাদারের কাজ করে থাকে। জেলের ব্যাপার সবই অদ্ভুত। বাইরে যে ছিল চাষী, দেখা গেল সে জেলের মধ্যে নাপিতের কাজ করছে, আর যে ছিল নাপিত, জমাদারের ঝাড়ু তার হাতে। এমনিভাবে রান্নার বামুনগিরি করে হয়তো ইউনিয়ন বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট, ধোপার কাজ করে হয়তো পথের ভিক্ষুক, চাকরের কাজ করে কোনো ভদ্রলোকের ছেলে আর জমাদারের কাজ করে সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকই। কারণ, জমাদারেরা প্রত্যেক দিন বারোটা বিড়ি পায়, তাদের খাদ্য 'উন্নত' শ্রেণীর এবং দণ্ড তাদের একটু ঘন-ঘন আর একটু বেশী পরিমাণে মকুব হয়ে থাকে। সুতরাং জেলের দুর্ভোগটা যথাসম্ভব কমিয়ে নিয়ে হাতের ঝাড়ু জেলের মধ্যেই ফেলে রেখে

বাইরে গিয়ে তারাই আবার হয়ে বসবে হয়তো কোনো সওদাগরী অফিসের বেয়ারা। জেলের মধ্যেকার সংবাদ ওখানেই সমাধিপ্রাপ্ত হয়, বিশ ফুট দেয়াল টপকে বা সান্ত্রী-পাহারাওলার লোহার দরজার মধ্য দিয়ে তা ঘুণাক্ষরেও বাইরে আসে না।

রান্নাঘরের পেছনে গোটা দুই ব্যাডমিণ্টন খেলার মাঠ। সামান্য কিছু সব্জীরও চাষ সেখানে হয় দেখা যাচ্ছে।

আইন অনুযায়ী যেখানেই আমরা থাকি না, গভর্ণমেণ্ট আমাদের খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে বাধ্য। কিন্তু এখানে ঘাস কোথায়? মাঠ কোথায়? কিন্তু আমরা সে অসুবিধায় দমবার পাত্র নই। তাই সম্মুখের খোয়া-ঢাকা মাঠে আমাদের রাগবি খেলা হয়। তারই একপাশে হয় ভলিবল্। রাগবির বল মাঝে মাঝে ফুটবলেও রূপান্তরিত হয়। আছড়ে পড়ে শরীরের নানা স্থানে ছড়ে যায়, কেটে যায়, পাইখানার নীচু লোহার চালে লেগে হরিদাসের একটা আঙ্গুল একদিন প্রায় ভেঙ্গেই গেল তবুও থামবার পাত্র আমরা নই।

সংবাদপত্রের মধ্যে আমাদের জন্য বরাদ্দ ষ্টেটস্‌ম্যান আর বাংলা সঞ্জীবনী ও হিতবাদী। ষ্টেটস্‌ম্যানে থাকে আগা খাঁয়ের ঘোড়ার সংবাদ আর যত ফিল্ম-ষ্টারদের পারিবারিক খোশখবর, তাই সঞ্জীবনীই ছিল আমাদের কাছে প্রিয় ও উপভোগ্য। প্রিয় এজন্য যে, ওতে রাজবন্দী সংবাদ নামে একটা ফিচার-কলাম ছিল, যাতে নয়া নয়া রাজবন্দীর নাম, রাজবন্দী স্থানান্তর ও রাজবন্দীর অসুস্থতার সংবাদ থাকতো। উপভোগ্য এজন্য যে, সঞ্জীবনী একেবারে ফোঁটা-তিলক-কাটা গোড়া হিন্দুর পত্রিকা। শান্তিনিকেতনের মেয়েরা 'জনসাধারণের কুদৃষ্টির সম্মুখে লাস্য নৃত্য করে' বলে সম্পাদক স্বয়ং বিশ্বকবিকেই অজস্র গালমন্দ করেছেন, একদিনের কাগজে পড়লাম। তথাপি. বাইরের চলিষ্ণু দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো এই সঞ্জীবনীই।

খাবার জন্য প্রত্যেকের বরাদ্দ ছিল এক টাকা দশ আনা দৈনিক আর মাসিক পকেটখরচা বাবদ কুড়ি টাকা। টাকাপয়সা এরা আমাদের হাতে দিত না। নীরেনবাবু দৈনন্দিন খাওয়ার জন্য ঐ বরাদ্দ অঙ্কের মধ্যে যা-খুশী-তাই রিকুইজিশন করতেন এবং আমরা পকেটখরচার টাকা দিয়ে যা-খুশী-তাই কিনতে পারতাম।

ঢাকা শহরে নীরেনবাবুর নাকি হোটেল ছিল শোনা গেল। তাই

ভদ্রলোক যেমন শহরের প্রতিটি তরী-তরকারির দর জানেন, তেমনি পরিপাটি করে খাওয়াতেও জানেন। শহরে ঠিকাদারের পক্ষে খুব বেশী ঠকানো যেমন সম্ভব ছিল না, তেমনি চর্ব্বচোষ্যলেহ্যপেয় ভোজনে আমাদের স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর উন্নত হতে লাগলো। আমাদের কিচেনকে আমরা নীরেনবাবুরই হোটেল বলে আখ্যা দিতাম। সত্যি, লোকটা অত্যন্ত পরিশ্রমী। রাবণের চিতার মতো জ্বলন্ত চুল্লীর ওপর বিরাটকায় কড়াইতে আমাদের রাঁধুনী বামুন ইয়াসিন হয়তো মিষ্টান্নের দুধটা ঠিক মত নাড়তেই পারছে না দেখে নীরেনবাবু নিজেই এলেন এগিয়ে। খুন্তী নয়, খন্তা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আধ মণ দুধ নাড়তে সুরু করলেন। সেই ভোর থেকে ভদ্রলোক ঠায় থাকেন রান্নাঘরের দরজায়। চতুর্দ্দিকে শ্যেনদৃষ্টি, এক চিমটি নুণ এদিক ওদিক করবার উপায় নেই, আর সেই রাত দশটায় আমাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে নীরেনবাবুর খাবার আসে তাঁর ঘরে! সম্ভব হলে আর সম্মত হলে আমরা নীরেনবাবুকে কিছু পারিশ্রমিকও দিতে প্রস্তুত ছিলাম। এত তাঁর কৃতিত্ব!

সকালে কোনদিন লুচি ও মুর্গীর মাংস, কোনদিন ফেনাভাত ও ঘি, আবার কোনদিন নারকেল-কোরা দিয়ে চিঁড়ে ভাজা, সঙ্গে হাঁসের ও মুরগীর ডিম—কাঁচা থেকে সুরু করে কোয়ার্টার, হাফ, থ্রি কোয়ার্টার ও ফুল বয়েল্‌ড, যার যতটা খুশী। এক-এক রকমের ডিমের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বালতি।

দুপুরের আহারটা অনেকটা অমানুষিক বলা যেতে পারে। ঢাকা শহরের সর্ব্ববৃহৎ চিতল মাছের পেটিগুলোই শুধু একদিন আনা হলো। একদিন আনা হলো এক ঝুড়িভর্ত্তি বেলে হাঁস। একদিন এলো প্রত্যেকের জন্য একটি করে রুই মাছের মাথা। কোনদিন হলো জনপ্রতি দু'টো করে মুর্গীর রোষ্ট। কোনদিন আস্ত ইলিশ মাছ ভাজা।

বিকেলে নানাজাতীয় ফল ও পোয়াটেক ছানা ও আধ সের ঘন দুধ। মাঝে মাঝে সে দুধে বাদাম, পেস্তা ও কিসমিসও পাওয়া যেত। আঙুর, বেদানা, আপেল ও কমলা রোজই মিলতো।

রাতের খাবার শেষ হলে লেমনেড, সোডা, কমলা ও অন্যান্য ফলের ব্যবস্থা ছিল। সকালে ঢাকার বিখ্যাত খাদ্য 'বাখরখানি' ও বিকেলে 'অমৃতি'ও থাকতো মাঝে মাঝে।

খাওয়া ব্যাপারে নামকরাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। তাই

দু'-চার দিন যেতে না যেতেই আমিও 'ভক্ষণ সমিতির' একজন বিশিষ্ট সভ্য হয়ে গেলাম।

তেতলায় আমাদের ঘরে, ঘর মানে দীর্ঘ হল-ঘরে, ভক্ষণ সমিতির আড্ডা। সভাপতি সুরেন্দ্র মজুমদার, সর্ব্ববয়োজ্যেষ্ঠ। সহসভাপতির পদ এখনো খালি আছে। অবশ্য সে পদের জন্য প্রার্থী আছেন নাম-করা ক'জন খাদক; যথা, তরণী সোম, বীরেন ঘোষ ও সতীশ দাশ। সভ্যসংখ্যা বর্ত্তমানে পনেরো জন।

সভ্য হবার নিয়ম কিন্তু সহজ নয়। কোনো বিশেষ ফরম্-এ আবেদনপত্র পেশ করতে হয়না বটে, তবু নিয়ম হচ্ছে, প্রার্থীকে সভায় বসে হয় একটি গান করতে হবে, নয় তো স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করতে হবে। গানের গলা না থাকলেও ক্ষতি নেই, কবির কলম ভেঙ্গে গেলেও আপত্তি নেই। গম্ভীর ভাবে যে কোনো গান যে কোনো সুরে ও তালে গলা ছেড়ে গাইতে হবে অন্ততঃ দু'মিনিট কিংবা ছন্দ ও মিল অর্থহীন হলেও যে কোনো স্বরচিত কবিতা সুর করে পাঠ করতে হবে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট। তারপর সভাপতি ও কার্য্যকরী সমিতি তার আবেদন সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন।

সভ্য হবার আর একটি যোগ্যতা চাই এবং সেটাই প্রাথমিক ও সর্ব্বপ্রধান। খেতে পারা চাই। সাধারণে যা খায়, অন্ততঃ তার দ্বিগুণ। ব্যঞ্জনের কোনো বাছাই থাকতে পারবে না, স্বাদের কোন বালাই থাকবে না, সময়ের কোনো বিচার নেই, যখন-তখন যা-তা জিনিস বাটি বাটি বা থালা থালা সাবাড় করে দিতে হবে। এবং সর্ব্বোপরি এর ফলে অসুখ হলে তৎক্ষণাৎ তার সভ্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। যে যত বেশী টানতে পারবে, সে তত বেশী সিনিয়রিটি দাবী করতে পারবে এবং তার সভ্যপদের শিকড় ততটা পাকা হয়ে উঠবে এবং তার কর্ত্তৃত্বও বেড়ে যাবে ততখানি।

ভোলাবাবু একদিন সভাপতি সুরেনদা'র সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরদিনই সন্ধ্যার পর ভক্ষণ সমিতির সভায় আমার ডাক পড়লো। গান আমি যে গাইতে না জানতাম তা নয়। বিয়েবাড়ীর মজলিসে বহু গান গেয়েছি। তথাপি কবিতা রচনারও ক্ষমতা যে আমার আয়ত্তে, সেটা প্রমাণ করবার জন্যই সভার সমক্ষে সুর করে স্বরচিত যে কবিতাটি পাঠ করেছিলাম, তার অনেকখানিই আমার মনে আছে আজো :

ওরে বীরেন, ওরে আমার ভোলা,
ওরে যতীন, ওরে বিপিন,
খাবার ঘরের দুয়ার বুঝি খোলা।

পেট-রোগারা ভাঙ্গা গলার জোরে
যা খুশী তাই বলে বেড়াক্ তোরে,
সকল যুক্তি হেলায় তুচ্ছ করে
দিনরাত্তির চালা, খাওয়া চালা।
আয় দিবাকর, আয় রে আমার ভোলা॥

এদিক্ ওদিক্ তাকাস্ নে আর কেউ,
ত্বাখ্ না চেয়ে বান ডেকেছে
কড়াই ছেপে উঠছে ডালের ঢেউ।

ঢালতে ওরা চায় না বাটি বাটি,
দেবার বেলা এমনি আঁটিসাটি,
মনে মনে জানে কিন্তু খাঁটি
একটু পরেই ঠক্‌ঠকাবে তলা।
তরণী রে, ওরে আমার ভোলা॥

নীরেনবাবু করবে তোরে মানা,
খালি কড়াই দেখবে যখন,
ভাববে এ কী বিষম কাণ্ডখানা।

খাওয়া দেখে উঠুন তিনি ঘেমে,
আসন ছেড়ে আসুন তিনি নেমে,
সেই সুযোগে দমের পরে দমে
কর রে সাবাড় বাটি এবং থালা।
ওরে রমেশ, ওরে আমার ভোলা॥

ম্যানেজারের খাবার আলমারী
চিরকাল কি রইবে বন্ধ?
হরিদাস, তুই আয় রে নীচে নেমে।

ভীমের মতন, কিন্তু গদা ছেড়ে
হাসি নয় রে, নিছক চুপিসাড়ে
খাবার ঘরের আলমারীটা ঝেড়ে
অমৃতি আর আন্ রে রসের গোলা।
ওরে নির্মল, ওরে আমার ভোলা॥

আপেলগুলি আন্ রে দেখে দেখে।
টক্ না লাগে আঙ্গুরগুলি,
মুখে ফেলে দেখিস্ নিজে চেখে।

কলা আছে, জানি শশা আছে,
তাই জেনে তো সিক্ত জিহ্বা নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পেট-রোগাদের কাছে
আহার নিয়েও হিসাব করে চলা।
ওরে ননী, ওরে আমার ভোলা॥

সভাপতি, তুই যে চিরজীবী।
গলা সমান আহার করে
ষ্ট্রেচার চড়ে শয্যা এসে নিবি।

খাবার নেশায় ভোর করেছিস্ কারা,
খাবার তরেই জেগে আসার তাড়া,
খেয়ে খেয়ে হোস্ যদি বা সারা,
গলায় দেবো রসগোল্লার মালা।
ওরে সুরেন, ওরে আমার ভোলা।

কবিতা শুনে সভাপতি গদগদ ভাষায় আমার অজস্র প্রশংসা করে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করলেন এবং যেমন সভ্যদের মনের কথা এমনি সরসভাবে কবিতার ছন্দে প্রকাশ করেছি, তেমনি নীরেনবাবুর ভাতের হাঁড়িও যেন উজাড় করে দিতে পারি, তেমনি একটা আন্তরিক আশা প্রকাশ করে তাঁর ভাষণ শেষ করলেন। করতালির শব্দে হল-ঘর কম্পিত হয়ে উঠলো। তবণীবাবু আতঙ্কিত হলেন সহ-সভাপতির শূন্য আসন বুঝি দ্বিজেনবাবুই পূরণ করে বসেন।

আলোচ্য বিষয়ের তালিকার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে সুরেনদা' ঘোষণা করলেন : এবার নির্ম্মল বসুর সঙ্গীত! জীবনে নির্ম্মল কোনোদিন গান করেনি, সুর, তাল, লয়, মান এসব তার কাছে গ্রীক, কোনো গানের কোনো লাইনও সে জানে না। কিন্তু ভক্ষণ সমিতি নিয়মানুবর্ত্তিতায় অগ্রগামী, সভাপতির আদেশ তাকে পালন করতে হবেই।

দু'বার কেশে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে খুব গম্ভীরভাবে মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে প্রাণ মন ঢেলে দিয়ে সে সুরু করলো :

জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে
ভারত ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ।
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ।

এর পরের লাইন নির্ম্মলের কিছুতেই আর মনে পড়ছে না। ওদিকে কয়েদীদের এ্যালুমিনিয়মের থালা বাজিয়ে তবলচী বীরেন ঘোষ যে তাল রাখছে, যদি সে তাল কেটে যায়? তাই দেরী আর না করে নির্ম্মল অকস্মাৎ প্রচণ্ড চীৎকারে পাচ নম্বর ইয়ার্ড প্রকম্পিত করে ধরে বসলো :

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় হে,
ভারত ভাগ্যবিধাতা।

অধিবেশন চলতে থাকাকালে হাসি নিষিদ্ধ। অথচ হাসির বেগে প্রত্যেকেরই দম ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছে! সুরেনদা'র দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এলেও অন্তর্দৃষ্টি তাঁর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। অবস্থা সঙ্গীন দেখে তৎক্ষণাৎ তিনি সভাভঙ্গের আদেশ-বাণী ঘোষণা করলেন। আর যায় কোথা! হাসির চোটে সবাই একেবারে পাগল হয়ে উঠলো। ভোলাবাবু তো ছুটেই পালিয়ে গেলেন একেবারে ঘরের বাইরে। সে এক অদ্ভুত, অফুরন্ত একটানা হাসি। কিছুতেই আর থামতে চায় না। হয়তো একজন খানিকটে সামলে নিয়েছে, অমনি পাশের একজন আবার খুক খুক সুরু করলো। বাস, আবার হো হো সুরু হয়ে গেল।

কতক্ষণ হেসেছিলাম জানি না। অকস্মাৎ আমাদের হাসিতে বাধা দিয়ে যুদ্ধের দামামার মতো খাবার ঘণ্টা বেজে উঠলো। অমনি হাসি একেবারে

থেমে গেল। বিরাট কর্ত্তব্য আমাদের সম্মুখে এসেছে তারই উদাত্ত আহ্বান. কারণ নীরেনবাবুর ডালের কড়াই আজ আমরা আক্রমণ করবো। অতএব, চল সবে, যাই সমরে!

আমাদের সংগ্রাম-নীতি অতীব উদার। প্রতিপক্ষকে আমাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুর কথা জানিয়ে দিই পূর্ব্বাহ্নেই। হোক না সে প্রস্তুত, কী যায় আসে? 'সমুদ্রমপি শোষয়ামি' মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে ভক্ষণ সমিতির সম্মিলিত আক্রমণ-ধারা নীরেনবাবু কতক্ষণ সইতে পারবেন? অতএব একসময় বিরাট ডালের কড়াইয়েরও তলদেশ দেখা যেতে লাগলো এবং সাত বাটি চুমুক দিয়ে খাবার পর তখনো হরিদাস ডাল ডাল বলে হাঁক ছাড়ছে! সভাপতি সুরেনদা' ডালের বাটির মধ্যে একমুঠো ভাত ছড়িয়ে নিয়েছেন আর নির্ম্মল নিয়ে বসেছে ছোটখাটো একটি গামলা।

নীরেনবাবু এগিয়ে এলেন। সবিনয়ে নিবেদন করলেন: ডাল আর নেই। ভক্ষণ সমিতির সভ্যবৃন্দ শোভাযাত্রা করে বিজয়োল্লাসে ঘরে ফিরে এল। রাত তখন প্রায় দশটা। একটু পরেই আমাদের লোহার শিকের দরজা রাতের মত বন্ধ হয়ে গেল।

দরজা বন্ধ হলেও আমাদের আলাপআলোচনা তখনো বন্ধ হয় না; আমাদের দিন তখনো শেষ হয় না। বীরেন ব্যাপার মুড়ি দিয়ে আমার সীটে এসে বসলো। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তার পর অকস্মাৎ একসময় গলা খাটো করে বললো: কুমিল্লার বিস্তৃত সংবাদ জানা গেছে দ্বিজেনবাবু। ষ্টীভেন্স সাহেবকে যারা হত্যা করেছে, তাদের নাম শান্তি ঘোষ আর সুনীতি চৌধুরী। হত্যা করে স্বেচ্ছায় তারা ধরা দিয়েছে। পালাবার এতটুকু চেষ্টা করেনি তারা। কিন্তু এদের নির্ঘাৎ ফাঁসী হয়ে যাবে।

চুপ করে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় ঘটনাটি যা পড়েছি: মিঃ ষ্টীভেন্স কুমিল্লার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। একদিন তাঁর বাংলোতে যেমন অনেকে অনেক রকম আবেদন ও নিবেদন নিয়ে আসে, তেমনিভাবেই এল দু'টি স্থানীয় স্কুলের ছাত্রী। বয়েস কতোই-বা আর হবে! ষোলো কি সতেরো। শহরেরই বাসিন্দা, অপরিচিত নয় কেউ। ষ্টীভেন্স সাহেবের

হাতে যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর একখানি আবেদপত্র তারা পেশ করলে— একটি সন্তরণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা তারা করতে চায়; এ ব্যাপারে স্বয়ং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যদি অনুগ্রহ করে একটু অগ্রণী হয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন···সাহেব ভ্রূ কুঁচকে বললেন: দেখা যাবে।

আবেদন পত্রখানা এক জনের হাতে ফিরিয়ে দিতে যেতেই অপর মেয়েটি ফস্ করে শাড়ীর আড়াল থেকে বার করলো একটি রিভলভার। একটি মাত্র গর্জ্জন শোনা গেল আর শোনা গেল জেলানায়ক ষ্টীভেন্স সাহেবের পতনশব্দ। বাধা দিতে ছুটে এল ক'জন এঘর ওঘর থেকে। কিন্তু অপর মেয়েটি সেজন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। আবেদন পত্র ফেলে দিয়ে সেও রিভলভার উঁচিয়ে ধরলো ও এলোপাথাড়ি গুলী চালাতে লাগলো। তারপর শান্ত হয়ে তারা ধরা দিল।

মনের কোণে একটা কাঁটা যেন খচ্ খচ্ করতে লাগলো। এ পর্য্যন্ত মারণাস্ত্র দেখা গেছে ছেলেদেরই হাতে। তাদেরই অস্ত্রগর্জ্জনে একে একে ধরাধাম থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেছেন পেডি, লোম্যান, সিম্পসন, গার্লিক। কিন্তু মেয়েদের হাতে রিভলভার ?····

সহসা কিছু বলতে পারলাম না। বীরেন বোধহয় সেটা উপলব্ধি করেই আর কিছু বললো না। ধীরে ধীরে নিজের সীটে গিয়ে মশারির মধ্যে প্রবেশ করলো। কি ভাবছিলাম জানিনে। সে ভাবনার যেমন নেই অর্থ, তেমন নেই সামঞ্জস্য। কিন্তু কোথা থেকে যেন কীসব অজস্র চিন্তার পোকা মাথার মধ্যে ঢুকে কিলবিল করতে লাগলো!

চেয়ে দেখলাম প্রায় সবাই শুয়ে পড়েছে। ভোলাবাবু মা'র কাছে নিবিষ্ট মনে একখানা চিঠি লিখছেন আর মশারির মধ্যে বসে বসে নির্ম্মল পড়ছে স্বামী বিবেকানন্দের "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য।" সবার টেবিলের মোমবাতিগুলো আমাদের ভৃত্যেরা নিবিয়ে দিয়ে গেছে। সারারাত ঘর অন্ধকার রাখা নিয়ম-বিরুদ্ধ বলে মেঝের ওপর গোটাচারেক হারিকেন কমিয়ে রাখা হয়েছে।

বাইরের শহরেও চাঞ্চল্য কমে এসেছে নিশ্চয়। শীতের রাত এগারটায় সবাই এসে নিজের গৃহে আশ্রয় নিয়েছে। পাটবিহীন দরজার সমান জানালাপথে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, আকাশে কাস্তের মত একফালি চাঁদ আর তাকে ঘিরে অসংখ্য মিটমিটে তারা। কেমন যেন কুয়াসায় ঢাকা মনে হয়। হাঁক দিলাম: হালিম, আলোটা নিয়ে যাও।

হালিম আলো নিয়ে গেল। আমি লেপখানা মাথার ওপর টেনে দিয়ে চোখ বুজলাম। কিন্তু চোখ বুজলেই কি ঘুম আসে? কিংবা ঘুম এসেছিল। ঘুমের মধ্যে দেখলাম বিচিত্র এক স্বপ্ন!···মিশমিশে কালো আকাশ। নেই চাঁদ, নেই একটিও তারা। জমাট অন্ধকারের পুরু একটা সামিয়ানা দিগ্‌দিগন্ত ছেয়ে যেন টাঙ্গানো রয়েছে। হঠাৎ দেখলে অন্তরাত্মা বুঝি কেঁপে ওঠে ভয়ে! মনে হয়, অক্টোপাশের মতো হিংস্র চোখ মেলে অন্ধকার যেন ওৎ পেতে বসে আছে কিংবা পাইথনের মতো মুখব্যাদান করে রয়েছে!··· অকস্মাৎ সেই কালো যবনিকায় দেখা গেল কেমন নীলাভ আলোকের বিচ্ছুরণ। দুটি সরু লিকলিকে শিখা কেঁপে কেঁপে একেবারে লেলিহান হয়ে উঠলো। স্পষ্ট দেখা গেল, দু'টি নারীমূর্তি ফাঁসীর রজ্জুতে ঝুলছে! আলুলায়িত কুন্তলা, স্খলিতবসনা ষোড়শী। আকাশের কালো মেঘের অন্তরাল থেকে নেমেছে দু'টি রজ্জু, সেই রজ্জুতে লম্বমান দু'টি কিশোরী। কোথাথেকে আসা দমকা হাওয়ায় তাদের বন্ধনহীন কেশরাশি আকাশে উড়ছে। তারা-গুলোকে ঢেকে দিয়েছে, আড়াল করে রেখেছে পূর্ণিমার চাঁদকে। চুলের ফাঁকে ফাঁকে এলোপাথাড়ি হাওয়া শন্ শন্ করে বয়ে চলেছে। শব্দ শোনা যাচ্ছে গোখরো সাপের ফোঁসফোসানির মত। নারী দু'টির শুষ্ক অধরকোণে তখনো অপরিম্লান হাসির ঝিলিক। দু'কস বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে গরম রক্তের ধারা, ইথারের গা বেয়ে এক-একটি বিন্দু হয়ে। বাতাসের সংস্পর্শে এসেই ফসফরাসের মতো তা জ্বলে জ্বলে উঠছে, উল্কার মতো তির্য্যক্‌গতিতে ছিটকে পড়ছে পৃথিবীর প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে।······

অপরিসীম সাহসে ভর করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম নারী দু'টির মুখের পানে। —এ কি, চেনা-চেনা মনে হয় কেন? কোথায় যেন দেখেছি এদের? কোথায়? আমাদের দেশে? আমাদের গ্রামে? আমাদের পাড়ায়? তোমার বাড়ীতে? আমাদের বাড়ীতে? এ কি, তোমাদের-আমাদের বোনের মত কেন এদের দেখতে? তবে কি—তবে কি—

অকস্মাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। হালিম এসে ডাকছে: বাবু চা। পাঁচটা বেজে গেছে।

ইঃ, লেপখানা একেবারে ভিজে গেছে দেখছি।··· ··হাত বাড়িয়ে ব্র্যাকেট থেকে তোয়ালেখানা টেনে নিলাম।

ছয়

দিবাকর সেনগুপ্ত নামে এক ভদ্রলোক আমাদেরই ঘরের বাসিন্দা। সুপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান্ এবং বেশ আলাপী। কিন্তু মুশকিল দেখা দেয় সেখানটাতেই। ভদ্রলোকের আলাপটা কেমন যেন গায়ে-পড়া গোছের। যা তিনি জানেন না, তা জানবার জন্য তাঁর কৌতূহল বেশ তীব্র মনে হয়, অথচ ভাবখানা এমনি দেখাতে চেষ্টা করেন যেন ওসব কেন, ওর চাইতে অনেক বেশী কথা তাঁর জানা আছে: এটা শুধু গল্পচ্ছলেই এসে গেছে বলেই এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। ইচ্ছে হয় জবাব দিন্, না হয় না দেবেন। তাতে হায়-আফসোস নেই।

অথচ হায়-আফসোস যে তার যথেষ্ট থাকে, তাব প্রমাণ আমি নিজেও পেলাম। পেডি, লোম্যান, সিম্পসন আর গার্লিককে যাঁরা হত্যা করেছেন, তাঁরা কি সবাই বি ভির লোক? একদিন দুপুরে খোলামাঠে বসে শরীরে তেল মর্দন করতে করতে তিনি এই প্রশ্নটি আমায় করলেন।

আকাশ থেকে পড়লাম! বললাম: তা কি করে বলবো বলুন? রিভলভার নিয়ে যারা গেল, তারা তো আর আমায় জিজ্ঞেস করে যায়নি।

দিবাকর এই হত্যাকাণ্ডগুলোর ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন: কিন্তু শোনা যায়, ঢাকার এই বি ভিই সেই মেদিনীপুরে গিয়ে প্রথম বিপ্লবী দল গড়ে তোলে। সত্যি নয়?

তা তো জানিনে।

মৃদু হেসে দিবাকর বললেন: বুঝেছি, আপনি কিছুই বলবেন না। কিন্তু অনুশীলনের লোকেরা এই সব life for life কাজগুলো নিজেদের বলে দাবী করছে, সে সংবাদ রাখেন? এই তো সেদিন এসেছে রমেশ ভট্টাচার্য্য। ও কি প্রচার করছে জানেন? বিনয় বসু না কি কায়েৎটুলীর ওদের কুস্তির আখড়ায় নিয়মিত কুস্তি করতে যেতো। আর দীনেশ গুপ্ত তো নাকি ওর নিজের হাতের recruit করা ছেলে, রিভলভার ছোড়া সে-ই নাকি তাকে শিখিয়েছিল। ওদের এসব কথার প্রতিবাদ করাও কি আপনি উচিত মনে করেন না?

নির্ব্বিকার কণ্ঠে জবাব দিলাম : না।

কেন ?

কারণ রমেশবাবু নিজেই জানেন যে, তিনি চাল মারছেন, কারণ ঢাকা শহরের এমন একটি লোক নেই যে, বিনয় বোস আর দীনেশ গুপ্তকে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের পুরোভাগে মার্চ করতে দেখেনি। শুধু শহর কেন, বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামেও এই অমিতাচার দু'জনকে চামেশা দেখা গেছে ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠনের কাজে।

দিবাকরবাবু অকস্মাৎ ক্ষেপে ওঠেন : চলুন, এখনই যাই রমেশবাবুর কাছে। মিথ্যেবাদীর—

বাধা দিলাম : থাক্, প্রয়োজন নেই। Falsehood shall meet a natural death—অপেক্ষা করুন।

কিন্তু দিবাকরবাবুর ধৈর্য্য যেন আর বাধ মানছে না! সেদিনই রাত্রে ঘর বন্ধ হয়ে যাবার পর ভদ্রলোক আবার এসে হাজির।

দ্বিজেনবাবু, কি করছেন ?—ও, ডষ্টয়ভস্কির "মাদার"! পড়ুন। চমৎকার বই। কিন্তু আগে পড়েননি ?

সময় কোথায় ?—বলে বইখানা টেবিলে রাখলাম। দিবাকরও বসে পড়লেন এবং আমার কথার রেশ ধরে বেশ বলে যেতে লাগলেন : তা তো নিশ্চয়ই। বাইরে থাকলেই খালি কাজ আর কাজ। নাওয়া খাওয়ায়ই সময় মেলে না, তার আবার বই পড়া! বিক্রমপুরের দক্ষিণভাগটা পুরোই তো আপনার চার্জে ছিল, তাই না? তা থাকবেই তো। এই প্রায় এক মাসের পরিচয়ে যতটুকু আপনাকে বুঝতে পেরেছি দ্বিজেনবাবু, তাতে করে মনে হয়, আপনি বি ভির একটা স্তম্ভস্বরূপ।

খুশী হলাম না শুধু নয়, বেশ বিরক্ত বোধ করতে লাগলাম। কারণ আমি বি ভির স্তম্ভ নই। যেসব মারাত্মক কথা ও আমার মুখে ভরে দিতে চায়, তা যে কতখানি সাংঘাতিক, তা তো আর আমার অজানা নয়!

পরদিনই বীরেনকে গোপনে জিজ্ঞেস করলাম। বীরেন তো তখনি তাকে দু'ঘা বসিয়ে দিতে চাইলো। বললো : আপনি তো জানেন না, আমিও বলতে ভুলে গেছি, শালা আই বি-র চর। ডেটিনিউ সেজে এসেছে। দিই লাগিয়ে দু'টো ঘুষি ?

বীরেনের ঘুষির ওজন যে কতখানি, তা আমার অজানা নয়। ঢাকা শহরে তখন গুপ্ত সমিতির দলীয় চেতনা একটু মাত্রাধিক ছিল। শুধু অনুশীলন আর যুগান্তর দল নয়, একই দলের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যেও নানা গুরুতর ও তুচ্ছ বিষয়ে মনকষাকষি চলতো এবং তার অনিবার্য্য পরিণতি ছিল আর্ম্মানীটোলার খেলার মাঠে বা রেসকোর্সে অথবা ঢাকেশ্বরী মন্দিরের কাছে খোলা ময়দানে দু'দলের মারামারি। অতর্কিতে নয়, সংবাদ আদানপ্রদান করে, এনগেজমেণ্ট করে। কখনো লোহার শিক দিয়ে, কখনো হকি ষ্টীক দিয়ে, কখনো পেতলের তৈরী পাঞ্চ দিয়ে আবার কখনো-বা হাণ্টার দিয়ে। রক্তদর্শন ছিল অবধারিত।

১৯২৬ সালের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে আমি পড়ি, কলেজ হোষ্টেলে থাকি। ১৯৩০ সালের বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের মেজর বিনয় বসুও তখন থাকতো হোষ্টেলে আমারই পাশের ঘরে। সেও ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে। একদিন বিকেল বেলা শিশির সেনগুপ্ত এসে আমাদের বলে গেল সন্ধ্যার পর আর্ম্মানীটোলার মাঠে যেতে। তাঁতিবাজারের রবীন রায় না কি আমাদের একটি ছেলেকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। তাই এই চ্যালেঞ্জ! সন্ধ্যার মধ্যে যদি এই মামলার ফয়সালা না হয়, তাহলে ঐ মাঠেই হবে শক্তি পরীক্ষা।

প্রস্তুত হয়েই গেলাম। অর্থাৎ রাত ন'টায় হোষ্টেলে ফিরে আসবার সম্ভাবনা কম বলেই রোল-কলের সময় যাতে আমাদের দু'জনকার প্রক্সি দেওয়া হয়, তার ব্যবস্থা করে গেলাম।

মাঠে গিয়ে দেখি, পরিস্থিতি বেশ সঙ্গীন! অনেকগুলো হকি ষ্টীক এসে গেছে, সঙ্গে আবার গোটা দুই ছোরাও। বীরেন কোমর থেকে বার করে বললো: আজ একটাকে আমি নোবই।

বিনয় কুস্তিগীর। বড়লোকের ছেলে। কেমন নাদুসনুদুস সুডৌল শরীর। বুকে জড়িয়ে ধরতে ভালো লাগে। থাকেও খুব পরিচ্ছন্নভাবে। মুখে একটা স্বাভাবিক মৃদু হাসি যেন লেগেই আছে। সে বললো: ওসব ষ্টীক লাগবে না আমার। বেঁচে থাক্ আমার কুস্তি! এমনি করে ধরবো আর 'ঢাক্'—ব্যস্ একেবারে চিৎ!—বলে সে আমাকেই চিৎ করে ফেলে দেয় আর কি!

বিপক্ষ দলও প্রস্তুত হয়েই এসেছে বোধহয়। মাঠের অপর প্রান্তে তারা অপেক্ষা করছে দেখা গেল। সন্ধ্যের পর মাঠের সাধারণ জটলা ও জনতা

কমে গেলে দলীয় সবাই এসে জড়ো হলো। প্রতিপক্ষও এগিয়ে এল। দেখা গেল, তাদের প্রত্যেকের হাতে হকি ষ্টীক।

দুই পক্ষের বড়দের মধ্যে এই ব্যাপার নিয়ে যে আলোচনা চলছে পাটুয়াটুলীতে রাঙ্গাদা'র বাসায়. সেখানে আমাদের একজন বার্ত্তাবহ অপেক্ষা করছে। যাহোক একটা কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়ে গেলেই সে সাইকেল নিয়ে ছুটে আসবে আমাদের সংবাদ দিতে। তারই ওপর নির্ভর করছে যুদ্ধ, অথবা শান্তি!

কিন্তু কোথায় সে? জিতেন বললো: আর দেরী করা যায় না। স্থরু হোক্।

প্রতাপ তৎক্ষণাৎ তাকে সমর্থন করলো: না বলেছিস। যদি ভালো খবর আসেই, তখন থেমে গেলেই চলবে।

তাই ঠিক হলো। প্রতিপক্ষ ও আমাদের মধ্যেকার ব্যবধান শনৈঃ শনৈঃ কমে এল এবং ক্রমে তা মাত্র দশ-বারো হাতে এসে ঠেকলো। স্চনা করে দেবার জন্য. আমার আজো স্পষ্ট মনে আছে, অকস্মাৎ বীরেন ছুটে গিয়ে সম্মুখে যে লোকটিকে পেলো. তাকেই এমনি প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিল যে, সে ছিটকে গিয়ে পড়লো কয়েক হাত দূরে, আর উঠলো না। তারপরই প্রচণ্ড বিক্রমে দুই দলের বাছা বাছা পালোয়ানেরা এগিয়ে এসে যেই একে অপরের ওপর লাফিয়ে পড়বে, এমন সময় তীরবেগে এসে হাজির আমাদের বার্ত্তাবহ। মিটমাট হয়ে গেছে—অতএব সন্ধি! কিন্তু বীরেনের ঘুষির জের ছেলেটিকে কয়েক মাস টানতে হয়েছিল।

সেই জাতীয় একখানা ঘুষি যদি দিবাকরবাবুর নাকে পড়ে, তা'হলে কোন কালে তার নাক ছিল কি না, তাও বোধহয় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না! তাই ওকে নিরস্ত করলাম: মারার চাইতে চিনে রাখা ও সাবধানে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বীরেন বললো: জানেন, ও লোকটা প্রায়ই যায় অফিসে। বলে যায় ওর ইন্টারভিউ আছে। মাসে দু'বারের বেশী আমাদের আত্মীয়েরা মাথা কুটলেও দেখা করবার অনুমতি পায়না, ও কি গ্র্যাসবি সাহেবের পোষ্যপুত্র না কি? আমার মনে হয়, যোগিনী বোস বা জিতেন ধর অফিসে আসে, আর ও এখানকার যাবতীয় সংবাদ তাদেরকে জানাতে যায়! বিশ্বাস করবেন না।

গুপ্ত সমিতিতে সে যুগে যেমন ছিল পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা,

ঠিক তেমনিই ছিল কঠোরতম নিয়মানুবর্ত্তিতা ও গোপনতা রক্ষার প্রচেষ্টা। একই কাজে হয়তো পাঁচ জনকে প্রেরণ করা হলো, বলে দেয়া হলো, কাজ সুসম্পন্ন করে পলায়নের সুবর্ণ সুযোগ না পেলে পালিও না, পকেটে রইলো পটাসিয়াম সায়নাইড আর হাতের রিভলভারের শেষ গুলীটি তো রইলোই। পাঁচটি কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র-নেতার সুপারিশ অনুযায়ী হয়তো এই পাঁচ জনকে সংগ্রহ করা হলো। এরা কেউ কাউকে চেনে না, এর আগে কার্য্যব্যপদেশে একাধিক বার দেখা হলেও কেউ কারুর সঙ্গে কথা কয়নি। আজ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বার পূর্ব্বক্ষণে অর্থাৎ মৃত্যুকে নিয়ে হোলি খেলায় মত্ত হবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে সরকারীভাবে এদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। পরিচিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এরা নিবিড় বন্ধুত্বে বদ্ধ হলো। তারপর যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে হয়তো দেখা গেল, একখানা মোটর গাড়ী এদের নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। কে পাঠিয়েছে গাড়ী, চালক বিশ্বাসী কি না সেসব প্রশ্ন করবার অধিকার এদের নেই। নীরবে গাড়ীতে উঠে বসে এরা যথাস্থানে গিয়ে অবতরণ করলো।

অর্থাৎ তোমার যতটুকু না জানলে কাজ আটকে যাবার আশঙ্কা আছে, ঠিক ততটুকু তোমায় জানানো হবে। এই নিয়ম সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। বিক্রমপুরকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা আছে। প্রত্যেক অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মীর সঙ্গে অপর অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মীর যোগাযোগ থাকে সত্য, কিন্তু একে অপরের সমগ্র সদস্যসংখ্যা কত বা কারা এর সদস্য, সে সব সংবাদ জানতে পারে না। নিয়ম নেই। ঢাকার কেন্দ্রীয় সমিতির সঙ্গে সারা বিক্রমপুরের যোগাযোগ রক্ষা করে চলে মাত্র একজন কর্ম্মী। কেন্দ্রীয় সমিতির ও মাত্র একজনকেই সে চেনে। প্রত্যেক অঞ্চলের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি যার কাছে থাকে বা বেনামী ইস্তাহারে ব্যবহৃত ব্লকগুলি যার কাছে গচ্ছিত থাকে অথবা অন্যান্য বাজেয়াপ্ত পুস্তক, ছবি বা পুস্তিকা যার গুপ্ত গ্রন্থাগারে আছে, সে শুধু কেন্দ্রীয় সমিতির একটিমাত্র সদস্যকেই চেনে ও জানে। তাঁরই আদেশে মালখানা সে খোলে আর বন্ধ করে ও মনে মনে মালপত্রের জমাখরচের হিসাব রাখে।

এই যে নিয়ম ও অনুশাসন, আশ্চর্য্য যে, এর একটিও লেখা নেই। গুপ্ত সমিতিতে কাগজ-কলমের ব্যাপার নেই। সবই মুখে মুখে, মনে মনে, অন্তরে-অন্তরে। সেখানকার অদৃশ্য শ্লেটে তা লেখা হচ্ছে ও প্রয়োজনবোধে মুছে

ফেলা হচ্ছে। দলে যোগদানের প্রথম দিন থেকে একেবারে শেষ দিন পর্য্যন্ত কেউ তোমার নাম লিখে নেবে না এবং অনেক জায়গাতেই তোমার কি নাম, তাও কেউ জিজ্ঞেস করবে না। সাধারণ সদস্য থেকে নিজের কর্ম্মক্ষমতার দ্বারা ধীরে ধীরে বা একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবেই কবে, কখন্ যে তুমি দলীয় কর্ম্মকর্তাদের অন্যতম হয়ে উঠলে, অপরে তো দূরের কথা, নিজেও যেন তা টের পেলে না। এর নিয়োগ, বদলি, প্রমোশন বা বরখাস্ত কোনো ব্যাপারেই কোনো সার্কুলার নেই, বিজ্ঞপ্তিরও প্রয়োজন হয় না। কর্ম্মদক্ষতার দ্বারা তোমার উন্নতিও যেমন এল একটি স্বতশ্চল যন্ত্রের মতো, তেমনি সামান্যতম দুর্বলতার দোষে স্বতশ্চল পেষণ-যন্ত্রেই তুমি কবে যে একেবারে নিষ্পিষ্ট হয়ে পাউডার হয়ে বাতাসে উড়ে গেলে তার হদিসই পাওয়া যাবে না।

সমগ্র সমিতিটাই চলতো স্বয়ংচালিত যন্ত্রের মতো। যেমন নিশ্চিত ও শাণিত তার গতি, তেমনি মজবুত ছিল তার কলকব্জাগুলি। মাটির নীচের জমাট অন্ধকারে একটা অদৃশ্য জগৎ এমনিভাবে চলতো, বাইরের দৃশ্যমান জগতে তার প্রাণস্পন্দনের বিন্দুমাত্র ধ্বকধ্বকানিও শোনা যেত না!

এমনি কড়া নিয়মের প্রয়োজনীয়তাও ছিল যথেষ্ট। সন্দেহবশে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারলেই আই বি অফিসের রুদ্ধদ্বার কক্ষে চলতো তার ওপর অমানুষিক অত্যাচার। প্রথমেই নয়। প্রথমে চলতো অনুরোধ, উপরোধ, আবেদন নিবেদন: ভাই আমার, দাদা আমার, বল না, ঐ রিভলভারটা কে তোমায় দিয়ে পাঠিয়েছিল? আহা হা, এমন কাঁচা শরীর, হাজতের কষ্টে কেমন কালি হয়ে গেছে। ওরা বুঝি ভালো খাবার দেয় না?—এই রামসিং, ইউ উল্লু, ইধার আও। এই বাবুকে খেতে দিস্ না নাকি রে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। শোন্, আজ থেকে রোজ রাত্রে মাংস আর পরোটা দিবি। আর যা, এক্ষণি কিছু খাবার নিয়ে আয়।—বলে ঝনাৎ করে একটা টাকা মেঝের ওপর ফেলে দিলেন মনোরঞ্জন দারোগা। তার পরই: তুমি আমার ছেলের বয়সী। দেখতেও আমার বড় ছেলের মতো; তাই তোমায় দেখে কেমন একটা মায়া ধরে গেছে। তাই তো স্যারকে বলে আর কাউকে দিইনি তোমার কাছে ঘেঁষতে, আমি নিজেই এসেছি। বল তো বাবা, সব খুলে বল তো। বলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। মা বাবা হয়তো কত কান্নাকাটি করছেন।—আরে, হাজতে কি ভদ্রলোকের ছেলেরা থাকতে পারে?—বল।

আবেদন নিবেদন অচল হলে চলতো প্ররোচনা বা পারস্যুয়েশন। একশো টাকার নোটের একশোখানার একটি বাণ্ডিল টেবিলের ওপর এগিয়ে দিয়ে প্রফুল্ল বসু বলে উঠলেন ঃ পাছে তোমার অবিশ্বাস হয়, তাই চেক না এনে একেবারে ক্যাশ টাকা নিয়ে এসেছি। নাও, ভালো করে গুনে ছাখ, দশ হাজার আছে কি না। এই টাকা নিয়ে বাড়ী চলে যাও। গরীবের সংসার. মার্চেন্ট অফিসের ত্রিশ টাকার গোলামী আর খুঁজে বেড়াতে হবে না। বরাত ফিরে যাবে। আর তার বদলে তুমি দিচ্ছ কি? কতটুকু তার মূল্য? তাতে তোমার কোন ক্ষতি আছে কি? এখানে এই ঘরে গোপনে বসে যে নামটি আমায় বলে যাবে, তোমার দলের কে জানতে পারছে তা? আমি তোমায় তো আর লিখে দিতে বলছি না। তোমার এই দুর্ভোগেরও যেমন শেষ হলো, তেমনি দলের মধ্যেও তোমার প্রতিপত্তি আগের মতই রইলো। মাঝখান থেকে নীট লাভ দশ হাজার টাকা। ইচ্ছে করলে বিলেতও ঘুরে আসতে পারো। জার্মাণীতে গিয়ে হয়তো সাবান তৈরীই শিখে এলে। তখন তো টাকা দিয়ে তোমার দলকেই পারবে সাহায্য করতে। সেটাই ভালো, না একটা ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ভালো?—নাও. আর দ্বিধা করতে হবে না। ওসব সঙ্কোচ দূর করে ফেল।

আবেদন বা পারস্যুয়েশন ব্যর্থ হলে প্রথমে চলে হুমকী ও হুঙ্কারজনক অশ্লীষ ভাষায় বাপ-মা তুলে গালাগাল, তারপর মুখে থুতু ছিটিয়ে দেয়া বা চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে দেয়া। সেসব অস্ত্র ব্যর্থ হলে প্রয়োগ করা হয় একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র, শারীরিক নির্য্যাতন। যত রকম নির্য্যাতন কল্পনা করা যেতে পারে, সব। মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান মেশানো। তাই কম্বল দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে মেঝের ওপর শুইয়ে দিয়ে একটা বাঁশ আড়াআড়ি ভাবে শরীরের ওপর রেখে দু'পাশে দু'জন বসে চাপ দেয়া হয়। ঘটির মধ্যে বালি ভর্ত্তি করে সেই ঘটি দিয়ে প্রহার করা হয়। এতে ওপরকার চামড়া ফেটে যাবার আশঙ্কা যেমন নেই, তেমনি মাংসের ভেতরটা একেবারে থেঁতলে পিষে কাদা করে দেবে। নখের ফাঁকে সূঁচ বিঁধিয়ে দেয়া হয়। তিনটি আঙুলের ফাঁকে একটি সরু লোহার শিক ঢুকিয়ে দিয়ে ভীষণ ভাবে চাপ দেয়া হয়। চেয়ারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে বসিয়ে রুল টানবার কাঠের রোলার দিয়ে শরীরের প্রতিটি জয়েণ্টে আঘাত করা হয়। পরে হয়তো হাণ্টার দিয়েই বেদম প্রহার করা হয়।

আইন আছে বটে যে, গ্রেপ্তার করবার পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই কোনো ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে ধৃত ব্যক্তিকে হাজির করতে হবে, বিশেষ কারণ ব্যতীত পুলিশের হেফাজতে রাখা যাবে না, তাও চোদ্দ দিনের বেশী নয়। কিন্তু বৃটিশের আমলের বিচারক। তাই প্রহৃত আসামী হয়তো কয়েদীর গাড়ীতে ধুঁকছে, এমন সময় এস বি বা আই বি-র দারোগা স্যারের সম্মুখে কাগজপত্র স্থাপন করলেন আর অমনি স্যার বিনাদ্বিধায়, বিনাপ্রশ্নে অবলীলাক্রমে স্বাক্ষর করে দিলেন: The accused is produced before the Court and on enquiry it is learnt that he is getting good behaviour in the hands of the police and he has got nothing to complain against······ইত্যাদি।

চোদ্দ দিন এস বি অথবা আই বি-র খপ্পরে আতিথ্য গ্রহণের পর অনেকেরই প্রায় হেঁটে চলবার শক্তি থাকে না।

শান্তি সোম একদিন আড়ালে ডেকে নিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলেন: আই বি অফিসে তোমায় টরচার করেনি, গাঙ্গুলী? বললাম: না, একেবারেই না। একটা কটু ভাষা পর্য্যন্ত ব্যবহার করেনি!

এর কারণ পরে জানতে পারা গিয়েছিল। আমি নাকি ছিলাম সেনট্রাল আই বি-র আসামী, তাই জেলার কর্ত্তারা আমায় নিয়ে বেশী ঘাঁটাতেন না। তবে জেলার এলাকায় আমার কখনো আগমন বা আনাগোনাও তাঁরা আদৌ পছন্দ করতেন না। তাই ১৯২৮ সালের পর থেকেই দেশের বাড়ীতে যাওয়া আমার প্রায় ঘটতোই না।

শান্তি সোম বললেন: এবার ওরা পাইকারীভাবে গ্রেপ্তার সুরু করে দিয়েছে। বোধহয় সবাইকেই দেবে কনফার্ম করে।

নিয়ম ছিল, গ্রেপ্তার করে গভর্ণমেণ্ট তদন্ত করে দেখবেন যে, সত্যিই এ নিশ্চিতভাবে বৈপ্লবিক কার্য্যাবলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কি না। তারপর তাঁরা সিদ্ধান্ত করবেন, একে রাজবন্দীর পদে পাকা ভাবে নিযুক্ত করবেন, না মুক্তি দেবেন। শান্তি সোম অন্যান্য আরও প্রায় পঞ্চাশ জনের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছেন আমি গ্রেপ্তার হবার দিনপনেরো

পূর্বে। সুতরাং ওঁদের ভাগ্য সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হবার সময় আগতপ্রায়।

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, তাই হলো। একদিন সকালবেলা আমাদের বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি জেলার আশুবাবু এসে তাঁর ড্যাবডেবে চোখ দু'টোতে খুশীর ঝলমলানি ফুটিয়ে তুলে সংবাদ জানিয়ে গেলেন যে, এক মদন ভৌমিক ব্যতীত সবাইকে গভর্ণমেণ্ট কনফার্ম করেছেন!

আশুবাবুর পক্ষে পরম সুসংবাদ। কারণ, এবার আমরা প্রত্যেকে প্রারম্ভিক ভাতাবাবদ পাবো ষাট টাকা আর তার ওপর জন-প্রতি মাসিক হাত খরচার জন্য আরো কুড়ি টাকা। এই আশী টাকার একটি পয়সাও তো আমাদের হাতে দেওয়া হবে না। আমরা জিনিষপত্রের অর্ডার দেব আশুবাবুর মারফৎ আর বাইরের ঠিকাদার সেগুলো সাপ্লাই দিয়ে যাবে আশুবাবুরই কাছে। তারপর ভাউচারে স্বাক্ষর করে দেবার পর আমাদের চাওয়া জিনিষ আমাদের হাতে আসবে। মাঝখানের লোক হিসেবে আশুবাবুর কিছু কমিশন লাভ হবে আর রাজবন্দীর সংখ্যা যত বেশী হবে, তত বেশী টাকার অর্ডার হবে, আর কাজেকাজেই কমিশনের অঙ্কটাও বেশ মোটা হয়ে উঠবে। তাই আমাদের সর্বনাশ হলেও আশুবাবুর পৌষ মাস দেখা দিল!

সিভিল ইয়ার্ডে একখানা ঘরে আশুবাবুর দোকান। দোকান মানে, আমাদের প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্যের নমুনা সেখানে সাজানো আছে। রোজ বিকেলে আমাদের প্রতিবারে পাঁচ জন করে সিপাই-পাহারায় সেখানে যাবার অধিকার আছে। সেখানে আমরা ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী নমুনা দেখে জিনিষপত্রের অর্ডার দিয়ে আসি। অনেকে অনেক নতুন জিনিষের অর্ডার দিয়ে থাকেন আশুবাবুর দোকানে তার নমুনা নেই। ঠিকাদারকে দিয়ে আশুবাবু তা-ও আনিয়ে দেন।

এই আশুবাবুটি একটি অদ্ভুত জীব! ব্যবসায়ী বুদ্ধি তাঁর অত্যন্ত প্রখর বলে যা-তা জিনিষ দিয়ে দ্বিগুণ মূল্য আদায়ের ফিকিরে সর্বদা তিনি ঘোরাফেরা করেন। এজন্য রাজবন্দীরা চোর বা দালাল আখ্যা দিয়ে অকথ্যভাবে গালাগাল দিলেও, আশ্চর্য্য, তাঁর ড্যাবডেবে চোখ দু'টোতে হাসির ঝিলিক থাকবেই। কানে তুলো ও পিঠে কুলো নিয়েই দিব্যি তিনি প্রায়ই সকালবেলা এসে আমাদের সঙ্গে বেশ জমিয়ে বসে প্রাতরাশটা শেষ করে যান এবং নির্লজ্জের

মতো আবার মন্তব্য করে যান : আপনাদের এখানে খেতেও তো ভয় করে। পটাসিয়াম সায়নাইড যারা অবলীলাক্রমে খেয়ে ফেলতে পাবে, তারা অপরকেও তা পরিবেশনও তো করতে পারে। তারপর রাজবন্দীদের সাথে বেশী মেলামেশার সংবাদ সাহেবের কানে গেলে আর রক্ষে নেই। আই বি নির্ঘাত জেনে ফেলবে. তা'হলেই চাকরিটি খোয়া গেল আর কি !

আমরা প্রায় সকলেই ওঁকে করুণার চক্ষে দেখি। কিন্তু বীরেন কাছে থাকলে আর উপায় নেই। জিজ্ঞেস করে : তা'হলে না এলেই তো পারেন এখানে ?

ড্যাবডেবে চোখে হাসি ফুটিয়ে জবাব আসে : কিন্তু কাজ যে আমার আপনাদের দিয়ে। কত বলি সাহেবকে এই কাজের ভার অপরকে দিতে। কিছুতেই দেবে না।

অর্থাৎ যেন কত অনিচ্ছাতে এই অস্বস্তিকর কাজটি আপনি করে থাকেন। জিনিষপত্র সরবরাহ ভারী হাঙ্গামের কাজ, তাই না ? কিন্তু মাসের শেষে মুনাফাটি যখন আসে আশুবাবু, তখন ?

ড্যাবডেবে চোখ কপালে ওঠে : বলেন কি বীরেনবাবু, মুনাফা ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আপনাদের টাকা থেকে আবার কমিশন খাবো আমি ? অমন দুর্মতি ভগবান যেন কোনদিন না দেন।

লোকটা কিছুতেই রাগ করে না! খুব ভালো আই বি অফিসার হতে পারতো। খাবার লোভ ভীষণ, খেতেও পারে বেশ। রাজবন্দী হয়ে এলে সসম্মানে ভক্ষণ সমিতির সহ-সভাপতির শূন্য পদে ওকে নেয়া যেত।

কিন্তু বীরেন ওকে একেবারেই সইতে পারে না। আমরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করে যতই রগড় করতে যাই, বীরেন সিরিয়াসলি ততই চটে যায় ওঁর ওপর।

একদিন সকালে তো সাংঘাতিক কাণ্ড ! সুপার সাহেব এসেছেন সকাল বেলা যথারীতি আমাদের ইয়ার্ড পরিদর্শনে। সঙ্গে জেলার নরেন সরকার, জনকতক ডেপুটি জেলারের মধ্যে আশুবাবু, বড় জমাদার, সশস্ত্র জেল-সিপাই ও কয়েকজন কয়েদী মেট্।

সুপারিনটেনডেন্ট লিওনার্ড সাহেব নিরক্ষর হলেও পাকা লোক। কোথাও ছুঁচটিকে বাধা দিয়ে কোথাও হাতীকে কিভাবে ছাড়পত্র দিয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়, সে কৌশল তাঁর ভাল করেই জানা আছে। তাই চার নম্বর

ইয়ার্ডেই কয়েকজন সাধারণ কয়েদীকে লাথি মেরে পাঁচ নম্বর ইয়ার্ডে রাজবন্দীদের মধ্যে এসেই তিনি দিলখোলা গল্পবাগীশ হয়ে ওঠেন। এ-কথা ও-কথা নিয়ে অনর্থক বাজে বকেন ও হাসাহাসি করেন অকারণে। আহ্লাদে আটখানা হয়ে একেবারে যেন ফেটে পড়েন।

সেদিন বীরেনের সহ্য হলো না। আশুবাবু যে বাজে সব জিনিষ দিয়ে দ্বিগুণ দাম আদায় করেন, সে কথাটা সে আশুবাবুর সম্মুখেই লিওনার্ডকে জানিয়ে দিল। লিওনার্ড তাঁর চশমার মধ্য দিয়ে আশুবাবুর পানে নীল চোখের ক্রুদ্ধ চাহনি হেনে ডাকলেন : Ass-u !

আশুবাবুর ড্যাবডেবে চোখে ভয়, দুঃখ ও ক্রোধ মিলিয়ে একটা অদ্ভুত দ্যুতি দেখা দিল। তিনি প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে সাহেবের সম্মুখে কি একটা কথা বলে সমস্ত রাজবন্দীদের নামেই একটা পাল্টা অভিযোগ করে বসলেন।

আর যায় কোথা! বীরেন তৎক্ষণাৎ ঝেড়ে দিল আশুবাবুর ড্যাবডেবে চোখের কোণে সেই সাংঘাতিক একখানি ঘুষি! তৎক্ষণাৎ আশুবাবু একেবারে ধরাশায়ী হলেন।...এ অপমান অসহ্য! জমাদার পকেট থেকে বাঁশী বার করে বাজিয়ে দিল। গেটে ঢং-ঢং করে "পাগলা ঘন্টি" বেজে উঠলো। চারিদিকে বাঁশী শোনা যেতে লাগলো। ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। হাঁকডাক চীৎকারে জেলের মধ্যে একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে গেল যেন:

পাঁচ নম্বর লেখা একখানা প্রকাণ্ড বোর্ড জেল-টাওয়ারে ঝুলছে দেখা গেল।

সাত

জেলের "পাগলা ঘন্টি" সহজ ব্যাপার নয়। মারাত্মক একটা কিছু না ঘটলে এই ঘণ্টা বাজানো হয় না।

বিপদের সঙ্কেতসূচক এই ঘণ্টাটি জেল দরজার ছাদের গম্বুজ থেকে ঢং ঢং করে যখন বাজানো সুরু হয়, সিপাইদের ব্যারাকে তখন হুলস্থূল পড়ে যায়। তখন যে যে-কোনো অবস্থাতেই থাক্ না কেন, তৎক্ষণাৎ তাকে হাতের কাছে সহজলভ্য হাতিয়ার নিয়ে ছুটে এসে ফল্-ইন করতে হয় ব্যারাকের সম্মুখস্থ ছোট প্রাঙ্গণে। মুহূর্ত্তে সবাই এসে দাঁড়ালেই তারা অধিনায়কের হুকুমে ডবল মার্চ্চ করে এসে প্রবেশ করে জেলের অভ্যন্তরে। সাধারণতঃ জেলের বিরাট লৌহদ্বারের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্রাকার দরজা খুলেই সব কাজ চালানো হয়। কিন্তু "পাগলা ঘন্টি" বেজে উঠলে দ্বাররক্ষী বিনা দ্বিধায় দ্বারের শুধু একটা পাট নয়, দু'টোই একেবারে সটান খুলে দিয়ে এই সশস্ত্র সিপাই দলেরই প্রতীক্ষা করতে থাকে।

জেলের অভ্যন্তরে প্রত্যেক খাতার প্রত্যেক কয়েদীকে ঘরে তালাবন্ধ করে ঘরের অভ্যন্তরে সমান্তরাল দু'টি ফাইলে বসিয়ে রাখা হয়। জেলের কারখানা, গুদাম, রান্নাঘর, হাসপাতাল বা অন্যত্র যারা কার্য্যে রত ছিল, তাদেরকেও হাতের সমস্ত কাজ ফেলে ফাইল করে বসে থাকতে হয়। তার পর চলে গুনতি। কোথাও গণনা করে স্বয়ং সিপাই, কোথাও মেট্। গোনবার পরে প্রত্যেক খাতা বা অন্যান্য স্থানের সংখ্যা জেলের অফিসে পৌঁছানো হয়। তৎক্ষণাৎ তা মোট সংখ্যার সঙ্গে মেলে কিনা দেখা হয়। মিলে গেলেই সংবাদ প্রেরিত হয় সেই জেল দরজার ছাদের গম্বুজে। সেখানকার সিপাই এবার ঘণ্টায় ঢং করে তিনটি আওয়াজ করে, যার অর্থ হলো যে, কয়েদী যারা জেলে ছিল, জেলের মধ্যেই তারা আছে এবং গোলমাল যা হয়েছিল, তা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। অতএব আবার জেলের স্বাভাবিক কর্ম্মতৎপরতা সুরু হয়ে যায়।

সশস্ত্র জেলসিপাইরা অকুস্থলের নিশানা পায় গম্বুজের সিপাইর হাতে লটকানো বোর্ডখানা দেখেই। সুতরাং ত্বরিতে তারা সেখানে হাজির হয়ে লাঠি চালিয়ে এবং প্রয়োজন বোধ করলে গুলী চালিয়েও পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে ফেলে। শুধু তাই নয়। জেল থেকে জেলার সর্ব্বময় কর্ত্তা জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট

ও পুলিশ সুপারকেও ফোন করে দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ শহরের রিজার্ভ বাহিনীর একটি দল লরী ভর্ত্তি হয়ে এসে জেলের দেয়ালের বাইরে বন্দুক নিয়ে পাহারায় দাড়িয়ে যায়।

পূর্ব্বেই বলেছি, ঢাকা জেলটি একেবারে শহরের মাঝখানে। আমাদের তেতলার 'সি' ব্যারাকের ঝুল বারান্দায় দাঁড়ালে রাজপথের একাংশ স্পষ্ট দেখা যায় এবং রাজপথের যে অংশটিতে দাঁড়ালে আমাদের ঝুল বারান্দা দেখা যায়, স্বভাবতঃই সেখানে কৌতূহলী দু'চারজনকে দেখা যেত। আর পাঁচ নম্বর খাতায় যে রাজবন্দীরা বাস করেন, এ সংবাদও তাদের জানতে বাকি ছিল না নিশ্চয়ই।

আজ সকালে অকস্মাৎ পাগলা ঘন্টার শব্দে শহরের লোকেরাও নিশ্চয়ই গম্বুজে দৃষ্টিক্ষেপ করে বিপদের নিশানা সেই বোর্ডখানা দেখতে পেয়েছে; তাই রাজপথের সেই বিশেষ অংশটিতে রীতিমত একটা জনতার সমাবেশ হয়ে পড়েছে দেখা গেল। তাদের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি আমাদেরই ঝুল বারান্দার পানে নিবদ্ধ।

চারুবাবু তেতলা থেকে ঝটাপট নেমে এসে এই সংবাদটাই ছেড়ে দিলেন আমাদের মাঝে।

কি করবো স্থির করতে পারছিলাম না আমরা। ধূলা ঝেড়ে উঠে আশুবাবু জেল সুপার লিওনার্ড সাহেবের সম্মুখে এসে ক্রন্দনভাঙ্গা সুরে কি বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক এমন সময় জমাদার বাঁশী বাজিয়ে দিয়ে এমনি অনর্থ ঘটিয়ে বসেছে যে, আশুবাবুর ড্যাবডেবে চোখের মণি দু'টি যেন আরও বড় হয়ে শূন্য প্রেক্ষণে চেয়ে রইলো। জেলার নরেন সরকার ভুঁড়ির ওপর হাফ প্যাণ্টটা আরও একটু টেনে দিয়ে গোঁফ জোড়াটায় সাহেবের অলক্ষ্যে আর একটা মোচড় দিয়ে হাণ্টারটা বগলদাবা করে সশস্ত্র বাহিনীর অপেক্ষা করছেন। ভাবখানা—এইবার বাছাধনদের দেখাচ্ছি!

সাহেবের সঙ্গে সিপাইদের যে ক্ষুদ্র দল ছিল, তারা আমাদের বার বারই ঘরে ঢুকে পড়বার অনুরোধ জানাচ্ছে, জমাদার কর্কশ স্বরে "চলিয়ে, নম্বরমে চলিয়ে" বলে হুকুম জারী করছে ও সঙ্গে সঙ্গে এই বলে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, "নেই তো মুসকিল হো যায় গা।" বাইরে তখনো অবিশ্রাম বাঁশীর আওয়াজ চলছে এবং ডবল মার্চ্চ করে যে সিপাইর দল আসছে, স্পষ্ট তাদের

পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। আমাদের ইয়ার্ডের দরজা সটান খোলা। এই তারা এসে পড়লো বলে।

অকস্মাৎ ডেপুটি জেলার মহম্মদ হানিফ চীৎকার করে উঠলেন: I say, all of you get inside the Barrack, otherwise you will be fired upon······

হানিফ সাহেব হয়তো আরও কিছু বলতেন, কিন্তু বীরেনের ভীম গর্জ্জনে তিনি থেমে গেলেন: Shut up, you rascal, shut up—

এমন সময় হুড়মুড় করে এসে সশস্ত্র বাহিনী আমাদের ইয়ার্ডে ঢুকে পড়লো এবং কালবিলম্ব না করে বন্দুকধারীরা বন্দুকে কার্ত্তুজ ভরে ফেললো। নিয়ম হচ্ছে, তারা এসেই কয়েদীদের একচোট "ধোলাই" করবে, তারপর বলপ্রয়োগে তাদেরকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবেই, প্রয়োজন বোধ করলে গুলী চালিয়েও। এখানেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হতো না, যদি না স্বয়ং লিওনার্ড থাকতেন। তাই বন্দুকধারীদের প্রস্তুত করে রেখে জমাদার খটাস্ করে সাহেবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে গুলী চালাবার হুকুম চাইলো: হুজৌর্-র্!

বেশ বুঝতে পারলাম রক্তারক্তি কাণ্ড একটা ঘটবেই! আশুবাবুর গালের ঘুষি আর ফিরিয়ে নেয়া যাবে না, তেমনি ভয় দেখিয়ে রাজবন্দীদেরও ঘরে ঢোকানো সম্ভব নয়। বন্দুক দেখে শৃগালের মতো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা রাজবন্দীদের নীতির বাইরে ছিল। সুতরাং একেবারে প্রস্তুত হয়ে এসেই দাঁড়ালাম বীরেনের পাশে, তার গা ঘেঁষে। পার্শ্বে দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখলাম একে একে এসে দাঁড়ালো ভোলাবাবু, নির্ম্মল ও ননী। তাদের পাশে এসেছে রমেশ, কামাখ্যাদা, তরণীবাবু, হরিদাস ও চারুবাবু। খাবার ঘরে ক'জন বুঝি চা খাচ্ছিল, তারাও এসে দাঁড়িয়ে গেল আমাদেরই আশে-পাশে। রান্নাঘর থেকে নীরেনবাবুর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল নিরঞ্জন, দীনবন্ধু ও অবিনাশ এবং আরও কয়েকজন। দোতলায় তেতলায় প্রাঙ্গণের এখানে-ওখানে যেখানে যারা ছিল, সবাই একে একে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। গুলী চলতে পারে নয়, গুলীবর্ষণ অবধারিত। লালমুখ সাহেব নিজেকে মনে করে বৃটিশ ক্রাউনের প্রতিনিধি, মনে করে জেলের অভ্যন্তরে সে নিজেই আইন; সুতরাং হুকুম সে করবেই, প্রয়োজন হলে একটি একটি করে এই দেড়শো

রাজবন্দীর শবদেহ শোভাযাত্রা করে সে মর্গে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতেও কসুর করবে না। অপর দিকে পাথরের মতো সারি সারি দণ্ডায়মান কানাইলাল-ক্ষুদিরামের উত্তর-পুরুষ, বৃটিশ ক্রাউনের সম্মুখে মাথা নত করবার কৌশল আজো যারা শিখতে পারেনি। রক্তের জবাব এরা চিরকাল রক্ত দিয়েই দিয়ে এসেছে। তাই জানি, শেষ নিশ্বাসটুকু বেরিয়ে যাবার পূর্ব্বে এখান থেকে এক ইঞ্চিও এদের কাউকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।······স্পষ্ট অনুভব করলাম, একটা অবাঙ্ময় সর্ব্বনাশা সিদ্ধান্ত যেন সবারই শব্দহীন সমর্থন লাভ করলো: বাধা দিতে হবে।

শোনা গেল নরেন সরকারের গর্জ্জন: বী রেডি। পয়েন্ট ইওর আর্মস্।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকধারীরা ডান হাঁটু মুড়ে দিয়ে বসে বাঁ হাঁটুর ওপর বাঁ কনুই স্থাপন করে টোটাভরা বন্দুকগুলি আমাদের পানে লক্ষ্য করে ধরলো। এবার এগিয়ে এলেন স্বয়ং জেল সুপার লিওনার্ড। যা বললেন, তা এই: এক মিনিট সময় দিলাম। এর মধ্যে তোমরা যার যার ঘরে ঢুকে পড়, নইলে রাইফেলের বুলেট তোমাদের বুকে ঢুকবে।

স্তব্ধতা! নিশ্বাসও বোধহয় পড়ছে না কারুর। নড়বারও লক্ষণ দেখা গেল না একজনেরও। আর একটি মুহূর্ত্ত! এর পরই নিশ্চয়ই সাহেবের কণ্ঠ শোনা যাবে: ফায়ার!···হ্যাঁ, আমরাও প্রস্তুত! ক্রাউনের হুকুম তামিল করার চাইতে বুলেটকে কী করে আলিঙ্গন করতে পারি, হাসিমুখে দোব তারই পরীক্ষা!

কিন্তু অকস্মাৎ কোথায় সুরেনদা'র কণ্ঠ শোনা গেল। চেয়ে দেখলাম, তেতলার সিঁড়ি বেয়ে দু'জন বন্দীর স্কন্ধে ভর করে দ্রুত নেমে আসছেন ক্ষীণদৃষ্টি, অসুস্থ, বৃদ্ধ সুরেনদা, ওখান থেকেই চীৎকার করে বলছেন: Wait, wait, Leonard, for a second. Let the first bullet pierce through my lungs.

সবার সম্মুখে এক পা এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন সুরেনদা. দু'জন বন্দীর কাঁধে ভর করে, বুক এগিয়ে দিয়ে। চোখে তাঁর দৃষ্টি নেই, মিটমিট করছে। কিন্তু মনে হলো, সে বুকখানা যেন দুর্ভেদ্য ট্যাঙ্ক, বন্দুকের গুলী প্রতিহত হয়ে ফিরে যাবে!······

আবেগকম্পিত স্বরে বললেন: সামান্য একটা ব্যাপারের জন্য যদি এলার্ম

সিগন্যাল দিতে হয়, সিপাইদের ফায়ার করবার হুকুম দিতে হয়, তাহলে—তাহলে, yes, I stand here before you, let me die before my younger brothers meet death !

বাঙালী অফিসার হলে কি করতো জানিনা, কিন্তু এমনি সাংঘাতিক জটিল ও উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে লিওনার্ড সাহেবের স্থৈর্য্য অপরিসীম। একটি বার মাত্র সুরেনদা'র পানে দৃষ্টিক্ষেপ করেই তিনি মারাত্মক অবস্থাটা চট্ করে উপলব্ধি করে নিয়ে তৎক্ষণাৎ একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করে বসলেন। বন্দুকধারীদের পানে ফিরে তিনি তাদের চলে যাবার হুকুম উচ্চারণ করলেন এবং তারা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সদলবলে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। আর আমাদের পানে ফিরেও চাইলেন না।

আশুবাবুকে অবশ্য বদলী করা হলো না আমাদের বিভাগ থেকে, কিন্তু দুপুরের পরই যে বিজ্ঞপ্তি এলো, তাতে জানা গেল, আশুবাবুকে ঘুষি মারার শাস্তিস্বরূপ আগামী দু'মাসের জন্য বীরেন্দ্রনাথ ঘোষের পত্রলেখা ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের সুবিধা বাতিল করা হলো।

গুরু পাপে লঘু দণ্ড। সময়বিশেষে তারও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিল চুরির কাহিনী একেবারে উদ্ভট কল্পনা নয়। ভবিষ্যতে আরও জানা যাবে যে, সম্মুখরণে চিরকাল ভঙ্গ দিয়ে লিওনার্ড কীভাবে পশ্চাৎ থেকে ছুরি চালাতেন।

সীমাহীন ধূর্ত্ত ও মূর্তিমান শয়তান !

আট

কোনও 'বি' ক্লাস কয়েদীকে আমাদের ইয়ার্ডে কাজ করতে পাঠানো হতো না। 'বি' ক্লাস মানে একাধিকবার জেলখাটা কয়েদী। সবাই 'এ' ক্লাস। অর্থাৎ এই প্রথম হাতেখড়ি।

কিন্তু হাতেখড়ি দিয়ে সারা জীবনের মতো ফিরে যাবার ইতিহাস খুবই বিরল। হাতেখড়ির পরই এরা পড়তে শেখে, বুঝতে শেখে, হাত পাকাবার কৌশলটা আয়ত্ত করতে শেখে। এদেরও রীতিমত রিক্রুট করা হয় প্রসিদ্ধ ডাকাত, চোর বা বদমায়েসের দলের মধ্যে থেকে। বাইরে রিপুর তাড়নায় অকস্মাৎ একদিন ভুল করে বসে জেলে এসে এরা রীতিমত পাঠগ্রহণ করে ওস্তাদদের কাছ থেকে। বিদ্যাশ্রমের অধ্যয়ন সমাপ্তির পর এরা একেবারে ঝুনো হয়ে বেরিয়ে যায় বাইরে!

কারাদণ্ডের ফলে কোনও চোর বা বদমায়েস সাধু হয়ে গেছে, এমনি দৃষ্টান্ত বড়-একটা দেখা যেত না। কী করে যাবে?···জেলে ধূমপান নিষিদ্ধ। বাইরে যা আদৌ আইন বিগর্হিত নয়, চাষী মজুরদের মধ্যে যা পরিবারের সবাই একসঙ্গে বসে উপভোগ করে থাকে, দৈহিক পরিশ্রমকারীদের পক্ষে শ্রান্তি অপনোদনের জন্য যা একেবারে অপরিহার্য্য, মধ্যবিত্তদের যা সস্তা বিলাসের অঙ্গ, সেই ধূমপানে জেলের মধ্যে হয় শাস্তি—দাঁড়ানো হাত-কড়া, মাড়ভাত, পায়ে বেড়ি, চটের পোষাক এবং হয়তো বেত্রাঘাতও।

তাই জেলে এসেই নিম্নশ্রেণীর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কয়েদীরা ধূমপানের জন্য অধীর হয়ে ওঠে এবং যে করে হোক্, যে পথেই হোক্, যাকে দিয়েই হোক্, যতটুকুই হোক্ তামাক পাতা বা বিড়ি বেআইনী ভাবে সংগ্রহে তৎপর হয়ে ওঠে। কয়েদীদের তামাক পাতা বা বিড়ি সরবরাহের ব্যবসা বেশ লাভজনক—সিপাইরা তা ভালভাবেই জানে। সুতরাং জেলে তামাক পাতা ও বিড়ির চোরা কারবার বেশ চলতে থাকে। মনে পড়ে, একবার শুনেছিলাম চার নম্বর ইয়ার্ডের পাশের আলুর ক্ষেতের নীচে নাকি তামাক পাতার একটা খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। খনি!···চমকে উঠেছিলাম সেদিন। কিন্তু পরে বেশ বুঝতে পেরেছিলাম এমনি অনাবিষ্কৃত খনি জেলের অভ্যন্তরে আরও বহু আছে।

অথচ ধূমপান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ নয়। মেথরেরা পারিশ্রমিক বাবদ প্রত্যহ বারোটি বিড়ি পেয়ে থাকে। যেসব কয়েদী দক্ষতা দেখিয়ে কয়েদীদের মাতব্বর হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে, convict overseer খেতাব পেয়েছে, নলচে আড়াল দিয়ে তারা সিপাইদের কাছ থেকেই তামাক পাতা বা বিড়ি চেয়ে খায়। যাঁরা প্রথম শ্রেণীর বিচারাধীন আসামী বা দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদী, তাঁদের পক্ষে ধূমপান নিষিদ্ধ নয়। আর, রাজবন্দীদের বেলায় তো ওর কোনো পরিমাণেরই বালাই নেই। কিন্তু কতক লোককে সুবিধা দিয়ে অবশিষ্টদের ঠেকিয়ে রাখতে যাওয়া যে কতখানি ভ্রান্তিপূর্ণ নীতি, জেলে গেলে তা বেশ উপলব্ধি করা যায়।

তারপর দুষ্কৃতকারীরাই যে এসে জেলে জমায়েৎ হয় তাও নয়। বাইরে থেকে জানতে না পারলেও জেলের অভ্যন্তরে সর্ব্বশ্রেণীর কয়েদীদের সঙ্গে মিশে ও তাদের সঙ্গে আলাপ করে আমরা জানতে পেরেছি যে, লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়েছে অথবা একের দোষে অপরের প্রতি দণ্ডাদেশ হয়েছে কিংবা একেবারে নিরপরাধ ব্যক্তি আইনের নির্দ্দয় প্যাঁচে পড়ে ফেঁসে গেছে, এমনি দৃষ্টান্ত ওখানে মোটেই অপ্রতুল নয়। জেলে এসে দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে মেলামেশা করে এরাও ভবিষ্যতে বাইরে গিয়ে অবশেষে সমাজের আবর্জ্জনা হয়ে দাঁড়ায়। সংশোধন না হয়ে এখানে এসে হয় এদের কুশিক্ষা ও পাপানুষ্ঠানের দীক্ষাগ্রহণ। নির্দ্দয় আইন মানুষের অন্তরের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করে রক্ষা করে চলে শুধু নিজের দাঁড়ি, কমা ও সেমিকোলন। তাই কারাগার আমাদের দেশে অপরাধী সৃষ্টির কারখানা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আমাদের ঘরের অন্যতম ভৃত্য (জেলের ভাষায় যাদের বলা হয় ফালতু) হালিমের ইতিহাস এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হালিম বরিশাল জেলার লোক। চাষ-আবাদই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন। দু'টি ছেলে ও তিনটি মেয়ে নিয়ে সংসার তার একরকম চলে যাচ্ছিল। উপচে-পড়ার মতো স্বচ্ছলতা না থাকলেও নুইয়ে-পড়ার মত অভাব-অনটন ছিল না। কিন্তু কাল হলো তার দ্বিতীয় বার বিবাহে ও এক সুন্দরী ষোড়শী বধূ ঘরে এনে। গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য তমিজদ্দীন হালিমের ঘরে ঈদ করতে এসে ফাতেমাকে দেখতে পায় ও আলাপ করে তাকে তার ভালো লাগে।

কিন্তু আলাপেই সে ক্ষান্ত হলো না, অন্তরঙ্গ হবার ফিকিরে বার বার ঘুরে-

ফিরে আসতে লাগলো। দরিদ্র চাষী হালিম এটা ভালো চোখে না দেখলেও প্রতিবাদ জানাবার সাহস পেল না প্রথম প্রথম।

ক্রমে দেখা গেল, ফাতেমার আসনও টলটলায়মান! একদিন সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এসে হালিম দেখলো দু'জনে বড্ড বেশী ঘেঁষাঘেঁষি বসে মালসার কাঠের আগুন পোহাচ্ছে ও খোসগল্পে মজে গিয়ে বেশ হাসিতামাশা করছে। গোয়াল-ঘরে আড়ালে ডেকে নিয়ে অনুচ্চস্বরে ভৎর্সনা করতে গিয়ে হালিম বিস্মিত হলো স্ত্রীর জবাব দেবার ভাষা ও ভঙ্গী শুনে। অনুচ্চ তিরস্কারের জবাবে স্ত্রী উচ্চস্বরেই বলে বসলো: উনি আমার ধর্ম্মের ভাই। ওঁর সঙ্গে গল্প করলে আবার দোষ কোথায়?

ধর্ম্মের ভাইয়ের সঙ্গে অধর্ম্ম কিছু হবে না এবং হতে পারে না বলেই বিশ্বাস করতো সরল মানুষ হালিম। তাই সে লজ্জা পেল সন্দেহ পোষণ করে ও তা প্রকাশ করে।

তারপর কিছুদিন যায়। ভাই-বোনের সম্পর্ক গাঢ়তর হয়ে উঠলেও স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া তেমন দেখা যায়নি বলেই হালিম ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামাতো না। বরং তার মনে হতে লাগলো, প্রথম স্ত্রী গহরজানের চাইতেও ফাতেমা প্রেমময়ী ও সুগৃহিণী। পরলোকগতা গহরজানের অভাব সে ভুলে যেতে লাগলো।

কিন্তু হায়, কে জানতো সুচতুরা ফাতেমা পাকা অভিনেত্রীর মতই একদিকে প্রেম ও সোহাগ দিয়ে স্বামীকে অভিভূত করে রেখে অপর দিকে মনোরঞ্জন করতো তার ধর্ম্মের ভাইয়ের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে! স্বামীকে তুষ্ট করে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সে দরজা খুলে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বেরিয়ে আসতো গভীর রাত্রে। উঠোনের ওপারে গোয়ালঘরের অন্ধকারে তখন তমিজদ্দীনের বিড়ির আগুন দেখা যায়।

হালিমের আজও মনে পড়ে, সেদিন ছিল অমাবস্যার রাত্রি। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশের পুরু কালো আস্তরণের সঙ্গে চারিদিকের গাছ-পালা যেন এক হয়ে মিশে গেছে। গভীর নিশীথে অকস্মাৎ হালিমের নিদ্রা ভেঙ্গে গেল ছোট মেয়েটার একটানা ক্রন্দনে। নিদ্রা তার অত্যন্ত গভীর। সারাদিন ক্ষেত খামারে পুড়ে এসে রাত্রে বিছানায় গা দিতে-না-দিতে ঘুমে দু'চোখ তার আচ্ছন্ন হয়ে আসতো। কিন্তু—হালিম বলতে লাগলো: বোধহয়

খোদারই মর্জ্জি ছিল বাবু, তাই ঐটুকু মেয়ের কান্নার শব্দেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাশে হাত বাড়িয়ে ফাতেমাকে ডেকে দিতে গিয়ে দেখি সে নেই। চট্ করে মাথায় একটা ঘা খেলাম যেন। দেখলাম দরজা ভেজানো। নিঃশব্দে বাইরের দাওয়ায় এসে দাঁড়ালাম। কোথায় যেতে পারে ?···অকস্মাৎ মনে হলো, তমিজদ্দীনের বাড়ী! তৎক্ষণাৎ রওনা হলাম সাবধানে। কিন্তু গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় স্পষ্ট ফিসফিস কথার শব্দ শুনতে পেলাম আর সঙ্গে সঙ্গে খড়ের খস্‌খস্। থমকে দাঁড়ালাম। বেড়ায় কান পাতলাম। হ্যাঁ, দু'জনের কথা চলছে, মাঝে মাঝে চাপা হাসিও। মাথায় খুন চেপে গেল! ···রাতের আঁধারে গোয়াল ঘরে চুরি করে এসে ভাই-বোনের ধর্ম্মচর্চ্চা হচ্ছে ? ধর্ম্মভাই !!—সামনেই দেখি বেড়ায় গোজা রয়েছে হাত-দা'খানা।

হালিম একটু থামলো। বোধহয় উত্তেজনার মাত্রাটা একটু সামলে নিল। তারপর ধীরে ধীরে বললো : আদালতেও সবই আমি স্বীকার করেছি। বলেছি, হ্যাঁ, ঐ দা দিয়েই অন্ধকারে এক ঘা মেরেছি। কার কোথায় লেগেছে জানিনে। পরে দেখেছিলাম, তমিজদ্দীনের একখানা হাত একেবারে উড়ে গেছে, আর ফাতেমার বুকে গিয়ে বিঁধেছে দায়ের ধারালো ফলা।

হালিম আবার থামলো। গলার স্বরটাও তার যেন একটু কেঁপে উঠলো। মুহূর্ত্ত মাত্র! তারপরই সে প্রকৃতিস্থ হয়ে বলতে লাগলো : দায়রা জজ দিলেন ফাঁসীর হুকুম। হাইকোর্টে দু'জন জজের দু'মত হওয়াতে বড় জজ রায় দিলেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

হালিম কেন শুধু, হালিমের মত আরও অনেক কয়েদী এখানে আছে, যাদের দীর্ঘমেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে আইনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে বটে, কিন্তু ন্যায়বিচার হয়েছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

আমাদের ইয়ার্ডে যারা কাজ করে, তাদের নিয়মমাফিক খাবার আসে কিন্তু ওদের পৃথক্ চৌকা থেকে। সকাল হতেই আসে বড় বড় বালতি-ভর্ত্তি খুদের লপ্‌সি, কোনো কোনোদিন ওরই মধ্যে গোটাকয়েক ছোলার ডালের দানা ছড়িয়ে দিয়ে নাম দেয়া হয় খিচুড়ি। মাঝে মাঝে এক-আধটা শুকনো লঙ্কাও মেলে। নুণ একটু দেয়া হয়েছিল কিনা, তা বুঝতে হলে গেলে পেতে হয়।

দুপুর বেলায় আসে ট্রাঙ্ক-ভর্ত্তি ভাত। সত্যিই ট্রাঙ্ক। শুধু এর ডালাটা কব্জি দিয়ে আঁটা নয়, আলগা। ঢাকনির মতো। ট্রাম ইন্‌সপেক্টারদের

বারান্দাটুকু বাদ দিয়ে টুপীটা উলটে দিলে যা হয়, ঠিক তেমনি ধরনের একটি লোহার পাত্র আছে ট্রাঙ্কের মধ্যে, তাকে বলা হয় কাঠা। উপচে-পড়া এক কাঠা ভাত জনপ্রতি বরাদ্দ। সিগারেটের টিনের আকার ও বোধহয় সাইজেরও একটি এ্যালুমিনিয়মের বাটি একটি লম্বা ডাণ্ডার সঙ্গে লাগানো আছে। সেই বাটির এক বাটি করে ডাল। পরিমাণ মন্দ নয়। ঐ ধরনের একটু ছোট সাইজের বাটির এক বাটি তরকারি।

কী কী জিনিষ দিয়ে যে সেই তরকারি রান্না করা হয়, তা বোঝবার উপায় যে একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু কিছু শাক-পাতা তাতে থাকবেই। তা সে পালং থেকে সুরু করে সরষে শাক, মুলো শাক, নটে শাক, পটল পাতা, শালগম ও ওলকপির পাতা, ফুলকপির পাতা, এমন কি পেঁপে গাছের কচি পাতাও থাকতে পারে। দুষ্ট লোক অবশ্য বলে যে, ঘাসও না কি মাঝে মাঝে তাতে ছেড়ে দিতে কার্পণ্য বা সঙ্কোচ করে না বড় চৌকার বাটলারগণ। একটু বেশী ঝোল ও তাতে এই ঘাসজাতীয় দ্রব্যগুলি গলিত অবস্থায় থাকে। আর যাই থাক না তাতে, সবই অতিরিক্ত সেদ্ধ করা হয়। ফলে বেশ হড়হড়ে জাতীয় তরকারি প্রস্তুত হয়।

জেলের অভ্যন্তরে বিরাট সবজী বাগান আছে। তাতে চমৎকার সব তরকারি জন্মে। আলু, বেগুন, সিম, শালগম, ওলকপি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, লাউ, কুমড়ো, মুলো, টমেটো, বরবটি প্রভৃতি বারো মাসের তরকারি এখানে হয়। সেই ক্ষেতে সারাদিন খেটে মরে এই সাধারণ কয়েদীর দল, অথচ খাবার বেলায় এরা পায় শুধু পাতা আর ঘাস এবং খুব বেশী হলে সময়োত্তীর্ণ দু' একটা জিনিষ। অর্থাৎ, চৈত্র মাসে হয়তো এদের দেয়া হলো ফুলকপির শুকনো ফুলগুলো কিংবা বুড়ো মুলোর ঝাড় কিংবা শালগজানো শালগম। তেল ও মসলাহীন সেই অপূর্ব্ব ব্যঞ্জন থেকে এমনি বোঁটকা গন্ধ বেরুতে থাকে যে, একেবারে সওয়া যায় না। বাগানের তরকারি যায় অফিসারদের বাড়ীতে আর বাকিটা বাইরে বিক্রী করে ফেলা হয়।

ভাত, ডাল ও তরকারি প্রত্যহই পাওয়া যায়। এ ছাড়া প্রতি চতুর্থ দিনে পাওয়া যায় মাছ অথবা মাংস। অবশ্য একবেলা। ইংরেজের রাজত্বে অবিচার হতে পারে না। তাই মাছ বা মাংস যেদিন আসে, সেদিন বণ্টনকারীদের সঙ্গে এক জন আসে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে। যদি কেউ মাছের বা মাংসের টুকরো

দেখে চ্যালেঞ্জ করে বসে, তৎক্ষণাৎ ওজন করে তাকে দেখিয়ে দেয়া হয় যে, ঠিক এক ছটাক এক টুকরো মাছ বা মাংসই তাকে দিয়ে সরকারী হুকুমের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়েছে।

কিন্তু মজা হচ্ছে, মাছগুলো আসে ভাজা হয়ে আর মাছের ঝোল আসে পৃথক্ একটি বালতিতে। সেই ঝোল একেবারে পৃথক্ রান্না করা হয়, মাছের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে না। এমনি অভিনব মাছের ঝোলের কারণ দু'টি। প্রথম, কয়েদীদের মধ্যে অনেকে ঐ হলুদ মেশানো জল অথবা ঝোল পছন্দ করে না আর দ্বিতীয়, ঝোলে-ডোবানো মাছের ওজন বৃদ্ধি হবেই, তাতে তারা ঠকছে বলে দাবী করতে পারে।

মাংসের ঝোলকে অবশ্য মাংসেরই ঝোল বলা যায়, কারণ একই সঙ্গে রান্না করে মাংসের টুকরোগুলো সাবধানে তুলে নেয়া হয়। আর মাংস ভাজা ওরা কেউ খায় না।

এ ছাড়া পাওয়া যায় একটুখানি তেঁতুল, যাকে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাষ্ট্র সচিব সুমধুর চাটনি বা টক আখ্যা দিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেন। এক টুকরো তেঁতুল।

বিকেলে যারা ভাত খায় না, তাদের জন্য রুটিরও ব্যবস্থা আছে। প্রায় তেরো ইঞ্চি ডায়মেটারের এক-একখানা পাতলা রুটি, দু'খানা করে বরাদ্দ। চাইলে আর একখানাও পাওয়া যেতে পারে। চালনিতে ছেঁকে আটা বার করে নেবার পর যে ভুসি থাকে, দেখলে মনে হয় সেই ভুসি দিয়েই ঐ রুটি প্রস্তুত করা হয়। আটা খৈলের সঙ্গে মিশ্রিত করে জেলের প্রধান জমাদারের বিরাটকায় গরুগুলির খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হয়।

আমাদের ইয়ার্ডে যে সব কয়েদী কাজ করতো, আমাদেরই খাবার খেত, তারা অবশ্য এ সব খাদ্য যেমন নিয়মমাফিক আসতো, তেমনি নিয়মমাফিক গ্রহণ করতো শুধু, কিন্তু মুখে তুলতো না। আমরাই দিতাম না ওদের তা খেতে। বরং সখ করে মাঝে মাঝে আমরাই তা একটু চেখে দেখে বেশ মজা অনুভব করতাম।

নয়

পাগলা ঘন্টি বাজবার পর প্রায় দু'সপ্তাহ কেটে গেছে। সুতরাং উত্তাপ ও উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত হয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনযাপন সুরু হয়েছে। সপ্তাহে দু'বার সুপারিনটেনডেন্টের আমাদের ইয়ার্ড পরিদর্শনে আসবার কথা। কিন্তু গত দু'সপ্তাহ তিনি আর আসেননি, এসেছেন শুধু জেলার নরেন সরকার। সঙ্গে সিপাইদের সংখ্যাও কম দেখা গেছে। ঘরোয়া সফরের মতো। সেদিনের ঘটনার কথা বেমালুম না তুলে, অকস্মাৎ তিনি আমাদের শুভানুধ্যায়ী হয়ে ওঠেন: আরে মশাই, চোর চোর, সব শালা চোর। সেদিন আমি নিজে বাজারে গিয়ে ইয়া বড় বড় কৈ মাছ নিয়ে এলাম পঞ্চাশটি এক টাকায়, আর সেদিন সেই রকম কৈ মাছেরই দাম শালা কনট্রাকটর চার্জ্জ করেছে পুরো দু'টাকা করে? আপনাদের আর কি, নীরেনবাবুর সামনে বিল ধরলেই তিনি খস্ খস্ করে সই মেরে দেন। এমনি অন্যায় আমাদের কিন্তু গায়ে লাগে। হোক্ না সরকারী টাকা, তবুও একশো টাকায় একশো টাকা লাভ? আপনাদেরও বলি, যে টাকাটা শালা বেশী নিয়ে গেল, তা দিয়ে আর-একটা ভালো জিনিষও তো পারতেন কিনতে। কত কাল থাকতে হবে কে জানে! বলি, স্বাস্থ্যটা তো রক্ষা করে চলবেন।

একদিন যিনি বন্দুকধারীদের প্রতি 'পয়েণ্ট ইয়োর গান্' হুকুম দিয়ে আমাদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন, আজ আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তাঁর এই উৎকণ্ঠা এত বিসদৃশ ঠেকে যে, নীরেনবাবু বেশ একটু শ্লেষই করেন: ওজন নেবার খাতাটায় একবার চোখ দিয়েছেন? দেখেছেন আমাদের গড়পড়তা ওজন বৃদ্ধির হিসাব? সপ্তাহে এক পাউণ্ড করে প্রায় প্রত্যেকেরই বেড়ে চলেছে। এর চাইতেও বেশী আশা করলে অবশেষে আপনার দশা হবে যে!

নরেনবাবু দু' হাতে ভুঁড়িটা চেপে ধরলেন, বোধহয় হাসির ধাক্কায় সেটা খসে পড়ে না যায়, সেজন্য। তারপর বললেন: না, তেমন আর বেশী কি! এর চাইতে কত বড় বড় ভুঁড়ি দেখেছি। এই তো সেদিন নবাব-বাড়ীর একটা বিয়েতে গিয়েছিলাম—

বাধা দিয়ে ভোলাবাবু বললেন : তা হতে পারে। গৌরীশঙ্কর যে কাঞ্চনজঙ্ঘার চাইতেও উঁচু তা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু তাতে করে কাঞ্চনজঙ্ঘা উপেক্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়ায় না।

চারুবাবু বলে ফেললেন : সারা ঢাকা জেলটাই তো আপনার উদরে। তাই সাইজটা তেমনি হওয়া চাই তো। ওতে দোষ নেই।

তীক্ষ্ণ শ্লেষটা সহজ করে দেবার জন্য নরেনবাবু উচ্চ হাস্য করে উঠলেন এবং বললেন : তবুও তো একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন না ?

রাত্রে দিবাকরবাবু আমার টেবিলে এসে বসলেন। মার কাছ থেকে একখানা দীর্ঘ পত্র পেয়েছি, তারই জবাব লিখছিলাম নিবিষ্ট মনে। কখন্ যে সিপাই রাতের মতো দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেছে, টেরই পাইনি।

বাধা পেলাম। লোকটা অকস্মাৎ এসে হাজির হয় এমনি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এতটুকুও আভাস না দিয়ে যে, গা জ্বালা করে। তথাপি শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম : কি ব্যাপার দিবাকরবাবু ?

না, তেমন কিছুই নয়। শুধু ভাবছি বীণা দাসের গুলীটা যদি জ্যাকসনের বুকে লাগতো, তাহলে বাংলা দেশ একটা রেকর্ড করে ফেলতে পারতো। কিন্তু ব্যাটার কি ভাগ্য দেখছেন ? এত কাছ থেকে মারা হলে, অথচ একটি গুলীও শালার বুকে বা গায়ে লাগলো না।

এ সম্বন্ধে মন্তব্য করবার কি আছে এবং থাকলেও সরকারী গোয়েন্দা রাজবন্দী দিবাকর সেনগুপ্তের সঙ্গে তা নিয়ে কেন যাবো আলোচনা করতে ? তাই শুধু একটু মুচকি হাসলাম মাত্র।

কিন্তু ঐ হাসিতেই দিবাকরবাবু যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করলেন : আমার কি মনে হয় জানেন দ্বিজেনবাবু, বি ভির ঐ life for life নীতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং একেবারে নিশ্চিত। মরতে হবে নির্দ্দেশ থাকলে মারবার যত্নটা বোধ হয় আরো বেড়ে যায়। আর পলায়নের পরামর্শ থাকলে, আগেই একটা চোখ থাকে দরজার দিকে। এ জন্যই বি ভির প্রত্যেকটা প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। মরতে হবে জানলে বীণা দাস একেবারে ডায়েসের ওপরে উঠে গুলী চালাতো, তাহলেই গভর্ণর বাছাধনকে আর রক্ষা পেতে হতো না।

বললাম নেহাৎ কিছু বলতে হবে বলেই : তা কনভোকেশনটা খুব জমেছিল বলুন ?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।—বলে দিবাকরবাবু হাসতে লাগলেন। তারপরই অকস্মাৎ স্বর অত্যন্ত খাটো করে বললেন : গত সপ্তাহে সকালবেলা যে সিপাইটার ডিউটি ছিল, মনে আছে সেই মাধব সিংকে ? ওকে হাত করে ফেলেছি। রাজী হয়েছে। যদি কোথাও চিঠি পাঠাতে হয়, পাঠাতে পারেন। জবাবও ও এনে দেবে। টাকা অবশ্য ও চায়নি। তবুও বোঝেন তো—

বললাম, কোথায় আর খবর পাঠাবো। আর কি-ই বা খবর আছে। তবুও দেবেন আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে আবার এখানে ডিউটি পড়লে।

না, না, খুব বিশ্বাসী।—এই দেখুন না, কাল রাত্রে এই 'আনন্দবাজার'খানা লুকিয়ে দিয়ে গেছে।—বলে তিনি র‍্যাপারের নীচে থেকে একখানা আনন্দবাজার সত্যিই বার করলেন। সত্যিই দেখলাম তার তারিখ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২ সাল।

বিনাবাক্যে একটু চোখ বুলিয়ে নিলাম। বাইরের সংবাদ কিছু সংগ্রহ করা গেল, সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্যও। পুরস্কারস্বরূপ দিবাকরবাবুকে খুশী করে দিলাম : আচ্ছা, ঠিক আছে। প্রয়োজন হলেই জানাবো আপনাকে। আর জানাবোই বা কি ? চিঠিই দিয়ে দোব আপনার হাতে, আপনি মাধব সিংকে দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন, কেমন ? আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে, আপনাকেই শুধু চিনে রাখুক। পরিচিতের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কি, কি বলেন ?

খুব খুশীভরা মন নিয়ে উঠে গেলেন গোয়েন্দা-রাজবন্দী দিবাকর সেনগুপ্ত। ভাবলেন, এইবার কাজ দেখাবার একটা মওকা পাওয়া গেল। যোগিনী বোস বা জিতেন ধর এবার খুশী না হয়েই পারেন না।

খুশী আমিও হলাম ওঁর মূর্খতা অনুভব করে। গোয়েন্দা পুলিশ বিপ্লবীদের সঙ্গে বুদ্ধি বা কূটনৈতিক চালের লড়াইতে কোনোদিনই জয়লাভ করতে পারে না, যদি না বিপ্লবীদেরই অন্তরঙ্গ কেউ ওদেরকে সাহায্য করে সংবাদ সরবরাহ করে। ঢাকায় মেডিক্যাল স্কুলে লোম্যান ও হাডসন গুলীবিদ্ধ হবার পরই বিনয় স্কুলের রেলিং টপকে নীচে খালে নেমে পড়ে। খালে হাঁটুসমান জল পার হয়ে সে দৌড়ে গিয়ে ওঠে এক মুসলমানের কুঁড়ে ঘরে। সেখান থেকে

তার বন্ধুরা সেইদিনই গভীর রাত্রে নৌকাযোগে তাকে পাঠিয়ে দেয় নদীপথে চাঁদপুরে। প্রায় সাড়ে তিন মাস পর বিনয় পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস-এ। আর্মানীটোলার মেসে বিনয়ের রুম-মেট ছিল গোপাল সেন। গোপালকে গ্রেপ্তার করে তার ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালায় ঢাকার আই বি পুলিশ। কিন্তু একটি কথাও প্রকাশ করেনি সে। তাই লোম্যান-হাডসন-সিম্পসন-গার্লিক প্রভৃতির ওপর যে গুলীচালনা হয়, তা নিয়ে পুলিশ কোনও ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করতে পারেনি, যদিও এ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করেছে অনেককে এবং নিশ্চয়ই আই বি অফিসে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে জামাই-আদর দেখায়নি। তবুও পারেনি। কারণ বি ভি বিপ্লবী দলে দিবাকর সেনগুপ্ত নেই!······

ফেব্রুয়ারী মাস পড়লে কি হবে, শীতের যেন আর কমতি নেই! হালিম এসে জানালার চিকখানা ভালো করে ফেলে দিয়ে গেল বটে, তবুও আপাদমস্তক লেপ ঢাকা দিয়েও যেন ঠাণ্ডা মনে হতে লাগলো। তরণী সোমের নাসিকা-ধ্বনি সুরু হয়ে গেছে। অন্যান্য সবাইও নিদ্রামগ্ন। দিবাকরবাবু যথারীতি তাঁর কোন আত্মীয়কে চিঠি লেখা সুরু করলেন। আত্মীয় যে কে, তা বোঝবার ক্ষমতা একুশ বছর বয়েস হলেও আমার হয়েছে। আজকের সারাদিনের ডায়েরী লেখা হচ্ছে এবং কালই হয়তো আবার একটা কাজের ছুতো করে যাবেন অফিসে আর ওখানা পাঠিয়ে দিয়ে আসবেন যথাস্থানে। উল্লসিত হয়ে নিশ্চয়ই আজকে আমার কথাও লিখেছেন। লিখুন। ওতে ঘাবড়াবার ছেলে নই আমি।

কারণ, গত বছর আলিপুরের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর গুণেশ সেনের রিভলভার তাঁর ড্রয়ার থেকে উধাও হয়ে যাবার ব্যাপারে যখন আমায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তখনই কলকাতার এস বি অর্থাৎ গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চের সঙ্গে আমার সম্যক্ পরিচয় ঘটে গেছে। বয়লার-ঘর তখনই ঘুরে এসেছি।···

গ্রেপ্তারের দিনের কথা মনে পড়ে। সন্ধ্যার পর যথারীতি ব্যায়াম সেরে ভবানন্দ রোডের আমাদের বাড়ীর সামনে সাইকেলে এসে নামলাম এবং অভ্যাস মতই রাস্তাটার একবার এদিক আর একবার ওদিক দৃষ্টি প্রসারিত করে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। গা ঢাকা দেবার মতো পরিস্থিতি তখনো দেখা দেয়নি।

জানুয়ারী মাস। এদিকে তখন দু' চারখানা মাত্র বাড়ী উঠেছে। প্রায়ই ফাঁকা মাঠ। তাই বেশ শীত।

বেড়ার গায়ে সাইকেলখানা হেলান দিয়ে রেখে সোজা রান্নাঘরে ঢুকে পড়লাম। দেখলাম, ভাগ্য সুপ্রসন্ন, ঠিক সময়েই এসে পড়েছি। সেজ বৌদি চা তৈরী করছেন। মেজ বৌদি আর সোনা বৌদিও বেশ জমিয়ে বসেছেন। শুধু চা যে খেতে নেই, এ জ্ঞানটা মেজ বৌদির ভারী টনটনে, তাই তিনি তাড়াতাড়ি ভাঁড়ার ঘর থেকে এক মুঠো মুড়ি এনে দিলেন।

চায়ের আসর বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় বাইরে কার কণ্ঠ শোনা গেল: দ্বিজেনবাবু বাড়ী আছেন? দ্বিজেনবাবু—

বন্ধু যে নয়, তা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম। বন্ধুরা বাবু বলে না, আর কণ্ঠও অপরিচিত। সাড়া দিলাম: যাচ্ছি, দাঁড়ান।

চা-মুড়ি শেষ করে বাইরে এসে দেখি সত্যিই অপরিচিত এক ভদ্রলোক। বললেন অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করে: একটু আসুন, এক মিনিট।

রাস্তায় পড়তেই দেখলাম, তিনি আড়ামোড়া তোলার ছলে কৌশলে রাস্তার একবার এদিকে আর একবার ওদিকে হাতছানি দিয়ে কাদের ইসারায় ডাকলেন এবং পরমুহূর্তেই প্রায় বারো-চৌদ্দ জন পুলিশ এসে আমায় ঘিরে ফেললো। তৎক্ষণাৎ বন্ধুর এক মিনিটের তাৎপর্য্য জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

দারোগা প্রফুল্ল মণ্ডল এস বির চাকুরে। তাই ভারী মিষ্টি তাঁর কথা: অত্যন্ত দুঃখিত দ্বিজেনবাবু! আপনার বাড়ীটা একবার সার্চ্চ করতে হবে।

সার্চ্চ হলো তন্ন তন্ন করে। ওদের নজর দেখা গেল বিশেষ করে ভাঁড়ার ঘরে এবং ভাঁড়ার ঘরের হাঁড়ি-কুড়ির প্রতি। যথারীতি কিছুই পাওয়া গেল না। এবার মণ্ডল মশাইয়ের কণ্ঠস্বর আরো মোলায়েম: দ্বিজেনবাবু, আপনাকে একটি বার পাঁচ মিনিটের জন্য থানায় যেতে হবে আমার সঙ্গে।

কেন?

এই একটা বিবৃতির জন্য। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন মাত্র। পাঁচ মিনিটের ব্যাপার!—বলে মণ্ডল ব্যাপারটার গুরুত্ব একেবারে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলেন।

শীতের রাত। সন্ধ্যে হতেই রাতের রান্না শেষ হয়ে যায়। বৌদিরা তাঁদের দেবরকে খুব ভালো রকম চেনেন। তাই মেজ বৌদি বললেন:

এই মাছের ঝোলটা নামছে, একেবারে খেয়েই যাও। পাঁচ মিনিট মানে পাঁচ ঘণ্টাও তো হতে পারে!

পাঁচ মিনিট যে সত্যিই মাত্র তিনশো সেকেণ্ড, মণ্ডল আর একবার সেই সত্যটা উচ্চারণ করে বৌদির শ্লেষটা সহজ করে দেবার চেষ্টা করলেও দেখা গেল. পাঁচ মিনিটের মধ্যে খেতে দেবার আপত্তি তাঁর খুব প্রবল নয়।

দাদারা কেউ তখনো বাড়ীতে ফেরেননি। তাই সেজ বৌদিই অগ্রণী হয়ে মণ্ডলকে ঘরে গিয়ে বসতে বললেন। কিন্তু মণ্ডল বোধহয় মারাত্মক আসামীকে রান্না ঘরে রেখে স্বস্তি পাবেন না, তাই এই প্রচণ্ড শীতেও বাইরে উঠানেই অপেক্ষা করা শ্রেয় মনে করলেন। বারো জন পুলিশ চব্বিশটি চক্ষু চতুর্দ্দিকে মেলে রেখে সতর্ক পাহারায় দাঁড়িয়ে রইলো।

কাছেই টালিগঞ্জ থানা। পাঁচ মিনিটের জন্য সেখানে এনে একটি কক্ষে বসিয়ে রেখে অপর কক্ষ থেকে প্রফুল্ল মণ্ডল টেলিফোনে যে কথা ক'টি বললেন, তাতেই পরিষ্কার আমার অবস্থাটা জানা গেল।

—হ্যালো, শুনুন, দ্বিজেনবাবুকে এখানে এনেছি।···না, কিছুই পাওয়া যায়নি।···সঙ্গে আর কেউ ছিল না—একা।···অ্যাঁ, কোথায়? ভবানীপুরে? কাল সকালে, ওখানে? ···রায় বাহাদুর কথা কইবেন? আচ্ছা।

তারপর ভবানীপুর থানায় রাত্রিবাস এবং তারপর দিন পনেরো থাকতে হলো পার্ক ষ্ট্রীট থানায়। সেখান থেকে লর্ড সিংহ রোডে প্রত্যহই যেতে হতো পুলিশ ভ্যানে এবং সারাদিন অঙ্গ সংবাহনের পর ফিরে আসতাম সন্ধ্যার পর। সেখানকার আদরআপ্যায়ন সীমাহীন হয়ে উঠলো তখন, যখন অকস্মাৎ একদিন দেখলাম রায় বাহাদুর বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কক্ষে আমার তলব পড়লো।

বনবিহারীর এক চক্ষু একটি প্লেট ঝুলিয়ে ঢাকা। অসুখ নয় কিছু। পরে জেনেছিলাম, ওটা নাকি স্কটল্যাণ্ডীয় কৌশল, এক চোখ ঢেকে রাখলে সে লোককে দু' চোখ খোলা অবস্থায় দেখলে চেনা কঠিন। বিপ্লবীরা যাতে তাঁকে চিনে না রাখতে পারে, তাই অসুখের ভান।

কিন্তু আশ্চর্য্য তাতে কিছু হইনি। চমকে উঠলাম তখন, যখন দেখলাম, তাঁর সুমুখের একখানা চেয়ারে কাঁচুমাচু মুখ করে বসে আছে গুণেশ সেনের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ বিমল সেন।

চেন একে ?—বনবিহারীর ক্রুদ্ধ প্রশ্ন শোনা গেল।

মেঝের দিকে চেয়ে বিমল মৃদুস্বরে জবাব দিল : চিনি।

তুমি এর হাতে রিভলভারটা এনে দিয়েছিলে ?

হ্যাঁ।

চমকে উঠলাম : বলিস্ কি রে ?

জবাব দিলেন বনবিহারী : হ্যাঁ, এমনিই সব বলছে। ভেবেছ কিছুই জানিনে আমরা ? শোন তবে।—বল তো, কি করে দিলে ?

মাথা নীচু করে শ্রীমান্ বিমল কুটি কুটি করে বেশ বলে যেতে লাগলো : সন্ধ্যার পর সাইকেলে এসে উনি রাস্তায় অপেক্ষা করছিলেন। আমি বাবার ড্রয়ার খুলে রিভলভারটা ও কার্তুজগুলো একটা সাবানের বাক্সে ভরে নীচে এনে ওঁর হাতে দিয়ে যাই। উনি চলে যান।

এবার ?—গর্জ্জে উঠলেন রায়বাহাদুর : কি বলবার আছে তোমার ? চালাকী পেয়েছ ? We have got report of all your activities from Dacca—ভেবেছ আমরা সংবাদ রাখিনে।—বল, চুপ করে থেকে লাভ নেই।

বললাম : কি আর বলবার থাকতে পারে !

হ্যাঁ, সত্যিই তাই, বলবার আর কিছু নেই।—এবার লক্ষ্মী ছেলেটির মতো ওটা বার করে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। আর তা নইলে, there will be a big conspiracy case against you and you shall get transportation for life। যান, নিয়ে যান। শুনুন প্রফুল্লবাবু, ওকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিন। সব বলে দেয় ভালই। নইলে ঐ ডালহৌসী ষড়যন্ত্র মামলাটায় একেও জুড়ে দিন, বুঝলেন ?

যে আজ্ঞে।—বলে মণ্ডল মশাই আমায় নিয়ে বেরিয়ে এসে প্রবেশ করলেন সোজা মণি বোসের কক্ষে। বাংলার, বিশেষ করে কলকাতার, বিপ্লবীদের সঙ্গে মণি বসুর সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই ঘটেছে একবার অথবা একাধিক বার। কোটর থেকে বেরিয়ে-আসা সেই বিরাট্ ডেলার মত দু'টি চোখ আর গরুড়ের মতো নিম্নমুখী-অগ্রভাগ নাসিকা আর মা বাবা থেকে সুরু করে উর্দ্ধতন সব ক'টি পুরুষেরই উদ্দেশ্যে বাছা বাছা গালিবর্ষণ, বাংলার, বিশেষ করে কলকাতার, প্রত্যেক বিপ্লবী বন্দীরই স্মৃতিপটে চিরকাল জেগে থাকবে !

তাঁর বিখ্যাত কোটরে শুধু হাণ্টারই থাকতো না, মণি বসু এক গ্লাস জলও

রাখতেন রেডি করে। কারণ জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্য জলের প্রয়োজন হতে পারে। দূরদর্শী ও সাবধানী। আমরা এই বিশেষ ঘরটিকে বলতাম বয়লার আর এই অগ্নিপরীক্ষায় যে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসতো, তাকে বলা হতো বয়লার-প্রুফ !

১৯৩১ সালের প্রথম দিকের প্রায় চার মাস বিচারাধীন আসামীরূপে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে অবস্থানের স্মৃতি ভোলবার নয়।

তল্লাসী করে রিভলভার পাওয়া যায়নি বটে, কিন্তু বিমলের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে হয়তো রিভলভার চুরির একটা মামলা খাড়া করা যাবে, এমনি দুরাশা নিয়েই আমায় জেলে পাঠানো হলো। কাষ্টোডি ওয়ারেণ্টে উল্লেখ করা হলো ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারা অর্থাৎ নির্জ্জলা চুরি। আর এক কোণে লাল কালিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো, To be segregated অর্থাৎ সাধারণভাবে অন্যান্য বন্দীর সঙ্গে না রেখে পৃথক করে রাখতে হবে।

তখন জেলার ছিলেন মিঃ সোয়ান। শুনেছিলাম প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে তিনি নাকি সেনাদলের একটা কেউ-কেটা ছিলেন এবং অনেকবারই নাকি তাঁকে মুখোমুখি হাতাহাতি লড়াই করতে হয়েছিল। সেই তুলনাহীন বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ আজ তিনি আলীপুর সেন্ট্রাল জেলের মতো বিরাট প্রথম শ্রেণীর জেলের মহাপরাক্রমশালী জেলার। জেলার হিসেবে বুদ্ধির দৌড় তাঁর কতখানি, জেলের বাসিন্দারা তা ভালভাবে জানলেও সোয়ান নিজেকে বুদ্ধির জাহাজ মনে করতেন। এমনি to be segregated আসামী তিনি অনেক দেখেছেন। তাই সহজেই বুঝে ফেললেন যে, নিশ্চয়ই আমি একজন confessor অর্থাৎ স্বীকারোক্তিকারী আসামী। জেলে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন প্রফুল্ল মণ্ডল। সোয়ানের হাতে ওয়ারেণ্টখানা দিয়ে কানে কানে বলে গেছেন যে, আমি একজন স্বদেশী আসামী, স্বদেশী চোর। উর্ব্বর মস্তিষ্ক খাটিয়ে সোয়ান তৎক্ষণাৎ আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করে ফেললেন এবং পাঠিয়ে দিলেন ১৬ নং সেল্-এ।

প্রবেশ করেই দেখি দীনেশ। দীনেশ গুপ্ত। বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের ক্যাপ্টেন দীনেশ গুপ্ত। রাইটার্স বিল্ডিংস-এর প্রাতঃস্মরণীয় অলিন্দ যুদ্ধের অন্যতম বীর। লেফটেন্যাণ্ট বাদল গুপ্ত পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে রাইটাস বিল্ডিংসে-ই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। মেজর বিনয় বসু মারাত্মক ক্ষতের

মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করে মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যুবরণ করে নিয়েছে। ত্রয়ীর তৃতীয় বীর এই দীনেশ। পটাসিয়াম সায়নাইড সে ও খেয়েছিল, নিশ্চিন্ত হবার জন্য কণ্ঠনালীতে গুলীও চালিয়েছিল। কিন্তু তথাপি তার মৃত্যু হলো না। সে সুস্থ হয়ে উঠলো। তাকে সুস্থ করে তুলে ট্রাইবিউনালের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বিচার চলছে। বিচার শেষ হয়ে এল।

দীনেশ বললো: কিন্তু কি যে বিচার হচ্ছে, তা তো আপনাকে বলতে পারবো না। কাঠগড়ায় আমায় একখানা চেয়ার দেয় আর দেয় স্টেটসম্যান। বসে বসে পড়ি। তারপর বিকেলে সার্জেন্ট এসে বলে, এবার চলুন। চলে আসি।

জিজ্ঞেস করলাম: মা আসেন না?

রোজই আসেন, জবাব দিল সে: শুধু মা কেন, দাদা দিদি ভাই আত্মীয়-স্বজন অনেকেই আসেন।

তাঁরা কি বলেন? প্রশ্ন করলাম।

দীনেশ মুচকি হাসলো: কি আর বলবেন। যা সবাই বলে থাকে। সে কিছু নয়।

কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেই-বা আমি ছাড়বো কেন? জিজ্ঞেস করলাম: তবু শুনি না, মা কি বলেন।

হালকাভাবেই বলতে লাগলো: এই—বলেন, তুই কেন এ কাজ করতে গেলি নসু? দেশকে ভালবাসার মানে কি এই? তোকে ছেড়ে আমরা থাকবো কি করে, বাঁচবো কি নিয়ে—এমনি সব আর-কি। বলে সে আবার মুচকি হাসলো।

জিজ্ঞেস করলাম: আর তুমি কি বল?

কি আর বলবো।

তবু শুনি কি বল।

এই—বোঝাতে চেষ্টা করি।

জিজ্ঞেস করলাম: কি বলে বোঝাও?

কি বলে? এইবার নিমেষে তার হাসি অন্তর্হিত হলো, মুখমণ্ডল হয়ে উঠলো কঠিন, দৃষ্টি হলো স্থির। ধীরে ধীরে বলতে লাগলো: বলি—মা, তুমি যে বলছো এত ছেলে থাকতে আমি কেন এই কাজ করতে গেলাম, তার জবাবে

জিজ্ঞেস করি, তোমার মতো সব মা-ই যদি এমনি করে নিজের ছেলেকে আটকে রাখেন, তাহলে কে করবে এই কাজ ? দেশ স্বাধীন করবার কাজ কি তাহলে স্থগিত থাকবে ? দীনেশের কণ্ঠস্বরে এবার আবেগ উৎসারিত হয়ে উঠলো : বলি—তুমি তো তবু আমায় দেখতে পারছো, আমার সঙ্গে কথা বলতে পারছো, একবার বাদল বা বিনয়বাবুর মাদের কথা ভেবে দেখ তো ! সেই মা-রা যদি সইতে পেরে থাকেন, তুমি কেন পারবে না ?

এ প্রশ্নের কোনো জবাব আমার জানা নেই। তাই চুপ করে রইলাম।

পাশাপাশি সেল-এ থাকতাম দু'জন। সেল ইয়ার্ডের দরজা সর্ব্বক্ষণ বন্ধ। দরজায় সিপাই। কিন্তু তাতেও নিশ্চিন্ত হতে না পেরে বুদ্ধিমান সোয়ান দীনেশের সেল-এর বাইরেই আর একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ডারকে নিযুক্ত করেছেন। আয়না, চিরুণী, গন্ধতেলের শিশি, মাখনের কৌটো, সাবানের বাক্স, এমনি সব মারাত্মক জিনিষগুলো এ্যাংলো ওয়ার্ডার জনের সম্মুখে টেবিলের ওপর জমা থাকতো ! ষোলোটি সেল-এর বাসিন্দা আমরা মাত্র তিনজন, দীনেশ, আমি আর-একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বন্দী। সে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদী। জেলের কোনো আইন ভঙ্গের অপরাধে সেল পানিশমেণ্ট হয়েছে। চৌদ্দ দিনের আট দিন কেটে গেছে। দেখা গেল এই আট দিনেই দীনেশ তার সঙ্গে বেশ জমিয়ে ফেলেছে। প্রথমটা একটু আশ্চর্য্য বোধ করলাম বৈ কি ! গোমেশ সেই দলীয় এ্যাংলো যুবক, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট অঞ্চলে বান্ধবীর হাতে হাত জড়িয়ে যারা নাইট শো-তে সিনেমায় যায়, নাইট ক্লাবের নাচ ও পানের আসরে যারা মত্ত হয়ে ওঠে, ফূর্ত্তি করার টাকার অভাব হলে যারা প্রতারণা, জালিয়াতি, রাহাজানি, এমন কি খুন করতেও দ্বিধা বোধ করে না। সমাজের কলঙ্ক সেই গোমেশের সঙ্গে দীনেশ যখন আমায় তার বন্ধু বলে পরিচয় করিয়ে দিল, তখন বিস্ময় আরও বেড়ে গেল।

পরদিন দুপুরে পাশাপাশি দু'জন যখন দীনেশের সেল-এ খেতে বসেছি, তখন আসল কথা জানতে পারলাম।

দীনেশ বললো : ব্যাটা গোমেশের কাছে একটা রিভলভার আছে আর আছে আড়াই-শো বুলেট। ওর রিলিজ-এর আর মাত্র আড়াই মাস বাকি। আর আপনার বিরুদ্ধেও আই বি কোনো মামলা করতে পারবে না। বাইরে গিয়ে আপনি ওর সঙ্গে দেখা করবেন। ওকে একশো টাকা দিলেই

ও রিভলভার আর বুলেটগুলো দিয়ে দেবে। আমি ওকে সব বলে ঠিক করে ফেললাম।

বললামঃ মামলা করতে না পারলেও আই বি হয়তো আমায় নিষ্কৃতি দেবে না, রাজবন্দী করে প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠিয়ে দেবে। কারণ বিমল রিভলভার আমায় দেবার কথা স্বীকার করেছে। তারপর আবার যার-তার রিভলভার নয়, স্বয়ং গুণেশ সেনের।

সহসা দীনেশ প্রশ্ন করলোঃ বিমল স্বীকার করে বসলো? তারপর এস বি কি করলো আপনাকে?—সহসা নিজেই তার জবাব দিলঃ ও—বুঝেছি, তাই প্রথম দিন আপনাকে খোঁড়াতে দেখেছি। খুব মেরেছে?

হালকা করবার চেষ্টা করলামঃ না, তেমন কিছু—

ফাঁকি দিচ্ছেন!—রীতিমত ধমকে উঠলো সেঃ নিশ্চয়ই হাণ্টার চালিয়েছিল। সেই মণি বোস, না? উঃ, কত লোকের কাছেই সেই মণি বোসের কথা শুনেছি। ভেবেছিলাম, বেঁচেই যখন উঠলাম, তখন মণি বোসের সঙ্গে আমার একবার মোলাকাৎ হবেই! কিন্তু জামাই আদরে আমায় এখানে দিয়ে গেল। আপশোস্!

সে বোধহয় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসই ত্যাগ করলো। পর মুহূর্তেই আবার জিজ্ঞেস করলোঃ হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যায় ওর ঘরে?

বললামঃ খুশী হলে দেয়, না হলে দেয় না।

দিক হাতকড়া, তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো দীনেশঃ হাত দু'টো জড়ো করে এমন ঘুসি লাগিয়ে দোব যে, মণি বোসের দাঁতগুলো খুলে পড়ে যাবে।

চক্ষে তার অগ্নিকণা দেখলাম, যে স্ফুলিঙ্গ দেখা গিয়েছিল কানাইলালের চক্ষে! আহার বন্ধ হয়ে গেছে, নিষ্পলক দৃষ্টি নিবদ্ধ মেঝের দিকে, ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠেছে। একটু পর দীনেশ বললোঃ যদি ছাড়া পাই, তাহলে আমার প্রথম কাজ কি হবে জানেন? To kill that scoundrel! রিভলভার দিয়ে নয়, ছুরি মেরে নয়, দু'হাতে গলা টিপে।

কিন্তু দীনেশ আর ছাড়া পেল না।......

দীনেশের খাবার আসতো হাসপাতাল থেকে। মেডিক্যাল ডায়েট। ভালো খাবার। আর আমার আহার্য্য আসতো তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের চৌকা থেকে। অখাদ্য আহার্য্য। কিন্তু তাতে অসুবিধা নেই। দীনেশের জন্য

বরাদ্দ মাছ, মাংস, ডিম, দই দু'জনে ভাগ করে খেতাম। দীনেশের ওজন বেড়ে যেতে লাগলো।

বিকেলে দু'জনে সম্মুখের এক ফালি ইয়ার্ডে এদিক থেকে ওদিক হাঁটাহাটি করতাম আর নানা কথা হতো। মামলা সম্বন্ধে সে আদৌ আগ্রহশীল না হলেও সহকর্ম্মিদের, বিশেষ করে বিনয়ের বীরত্ব ও সাহসের কথা বলতে গিয়ে সে মুখর হয়ে উঠতো। একদিন বলতে লাগলো: সবার শেষে আমি ঢুকলাম ঘরে পুশ-ডোর ঠেলে। আমার ডান কাঁধে তখন সার্জ্জেণ্টের গুলী ঢুকে আছে। হাতে ব্যথা। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। গুলী চালাতে না পারি, পটাসিয়াম সায়নাইড তো মুখে ফেলে দিতে পারবো।

ঢুকেই দেখি, বাদল টেবিলের ওপর মাথা রেখে চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে। বিনয়বাবু সায়নাইডের প্যাকেটটা মুখে ফেলে দিলেন এবং রিভলভারের নলটি কানের পাশে ছুঁইয়ে ট্রিগার টানলেন। পড়ে গেলেন মেঝের ওপর কিন্তু রিভলভারটি হাতেই ধরা রইলো। শত্রুকে শেষ করার কাজ তখনো যেন শেষ হয়নি। তখনো যেন চলছে আমাদের বারান্দার যুদ্ধ।

তারপর আমার পালা। বিনয়বাবুর মতো প্যাকেটটা আমিও মুখে ফেলে দিলাম এবং তারই মতো নিশ্চিত হবার জন্য থুতনির নীচে রিভলভার চেপে ধরলাম। গুলীবিদ্ধ হাত বোধহয় একটু বেঁকে গিয়েছিল, তাই গুলী মগজ ভেদ না করে কানের পাশে গিয়ে আটকে রইলো। আমিও পড়ে গেলাম।

একটু পর বুঝতে পারলাম, মরিনি। কথা কইবার শক্তি নেই, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম সব। টের পেলাম কারা যেন let us crawl বলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো। তারপরই কে যেন বিনয়বাবুকে অর্দ্ধমৃত দেখেই তাঁর কাছে ছুটে গেল, কানের কাছে মুখ নিয়ে চীৎকার করে জিজ্ঞেস করতে লাগলো: Who are you ? Tell me who are you ? What is your name ? Tell me what is your name ?

বার বার চীৎকার করার ফলে বিনয়বাবুর মুমূর্ষু কানে বুঝি তা প্রবেশ করলো। স্পষ্ট শুনতে পেলাম, তিনি বললেন, I am Binoy Bose of Dacca· ·

আবার সেই চীৎকার: Did you murder Mr. Lowmen, the I. G. of Police, at Dacca ? Did you ? Did you murder Mr. Lowmen ? Tell me, Benoy ! Do you hear ? Do you hear ?

কোনো সাড়া নেই। ভাবলাম, হয়তো সব শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু ওদের চীৎকারে আবার চমক ভাঙলো : Do you hear, Benoy? Did you murder Mr. Lowmen at Dacca? Did you? Did you, Benoy?

Yes, I did। স্পষ্ট শুনতে পেলাম বিনয়বাবুর উত্তর। ভালো লাগলো না। মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছ থেকে কথা বার করবার চেষ্টা!

আবার ওরা চীৎকার করে উঠলো : Do you hear Benoy? Do you hear? Tell me who sent you here? What is his name who sent you?

কোনো সাড়া নেই। ভাবলাম, এবার নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গেছে। ভালোই হয়েছে। মারাত্মক প্রশ্নের আর জবাব পেলো না ওরা।

কিন্তু আবার শোনা গেল ওদের কণ্ঠ : Do you hear, Benoy? Do you hear me? Tell me please; tell me who sent you here? Who is that man? What is his name?

চমকে উঠলাম। জড়িতকণ্ঠে অস্ফুট স্বরে বিনয়বাবু যে নামটি উচ্চারণ করতে যাচ্ছিলেন, ওরা তা শুনতে না পেলেও, বুঝতে না পারলেও আমি বুঝতে পারলাম। ভাবলাম, সর্ব্বনাশ বুঝি হয়ে গেল!···কিন্তু না, তা হয়নি। অমনি অবস্থায়ও দেখলাম, বিনয়বাবু তাঁর সম্বিৎ ফিরিয়ে এনেছেন। আর ওদের প্ররোচনাকে প্রশ্রয় দেয়া নয়, আর কোনো জবাব নয়, আর কোনো কথা নয়। শুনতে পেলাম বিনয়বাবুর দৃঢ় কণ্ঠ, হ্যাঁ, দৃঢ় কণ্ঠ : Don't disturb······ let me die peacefully······

দীনেশ বলতে লাগলো : কিন্তু এখানেই শেষ নয়। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বিনয়বাবুর সীটের পাশেই ছিল আমার সীট। বিনয়বাবুর মাথার গভীর ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করা হয়েছে, তবুও তাঁর নাক দিয়ে, কান দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে বেরিয়ে আসছে মস্তিষ্ক। খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। প্রায় সর্ব্বক্ষণই অজ্ঞান হয়ে থাকতেন। মা এসেছিলেন দেখতে। প্রদীপ তখনো নিভে যায়নি। শিখা কাঁপছিলো। মা ডাকলেন, কানের কাছে মুখ নিয়ে নাম ধরে ডাকলেন, অশ্রুভগ্ন কণ্ঠে চীৎকার করে ডাকতে লাগলেন : বিনয়, বিনয়!

মুহূর্তের জন্য বুঝি জ্ঞান ফিরে এল। মায়ের কাতর আর্ত্তনাদে চমক ভাঙলো

বিনয়বাবুর। চোখ মেলে চাইলেন। বোধহয় চিনতে পারলেন। অতি কষ্টে একখানা হাত তুলে প্রণাম জানাতে গিয়েই আবার সংজ্ঞা হারালেন।

দীনেশের কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে উঠলো। বললাম ঃ থাক্, আর একদিন শোনা যাবে।

সে কথায় কর্ণপাতও করলো না সে। বলতে লাগলো ঃ কিন্তু এখানেও শেষ নয়, দ্বিজেনবাবু। মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে আসার সুযোগ নেবার জন্য আসতে লাগলো আই বি এস বি-র ধুবন্ধরেরা। প্রশ্ন, কিছু বল। কে তোমায় রাইটার্স বিল্ডিংস-এ পাঠিয়েছিল, ঢাকা থেকে পালিয়ে কোথায় ছিলে চার মাস, কোথায় পেলে রিভলভার···বল, কিছু তথ্য দিয়ে যাও। আরও কিছু বদমায়েস স্বদেশীকে ঠাণ্ডা করবার জন্য কিছু মালমসলা চাই যে!

ওদের জ্বালাতন সইতে না পেরে, ওদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য— উদ্বেলিত আবেগে দীনেশের কণ্ঠ এবার কেঁপে উঠলো ঃ একদিন বিনয়বাবু তাঁর মাথার ঘায়ের মধ্যে আঙ্গুল চালিয়ে দিয়ে সেফটিক করে ফেললেন এবং চিরদিনের মতো চোখ বুজলেন।···

একই সঙ্গে দু'টি দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। দু'টি কিশোর বুকে ঘনিয়ে-ওঠা পাঁজরা-ভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস। কিন্তু মৃতের জন্য শোক করবো না। শহীদের যাত্রাপথ যদি অশ্রুজলে পিছল করে তুলি, পরজন্মে ফিরে আসার পথ যে তাহলে বিঘ্নসঙ্কুল হয়ে উঠবে। তাকে যে ফিরে আসতে হবে। একবার নয়, হয়তো বার বার। ততবার আসতে হবে তাকে, যতবার প্রয়োজন হবে দেশ-জননীকে শৃঙ্খল মুক্ত করবার জন্য। মায়ের ঘরে এবার এসেছি, পরজন্মে আসবো মাসীর ঘরে। গলায় দড়ির চিহ্ন দেখে চিনতে কষ্ট হবে না তোমার। ক্ষুদিরাম তাই ফিরে এসেছিলেন অসংখ্য ক্ষুদিরাম হয়ে। রক্তবীজের বংশ!··· ··

বিদায়ের দিনটির কথা মনে পড়ে।

স্পেশাল ট্রাইবিউনাল সেদিন রায় দেবে অপরাহ্ণে। দীনেশ তেমনি উদাসীন, তেমনি নির্লিপ্ত। গোমেশের সঙ্গে রিভলভার বিক্রয়ের ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করে ফেললো, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ডার জন-এর সঙ্গে যথারীতি হাসি পরিহাস করলো, সেল-এর মেট্ সামাদকে তার আর ডাকাতি না করে

স্ত্রীপুত্র কন্যা নিয়ে বসবাস করবার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিল, সিপাই রামভকত সিংয়ের পাকানো গোঁফজোড়া নিয়ে আবার ঠাট্টা করলো, তারপর অত্যন্ত সহজভাবে আমায় বললো: সবাইকে আমার কথা বলবেন। দাদাদের প্রণাম জানাবেন, ছোটদের জানাবেন ভালবাসা। বলবেন, তাদের কাউকে আমি ভুলিনি। জেলার ব্যাটা ভুল করে আপনাকে আমার এখানে পাঠিয়ে দিয়ে চমৎকার সুযোগ করে দিয়েছে। ভগবানেরই ইচ্ছা।

বিকেল তিনটে বাজতেই গেট থেকে খবর এল এসকোর্ট পার্টি এসে গেছে। প্রস্তুত হতে হবে। দীনেশ আবার স্নান করলো সুগন্ধি সাবান ও সুগন্ধি তেল দিয়ে। সদ্য ধোয়ানো ধুতি ও শার্ট পরলো। জন-এর সামনে দাঁড়িয়ে পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে এসেন্সের শিশিটা থেকে খানিকটে গায়ে ছড়িয়ে দিল, খানিকটে রুমালে, খানিকটে আমার গায়ে, খানিকটে জন-এর গায়ে। তারপর ফিক করে হেসে ফেললো: বুঝলেন দ্বিজেনবাবু, কারা যে এই তেল সাবান এসেন্স গেটে জমা দিয়ে যান জানি না। এসব যে কোনোদিনই ব্যবহার করিনি বাড়ীর সবাই জানেন। তাই তাঁরা পাঠান না। তবে?

এই 'তবে'-র জবাব আমি জানি। জেল গেটে-এ কোনো বন্দীর জন্য কিছু জমা দিয়ে যেতে হলে নাম ও ঠিকানা একটা জানিয়ে যেতে হয় বটে, কিন্তু তা শুধু জেল কর্তৃপক্ষের রেকর্ড করবার জন্য। ঐ ঠিকানায় ঐ নামে কেউ আছে কিনা, বন্দীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি, এ নিয়ে কোনো অনুসন্ধান হয় না। তবে রাজনৈতিক বন্দীর কথা স্বতন্ত্র। দুর্দ্ধর্ষ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে যারা সন্ত্রস্ত করে তুলেছে, life for life নীতির প্রবর্ত্তনে যারা হিজ মেজেষ্টিজ গভর্ণমেণ্টের সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে, তাদের নেতৃস্থানীয় একজনকে ধরতে পারলেই আই বি তাকে জিইয়ে রাখে যতদিন পারে আর হাজারো চক্ষু ও কান মেলে ওৎ পেতে বসে থাকে তার চারিদিকে, কে আসে, কে যায়, কে চিঠি লেখে, কোথায় চিঠি যায়!

দীনেশের বেলায় আই বি সুবিধা করে উঠতে পারে নি। জমাদাতার নাম বার বারই পাওয়া গেছে হয় দীনেশের মা, না-হয় দাদা, না-হয় দিদি। অথচ দীনেশকে বলেছেন তাঁরা যে, এইসব সুগন্ধি দ্রব্য তাঁরা কোনোদিন জমা দেননি। তবে তাঁরা কে? আমি জানি, তাঁরাই এই সব অজ্ঞাত জমাদাতা, দূরে দাঁড়িয়ে যাঁরা বাংলা মায়ের দুর্দ্দম সন্তানকে জানিয়েছেন প্রণতি, গোপনে

লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে নিঃশব্দে যাঁরা সর্ব্বদাই প্রসারিত করেছেন সহানুভূতি ও সাহায্যের কল্যাণহস্ত। কিন্তু তা নিয়ে আজকে আর আলোচনা ভালো লাগলো না।

দীনেশ প্রস্তুত হলো। জন-কে সহাস্যে বললো: জন, তোমার স্পেশ্যাল একঘেয়ে ডিউটি আজ শেষ হয়ে যাবে। And you will be relieved···

জন তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো: But I did never mind for it. On the other hand it was a pleasant opportunity to get you as the prisoner—

জন-এর সঙ্গে করমর্দ্দন করে দীনেশ বললো: কিন্তু আমার আয়না, চিরুণী, সাবান, তেল, পাউডার, স্নো যা রইলো, সব আমি আমার বন্ধুকে দিয়ে গেলাম। দেখো, এগুলো যেন সোয়ান না নিয়ে যায়।

গোমেশ বেরিয়ে আসতেই দীনেশ তাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিল: আমার এই বন্ধুটিকে মনে রাখবে কিন্তু গোমেশ। হয়তো ইনি পরে রিলিজ হবেন। কিন্তু নিশ্চয়ই ইনি তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। রিমেমবার, গোমেশ। বলে সে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

সেল-এর দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল মেট্ সামাদ। বিরাট চেহারা, বিরাট মুখমণ্ডলে কাঁচাপাকা দাড়ী। সত্যিই ডাকাত সর্দ্দার। দীনেশ তাকে একেবারে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে হেসে বললো: পাথরের শরীরটা জড়িয়ে ধরলেও বোধহয় গায়ের জোর বেড়ে যায়।

সামাদ কিন্তু সে হাসিতে আদৌ বিচলিত হলো না, উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো: আমারে কর্ত্তা মাত্র দুই ঘণ্টার লইগা ছাড়িয়া দিতে পারেন। যে সুমুন্দিরা আপনারে ধরছে, তাদের কইলজাগুলা যদি না ফাঁক করিয়া দিয়া আইতে পারি, তাইলে আমি বাপের ব্যাডা নই। আল্লা আমারে দুই ঘণ্টার ছুডি দেন না!

ঝর ঝর করে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। আমরা এগিয়ে চললাম। সিপাই দরজা খুলে দিল। দীনেশ বললো: আপনার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে জানিনা। যদি ট্রান্সপোর্টেশন দেয়, তাহলে চোদ্দ বছর পর আর যদি ফাঁসী দেয়, তাহলে হয়তো এই শেষ। জেলে ফিরে এসে আমি খবর পাঠাবো।

ফস্ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল : ফাঁসী ?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিল দীনেশ : হ্যাঁ, ফাঁসী। স্টেটসম্যানে যা পড়েছি, তাতে দেখছি ডিফেন্স যা নেয়া হয়েছে, তাতে হয় আমায় বেকসুর মুক্তি দিতে হয়, নয়তো একেবারে ফাঁসী। মুক্তি দেবে না, দ্বিতীয়টাই সম্ভব। কিন্তু—দৃঢ় কণ্ঠ শোনা গেল : থোড়াই কেয়ার করি আমি। বাঁচবো, এমনি নির্দেশ নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ যাইনি। বাঁচিয়ে যারা তুলেছে, তাদের কাছে দয়ার প্রত্যাশী নই আমি। জুজুর ভয় আমি করি না। বলতে বলতে চৌকাঠের ওপারে গেল সে। তারপর সহসা ফিরে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো : ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয় ? ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, দাঁড়িয়ে রইলো জন, গোমেশ, দরজার সিপাই আর মেট্ সামাদ।

যেন নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে লক্-আপ্ করবার পূর্ব্ব মুহূর্তে অকস্মাৎ হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এল জন। অভিশপ্ত ইয়ার্ডে আর ঢুকলো না। দরজার কাছে দাঁড়িয়েই বললো : দীনেশ খবর পাঠিয়েছে যে তাকে ফাঁসীর ঘরে নিয়ে যাচ্ছে।—তারপরই ক্রন্দনবিজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলো : I bet he cannot commit murder—such a nice boy, such a soft heart—I bet—I bet—

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ডার জন-এর চোখে উদ্বেলিত অশ্রুকণা দেখতে পেলাম। বৃটিশের কালো ইতিহাসে আছে অনেক ও' ডায়ার, কিন্তু আছে একটি মাত্র ওয়ার্ডার জন !……

প্রায় চার মাস পর আমার মুক্তি দেয়া হলো কোনরূপ বিধি-নিষেধ আরোপ না করে। পুলিশের আশা ছিল, ছেড়ে দিয়ে কিছু দিন পেছনে কেউ লাগিয়ে রাখলেই রিভলভারের গুদামের সন্ধান পাওয়া যাবে !…

এর পর ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরে কর্ণেল পেডিকে গুণেশ সেনের বাড়ী থেকে চুরি-করা সেই রিভলভারটি দিয়েই যে হত্যা করা হয়েছে, পুলিশ কোনও সূত্রে সে সংবাদ জানতে পেরে ১৯৩২ সালের এই ফেব্রুয়ারী মাসেই ঢাকা জেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে।

দেখা হতো জেলের অফিসের একটি নিভৃত কক্ষে। কে এসেছিলেন, ঠিক মনে নেই। তবে আই বি দারোগা প্রমোদ দাশগুপ্ত হতে পারেন।

ভারী সহানুভূতি দেখালেন: এই তো গেল তোমার ভবিষ্যৎ, তোমার সমগ্র জীবন। গভর্ণমেণ্ট confirmed করে দিয়েছে মানেই অন্ততঃ দশটি বছর। মানে, জেল থেকে বেরুবে একত্রিশ বছর বয়সে। কি করবে তখন? বাবা খেতে দেবে, না দিতে পারবে তোমার ঐ সত্য গুপ্ত আর হেম ঘোষ?···ভারী দুঃখ পাই তোমার মত ব্রাইট্ ইয়ংম্যানকে আটকে রাখতে। কিন্তু কি করবো, তুমি নিজেই যে বাধ্য কর।

চট্ করে প্রশ্ন করলাম: কি রকম?

প্রমোদবাবু বিস্ময় প্রকাশ করলেন: কি রকম! সেবার গুনেশ সেনের রিভলভার তুমি বলেছিলে নাওনি। তাহলে মেদিনীপুরে তা কি করে গেল, সেই রিভলভারেরই গুলীতে কর্ণেল পেডি কী করে নিহত হলেন?

নির্বিবাদে বলে ফেললাম: বোধহয় মেদিনীপুরের কেউ টাকা দিয়ে বিমলের কাছ থেকে ওটা সংগ্রহ করেছিল।

দু' চোখ কপালে তুললেন প্রমোদবাবু: মেদিনীপুরের কেউ! বল কি? জানি আমরা যে, মেদিনীপুরের এই সন্ত্রাসবাদী দলের গোড়া পত্তন করেছে বি ভি ঢাকা থেকে গিয়ে। বি ভি-র একজন পাকা সংগঠক সেখানে ছিল। তার নাম বলবো না। কথা হচ্ছে, ওটি নিয়ে তুমি তাকে দিয়েছ, আর সে চালান করেছে মেদিনীপুরে। তাই নয় কি?

বিরক্ত বোধ করলাম। এটা আর লর্ড সিংহ রোড নয় আর মণি বোসের বয়লারের সমুখে আসিনি এখন যে, সমঝে চলতে হবে। বললাম: দেখুন, আমার সময় নেই আপনার সঙ্গে বক্ বক্ করবার। কাজ করবোই, কিন্তু সে কাজের হদিস্ পাওয়া আপনাদের সাধ্যি নেই। তাই তো পরাজিত হয়ে অবশেষে করলেন রাজবন্দী! পাঠান না দেখি দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে একবার জেলে কয়েদী করে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে। বুঝবো আপনার হিম্মৎ কতখানি!

গট্ গট্ করে বেরিয়ে এলাম! ফল এই দাঁড়ালো যে, তার দিন চারেক পরই স্থানান্তরের হুকুম এলো বহরমপুর বন্দীশিবিরে! একদিন আরও তিন জন রাজবন্দীর সঙ্গে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল ছেড়ে ফুলবাড়ী ষ্টেশনে (ঢাকা ষ্টেশনের নাম) ট্রেণে চেপে বসলাম।

দশ

ঠিক কোন্ ট্রেণে আমাদের তোলা হয়েছিল, আজ আর তা মনে নেই। সঙ্গে ছ'জন সশস্ত্র গাড়োয়ালী সিপাই আর সাদা পোষাকে একজন আই বি-র দারোগা। তিনিও নিশ্চয়ই সশস্ত্র, তবে সিপাইদের মতো প্রকাশ্যে নয়, বস্ত্রাভ্যন্তরে, সংগোপনে। বন্দী হলেও আমরা রাজবন্দী, তাই আমাদের সঙ্গে সরকারী আচরণ কথঞ্চিৎ ভদ্রতার অপেক্ষা রাখে অন্ততঃ দৃশ্যতঃ। তাই হাতকড়া ও দড়ির মামুলী নিয়মের ব্যতিক্রম আমাদের বেলায়। কিন্তু তাই বলে যে আমরাও ভদ্রতা করে চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়ে অথবা ভাসমান ষ্টীমার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পলায়নের চেষ্টা করবো না, জোর গলায় যতই কেন না সে সম্বন্ধে আমরা বরাভয় দিই, অবিশ্বাসী সরকার তাতে নিশ্চিন্ত হন না। তাই, ঢাকা থেকে সহজ ও দ্রুত পথে বহরমপুর না গিয়ে গ্রহণ করা হয় ঘোরা ও দীর্ঘ পথ এবং মহামান্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অন্যতম মারাত্মক শত্রুর দল যে এই পথে চলেছে, বিজ্ঞপ্তি প্রচারে জানিয়ে দেওয়া হয় আই বি-র চেলা-চামুণ্ডাদের। ফলে, প্রায় ষ্টেশনেই সাদা পোষাকধারী একজন জানালায় এসে আমরা বহাল তবিয়তে ও শরীফ মেজাজে চলেছি কি না, মূল্যবান সে তত্ত্বটুকু সংগ্রহ করে নিয়ে যান!

মধ্যম শ্রেণীর যাত্রী আমরা। তাই, একদিকে যেমন সাধারণতঃ পরিচ্ছন্ন আরোহীদের সঙ্গে চলবার সৌভাগ্য লাভ করা যায়, তেমনি আবার কথা কইবার সুযোগ হারাতে হয়। সমাজের যে স্তরের মানুষ এঁরা, তাকে ঠিক জনতা আখ্যা দেওয়া যায় না। বুদ্ধি না থাকলেও এঁদের বোদ্ধার মুখোশ পরবার সখ আছে। সবাই যে একেবারে সরকারী চাকুরে এবং রাজবন্দীর সঙ্গে আলাপের কাহিনী উপরওয়ালার কর্ণগোচর হলেই যে এঁদের চাকরি খতম হয়ে যাবে, তা নয়। রাজবন্দীকে এঁরা সযত্নে এড়িয়ে চলেন, বোধহয় এটাই নীতি এঁদের। ফলে, শুধু বসবার কেন, পা দু'টি সটান মেলে দিয়ে দিব্যি শোবার জায়গাও সহজেই মিলে যায়।

দারোগাটির নাম সতীশ জানা। আদি বাস মেদিনীপুরে। প্রায় বারো বছর এই বিভাগের চাকরি, একেবারে ডাইরেক্ট সাব-ইন্‌স্পেক্টার। ঢাকা

শহরে এসেছেন মাত্র বছর দেড়েক। ঢাকা নাকি তাঁর খুব ভালো লেগেছে। মাছ দুধ যেমন সস্তা, তেমনি শাকসব্জী। পরিবারের সবার স্বাস্থ্যই ফিরে গেছে।—গায়ে পড়ে এমনি আত্মপরিচয় অনেকখানি দিলেন সতীশ জানা। অবশেষে স্বহস্তে আমাদের সুজনী বিছিয়ে বালিশ পেতে দিয়ে দরদী আহ্বান জানালেন: শুয়েই পড়ুন আপনারা। পড়ন্ত বেলা হলেও মালপত্র গোছগাছের জন্যে দুপুরে হয়তো ঘুমোতেই পারেননি আজ, তাই না?—নিন্ একটু গড়িয়ে। নামতে হবে তো সেই রাত্রে।

জিজ্ঞেস করলাম: আচ্ছা, এমনি মাথা ঘুরিয়ে গ্রাস মুখে তোলা কেন বলতে পারেন? গোয়ালন্দ হয়ে সোজা রাণাঘাট গিয়ে বহরমপুরের ট্রেণে না চেপে এমনি ঘুরপাক দিয়ে নিয়ে যাবার কারণ কি? এর পশ্চাতেও কি যোগিনীবাবুর উর্ব্বর মস্তিষ্ক না কি?

সতীশবাবু মৃদু হাস্য করলেন, বললেন: সেন্‌ট্রাল আই বি-র বন্দী আপনি, যোগিনীবাবুর নাগালের বাইরে। তাই স্বয়ং গ্র্যাসবি সাহেবের নির্দ্দেশ যে গোয়ালন্দ দিয়ে তাকে যেতেই দেবে না।

আর এঁরা? এঁদের কী অপরাধ? এঁরাও কি সেন্‌ট্রাল আই বি-র অতিথি?.

সতীশবাবু আবার হাস্য করলেন, বললেন: এক যাত্রায় পৃথক পথ কি হতে পারে?

গোয়ালন্দ সম্বন্ধে পুলিশের এত আতঙ্ক কেন, বুঝতে পারলাম। বাড়ী থেকে মা'র চিঠি অবশ্য দু'দিন পূর্ব্বেও এসেছে, কিন্তু তাতে শ্রীপদর কোন কথা নেই। ষ্টীমার থেকে যে জরুরী চিঠি শ্রীপদর কাছে লিখেছিলাম, সেখানা তার হাত পর্য্যন্ত পৌছোলো কি না কে জানে! গোয়ালন্দ থেকে যে সে আমারই সাথে গ্রামে এসেছিল, পুলিশ তা জেনেছে, সুতরাং তার নামীয় চিঠিপত্র হস্তগত করা আই বি-র পক্ষে স্বাভাবিক। ষ্টীমারের চিঠি শেষ পর্য্যন্ত গ্র্যাসবির হাতেই গিয়ে উঠলো না কি? তাহলে তো আমার বালিশ এবার ওরা নিয়ে আসবে এবং টাটকা একটি ছ'ঘরা রিভলভার হস্তগত করবে। তাই করেছে কি?......

নানা চিন্তায় মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। সতীশবাবু বললেন: হাঁ একটু কষ্ট হবে বৈকি এ পথে। তা—নতুন দেশ দেখা তো হবে, কি বলেন?

কত কালের জন্যে যাচ্ছেন কে জানে! তাই যত বেশীক্ষণ বাইরে থাকা যায়, ততই লাভ!—বাড়ীর চিঠি পেয়েছেন?

আবার বাড়ীর চিঠি!—চমকে উঠলাম মনে মনে। মুখে বললাম: হ্যাঁ, তা পেয়েছি। মা খুব দুঃখ করে লিখেছেন যে, বুড়ো বয়সে আমি তাঁকে দুঃখ দিলাম।

আপনারা ক' ভাই বোন?

সাত ভাই, একটি বোন। সবার ছোট, সাত ভাই চম্পার বোন পারুলের মত।

মর্ম্মাহত হলেন যেন সতীশ জানা: ওঃ, দেখুন তো একেবারে সাজানো সংসার। মা তো ঠিকই লিখেছেন। আর কেনই-বা গেলেন এই হাঙ্গামায়, আমিও তাই ভাবি। দু'টো বোমা-রিভলভার দিয়ে কি দেশ স্বাধীন হয় কখনো?

যা বলেছেন!—বলে বিরক্ত হয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। এমনি অনাহূত আদরআপ্যায়ন ও এমনি অযাচিত উপদেশের নিগূঢ় উদ্দেশ্য যে কী, তা বোঝবার মতো কূটবুদ্ধি আমার হয়েছে। বোধহয় একটু পর সতীশবাবু নিজেও সেটা উপলব্ধি কবলেন, তাই অন্য কথা পাড়লেন: আপনার দাদারা বোধহয় ভালো চাকরি করেন? সরকারি চাকরি আছে কারুর? ওঃ, আলীপুরে জজের ওখানে ট্র্যান্‌স্লেটর? চাকরিটি ভালো।

এমনি অনেক বাজে প্রশ্ন করলেন সতীশ জানা। আমি কোনটা নিয়েই আলোচনা না তুলে সংক্ষেপে 'হুঁ' 'হাঁ' করে কাটিয়ে দিতে লাগলাম। একটু পর যেন তাও আর ভালো লাগলো না। জানালার শার্সি তুলে দিয়ে বাইরে যত দূর পারি দৃষ্টি প্রসারিত করে রইলাম।…হ্যাঁ, গ্রাম। গ্রামের পর গ্রাম ছুটে চলেছে। গাছপালাসমাকীর্ণ ছায়া-শীতল গ্রাম। ঢেউ খেলান হরিৎ ক্ষেত-ঘেরা গ্রাম। নাম না-জানা অসংখ্য পাখীর কল-কাকলিতে মুখরিত গ্রাম। সরল, অনভিজ্ঞ জেলে, চাষী ও দিনমজুরের গ্রাম। এমনি অসংখ্য গ্রামের তুলনাহীন বিচিত্র চিত্র চোখের সামনে ঝলসে উঠে উঠে সরে যাচ্ছে। এমনি গ্রামের বুক চিরে চিরে ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে আমাদের বাষ্পীয় যান।

…এমনিই একটি অখ্যাত গ্রামেরই ছেলে আমি। ভালোবেসেছিলাম আমার দেশকে, দেশের মাটিকে, দেশের অগণিত শোষিত বুভুক্ষুদের। ব্যক্তিগত

সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের স্বর্ণ-সোপান ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিলাম বাইরে, কঙ্করময় বন্ধুর পথে, পরদেশীকে বিতাড়িত করবার সুকঠিন ব্রত গ্রহণ করেছিলাম। দৃশ্যমান দুনিয়ায় প্রকাশ্যভাবে চলছিল যে আপত্তি, যে অভিমান, তার ঢিমে তালের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরেই পদক্ষেপ করেছিলাম ভূগর্ভস্থ অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে, সেখান থেকেই সুরু করেছিলাম প্রতিবাদের মৃদু গুঞ্জন, লোম্যান, হডসন, সিম্পসন, পেডি ও ষ্টিভেন্সের ওপর মৃত্যুদণ্ডাদেশ নিয়ে জানিয়েছিলাম বিক্ষোভের অভিব্যক্তি।···কিন্তু তাই কি আমার অপরাধ? দেশকে ভালোবাসা কি অন্যায়? শাঠ্য ও জোচ্চুরি সম্বল করে সাত সমুদ্র পার হয়ে এসে যারা এই দেশটা দখল করে বসলো, এখানকার টাকা নিয়ে গিয়ে যারা লণ্ডনে নির্ম্মাণ করলো স্কাই-স্ক্রেপার, তারাই হল আমার দেশের সম্রাট, কোটি কোটি নরনারীর ভাগ্য বিধাতা? গ্রামের শুষ্ক পুষ্করিণী, শূন্য গোলা আর ভগ্ন গোয়ালের সমাধির ওপর বসে যারা নীরোর মত বাজাবে বাঁশী, তাদেরই একচ্ছত্র অধিকার থাকবে আমার দেশের সম্পদে, দেশের ঐশ্বর্য্যে, আর সর্ব্বহারা আমি সেই একটানা শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অঙ্গুলি হেলনের পুরস্কার লাভ করবো কারাদণ্ড, দ্বীপান্তর, ফাঁসী?······

মনুষ্যত্বের এতবড় অবমাননা নীরবে মেনে নিতে পারিনি বলেই আমার এই পুরস্কার!···এই তো চলেছে কামরা ভর্ত্তি আরোহী, পথের এই ক্লেশ, এই ক্লান্তি গন্তব্য স্থলে পৌঁছোলে অপনোদিত হয়ে যাবে প্রিয়জনের সান্নিধ্যে, এই আশা বুকে নিয়ে। কিন্তু এদের মনের কোণে এক প্রবঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাস কি এতটুকুও আলোড়ন সৃষ্টি করছে না? এক সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কুসুমাস্তীর্ণ পথে না এগিয়ে কেন এলাম এই কণ্টকাকীর্ণ পথহীন পথে, কারুর মনে কি জাগছে না এই প্রশ্ন? ষ্টেশনে ষ্টেশনে চলছে নামা-ওঠা, যাত্রী, ফেরিওয়ালা, কুলি ও দর্শকদের গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠছে প্লাটফর্ম্ম, কিন্তু এদেরই চোখের ওপর দিয়ে চলেছে একজন যুবক, এদেরই দুঃখ দুর্দ্দশা অপনোদনের এক আমৃত্যু ব্রত যে গ্রহণ করেছে, যে ব্রত উদ্‌যাপন প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ আজ চলমান দুনিয়া থেকে সে দীর্ঘকালের জন্য অপসৃত হতে চলেছে—এ সংবাদ কি তারা রাখে? কোথায়, কেউ তো ফিরে চাইছে না আমার দিকে, কেউ তো এগিয়ে আসছে না, কেউ তো বলছে না দু'টি মিষ্টি কথা, কেউ তো জানাচ্ছে না আশীর্ব্বাদ বা অভিনন্দন?

কী জানি কেন, বার বার মনে হতে লাগলো আমি রিক্ত, আমি অনাথ, আমি একক, এই দুনিয়ায় আপনার বলতে আমার কেউ নেই, দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে যতদূর দৃষ্টি যায়, একটা ভয়াবহ শূন্যতা বুঝি খাঁ খাঁ করছে।…

অকস্মাৎ সতীশবাবুর কথায় চমক ভাঙলো : দ্বিজেনবাবু, এই প্রথম অ্যারেষ্ট হলেন না কি ?

রিভলবার চুরি সম্পর্কে গ্রেপ্তার ও মুক্তির কথা উল্লেখ করলাম। শুনে সতীশবাবু বললেন : দাগ যখন একবার লেগেছিল, তখন আর রেহাই পাবেন কি করে ? যারা একেবারে নতুন, সবে আপনাদের খাতায় নাম লিখিয়েছে, তারাও এবার একটিও বাদ যায়নি।

চুপ করে থাকলাম। পুলিশ অফিসারের সঙ্গে খুব সংযত হয়ে কথা কইতে হয়। বিশেষ করে আমার সম্বন্ধেই সতীশ জানাব উৎসাহ ও আগ্রহ একটু বেশী মনে হলো। নরেনবাবু তাকিয়ে রয়েছেন জানালার বাইরে, হরিপদ পড়ছে পেঙ্গুইন সিরিজের কী একখানা বই, আর অমলবাবু কাৎ হয়ে শোবার মতো পোজ করে কী ভাবছেন আকাশ-পাতাল কে জানে !…

একটা ষ্টেশন এসে পড়লো। পানওয়ালা, বিড়িওয়ালা, পাঁউরুটিওয়ালা হেঁকে চলে যাবার পর এলো সোডা লেমনেড আর এলো কলা ও কমলালেবু। জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়লাম।

সোডা কোথাকার ? কত করে ?

ফেরিওয়ালা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল : আজ্ঞে নারায়ণগঞ্জের আসল মাল। দাম চোদ্দ পয়সা।

দু' বোতল নিলাম আর নিলাম এক ডজন কমলালেবু ও এক ডজন কলা। দামের জন্য ডাক দিলাম : সতীশবাবু !

বলুন !

মোট দাম হয়েছে পুরো এক টাকা। আর বোতল দু'টোর দাম কত দিতে হবে ? আমি তো এখন দু' বোতলই খেয়ে ফেলছি না, নিয়ে যাবো।

সতীশবাবু অসীম কুণ্ঠার সঙ্গে এক টাকা চার আনা বার করে দিলেন।

এ ব্যাপারে প্রচলিত বিধি ও তার ওপর চলনদার দারোগার ক্ষমতা যে কতখানি, তা আমার ভালোভাবেই জানা ছিল। নিয়ম ছিল, আমাদের খাবার জন্য দৈনিক যে টাকা বরাদ্দ আছে, ট্রেণে বা ষ্টীমারে যাতায়াতের সময় পাওয়া

যাবে তার দ্বিগুণ। তারপর বিন্দুমাত্রও অসুবিধার সৃষ্টি না করে এবং পথে কোনক্রমেই কোনো বিতর্ক না করে রাজবন্দীকে গন্তব্য স্থানে ঠাণ্ডা মেজাজে নিয়ে যেতে হলে আরও কিছু প্রয়োজন হতে পারে বলে ভাউচার লিখে দারোগার হাতে অতিরিক্ত কিছু টাকা দিয়ে দেওয়া হয়। এরও পর বদমেজাজী রাজবন্দীর পাল্লায় পড়লে পথে যাতে অর্থাভাবে কোনো অসুবিধায় না পড়তে হয়, তার জন্য কিছু টাকা দারোগার হাতে বিনা ভাউচারে তুলে দেওয়া হয়। তারও পর আছে: জরুরী কোনো অবস্থা দেখা দিলে দারোগার ক্ষমতা থাকে প্রয়োজন মত অর্থব্যয়ের। হেড কোয়ার্টারে ফিরে এসে বিল করলেই সে সমুদয় অর্থ ফিরে পাওয়া যায়।

এই ব্যবস্থার কথা জানি বলেই পথে বেরুলেই অকস্মাৎ আমরা এক দিকে যেমন হয়ে উঠি পেটুক ও অমিতব্যয়ী, অপর দিকে হয়ে উঠি একেবারে করুণার অবতার! যা খুশী তাই খাই, যা ভালো লাগে বা লাগে না, তাই কিনি, যাকে-তাকে যা-তা বিলিয়ে দেই আর ভিক্ষুক দেখলেই দু' চার আনা তৎক্ষণাৎ দান করে বসি। কুলি চার আনা চাইলে আমরা আরো বখ্‌শিশ দিই আট আনা, যেখানে হেঁটে যাওয়া যায়, সেখানে যাই রিক্‌সায় আর যেখানে রিক্‌সা হলেই যথেষ্ট, সেখানে চেপে বসি ট্যাক্সিতে। একটিমাত্র আমাদের নীতি, সরকারী অর্থ যেভাবে পারা যায় জনসাধারণের মাঝে বণ্টন।

পক্ষান্তরে, চলনদার দারোগা কৃপণের মত পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে নিয়ে গিয়ে রিপোর্ট দেয় এমনি দীর্ঘ এবং তাতে জরুরী অবস্থা দেখা দেবার ইতিবৃত্ত এমনি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে কতকগুলি অনভিপ্রেত ব্যয়ের তালিকা জুড়ে দেয় যে, বিলগুলি তার অনায়াসে পাশ হয়ে যায় আর শ্রীমান্ বেশ একটা মোটা মুনাফা পকেটস্থ করে। ফলে, টানাপোড়েন চলতে থাকে রাজবন্দী আর দারোগার মধ্যে।

ট্রেণের ঘণ্টা পড়ে গেল, এমন সময় প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক একদল মহিলা ও শিশু এবং লটবহরসহ হুড়মুড় করে এসে উঠলেন। কতক মেঝের 'পরে, কতক বাঙ্কে ও কতক বেঞ্চির নীচে ফেলে রেখে তিনি "কেতনা দেগা" বলে বিতর্কে আহ্বান করলেন কুলীর দলকে। সুরু হলো দর-কষাকষি, তর্কাতর্কি, রাগারাগি, এবং অবশেষে ভদ্রলোক গায়ের ময়লা তেল-চিটচিটে র‍্যাপারখানা কোমরে কোটের ওপর জড়িয়ে নিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে ঘোষণা করলেন: গভর্ণমেণ্টকা আদমকো

জুলুম? ছেলেখেলা মিলা হায়? আও, হাম ভি গভর্ণমেণ্ট কণ্টাগ্‌দার (কনট্রাকটর) হায়। এক টাকাকে যাস্তি হাম এক আধলা নেহি দে গা। সাত হাত মাটি খুড়লে ভি একঠো পয়সা নেহি মিলতা। আট আনা সস্তা হায়?—বলে তিনি কোটের আস্তিন গুটোতে গিয়ে বাহুর যে অংশটুকু অনাবৃত করলেন, সেটুকুতে চামড়া দিয়ে ঢাকা এক-একটা প্যাকাটি ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পেলাম না।

ট্রেণের গতি দেখা গেল এবং এই জন্যই ভদ্রলোকের সাহস আরো বেড়ে গেল। তিনি আবার একাই কুলীর দলকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন এবং আবারও উল্লেখ করতে ভুললেন না যে, তিনি গভর্ণমেন্ট কণ্টাগ্‌দার।

গভর্ণমেন্ট নামেই তখন ভেলকি খেলতো, তার ওপর ট্রেণ প্রায় প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে এসে গেছে, তাই অগত্যা কুলীর দল রূপোর টাকাটাই ট্যাঁকে গুঁজে লাফ দিয়ে পড়লো এবং ভদ্রলোক যুদ্ধজয়ী সেনাপতির মতো তাম্বুলরসচর্চ্চিত বত্রিশখানা দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললেন: দেখলি রেণু, বললাম না এক টাকার একটি পয়সা বেশী আমি দোব না?

চমকে উঠলাম। রেণু! কোন্ রেণু?

দেখলাম, সে রেণু নয়। এ শহরের রেণু! শহুরে আদব-কায়দায় ও আধুনিকতম পোষাক-পরিচ্ছদে এ রেণু একেবারে মুর্ত্তিমতী অজন্তার ছবি!

স্থানেব অভাব ছিল পূর্ব্বেই। তারপর একেবারে এতগুলো লোক উঠে পড়াতে বেশ মুশকিল দেখা দিল। আমার সুজনী অনেকখানি গুটিয়ে ফেলতে হল, সঙ্গীরা শিয়রের বালিশ কোলে তুলে নিলেন, উল্‌টো দিকের বেঞ্চের শায়িত ভদ্রলোক উঠে বসলেন, কাউকে তাঁর অ্যাটাচি কেসটা বেঞ্চের নীচে নামিয়ে দিতে হল, এমনিভাবে সমস্ত কামরার একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে এখানে-ওখানে-সেখানে এক-এক করে জন বারো শিশু ও মহিলাদের বসিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক যখন স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে পকেট থেকে পানের প্রকাণ্ড ডিবেটা বার করলেন, তখন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম শহুরে রেণুর স্থান মিলেছে আমারই বিপরীত দিকের বেঞ্চে ঠিক আমার মুখোমুখি।

আধুনিকাকে এইবার ভালোভাবে লক্ষ্য করবার সুযোগ পাওয়া গেল। ফিনফিনে পাতলা ব্লাউজ, নীচের বাসন্তী রংয়ের বক্ষোবাসের প্রান্তরেখাগুলি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, রুখু চুলের দু'টো বেণীর একটি দোদুল্যমান পিঠের ওপর,

অপরটি লম্বমান বুকের ওপর। রক্তরাঙা সাড়ীর আঁচলখানি আলগোছে গায়ের ওপর রাখা, কেয়ারফুলি কেয়ারলেসের মতো।

বসেই ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে তিনি গালেব রুজ সংস্কারে মনোনিবেশ করলেন।

এই রেণু সত্যিই সুন্দর, শরীরের গড়ন যেমন সুডৌল, তেমনি নিখুঁত। যৌবনের জোয়ারে ভরা নদীর মতো। যতই সময় কেটে যেতে লাগলো, ততই বুঝতে পারলাম ইনি কলকাতার কোনো কলেজের ছাত্রী এবং স্মার্ট। কথায়-বার্ত্তায়, হাসিতে হল্লাতে এই দলটি সমস্ত পথটাই বেশ প্রাণবন্ত ও হালকা করে রাখলো।

আমার কমলা ও কলাগুলো ছোটদের মধ্যে বণ্টন করে দিলাম যখন, তখন এদের সঙ্গে আমি বেশ জমিয়ে ফেলেছি। ছোটরা হাত পেতে নিলেও বড়রা একটু সংকোচ প্রকাশ করতে ভুললেন না, বিশেষ করে রেণু দেবী। বললেন: ও কি করলেন, ওদের সব দিয়ে দিলেন যে?

বললাম: তাতে কি আর হয়েছে। আমি আবার কিনে নোব।

বাঃ, বেশ তো। কিনে-রাখা জিনিষ এমনি করে বিলিয়ে দিয়ে আবার কিনবেন?—ও, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই বড়লোক!

হাসলাম ও রহস্য করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না: তা বড়লোক তো নিশ্চয়ই, অন্ততঃ যতক্ষণ ট্রেণে থাকবো ততক্ষণ তো।

রেণু প্রশ্ন করলেন: মানে?

জবাব দিলাম: মানে খুব কঠিন কিছু নয়। রাজার আতিথ্য গ্রহণ করতে চলেছি যে! তাই ব্যয়ের কোনো সীমা থাকতে পারে কি?

বলে আড়চোখে দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখলাম, দারোগা সতীশবাবুর ঝিমোনো থেমে গেছে। তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাণাকড়ি ব্যয় সংক্ষেপ করবার জন্যে যে নীতি গ্রহণ করেছেন, আবার বুঝি আমি তাতে ঘা দিই, এই দুশ্চিন্তার কালো ছাপ স্পষ্ট তাঁর মুখমণ্ডলে দেখা গেল! কিন্তু রেণু আমার রহস্য ঠিক অনুধাবন করতে না পেরে পাল্টা প্রশ্ন করলেন: রাজার আতিথ্য?

হ্যাঁ।

বুঝতে পারলাম না।

জানি, বুঝতে পারবেন না তিনি। এই হচ্ছে শহুরে রেণুর সত্যিকার রূপ!

সাতরঙা প্রজাপতির মত হাল্‌কা পাখনার ঘায়ে বাতাসে গ্লামোরাস তরঙ্গ সৃষ্টি করে আলগোছে ঘুরে বেড়ান এঁরা। সকালসন্ধ্যা কেটে যায় নিউ মার্কেটে আর প্রেক্ষাগৃহের ব্যালকনিতে পুরুষ বন্ধুর পাশে পাশে। বাইরের চলিষ্ণু দুনিয়া কোনও দিন অচল হয়ে ভেঙ্গে পড়লেও এঁদের চেতনা আসবে না। শাড়ী, বাড়ী ও গাড়ীর মধ্যেই যারা পেয়েছে জীবনের শ্রেয়কে, রাজবন্দীর অর্থ তারা জানবে কোত্থেকে ?...

এই যে আমার সম্মুখে এক মোহময় ভঙ্গীতে শরীর এলিয়ে দিয়ে বসে আছেন, ইঙ্গিতে, ইশারায় ও হস্তসঞ্চালনে সমস্ত কামরাখানির মধ্যে সৃষ্টি করে তুলেছেন বিভ্রান্তিকর আবহাওয়া, অন্তরঙ্গতায় যিনি একেবারে উচ্ছল ও উদ্বেল হয়ে উঠেছেন—নিশ্চিত জানি রাণাঘাটে আমাদের ছেড়ে ইনি যখন কলকাতাগামী ট্রেণে উঠে বসবেন, তখন থেকেই আর আমার কথা মনে পড়বে না এঁর।

তথাপি, রাজবন্দীরাও যে তাঁর আপাতমধুর সখ্যের মোহবন্ধনে গলা বাড়িয়ে দিতে রাজী নয়, সে পরিচয়টা ভালো করে দেবার জন্যেই আমার সত্যকার পরিচয় দিলাম। শুনে প্রথমটা তিনি জানালেন অসীম সহানুভূতি, সমগ্র রাজবন্দীর জন্যই যেন তাঁর কোমল হৃদয়ে দরদ একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, তারপর অকস্মাৎ যেন তাঁর উৎসাহে, স্মার্টনেসে ও অকুণ্ঠ আচরণে বিবর্ণতা দেখা গেল। অবশ্য একেবারেই যে নীরব হয়ে গেলেন, তা নয়, তবুও তৈলহীন প্রদীপের মতো টিম্ টিম্ করতে লাগলেন। বক্রদৃষ্টিতে দেখলেন গাড়োয়ালী সেনাদলকে, তাদের বন্দুকগুলো ও বেয়নেটগুলোকে এবং বার বারই অনুসন্ধানী দৃষ্টি তাঁর সাদা পোষাক-পরা দারোগাটিকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

বেশ বোঝা গেল এবার রঙিন ফানুস ফেটে গেছে, চুপসানো একখণ্ড নগণ্য কাগজ হয়ে নীচে নেমে এসে তা ধূলোয় মুখ থুবড়ে পড়েছে। পায়ের তলায় মাড়িয়ে গেলেও আর তা আকাশে ওড়বার স্বপ্ন দেখবে না।......

সন্ধ্যার পর ফুলছুরি ঘাটে ষ্টীমারে চড়তে হল। লটবহর গোটা তিনেক কুলীর মাথায় চাপিয়ে দিয়ে সতীশ জানা ও গাড়োয়ালী সেনাসহ আমরা চারজন একেবারে শোভাযাত্রা করে এসে দোতলায় উঠলাম। ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে ওপারে তিস্তামুখ ঘাটে পৌঁছে আবার ট্রেণে চাপতে হবে।

পদ্মানদীর ষ্টীমারের সঙ্গে এই ষ্টীমারের তুলনাই হয় না। এর আয়তন শুধু ক্ষুদ্র নয়, এর আকারও অত্যন্ত গেঁয়ো। একেবারেই আভিজাত্য নেই। এর

প্রপেলর দু'টি যেমন বেমানান ভাবে বৃহৎ, তেমনি এ দু'টি আঁটা রয়েছে একেবারে পশ্চাৎভাগে। সেখানে যেসব কলকব্জা এ দু'টিকে চালিত করে, যেমন নেই তাদের জাঁকজমক, তেমনি নেই তাদের ফুসফুসের জোর। যক্ষ্মা-রোগীর খুক্ খুক্ করে কাসির মতো ঝুক্ ঝুক্ শব্দ হচ্ছে সেখানে আর বিস্তর ষ্টীমের প্রশ্বাস বেরিয়ে এসে প্রমাণিত করছে যে আয়ু বোধহয় আর বেশীক্ষণ নেই। ষ্টীমারের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ হবে। একখানা ভারী ও অচল ফ্ল্যাটের সঙ্গে দু'খানা চাকা জুড়ে দিলে যা দাঁড়ায়, তাই।

দোতলায় সম্মুখভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিন এবং তার পশ্চাতেই ইণ্টার ক্লাসের যাত্রীদের জন্যে খানকতক বেঞ্চ বিছানো।

এবার আর সুজনী পাতা হল না, কারণ ওপারে পৌঁছোতে অল্প সময় লাগবে। তারপরই আবার ট্রেণ। রেণু দেবী যতই ভড়কে গিয়ে থাকুন, এবার তিনি হয় ভুল করে কিংবা কেয়ারফুলি কেয়ারলেসের মতো একেবারে আমার পাশেই বসে পড়লেন। স্তিমিত বৈদ্যুতিক আলোকে তাঁর মুখের চেহারা স্পষ্ট ঠাহর করতে পারছিলাম না। আমার সঙ্গীরা সবাই একটু লাজুক ধরনের, স্বল্পভাষী। আমার কিন্তু এই পরিবারের সঙ্গে পথে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সতীশবাবুর কালো মুখে আরও কয়েক পোঁচ কালি লেপন করে বার তিনেক আরও কমলা, আপেল ও আঙ্গুর কিনে ছোটদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছি এবং হাজারো আপত্তি সত্ত্বেও এবার রেণুর হাতে জোর করে খানকয়েক ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট গুঁজে দিতে আর সংকোচ বোধ হল না।

তারপর বেলফুলের কুঁড়ির মতো দু'পাটি দাঁতের ফাঁকে কুট্ কুট্ করে বিস্কুট ভাঙতে ভাঙতে রেণুর সঙ্গে যে কথা হল হুবহু তা লিখে দিচ্ছি:

রাণাঘাটে পৌঁছে আপনি অপেক্ষা করবেন বহরমপুর ট্রেণের জন্যে আর আমরা তো সোজা চলে যাবো কলকাতায়। আর দেখা হবে না আপনার সঙ্গে, তাই না দ্বিজেনবাবু?

বললাম: হবে না বলতে পারি না। কিন্তু সে যে কবে, আজ থেকে কত বছর পরে, নিশ্চয় করে তা বলা যায় না।

ফস্ করে প্রশ্ন এল: ভুলে যাবেন তো একেবারে? কিংবা মনে থাকলেও থাকবে অভদ্র মেয়ে হিসাবে—চেয়ে চেয়ে বিস্কুট খায়, লেমনেড খায়, খাওয়ায় না একটি পয়সারও—এই তো?

হেসে জবাব দিলাম ঃ আমি খাওয়াইনি একটি পয়সারও। যা খেলে, প্রকৃত পক্ষে তা খাওয়ালেন মহামান্য সরকার বাহাদুর। কিন্তু আমি ভাবছি, এমনি যেচে খাওয়াতে খাওয়াতে হঠাৎ আবার একদিন আতিথ্য গ্রহণেরই না আমন্ত্রণ এসে যায় আমারই মত। তখন চোখের জলে বান ডাকবে তো ?

জেলে নিয়ে গিয়ে নাকি খুব অত্যাচার করে ?—প্রশ্ন করলো রেণু।

বললাম ঃ আমার চেহারা কি অত্যাচারিতের চেহারা ?

রেণু আমার পানে চেয়ে মুচকি হাসলো, বললো ঃ না, তা মনে হচ্ছে না তো। বরং—

বরং মনে হচ্ছে বাদশাহী অট্টালিকা আর নবাবী খানা ছেড়ে চলেছেন রাজার অতিথি হয়তো কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে আনন্দ-সফরে, তাই না ?—বলে হেসে উঠলাম। রেণুও হেসে উঠলো হি হি করে।

ষ্টীমারের রেষ্টুরেণ্ট থেকে বয় এসে দু'কাপ চা দিয়ে গেল। চায়ের কাপে মুখ দিয়ে একবার সতীশবাবুর পানে দৃষ্টিক্ষেপ করলাম। পাছে চায়ের সঙ্গে কেক বা মামলেট চেয়ে বসে আবার খরচান্ত করি তাঁকে, তাই তিনি র‍্যাপারখানা খুব ভালো করে জড়িয়ে শম্বুকের মতো একপেশে হয়ে বসেছিলেন অন্ধকার নদীর পানে চেয়ে। একুশ-বাইশ বছরের স্বাস্থ্যবান সুন্দর ছোকরার সঙ্গে আঠারো বছরের পেখম-তোলা কলেজী মেয়ের ঘনিষ্ঠ আলাপ সেই মামুলী মন দেয়া-নেয়ার পথেই তো চলবে, তাও তো মাত্র রাণাঘাট পর্য্যন্ত।—সুতরাং ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে নিজেকে রক্ষাকার্য্যে মনোনিবেশ করাই সতীশবাবু যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন দেখা গেল।

পূর্ব্বেই বলেছি, আমার সহবন্দীরা সবাই একটু লাজুক ধরনের। তারপর এমনি পেখম-তোলা ময়ূরের মোহনীয় স্মার্টনেসের সম্মুখে তাঁরা যে ওষধি শিকড় দেখে সাপের মতো কুঁকড়ে গেছেন, বেশ বুঝতে পারলাম।

রেণুর বাবা আবার চাওয়ালার সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিয়েছেন। জলের মতো চা, এর দাম কখনো চার পয়সা হতে পারে ? সুতরাং "গভর্ণমেণ্ট কণ্টাগ্‌দার" পুনরায় চাওয়ালাকেই যুদ্ধে আহ্বান করলেন। তবে এবার আর জামার আস্তিন গুটোতে পারলেন না, র‍্যাপারটাও গায়েই রাখলেন জড়িয়ে। শীত যে ! নদীর ঠাণ্ডা হাওয়া যে গায়ে বিঁধছে। দেখলাম, পানের ডিবে তাঁর হাতে এবং একটু পরপরই দু'খিলি করে তুলে মুখে পুরছেন।

এই তো সুযোগ! বন্দীনিবাসে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে প্রবেশের পূর্ব্বে রেখে যাই না একটি স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে বাইরে পথের ধারে! কে বলতে পারে উত্তরকালে এই স্ফুলিঙ্গই সৃষ্টি করবে না এক সর্ব্বনাশা হব্যবাহন?···

চা খেতে খেতে অনেক কথা হল। দু'জনের মাঝখানকার হাল্‌কা লঘু পরদা কখন্ যে উড়ে গিয়ে গাম্ভীর্য্যের মতো একটা থমথমে ভাব এসে গেছে, দু'জনেই যেন তা টেরও পাইনি। রেণু জিজ্ঞেস করলো: কি করতে পারি আমি আর কেমন করে পারি?

বলতে লাগলাম: শান্তি, সুনীতি আর বীণা তোমারই মত মেয়ে। তারা কি করতে পেরেছে? তারা যা পেরেছে, তুমিও তা পারবে না কেন? রাজপুত মেয়েরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ করতেন তলওয়ার চালিয়ে। আর তুমি পারবে না ভ্যানিটি ব্যাগ ছেড়ে রিভলভার তুলে নিতে?

কোথায় পাবো? কাকে আমি চিনি? কে আমার চিনিয়ে দেবে? পর পর প্রশ্ন করলো রেণু।

হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করে নিয়ে এলাম রেলিংয়ের ধারে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে। তারপর বললাম: আমি তোমায় চিনিয়ে দেব। তোমায় একটা নাম ও ঠিকানা দিচ্ছি। রাত দশটার পর একে বাড়ীতে পাবে। আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলবে "হলদে ফুল" তোমায় পাঠিয়েছে। তাহলেই হবে।

হলদে ফুল?

হ্যাঁ, ওটাই আমার সাংকেতিক নাম। পার্টির লোক ছাড়া কেউ জানে না— বলে নীচে নদীর দিকে রেণুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম: দেখছো কী অন্ধকার! এমনি অন্ধকার আমাদের ভবিষ্যৎ। কোনো উজ্জ্বল প্রভাতের প্রতিশ্রুতি দিতে পারবো না তোমায়। কাজই আমাদের জীবন। এরই চাকার নীচে নিজেকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই আমাদের আদর্শ।

রেণু কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আমার কণ্ঠস্বরে তখন আবেগ এসে গেছে: কবে আমি বেরিয়ে আসবো জানি না। কিন্তু তবু বন্দীনিবাসে বসে বসে তোমার কথা ভাববো, ভাই জেলে গেলেও বোন রয়েছে বাইরে—এই হল আমার সান্ত্বনা। পারবে না তুমি আমাদের ব্রত গ্রহণ করতে? দেশকে স্বাধীন করবার কাজে পারবে না নিজেকে বিলিয়ে দিতে? কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে, বন্ধুদের মধ্যে, আত্মীয়জনের মধ্যে পারবে না এই অগ্নিমন্ত্র প্রচার করতে?

অকস্মাৎ অনুভব করলাম হাতের ওপর স্পর্শ। আমার রেলিংয়ের ওপর রাখা হাতে রেণুর তপ্ত হাত এসে ঠেকেছে! বুঝতে পারা গেল শহুরে রেণুর বুকেও জ্বালিয়ে দিয়েছি বিপ্লবের আগুন। এবার অত্যাচারীকে পুড়িয়ে মারবে সেই আগুনের শিখা!…উদ্দীপনায় যেন একেবারে ফেটে পড়তে লাগলাম: ক্ষুদিরাম-কানাইলাল থেকে সুরু করে বিনয়-বাদল-দীনেশ পর্য্যন্ত বাংলার অগণিত শহিদেরা যে পথের নিশানা দিয়ে গেছেন, সেই আমাদের পথ রেণু! সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ভারতকে স্বাধীন করাই আমাদের লক্ষ্য। যে কোনো দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা করলে এই সত্যটাই বার বার করে মনে ঘা দেয় যে, আবেদননিবেদনে করুণা পাওয়া যেতে পারে, স্বাধীনতা পাওয়া যায় না।. চেয়ে দেখ ফ্রান্সের দিকে, চেয়ে দেখ রাশিয়ার দিকে, আয়ারল্যাণ্ডের দিকে চেয়ে দেখ—

অকস্মাৎ বাধা পেলাম। আমার হাতখানা সস্নেহে হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে হঠাৎ রেণু বলে উঠলো: বাঃ, আপনার আংটিটি তো ভারী সুন্দর! কী বলে একে, নীলা? ইস্, কি চক্‌চক্ করছে! কতটুকু সোনা দিয়ে তৈরী দ্বিজেনবাবু? আমিও এমনি তৈরী করাবো একটা! দিন্ না একটখানি, বাবাকে দেখিয়ে আনি।

একেবারে চুপ করে গেলাম। নিশ্বাসও বুঝি বন্ধ হয়ে এল!…মুক্তো ছড়াচ্ছিলাম কোথায়? কার গলায় পরাচ্ছিলাম মুক্তোর মালা? কাকে দিচ্ছিলাম অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা? এ যে শহুরে রেণু…গ্রামের রেণু আমি চলে আসাতে খুশী মনে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারেনি, পত্রালাপ বন্ধ থাকলেও জানি আজও যেমন তার মনের গহনে আমার স্মৃতি ফুলের মত ফুটে রয়েছে, অপরিম্লান পারিজাতের মতই তা চিরদিন বিকীর্ণ করবে সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ!…

আর এ শহুরে রেণু। বাতাসে তুলে চলে এরা কড়া এসেন্সের হিল্লোল, এরা হিসেব করে কথা কয়, ওজন করে হাসে, এদের প্রতিটি নিমেষ সীমাহীন ভদ্রতায় নিখুঁত। এদের শালীনতা ও শোভনতার পালিশে দাগ ধরে না, পাশ কাটিয়ে এরা এসে দাঁড়ায় আদর্শবাদীর মুখোমুখি, গায়ে গা ঠেকিয়ে। আকাশের রামধনুর মতোই এদের ভালবাসা। দীপ্তিময়, কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর। দূর থেকে দেখতে ভালো লাগে এদের, কাছে এলেই কাঠামোর নোংরা কাঠ আর নীরস খড় বিশ্রীভাবে চোখে ঠেকে।…

বিপ্লবীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তৈরী করে যেতে চেয়েছিলাম ভেরা ফিগনার, কিন্তু দেখলাম রেণু বেলোয়ারী কাঁচের পুতুল ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ওপরে চেয়ে দেখলাম মিশমিশে কালো আকাশ, তাতে অসংখ্য তারার মিটমিটে প্রদীপ। আর নীচে, ষ্টীমারের স্বল্পালোকে নদীর যেটুকু দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে, তা মৃত্যুর স্তিমিত হাসির মতই ভয়াবহ মনে হচ্ছে। তার বাইরে ঠাণ্ডা, মৃত অন্ধকার, অনেক কালের বাসি মড়ার মতোই ভারী ও স্যাঁৎসেতে!···

হলদে ফুলের সাংকেতিক শব্দ ওকে বলে দিয়ে আমিই চোখে হলদে ফুল দেখতে লাগলাম!······

এগারো

বহরমপুর বন্দীনিবাসের লৌহদ্বারে আমরা যখন এসে পৌছলাম, তখন বেলা দশটা হবে।

লোহার শিকওয়ালা প্রকাণ্ড গেটখানা সরে গিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। গেটের পর অফিস। মালপত্র এসে জমা হল অফিসে। তল্লাসী হবে। তারপর আসল বন্দীশিবিরের দ্বার খুলবে।

গোটা কয়েক সিপাই এসে স্বরু করলো তল্লাসী। নামমাত্র। না করে উপায় নেই। কারণ ঐ নীরেট মগজে কী করে ঢুকবে যে, টুথ পেষ্টের টিউবের মধ্যে, সাবানের দেহাভ্যন্তরে অথবা কোটের লাইনিং-এর মধ্যে আমরা গোপনীয় পত্র বহন করে থাকি?

তাই তল্লাসী শেষ হয়ে গেল। এবার গুরুতর বিষয়, বাসস্থান নির্ব্বাচন। বাংলার বিপ্লবীরা তখন প্রথমতঃ মোটামুটি দু'টি দলে বিভক্ত ছিল—অনুশীলন ও যুগান্তর। তারপর ছিল ঐ এক-একটি দলের মধ্যেই বৃহৎ উপদল, হয়তো গোটা জেলা বা মহকুমা জুড়ে। আবার একটি ক্ষুদ্র শহরেই হয়তো এমনি গোটা কয়েক উপদল ছিল, পরস্পরবিরোধী। তারপর ছিল এমনি উপদলে গোটা কয়েক গ্রুপ—অমুক রায়ের গ্রুপ, তমুক দাসের গ্রুপ ইত্যাদি। এই গ্রুপ-লীডাররা অনেকটা সেনাবাহিনীর সেকশন কমাণ্ডারের মতো। হয়তো মাত্র দশ-বারো জনই তাঁর দলের সভ্য। তাহলেও তাঁর হাঁকডাক কম নয়। বাংলার বিপ্লব আন্দোলন যেন তাঁর দ্বারস্থ না হলে একেবারে মিইয়ে পড়ে

ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে, এমনি তাঁর ভাবখানা। এই গ্রুপ বিভাগের পরও আছে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব, পছন্দ ও নির্ব্বাচন।

কর্তৃপক্ষ বন্দীদের খুশীমত সীট নির্ব্বাচনের যে অধিকার দান করেছিলেন বন্দীরা পূর্ণভাবে তার সুযোগ গ্রহণ করে সমগ্র শিবিরটাই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সংখ্যাতীত অঞ্চলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন। তাই অফিসের কেরাণীরাও জানেন যে, এঁদের দল, উপদল, গ্রুপ-লীডার, আঞ্চলিক সখ্য, ব্যক্তিগত পছন্দ প্রভৃতি বহু বিষয় আছে, যা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে তবে এঁরা সীট মনোনয়ন করেন। কোন্ বন্দী কোন্ দলভুক্ত কিংবা ইস্টার্ণ ব্যারাকের তেরো নম্বর কক্ষের বাসিন্দারা কোন্ উপদলের সভ্য, এঁরা তা বেশ জানেন ও তাই নিয়ে পরিহাস করবার সুযোগ পেলে ছাড়েন না।

প্রধান কেরাণী প্রশ্ন করলেন: আপনি কোন্ ব্যারাকে ও কোন্ ঘরে থাকতে চান?

মানে?—বিস্মিত হলাম: খুশীমত সীট নেয়া যেতে পারে তাহলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বলে কেরাণী বলে যেতে লাগলেন: ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাক, ইস্টার্ণ ব্যারাক আর সাদার্ণ ব্যারাকে থাকেন যুগান্তর দলের বন্দীরা আর টালি শেডগুলোতে থাকেন অনুশীলনের সভ্যরা। আপনারা কি টালি শেডে যাবেন, না—

বললাম: ব্যারাকে যাবো। তবে কোন্ ব্যারাকের কোন্ ঘরে সেটা ভেতরে গিয়ে দেখে আপনাদের খবর পাঠিয়ে দেব, কেমন?

সে সময় রাজবন্দীদের মধ্যে দলীয় বা উপদলীয় চেতনা অত্যন্ত তীব্র ছিল। নতুন কেউ এলেই সাগ্রহে লক্ষ্য করা হতো তিনি কোন্ দলের, কার পরিচিত এবং কোথায় সীট নিলেন। তারপর মুহূর্ত্তের মধ্যেই সেই সংবাদ সমগ্র শিবিরে প্রচারিত হয়ে যেত মুখে মুখে যে, আজ অমুক দলের অমুক গ্রুপের একজন এসেছে। প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই পরিচিত বন্দীরা ঝটিতি এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানান এবং যেই তাঁদের মধ্যে একজন এসে কাঁধে হাত দিয়ে অন্যান্য সবাইকে পশ্চাতে ফেলে নবাগত কাউকে নিয়ে শিবিরের অভ্যন্তরে চলে যান, তখনই তার পরিচয় জানা যায়। পরিচিত কাউকে না পেলে তখন ভারী হাঙ্গামে পড়তে হতো, কারণ সবাই সন্দেহ সুরু করতো তাকে। সে আখ্যা পেত দিবাকর সেনগুপ্ত অর্থাৎ স্পাই রাজবন্দী নামে।

বন্দীশিবিরের ভেতরের দরজা খুলে যেতেই আমরা চারজন প্রবেশ করলাম এবং পরিচিতেরা এসে ছোঁ মেরে এক-একজনকে নিয়ে অদৃশ্য হতে লাগলেন। আশ্চর্য্য, আমায় এসে পাকড়াও করলেন নারায়ণগঞ্জের অনুশীলনের রিভল্ট (বিদ্রোহী) গ্রুপের লীডার সুধীর চট্টোপাধ্যায়। আমার সঠিক পরিচয় তার যথেষ্ট জানা ছিল আর ঢাকা জেলে একসঙ্গেই তো ছিলাম গত দু'মাস। এগিয়ে এলেন তিনি তাঁর দলীয় ঢাকা জেলের দু'টি একটি ছেলের সংবাদ সংগ্রহের জন্য। কাঁধেও একখানা হাত রাখলেন এবং সন্তর্পণে বেশ একটু এক পাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে আলাপ সুরু করলেন। ফল দাঁড়ালো এই যে, নেহাৎ ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ব্যতীত সারা শিবিরের প্রায় তিনশো বন্দী সেদিন সেই সকালে স্থিরভাবে জেনে নিলেন যে, আমি অনুশীলনের লোক, নারায়ণগঞ্জের রিভল্ট গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত।

যুগান্তর দলের নানা দল, উপদল ও গ্রুপের সদস্যেরা মুখ অন্ধকার করে যার যার কক্ষে ফিরে এলেন। অনুশীলনের আর-একজন বৃদ্ধি পেল।

এদের ভুল অবশ্য ভাঙলো সেদিনই দুপুরে ভোজনকক্ষে।

বারো

বন্দীশিবিরে চেনা ও জানা লোকের যে খুব অভাব ছিল, তা নয়। তবুও, সেকালে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির কর্ম্মীরা সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা গ্রহণ করতো গোপনতার এবং প্রতি ক্ষেত্রে সে-শিক্ষা সাধ্যমত কার্য্যে প্রয়োগ করতে ভুলতো না। তাই, প্রথম দিনেই একেবারে কোন্ নির্দ্দিষ্ট ব্যারাকের কোন্ বিশেষ সীটটি পেলে আমি বাধিত হই, অফিসে সে কথা প্রকাশ না করে শুধু বলেছিলাম টালির ব্যারাকগুলি বাদ দিতে। দেখা গেল, আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে ইস্টার্ণ ব্যারাকের চার নম্বর ঘরে।

সুধীরবাবুকে ছেড়ে দিয়ে আমার ঘরে এসে বসতেই অনুশীলনের যাঁরা দলবৃদ্ধির পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের মুখাবয়বের ঔজ্জ্বল্য চকিতে মিলিয়ে গেল শরতের হালকা মেঘের মতো। তার পরই 'লবি' আলোচনা ও গবেষণা সুরু হয়ে গেল যুগান্তর দলের সংখ্যাতীত উপদল ও গ্রুপের মধ্যে : লোকটি কোন্ গ্রুপের হে?

বারান্দায় এঁদের অনেককেই আনাগোনা করতে দেখলাম। আমার দিকে একটা অদ্ভুত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁরা সরে যেতে লাগলেন এবং ঘুরে এলেন আবার। কী যে এঁদের নীরব প্রশ্ন, স্পষ্ট তা বুঝতে পারলেও চুপ থেকে একটা সাসপেন্স সৃষ্টি করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

এঁদের মধ্যে দু' একজন হয়তো সাহসে ভর করে ঘরে ঢুকে পড়লেন এবং এগিয়ে এলেন পাশের সীটের বাসিন্দার কাছে, একটু ইতস্তত করে, টেবিলের ওপরকার এটা-ওটা-সেটা বৃথাই নাড়াচাড়া করে, নিরর্থক কয়েকটা মিনিট নষ্ট করে আবার আমার প্রতি একটা জ্বালাময়ী জিজ্ঞাসু দৃষ্টি হেনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন গুটি গুটি করে। এরই মধ্যে দুঃসাহসী একজন হয়তো একেবারে প্রাণ হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন আমার কাছেই! কিন্তু সোজাসুজি প্রশ্ন কবতে পারলেন না: আপনি ঢাকা জেল থেকে আসছেন?

জবাব দিলাম।

নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তীকে চিনতেন না?

পাল্টা প্রশ্নে উত্তর দিলাম: বরিশাল শঙ্কর মঠের তো? নিশ্চয়ই চিনতাম। আর কাকেই বা না চিনতাম! মাত্র তো শ' দেড়েক বন্দী। কারুর কাছে কি কেউ অচেনা বা অপরিচিত থাকতে পারেন?

তা তো বটেই, তা তো বটেই।—বলে প্রশ্নকারী সন্দেহ নিরসনের জন্যে আবার প্রশ্ন করলেন: ধীরেন সোমকে?

হেসে বললাম: সবাইকে চিনি। অনুশীলনের চারু রায়কে চিনি, আবার মাদারীপুরের পুষ্প চাটার্জ্জীকেও চিনি। বিশেষ করে, ঢাকা জেলের ভক্ষণ সমিতি দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে।

ভক্ষণ সমিতির প্রসঙ্গ আসতেই স্বভাবতঃই তার বিবরণ খানিকটে দিতে হলো এবং কিচেন ম্যানেজারের সঙ্গে জীবনব্যাপী মহাসংগ্রামে সর্ব্বত্র জয়লাভ করে কোন্ ওয়াটারলু রণক্ষেত্রে আমাদের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে, তাও বিবৃত করলাম। অবশেষে করলাম পাল্টা প্রশ্ন: কমেট মানে শশাঙ্ক দাশগুপ্ত কোন্ ঘরে আছেন বলতে পারেন?

ও—শশাঙ্কবাবু! হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব পারি। চলুন না, নিয়ে যাই আপনাকে ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের চোদ্দ নম্বরে।—আসুন।

আহ্লাদে ভদ্রলোক অকস্মাৎ ডগমগ হয়ে উঠলেন এবং উৎসাহের আতিশয্যে

আমায় সাহায্য করবার জন্য একেবারে উন্মুখ হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর অত্যুগ্র আগ্রহের আগুনে জল ঢেলে দিয়ে আমি বলে ফেললাম: থাক্, পরে ত দেখা হবেই।

কিন্তু তিনি শেষ চেষ্টা করলেন: তাঁকে ডেকে আনবো?

না, থাক্।—বলে আমি এই প্রসঙ্গের ওপর যবনিকা টেনে দিলাম। মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়িয়ে থেকে ভদ্রলোক চোখেমুখে খুশীর মশাল জ্বেলে নিয়ে হন হন করে বেরিয়ে চলে গেলেন। মনে হলো যেন বাইরে গিয়ে সমগ্র বিশ্বকে আহ্বান করে উদাত্ত কণ্ঠে এই মহাবাণীই ছড়িয়ে দেবেন যে, অনুশীলন অথবা যুগান্তরের রিভোল্ট দল নয়, রংপুর বা দিনাজপুরের ভ্যাবাগঙ্গারাম গ্রুপের নয়, সতীশ রায়ের সাড়ে তিনজনের পাকানো দল, এমন কি, মুখচোরা কমিউনিষ্টও নয়, একেবারে খোদ বি ভি···

ঘণ্টাখানেক পর খানার ঘণ্টা বেজে উঠলো এবং যতীশ গুহ, কমেট, মনোরঞ্জন, নীতিশ প্রভৃতির পাশেই বসলাম আসনে। ব্যস্, এবার ললাটে টীকা লাগানো হয়ে গেল এবং সর্ব্বপ্রকার গবেষণা ও আলোচনার ঘটলো পরিসমাপ্তি।

রাত দশটা পনেরো মিনিটে ঘর বন্ধ হয়ে গেলে আমার পাশের ছেলেটির পানে দৃষ্টিক্ষেপের অবসর পেলাম। ওর দাদার বয়সী তো আমি নিশ্চয়ই, কারণ অমরের বয়েস পনেরো-ষোলোর বেশী হবে কি না সন্দেহ। চেহারায় বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছুই নেই, তথাপি হঠাৎ একবার চাইলে আবার চাইতে ইচ্ছে করে। মুখাবয়বের কোথায় যেন কী-একটা আছে লেপটে, চোখের মণিতে তার প্রতিবিম্ব হঠাৎ ঝক্ ঝক্ করে ওঠে!

গ্যাটাপারচারের ফ্রেমে-আঁটা পুরু কাচের চশমা, তার পশ্চাতে এক জোড়া রহস্যময় চক্ষু। অন্যমনস্কতার ছাপ তাতে লেগে রয়েছে মনে করলে ভুল করা হবে। সে চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়, অথচ তাতে বুদ্ধির চোখ-ঝলসানো প্রখরতা নেই, অনেকটা উদাসীন দার্শনিকের মতো। এ্যাটম বা মলিকিউলের প্রতি দৃষ্টি যার সীমাহীন সজাগ অন্ধকার রাতে পাহারাওয়ালার লণ্ঠনের মতো, অথচ ব্যবহারিক জীবনের এলোপাথাড়ি পাগলা হাওয়ায় যার শিখা অনুক্ষণ কেঁপে কেঁপে ওঠে আত্মরক্ষার দাপাদাপিতে। সব্যসাচীর মতো সে পাখীর চক্ষুটিকেই শুধু দেখতে পায়, পারিপার্শ্বিক তার কাছে বিবর্ণ ও মূল্যহীন।

আলাপে জানা গেল, উড়িষ্যায় কেন্দ্রাপাড়ায় তার আদি বাড়ী। মেদিনীপুরে আই-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েছিল। কর্ণেল পেডি নিহত হবার পর আরও অনেকের সঙ্গে তাকেও গ্রেপ্তার করে কয়েক মাস হাজতে রাখা হয় ও পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। মিছামিছি আবার রাজবন্দী করে পাঠিয়ে দিয়েছে বহরমপুরে।···এমনি আকুতিভরা কণ্ঠে মন্তব্য করলো যে, আশঙ্কা হলো অমরের চোখের পাতা বুঝি সিক্ত হয়ে উঠেছে!

সমরেন্দ্র পাল আমার অন্যতম রুম-মেট। সদালাপী, মিষ্টভাষী ও অত্যন্ত স্মার্ট! বিশ্ববিদ্যালয় সামরিক শিক্ষা বাহিনীর তিনি ছিলেন অন্যতম সেকশন কমাণ্ডার। রাইফেলের নিশানায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে রৌপ্যপদক পুরস্কার পান। কলকাতার মার্জ্জিত ভাষায় কথা বলবার শত চেষ্টা করলেও জিহ্বার প্রহরা ব্যর্থ করে দিয়ে বেরিয়ে আসে মাঝে মাঝে খাস কুমিল্লার সুর। শ্রোতা হেসে উঠলে তিনিও হাসেন। ভারী সরল।

কুমিল্লার হিমাংশু ভট্টাচার্য্যও আছেন। সেখানকার জনৈক গ্রুপ-লীডার। কার্ত্তিকের মতো অত্যন্ত ঘন ও কুঞ্চিত চুল, চওড়া অথচ অত্যন্ত বেঁটে প্রায় হিটলারের মত এক জোড়া গোঁফ। পাতলা শুষ্ক তেজপাতার মতো দেহ আর তেমনি ক্ষুরধার বুদ্ধি! যুক্তিপ্রদর্শনে তাঁর জুড়ি মেলা ভার বলে একাধিক বার প্রমাণিত হয়েছে সংবাদ পাওয়া গেল।

প্রথম রাত্রির কথা আজও মনে পড়ে। হরিমোহন এসে মশারি গুঁজে দিয়ে গেলে আমি লেপখানা মাথার ওপর টেনে দিলাম। কিন্তু ঘুম কোথায়? দূরে কোথায় ঘন্টা বেজে চললো: বারোটা, একটা, দু'টো।···পরিচিতদের সঙ্গে আবার নতুন করে আলাপে এবং অপরিচিতদের সঙ্গে নতুন করে পরিচয়ে অনেকখানি সময়ক্ষেপ হলেও সে তো দিনের বেলা। রাত্রে এসে তো বন্ধুরা তেমন ভিড় কিছু করেনি। এমনি স্তিমিত অন্ধকারে, চোখ মেলে চেয়ে থেকে ঘন্টাব পর ঘণ্টা না কাটিয়ে বাড়ীতে মার কাছে চিঠি লিখলেও তো চলতো?

কিন্তু লিখবার সরঞ্জাম থাকলেই তো লেখা হয় না, লিখবার জন্য চাই মন। আমার একেবারেই মন ছিল না। বহরমপুরে এসেই যেন সে মন হারিয়ে ফেলেছি। ঢাকা জেলে থাকতে অত্যন্ত যুক্তিহীন হলেও তবুও একটা ক্ষীণ আশার আলোরেখা মাঝে মাঝে মনের কোণে ঝিলিক মেরে যেত: হয়তো

অকস্মাৎ এক প্রভাতে আসবে আমার মুক্তির সংবাদ। প্রতিদিনের প্রভাত ব্যর্থ প্রত্যাশায় পাণ্ডুর হয়ে উঠলেও আগামী দিনের অনিশ্চয়তা আবার খানিকটে সতেজ করে তুললো। কন্‌ফারমড্‌ হয়ে যাবার পরও মনে হয়েছে, তবু তো রয়েছি ঢাকা জেলে, আমার গ্রামের আট মাইলের মধ্যেই। দেয়ালের ওপর দিয়ে যে লাইট পোষ্টগুলো দেখা যাচ্ছে, ওরই নীচেকার রাস্তা দিয়ে কত বার যাতায়াত করেছি, নিঝুম রাতে শহরের খোয়া-ঢালা রাস্তায় পাড়া কাঁপিয়ে যে ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ী ছুটে চলে, তার বিশ্রী শব্দ এসে কানে কত পরিচিতের গুনগুনানি শুনিয়ে গেছে, শহরের সোরগোলে যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে আমারই কণ্ঠ। ঢাকা শহরকে মনে হয়েছে যেন আমাদের গ্রামেরই বৈঠকখানা। অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার হারালেও বৈঠকখানার ফরাশে তো গা এলিয়ে পড়ে থাকবার অধিকার ছিল।···

কিন্তু বহরমপুর বন্দীশিবিরে প্রবেশের পর অকস্মাৎ মনে হলো যেন কত দূরে আমায় টেনে আনা হয়েছে। কত পাহাড় পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে, কত সাগর পাড়ি দিয়ে, কত মরু-প্রান্তর অতিক্রম করে কোন্ পাতালপুরীর লৌহ কুঠরীতে আমায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। এ থেকে যেন আর নিষ্কৃতি নেই আমার! চক্রব্যূহে প্রবেশের পথ আছে খোলা, কিন্তু বেরিয়ে যাবার? ভাবতে গেলে সারা গায়ে কাঁটা দেয়, শরীরটা ছমছম করে ওঠে—মনে হয় জন্মজন্মান্তর ধরে এই ইস্টার্ণ ব্যারাকের চার নম্বর ঘরেই আমায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হবে।······

তথাপি নিরাশায় ভেঙ্গে পড়বার মতো ঠুনকো মন সে যুগের বিপ্লবীদের মধ্যে একজনেরও ছিল কিনা সন্দেহ। কী করে বিপ্লব আসবে, কোথা থেকে আসবে আমাদের অস্ত্র সশস্ত্র অভ্যুত্থানে কে করবেন আমাদের পরিচালনা, কোথায় সেই জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং, এই সব তীক্ষ্ণ প্রশ্নের খুব পরিষ্কার জবাব আমরা দিতে পারতাম না সত্য। সংগঠনের পরবর্ত্তী অধ্যায় কি, কি আমাদের কর্ম্মসূচী, কোন্ ইন্দ্রজাল-স্পর্শে অকস্মাৎ একদিন বৃটিশসিংহ ল্যাজ গুটিয়ে তার বিলিতি বিবরে অদৃশ্য হয়ে যাবে, কোন্ কর্ণধারের হাতে স্বাধীন দেশের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হবে, ঠিক কোন্ পথে দূর হবে দেশের নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতা, দুঃখ ও দারিদ্র্য, এ সম্বন্ধে ভাসা ভাসা ধারণা থাকলেও উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল আমাদের একেবারে সীমাহীন।

সে যুগের বিপ্লবীদের মন ষ্টীমাবের বয়লারের সঙ্গে তুলনীয়। বাইরেটা অন্ধকার, শান্ত ও স্বাভাবিক, কিন্তু ভেতরে অনির্ব্বাণ বৈশ্বানর, লক্লকে তার সর্ব্বগ্রাসী শিখা! আস্তরণের কোমলতা দেখে অন্দরের ভয়াবহতার পরিমাপ করা কঠিন। ত্বকেব মসৃণতায় অস্থির কঠোরতার প্রতিবিম্ব পড়ে না!······

চলার পথে পদে পদে পেয়েছে তারা বাধা, কানে শুনেছে আসন্ন বিপদেব ক্রুদ্ধ গর্জ্জন, বিশ্বাসঘাতকতার কুশাঙ্কুরে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তাদের দেহ, একে একে বিদায় নিয়েছে শুভানুধ্যায়ী ও সহযোগীর দল, তথাপি মুষড়ে পড়েনি, দুমড়ে যায়নি তারা, সূচীভেদ্য অন্ধকারে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে প্রতীক্ষা করেছে তারা এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতের!······

আলীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে ফাঁসীর আসামী দীনেশ গুপ্ত তাঁর দিদিকে লিখেছিলেন, "···মৃত্যুকে আমরা ভয় করি বলিয়াই সে আমাদের জুজুর ভয় দেখাইবাব সাহস পায়।···" সত্যিই বিপ্লবীরা মৃত্যুকে ভয় করে না। তাকে তারা জানায় আহ্বান পবিচিতের মতো, অন্তবঙ্গের মতো কাছে ডেকে নেয়, বন্ধুব মতো করে আলিঙ্গন!

তাই জানি, এ অমানিশা কেটে যাবে, এ রাত্রি প্রভাত হবে, বহরমপুব বন্দীশিবিরের লৌহ দ্বার দু'পাশে সরে গিয়ে সসম্মানে আবার একদিন আমার বেরিয়ে যাবার পথ উন্মুক্ত করে দেবে।······

তের

ক্রমে ক্রমে যা হয় তাই হলো, বন্দীশিবিরের সঙ্গে আমার মিতালী ঘটে গেল। এখানকার জীবনযাপনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলাম নিজেকে।

বিরাট বন্দীশিবির। আয়তন এক বর্গমাইলের কাছাকাছি। অতি দীর্ঘ ব্যারাক দু'টি, ইস্টার্ণ ও ওয়েষ্টার্ণ। এ ছাড়া ক্ষুদ্রাকার ব্যারাক দু'টি সাদার্ণ 'এ' এবং সাদার্ণ 'বি'। বড় ব্যারাক দু'টির প্রত্যেক কক্ষের আয়তন অনুযায়ী হয় চার জন বা ছয় জন বন্দী থাকেন। সাদার্ণ ব্যারাক দু'টির প্রত্যেক কক্ষে থাকেন চার জন করে। যুগান্তর দলের বিভিন্ন উপদল, গ্রুপ ও স্বতন্ত্র সদস্য মিলে এই ব্যারাক চারটি দখল করে রেখেছেন।

এ ছাড়া গোটা চারেক টালীর ছাউনি-দেয়া মাঝারি সাইজের ব্যারাক আছে। তাতে থাকেন অনুশীলন, রিভোল্ট দলের সদস্যেরা এবং জনকতক কম্যুনিষ্ট ও গুটিকয় কংগ্রেসী।

বাসিন্দার সংখ্যা তিনশো'র ওপর। কাজেকাজেই তাদের স্নানের জায়গা, খাবার ঘর, রান্নাঘর, জ্বালানী রাখবার ঘর, অসংখ্য কয়েদী চাকর, রাঁধুনী, ধোপা, নাপিত, জমাদার, বাগানের মালী—সব মিলিয়ে একটা আস্ত দুনিয়া বলা চলে। একটি ডিসপেনসারী আছে ও আছে ত্রিশটি বেডের একটি হাসপাতাল।

তারপর এরই মাঝে মাঝে খেলার মাঠ। সেখানে ফুটবল, টেনিস, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, হকি, ক্রিকেট ও বাসকেট বল খেলা হয়। যাঁরা ব্যায়ামের অভিলাষী, তাঁদের জন্য গোটা দুই নানাবিধ সরঞ্জামপূর্ণ ব্যায়ামাগার আছে, কুস্তির আখড়াও আছে।

খোলা জায়গায় স্নানের জন্য বিরাট চৌবাচ্চা আছে, আবার আবরু রক্ষা করে যাঁরা স্নান করতে চান, তাঁদের জন্য আছে প্রায় পঞ্চাশটা বাথরুম। এক ধরনের জলের আধার থাকে জেলের মধ্যে, যাকে জেলীয় ভাষায় বলা হয় মুড়ী। আঠারো ইঞ্চি চওড়া এবং হয়তো ত্রিশ ফুট দীর্ঘ ড্রেনের মতো। ট্যাপ দিয়ে জল এসে ভর্ত্তি হয়ে যায়, আবার ছিপি খুলে দিলে সব জল বেরিয়ে-যেতে পারে। এই দীর্ঘ গোটা চারেক মুড়ীর ওপর চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে ঘেরা ঝাঁপের দরজাওয়ালা সারি সারি স্নানের ঘর।

রাজবন্দীদের মধ্যে অনেকের ফুলের বাগানের শখ। তাঁরা হয় নিজেদের

ঘরের বাইরেই অথবা অন্যত্রও সুদৃশ্য ফুলের বাগান তৈরী করে নিয়েছেন। তাতে দেশী ও বিলিতি নানাজাতীয় ফুলের দঙ্গল। কেউ শখ করে পোষেন মুরগী, কেউ হাঁস, কেউ কবুতর। কারুর আবার পোষা কাঠবিড়ালীও আছে। পকেটে করে বা কাঁধে নিয়ে বেড়াতে যান, রাত্রে বালিশের পাশেই সে চুপটি করে ঘুমিয়ে থাকে। খাবারঘরে কাঁধ থেকে নেমে এসে কুটকুট করে হয়তো একটা আলু ভক্ষণ করে আবার কাঁধের ওপর উঠে বসে থাকে। অনেক সময় সারাটা দিন বাইরের গাছে গাছে জাত-ভাইবোনদের সঙ্গে খেলা করে সন্ধ্যে হতেই ফিরে আসে আমাদের ব্যারাকে, যাঁর পোষা ঠিক তাঁর কাছে। আশ্চর্য্য পোষ মানে এই কাঠবিড়ালী। সবার চাইতে উদ্ভট শখ দেখলাম নোয়াখালীর বীরেন কুণ্ডুর। তাঁর পোষা ছিল বেজী, সাদা বক, একটা হনুমান এবং একটা পাতি শেয়াল। কোন্ ড্রেণ দিয়ে কী করে এই শেয়ালটা বন্দীশিবিরে ঢুকে পড়ে। বীরেন তাড়া করে তাকে এনে আটকে ফেলে ব্যায়ামাগারে। তার পর তার গলায় দড়ি বেঁধে একেবারে ছাগলের মতো নিয়ে এল নিজের ঘরে। কি করে যে হনুমান বা বক সে বন্দী করেছে, সেই জানে! তার ঘরটি একেবারে চিড়িয়াখানা, দুর্গন্ধে ভরপুর।

সত্যি, একটা পৃথক জগৎ। এখানকার হাসিকান্না, এখানকার মান-অভিমান, এখানকার প্রত্যেকটি তরঙ্গ চারখানা দেয়ালের মধ্যেই উত্তাল ও দুর্নিবার হয়ে ওঠে, আবার এক সময় এই চারখানা দেওয়ালের মধ্যেই সমাধি লাভ করে আর তার ওপর জমতে থাকে বিস্মৃতির মাটির চাপ! বাইরের জগতের কোনো উচ্ছ্বাসেরই প্রতিধ্বনি এখানে মেলে না। পরিবর্ত্তনশীল সমাজের যেন একটি টুকরো নির্ম্মম হাতে এনে এই বন্দীশালায় রাখা হয়েছে বন্দী করে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে। স্নেহ, মায়া ও মমতায় এবং দরদী পরিবেশে বাইরে যে সুখনীড়টি গড়ে উঠতে পারতো, এখানে ঊষর ক্ষেত্রে পড়ে গিয়ে হয়তো তার আর্দ্রতা যাচ্ছে উবে।......

সমগ্র বাংলা দেশের লোক এখানে জড়ো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের লোক সাধারণতঃ কম, উত্তরবঙ্গের কিছু আছে, অবশিষ্ট অর্থাৎ অর্দ্ধেকের অনেক বেশী এসেছে পূর্ব্ববঙ্গ থেকে—ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ থেকে। কুমিল্লারও কিছু আছে। বন্দীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় তিনশো পঁচিশে। আর স্থান নেই।

আহারের বাবদ বরাদ্দ জনপ্রতি দৈনিক এক টাকা দশ আনা। অর্থাৎ বিরাট রসুই ঘরের গোটা দশেক চুল্লীতে প্রতিদিন পাঁচ শতাধিক টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করা হয়। এত টাকা ব্যয়ের পরও মাসের শেষ দিকে দৈনন্দিন উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ বেশ মোটা হয়ে জমে ওঠে। কিন্তু এক মাসের উদ্বৃত্ত পরবর্ত্তী মাসে টেনে নিয়ে যাওয়া সরকারী নিয়মে নিষিদ্ধ বলে প্রত্যেক মাসেই শেষ দিকে ঘনঘন কয়েকটা Feast বা বিশেষ ভোজনের ব্যবস্থা থাকে।

বিশেষ ভোজনের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে কিচেন ম্যানেজারের মৌলিকত্ব, রুচিপছন্দ ও কর্ম্মদক্ষতার ওপর। একজন ম্যানেজার যেভাবে করলেন অপর ম্যানেজার চেষ্টা করেন সম্পূর্ণ পৃথকভাবে করতে। এবং বলাই বাহুল্য যে, বৈচিত্র্য স্বষ্টির উন্মাদনায় অনেক সময় তা খানিকটে উদ্ভট হয়ে ওঠে। ফলে হয়তো কিছু অপব্যয় হয়; কিন্তু সে জন্যে দুঃখ করবার কারণ নেই। এটা সরকারী পয়সা, বরাদ্দ অর্থে যে আমাদের অতি কষ্টে সংকুলান হচ্ছে, সেটাই প্রমাণ করতে হবে সর্ব্বদা, নইলে ভাতা কমিয়ে দেবার আশঙ্কা আছে।

মার্চ্চ মাসের শেষাশেষি এমন একটা বিশেষ ভোজনের দিন পড়লো। কিচেন ম্যানেজার সত্যবাবু অফিসে গিয়ে ব্যবস্থা করে এলেন যে, দু'রকম পোলাউ হবে—ঝাল ও মিঠে। আর হবে দু'রকম মাংস—ঝোল ও কোর্ম্মা। রান্না করবে স্বয়ং নবাব সিরাজউদ্দৌলার বাবুর্চ্চি। ঠিক সিরাজের নয়, তবে মুর্শিদাবাদ নবাববাড়ীর খাস বাবুর্চ্চিই আসবে জানা গেল। কিন্তু বাইরের লোকের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আই বি বিভাগের অনুমতি ও উপস্থিতি ব্যতীত বে-আইনী। সুতরাং বাবুর্চ্চিরা এসে অফিসের ওখানে রান্না করে রেখে যাবে। তারা চলে যাবার পর আমাদের সত্যবাবু সেগুলো নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবেন। খাসী গোটা চারেক কিনে আনা হলো বটে, কিন্তু তা বলি দিয়ে কাটবার অধিকার আমাদের নেই। কারণ ঐ বিরাট খড়্গ নিয়ে খাসীর মুণ্ডচ্ছেদের নাম দিয়ে শিবিরের কমাণ্ডাণ্ট টবিন সাহেব বা তাঁর সহকারী গিরিজা দত্তকেই যদি আমরা তাড়া করে বসি! তাদের দিয়ে তো আর খাসীর কাজ চলতে পারে না।······

সুতরাং বাবুর্চ্চিরাই খাসী জবাই করে নিয়ে অফিসে রান্না সুরু করলো।

আর এদিকে খাবার হল্-এ সত্যবাবু ও জনকতক স্বেচ্ছাসেবক অন্যান্য ব্যবস্থায় মেতে উঠলেন।

হল্-এর মাঝখানে গোটা কয়েক তক্তপোশ জড়ো করে শুভ্র চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। সেই মঞ্চের ওপর অর্কেষ্ট্রা দল নানা যন্ত্র বাজাচ্ছেন। দেয়ালে মাঝে মাঝে ফুলের রিং, প্রত্যেকটি খুঁটি সাদা কাপড়ে মুড়ে তার ওপর দিয়ে জড়ানো ফুলের মালা। ফরাশের ওপর অনেকগুলো ফুলদানি, তাতে বেশ বড় বড় গোলাপ ও রজনীগন্ধা। সারা হল্‌ময় সুশৃঙ্খলভাবে নয়, ইতস্ততঃ ছড়ানো অনেকগুলো ছোট টেবিল, তার চারিদিকে চারখানা চেয়ার। টেবিলের মাঝখানে একটি ফুলদানিব মধ্যে থেকে রজনীগন্ধার ঝাড় গলা উঁচু করে আছে।

নিমন্ত্রিতেরা যেই একে একে এসে হল্ ঘরে প্রবেশ করছেন, অমনি দরজায় তাদেব বুকে গুঁজে দেয়া হচ্ছে একটি ছোট ফুলের তোরা আর ঝারি থেকে ছিটিয়ে দেয়া হচ্ছে গোলাপ জল।

রাত ঠিক আটটার সময় খাবাব দেবার ঘণ্টা পড়লো। এসে অবধি ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের চোদ্দ নম্বর ঘরে আমার আড্ডা জমে গিয়েছিল। প্রত্যেক দিনই খাবার ঘণ্টা পড়লে আমরা যাই স্নান করতে এবং খাবার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘণ্টা বেজে যাবার পর যাই দল বেঁধে খেতে। তখন বিরাট হোটেলের খাদ্যাবশেষ নিয়ে আমরা বসি কেউ বারকোশ নিয়ে, কেউ বা গামলা নিয়ে, আবার কেউ কড়াইতেই। মেনু'র অনেকগুলোই হয়তো তখন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে দমে যাবার পাত্র আমরা নই। শুধু নুন-ভাত হলেও আধপেটা আমরা কোনদিন খাইনে। খাওয়া সম্বন্ধে চোদ্দ নম্বরের ঔদাসীন্য সর্ব্বজনবিদিত।

হল্-ঘরে প্রবেশ করতেই যথারীতি পেলাম ফুলের তোড়া ও গোলাপ জল। খানতিনেক টেবিল জুড়ে আমরা বসলাম। যতীশবাবু, নীতিশ, কমেট, মনোরঞ্জন, ভোলা বসাক, ননী চৌধুরী, চারু জোয়ারদার, অমর চাটার্জ্জী, নরেন দাস, পরিমল রায়, জ্যোতির্জীবন ঘোষ ও আমি। নবাবী খানা মিলবে বলে আজই প্রথম এলাম যথাসময়ে। ওদিকে আবার দশটা বেজে পনেরো মিনিটে লক্‌আপ। এর মধ্যেই সব সেরে যার যার ঘরে পৌঁছুতে হবে।

কমেট ও ননী খাবার ব্যাপারে একেবারে সদাশিব। যা যখন পাওয়া যায়, তাতেই তারা খুশী, শুধু 'যতটুকুটা' একটু বিবেচনা করে দেখলেই তারা সন্তুষ্ট।

কমেট বললো ঃ এ কি, নবাবী খানার উপক্রমণিকা নাকি ?

গোটাকয়েক আঙুরের দানা মুখে ফেলে জবাব দিল ননী : আঙুর ফল যখন টক নয়, তখন নবাবী খানাতেও বোধহয় সিরাজউদ্দৌলার খোশবায় পাওয়া যাবে। সবুরে মেওয়া ফলে, এ কথা ভুলছো কেন ?

ভোলাবাবু বলে উঠলেন : তারপর শাস্ত্রবাক্য রয়েছে-প্রাপ্তিমাত্রেণ ভক্ষয়েৎ। অতএব—

খাওয়া সুরু হলো। এক প্লেট করে ফল—আপেল, আঙুর, বেদানার দানা, ন্যাসপাতি, আখরোট, কিশমিশ, মনাক্কা, কিছু বাদাম-পেস্তা, কমলা, শশা ও এক ফালি পেঁপে আর কয়েকটা বড় সাইজের কুল। সঙ্গে জল নয়, এক গ্লাস করে ঘোলের সরবৎ।

অর্কেষ্ট্রা দল বাজাচ্ছে ইংরেজী কোনো গৎ আর আমরা টেবিলে বসে খাচ্ছি সাত্ত্বিক আহার। অর্থাৎ পরবর্ত্তী রাজসিক ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য পাকযন্ত্রগুলিকে তালিম দিয়ে নিচ্ছি। পিটপিটে চারুবাবু বলে উঠলেন : কিশমিশগুলো ভালো করে ধোয়া হয়নি, দেখছেন বোঁটাগুলো রয়ে গেছে আর পেঁপেটা যেন বড্ড বেশী পাকা, গলে যাচ্ছে।

পেটরোগা চারুবাবু চিরকালই অতি সাবধানী। কিন্তু তাই বলে নীতিশ তো নয়, মনোরঞ্জনও নয়। তারা তৎক্ষণাৎ চারুবাবুর প্লেট ভারমুক্ত করে দিল। নীতিশ বললো : চারুদা, নবাবী খানা এলে আপনি এসে আমার টেবিলে বসবেন কিন্তু।

ননী বাধা দিল : যা, যা। আমার রুম-মেট ভাগাতে আসিস নে। পাশাপাশি রাত্রে শুতে হবে। তোকে দান করলে চারুবাবুকে আর ঘরে ফিরে যেতে হবে না।

কুস্তিগীর ভোলাবাবু জবাব দিলেন : তাহলে বদলী যাবো আমি। কায়েৎ-টুলীতে তোকে আমিও চিৎ করেছি বহুবার, তা ভুলিস্নি তো ননী ?

পরিমল বললো : তা এখানেই হয়ে যাক না একবার। নবাবী খানার জন্য পাকস্থলীর জায়গা বেড়ে যাবে'খন।

সত্যবাবু ঘুরে ঘুরে সবার টেবিলে তদারক করে বেড়াচ্ছিলেন। বোধহয় পরিমলের কথাটা কানে গেছে : প্রায় বক্তৃতা দেবার ভঙ্গীতে আশ্বাস-বাণী উচ্চারণ করলেন : সত্যিই নবাবী খানা ! যে বাবুর্চি রাঁধছে, তার ঠাকুরদাদার বাবা কিংবা তার বাবা ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার খাস বাবুর্চি। অফিসের

কাছাকাছি আমি ঘুরে এসেছি। একেবারে মুর্শিদাবাদী খোশবায়। এই এসে পড়লো বলে। আপনারা আর একটু ধৈর্য্য ধরুন।—ওহে, একখানা নতুন গৎ ধরো না, দীনেশ।—বলে অর্কেষ্ট্রা দলের নেতা দীনেশ দাসকে উসকে দেবার চেষ্টা করলেন।

একখানা কেন, নতুন ও পুরানো অনেকগুলো গৎ বাজানো হলো এবং ঘড়িব কাঁটাও এসে ঠেকলো পুরোপুরি ন'টায়। কোথায় নবাবী খানা! সবাই অধীর ছিলেন, এবার অতিষ্ঠ হয়ে ওঠবার উপক্রম দেখা গেল। মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল এ-টেবিলে ও-টেবিলে। দু'একটা টেবিল খালি করে নিমন্ত্রিতেরা উঠে গেলেন। বাদক দলেব ফরাশও খানিকটা খালি বোধ হলো। বেগতিক দেখে একটা কোণের টেবিল থেকে পুরো ছ'ফুট দীর্ঘ করালী বিশ্বাস দণ্ডায়মান হয়ে বক্তৃতা সুরু করলেন: বন্ধুগণ, ম্যানেজার আমায় কিছু বলবার অনুরোধ না জানালেও কর্ত্তব্য পালনেব তাগিদে আমি দাঁড়িয়েছি। আপনারা যে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন, তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবং তার যে যথেষ্ট যুক্তিও আছে, তাও অস্বীকার কববার উপায় নেই। আর ঘণ্টাখানেক পরই টবিনের বিউগল বেজে উঠবে আমাদের বুকে হাতুড়ি মেরে। নবাব সিরাজ কেন, তাঁর ঠাকুর্দ্দা আলীবর্দ্দী কবর থেকে উঠে এসে অনুবোধ জানালেও বৃটিশসিংহের প্রালিত পুত্র টবিন সাহেবের হুকুম টলবে না, তাও আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে জানি। কিন্তু বন্ধুগণ, এই ব্যাপারের জন্য ম্যানেজার কি করতে পারেন, তাই বলুন আপনারা? অফিসের গেটের কাছাকাছি তিনি চীৎকার করতে পারেন মাত্র, কিন্তু বাবুর্চ্চির দাড়ি ধরে টেনে দেবার সুযোগ তাঁর কোথায়? সেই পাকশালায় তাঁর প্রবেশাধিকার আছে কি? অতএব, বন্ধুগণ—

অকস্মাৎ একটি কণ্ঠ শোনা গেল: কিন্তু ম্যানেজারের ক্যানভাস করে কি মাংসের মাত্রা কিছু বেশী পাওয়া যাবে, করালীবাবু?

করালীবাবু জবাব দিলেন: নিস্বার্থভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেয়াই আমার কাজ। তা থেকে আপনারা নিজেদের খুশীমত উপসংহার টেনে নিতে পারেন। নবাবী খানা এসে পৌঁছোবার এই যে অযৌক্তিক বিলম্ব, এই যে আমাদের সীমাহীন প্রতীক্ষা—

কিন্তু অকস্মাৎ দরজার দিকে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল এবং পরক্ষণেই মিছিল করে চাকর রাঁধুনীর দল এসে প্রবেশ করলো। সবার হাতেই পোলাউয়ের

ডেকচি কিংবা মাংসের বালতি। নবাবী খানা এসে গেছে! সেই খাদ্যবাহী মিছিলকে নিমন্ত্রিতেরা কলস্বরে এমনিভাবে অভ্যর্থনা জানালেন যে, করালী বিশ্বাস বক্তৃতার মধ্যপথেই আসন গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। মিছিলের শেষে প্রবেশ করলেন স্বয়ং কিচেন ম্যানেজার সত্যবাবু, চোখেমুখে বিজয়ীর আত্মপ্রসাদ ঝক্ ঝক্ করছে!

দশখানা হাত বার করে তিনি মুহূর্তের মধ্যে দু'রকম পোলাউ প্লেটে সাজিয়ে দিলেন টেবিলে টেবিলে। সুবাসে পাগল হয়ে অর্কেষ্ট্রা দল একযোগে ফরাশ ত্যাগ করে টেবিল দখল করে বসে গেছেন। সবে নামানো হয়েছে, অত্যন্ত গরম। ওদিকে ঘড়ির কাঁটা সাড়ে ন'টায় এসে ঠেকেছে।

বোধহয় মনোরঞ্জনই সবার আগে জিভে ঠেকিয়েই চীৎকার করে উঠলো: ও ব্বাবা, এ কি নবাবী খানা রে! এ যে দেখছি মিষ্টি একেবারে সীতাভোগের মতো। আব এই-বা কি রকম ঝাল পোলাউ? নুণ নেই, মসলা নেই, ঝাল নেই, একেবারে হাইড্রোজেনের মতো tasteless, odourless—

রবি লাহিড়ীর কণ্ঠ শোনা গেল: আর খাসীর মাংস? এ কি রে ভাই, এ যে গলে একেবারে জুস্ হয়ে গেছে। আর এ কি ঝোল, না ঘি আর তেলের সুরুয়া?

অপর টেবিল থেকে, মতি সিং একখানা ঠ্যাং হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল: আব এখানা? এই হাত খানেক লম্বা হাড়খানা খাসীর, না কোন কচি বাছুরের, যে বাছুর এখনো ঘাস খেতে শেখেনি, একেবারে ফুলের মতো পবিত্র

শিবদাস লাহিড়ী বাধা দিল: থাম্ মতি, থাম্, আর ব্যাখ্যা করতে হবে না।

বিমল চক্রবর্ত্তী বললো: কেন, এতে তো দোষ নেই? শাস্ত্রে আছে হরিণ, কাছিম, আর একুশ দিন যার বয়স হয়নি, এমনি কচি বাছুর বিধবারাও খেতে পারেন।

একেবারে হাসিব হুল্লোড় পড়ে গেল।

ভোলা বসাক প্লেট ঠেলে রেখে বলে উঠলেন: না দ্বিজেনবাবু, এ নবাবী খানা আমার পোষাবে না। ও সত্যবাবু, সত্যবাবু কোথায়? আরে মশাই, ওবেলার খবসোলা মাছের ঝোল আর হাঁড়ির তলার এক মুঠো ভাত হবে কি?

কিন্তু কোথায় সত্যবাবু? প্রায় পাঁচশো টাকা ব্যয় করে যে নবাবী খানার

ব্যবস্থা করা হলো, তা যে এমনি হবে, কি করে জানবেন তিনি? তাই বুদ্ধিমানের মতো চাকরদের ওপর ভার দিয়ে তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছেন।

সত্যিই, পোলাউ আর মাংসের অদ্ভুত স্বাদ। পূর্ব্বেই বলেছি, বন্দীদের মধ্যে প্রায় সবাই পূর্ব্ব অথবা উত্তরবঙ্গের। উত্তরবঙ্গের কোথাও কোথাও মিষ্টি দিয়ে রাঁধবার রীতি প্রচলিত থাকলেও পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মসলা হলো ঝাল—শুকনো লঙ্কা হোক্, কাঁচা লঙ্কা হোক্, গোলমরিচ হোক্, আদা হোক্, নইলে নিদেনপক্ষে সরষে হোক্—ঝাল তাদের চাই-ই এবং প্রচুর পরিমাণে চাই। কিন্তু এ কি খাদ্য? মিষ্টি পোলাউ আর মাংসের কোর্ম্মার কথা ছেড়ে দিলেও ঝাল পোলাউ আর মাংসের ঝোলে আর যা-ই থাক, এতটুকুও ঝাল নেই।

সুতরাং একে একে সবাই উঠে পড়লেন। ননী মন্তব্য করলো: শালা বাবুর্চ্চি এখনো বোধহয় অফিসে আছে। যাবেন চারুবাবু ব্যাটার দাড়িটা ছিঁড়ে দিয়ে আসতে?

চারুবাবু এই সব দুষ্পাচ্য খাদ্য একেবারে স্পর্শ করেননি। ঘ্রাণেই নাকি তাঁর বমি বমি করছে। বললেন: ফল যা খেয়েছি, তাতেই আমার হয়ে গেছে। ও সব অখাদ্য আমি খাইওনি, তাই বাবুর্চ্চির দাড়ি ছেঁড়বার উৎসাহও আমার নেই।

দেখতে দেখতে সবগুলো টেবিল খালি হয়ে গেল। টেবিল ভর্ত্তি পড়ে রইলো সিরাজী খানা,—মিষ্টি পোলাউ, ঝাল পোলাউ, মিষ্টি মাংস আর ঝাল মাংস। বাবুর্চ্চিদের উদ্দেশ্যে চোখা চোখা গালি বর্ষণ করে সবাই গায়ের ঝাল মেটাতে লাগলেন।

সবার শেষে হল্ থেকে বেরিয়ে আসবার সময় দেখলাম, বাগ্মী করালী বিশ্বাস খালি টেবিল-চেয়ারের উদ্দেশ্যে অথবা স্তূপীকৃত খাদ্যের উদ্দেশ্যে তখনো ওজস্বিনী ভাষায় এক্সটেম্পোর চালাচ্ছেন: নবাবী খানা আপনাদের মনোরঞ্জন করতে পারলো না। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হলো যে, নবাবী আমল শেষ হয়ে গেছে। পলাশীর রণক্ষেত্রে স্বাধীনতা-সূর্য্য ডুবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নবাবী সভ্যতা ও আচারব্যবহারও বাংলা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আপনাদের আত্মত্যাগ, আপনাদের সর্ব্বাত্মক সংগ্রাম ও আপনাদের রক্তদানের ফলে সেই স্বাধীনতা-সূর্য্য ভারতের গগনে আবার উদিত হলেও সেই নবাবী আমল আর ফিরে আসবে না। কারণ আপনাদের সে প্রস্তুতি কোথায়? এই যে মিঠে-

পোলাউ, এই যে খাসীর লম্বা ঠ্যাং দাদু আলীবর্দী যা নাতি সিরাজকে হাতে করে খাইয়ে দিতেন—

এমন সময় শিবির প্রতিধ্বনিত করে বেজে উঠলো বিউগল। দশটা বেজে গেছে। পনেরো মিনিট সময় আছে নিজেদের ঘরে ফিরে যাবার। কাজেই করালী বিশ্বাসের বক্তৃতা মধ্যপথে থেমে গেল। খালি টেবিল-চেয়ারগুলোকেই বোধহয় অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে করালীবাবু বেরিয়ে এলেন। বাইরে এসে বললেন : চারু জোয়ারদারের কাছে বোধহয় দিনাজপুরের কাটারীভোগের চিড়ে আছে। যাই, এক মুঠ নিয়ে যাই। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, দ্বিজেনবাবু!

চোদ্দ

রাজবন্দীদের খাদ্যের জন্য গভর্ণমেণ্টের গৌরী সেনী ব্যবস্থার পশ্চাতে আছে তাঁদের সুস্পষ্ট একটি কূটনীতি, বাইরের লোক তার সংবাদ রাখেন কি না জানিনে। সরকারী বরাদ্দ অর্থে আমাদের কায়ক্লেশে সংকুলান হয়, এটা প্রমাণিত করবার জন্য কিচেন ম্যানেজার সর্ব্বদাই চেষ্টা করতেন দৈনন্দিন বরাদ্দ অর্থের সবটাই ব্যয়ের। কিন্তু তা হতো না। তাই মাসের শেষ দিকে feast হতো। ফলে অপব্যয় হতো প্রচুর আর সেই অপব্যয়ের সংবাদ যে যথাস্থানে যথাসময়ে পৌছোত, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ঢাকা জেলেই যে শুধু দিবাকর সেনগুপ্ত আছে, তা কি করে বলা যায়? এই বিরাট বন্দীশিবিরের বিশ্বে অমনি ক'জন দিবাকর যে আত্মগোপন করে রয়েছে এবং ইঁদুরের মতো কিভাবে যে তারা মাটির নীচে দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে চোরাবালির সৃষ্টি করছে, কে তার সঠিক সংবাদ রাখে? গভর্ণমেণ্ট এখানকার মেঝেতে সূচ পড়বার শব্দও শুনতে পান।······

কিন্তু এর পরও আমাদের বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ হ্রাস করা হয় না কেন? প্রয়োজনাতীত অর্থ ব্যয় করে গভর্ণমেণ্ট তাঁদের মারাত্মক শত্রুদের পোষেন কেন? কারণ, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য আমাদের আরামপ্রিয় ও ভোজনপ্রিয় করে তোলা। থালাপূর্ণ দামী খাদ্য না হলে যদি আমাদের মন খারাপ হয়, তাহলে কাজে আমাদের উৎসাহ ও আগ্রহ কমে আসবে, গভর্ণমেণ্টের তাই

বিশ্বাস। এই সহজ লজিকের ওপর নির্ভর করেই আমাদের রাজসিক খাদ্য ও নবাবী খানার সুযোগ দেয়া হয়। সরকারী অভীষ্ট খানিকটে সিদ্ধ হয় বৈ কি ?……

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গভর্ণমেণ্টের এই নীতি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। অর্থ ব্যয় না করলে বরাদ্দ হ্রাস পাবে, আবার ব্যয় করলেও অলস হয়ে পড়বার আশঙ্কা আছে, এই উভয় সংকটকে অপরে ভয় করে চললেও আমরা করিনি। ডায়লেমার দু'টি তীক্ষ্ণ ও উন্মুক্ত হর্ণ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে আমরা সাহসী বুলফাইটারের মতো দু'হাতে ধরে ফেলেছি তার দু'টি শিং এবং মোচড় দিয়ে দিয়েছি ভেঙ্গে বৃষপুঙ্গবের স্কন্ধ !…যেমন পেটুকের মতো খেতাম আমরা, তেমনি ব্যায়ামও করতাম কয়েক ঘণ্টা নিয়মিতভাবে। ঢাকার ছেলেরা ছিল কুস্তিতে ওস্তাদ, বরিশালের ছেলেরা ছিল প্যারালাল বারে আর কুমিল্লার ছেলেরা ছিল ভারোত্তোলনে। কোনোটাতেই প্রথম স্থান অধিকার না করলেও সবটাতেই ছিলাম আমি।

ঢাকা জেলের পুরানো বন্ধুরা এসে পড়বার পর কুস্তির আখড়া বেশ ভালো ভাবে সরগরম হয়ে উঠলো। ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের পশ্চাৎভাগে তৈরী হলো মাটি, তাতে ঢালা হলো আধ মণ সরষের তেল। সবার দেখাদেখি ল্যাঙ্গট এঁটে আমিও নেমে গেলাম। কামাখ্যাদা'র সঙ্গে প্রথম দিনের লড়াইতেই এতখানি শ্রান্ত হয়ে পড়লাম যে, সাত রাউণ্ড কুস্তির পর আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলাম।

প্রথম দিনের টেনিস খেলার কথাও মনে পড়ে। র‍্যাকেটখানা বেশী বড় ও ভারী মনে হচ্ছিল ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেটের তুলনায়। রবারের বলটাও বড্ড জোরে ছুটে আসে জালের ওপর দিয়ে। শাটল্ ককের মতো হাওয়ায় আদৌ আটকায় না। ফিরিয়ে দিতে হলেও প্রয়োজন প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত, ব্যাডমিণ্টনের মতো ঠুকুস-ঠাকুস অচল।

অতএব, প্রথম বলটাই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এত জোরে হাঁকিয়ে দিলাম যে, ক্রিকেট খেলার নিয়ম অনুযায়ী সেটা ওভার বাউণ্ডারী আউট হয়ে গেল আর র‍্যাকেটখানা খটাস্ করে এসে ঘা মারলো আমারই কপালে। চশমার ব্রিজ গেল দু'টুকরো হয়ে ভেঙ্গে আর কপাল থেঁতলে রক্ত দেখা দিল। তারপর ডাক্তার…বেনজিন লীন্ !

প্যারালাল বার ব্যায়ামের ওস্তাদ অজিত দাস, মধুসূদন দত্ত, সুধীর দাস প্রভৃতি। সবাই বরিশালের। সেখানে আমি যোগদান করলাম। রাইজিং থেকে সুরু করে অনেকখানিই ফেললাম শিখে, শুধু পিকক্ কিছুতেই হতে পারলাম না শত চেষ্টা করেও।

কিন্তু ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন আর ক্যারম খেলায় আমি প্রায় অদ্বিতীয় হয়ে উঠলাম। ফুটবলে আমার কৃতিত্ব আমি যেকোন পজিশনে চমৎকার খেলতে পারি। দু'টো পা যেমন চলে, তেমনি আমার মাথাও। চশমাতে আমার পাওয়ার বেশ। তাই খুলে নিয়ে খেলি। তথাপি গোলকিপার কোন দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে চকিতে দেখে নিয়ে ঠুক করে মাথা দিয়ে বলটি আস্তে অপর দিক দিয়ে গোলে ঢুকিয়ে দেবাব ব্যাপারে আমার দোসর নেই। আব সাংঘাতিক বেগমান আমার শট্। পেনাল্টি হলে কোনো কৌশলের আশ্রয় না নিয়েই সোজা শট্ মারি আমি, গোলকিপার তা প্রতিহত করবার জন্য আদৌ চেষ্টাই করে না। ভেটারেন গোলকিপার কুশাবাবু তো একবার স্পষ্টই বললেন : দ্বিজেনবাবুর কিক্ থামাতে গিয়ে কি হাতখানা খোয়াবো ?

ভলিবলে আমার যোগ্যতম স্থান নেটে নয়, দ্বিতীয় সারির মধ্যস্থানটি। ফুটবলের সেণ্টারহাফের মতো। একেবারে কেন্দ্রস্থল। দায়িত্ব সীমাহীন। বল শুধু ফিরিয়ে দিলেই হবে না, নিয়ন্ত্রিত আঘাতে ওটি জালের ঠিক ওপরে এমনিভাবে তুলে দিতে হবে যাতে সেণ্টার খেলোয়াড় অনায়াসে তা হয় রসগোল্লাটির মতো টুক্ করে প্রতিপক্ষের দিকের ফাঁকা জায়গাটি দেখে ছেড়ে দেবে কিংবা চাপ মেরে একেবারে রাইফেলের বুলেটের মতো উড়িয়ে দেবে। আরো মজার ব্যাপার এই যে, আমি বল মারি দু'হাত জড়ো করে নয়, প্রায়ই এক হাতে। ফলে, আমার ক্ষিপ্রতা সবার চাইতে বেশী!

ব্যাডমিণ্টনে আমার স্ক্রু মারা বা প্লেসিং ছিল অননুকরণীয়। গায়ের জোরে চাপ মারার চাইতে স্ক্রুও প্লেসিংএর দ্বারা যে কত বিজ্ঞানসম্মত খেলা দেখানো যায় হৈ হৈ ও ছুটোছুটি না করে, আমি তা দেখিয়ে দিলাম।

ক্যারম এতই ভালো খেলতাম যে, সারা শিবিরে আমরা ছিলাম চার জন, যাদের খেলা দেখবার জন্য ভিড় পড়ে যেত। শিবদাস লাহিড়ী, নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, দেবেশপ্রসাদ চৌধুরী ও আমি। বিজ্ঞানের চরম প্রমাণিত হতো আমাদের প্রত্যেকটি মারে। শুধু ঝড়ের মতো আঘাত দেয়া নয় এবং তার ফলে

কোথাও একটি ঘুঁটি অপ্রত্যাশিতভাবে পকেট হয়ে যাওয়া নিয়ে আত্মপ্রশংসা নয়, প্রত্যেকটি মারের পূর্ব্বে তার ফলাফল কি নিশ্চয়ই হবে আর কি-কি হবার প্রচুর সম্ভাবনা আর কি হয়তো হতে পারে, দর্শকের সমক্ষে তা বিবৃত করে আমরা ষ্ট্রাইকার ছেড়ে দিই।

শুধু ব্যায়াম আর খেলাধূলা নয়। শিবিরে আসবার পরেই জানাজানি হয়ে গেছে যে, ১৯২৮ সালের ভারতীয় জাতীয় মহাসভার কলকাতার অধিবেশনে যে বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে, তারই 'বি' কোম্পানীর অন্যতম সার্জেন্ট ছিলাম আমি।

১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের সময়ের একটি ঘটনার কথা এখানে বিবৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পার্ক সার্কাস ময়দানে হয়েছিল অধিবেশন। সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি জে, এম, সেনগুপ্ত। ভলান্টিয়ার বাহিনীর জি-ও-সি সুভাষচন্দ্র বসু। ময়দানের কাছাকাছি প্রাচীর-ঘেরা একটি স্থানে দক্ষিণ কলকাতার 'বি' কোম্পানীর তাঁবু পড়লো। কোম্পানীর নায়ক মেজর সত্য গুপ্ত। একই তাঁবুতে মেজর গুপ্ত, কোয়ার্টার মাষ্টার বিনয় রায়, আরও দু-একজন অফিসার ও আমি ছিলাম।

যানবাহন নিয়ন্ত্রণ থেকে সুরু করে সারাটা দিন নানারকম ডিউটিতে কেটে যেত। আবার এক-একদিন 'বি' কোম্পানীর থাকতো রিজার্ভ ডিউটি। অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কোনো ডিউটি নেই অথচ প্রস্তুত থাকতে হবে সর্ব্বক্ষণ কোনোরূপ ইমার্জ্জেন্ট ডিউটির জন্য। যদি ডাক আসে, তৎক্ষণাৎ ছুটতে হবে, নইলে ছুটি।

প্রথম সন্ধ্যাতেই একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। অন্যান্য কোম্পানী পার্ক সার্কাস হেড কোয়ার্টার্সে আসবার পর সামরিক ইউনিফরম পেয়েছে, ব্যতিক্রম শুধু 'বি' কোম্পানীর বেলায়। দক্ষিণ কলকাতার ১-সি রসা রোডে মেজর গুপ্তের বাড়ীতেই আমরা ইউনিফরম পেয়েছি এবং তাই সেখান থেকে মার্চ্চ করে আমরা যখন পার্ক সার্কাস এসে পৌঁছোলাম, তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে।

কিচেন ম্যানেজার সুরেশ দাস মেজর গুপ্তকে বললেন: এই চড়া ভাত নামলেই আপনার ছেলেদের বসিয়ে দিন। ওরা এতখানি পথ হেঁটে এসেছে।

একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর ঘরের ভেতর ও বারান্দায় পাতা পড়েছে এবং সত্যদা' যখন এসে সুরেশবাবুর আশ্বাসবাণী ঘোষণা করলেন, তখন অন্যান্য কোম্পানীর

অনেকেই পাতা দখল করে বসে গেছে। অথচ আমাদেব অধিকাংশ ছেলেই স্থান পায়নি।

সত্যদা' আবার ছুটলেন সুরেশবাবুর কাছে। এবাব সুরেশবাবু নিজেই এলেন এবং সবাইকে শুনিয়ে স্পষ্ট ঘোষণা করলেন যে, পুরো বাবান্দাটা 'বি' কোম্পানীর জন্য রিজার্ভ করা আছে এবং সবার আগে তাদেরই খাবাব দেবা হবে। কারণ তারা এসেছে মার্চ করে সেই দক্ষিণ কলকাতা থেকে। অন্যান্য সবাই বাস-এ।

যারা পাতা দখল করে বসেছিল, তাদেব মধ্যে কিন্তু কোনও চাঞ্চল্য দেখা গেল না। সত্যদা' হুকুম দিলেন : বাইরেব সবাইকে তুলে দাও।

আমরা কজন চেষ্টা করলাম, ফল হলো না। বাস-এ আসা আর হেঁটে আসা যে অনেকখানি তফাৎ, তা বুঝতে চাইলো না কেউ। অবশেষে যখন কিচেন ম্যানেজারের নির্দেশের পুনরুক্তি করলাম, তখন তারা রীতিমত কড়া মন্তব্য করলো : ম্যানেজাবের পক্ষপাতিত্ব মেনে নিতে আমরা বাধ্য নই।

সুতরাং এবার এগিয়ে এলেন মেজর গুপ্ত। এক-একজনের সম্মুখে যাচ্ছেন আর জিজ্ঞেস করছেন : Which Company do you belong to? A? C? D?—Please vacate the seat, it is reserved for B Company boys—get up, get up please—

প্লীজ করবাব জন্য সত্যদা' যতই নরম ভাষা ও মোলায়েম সুব প্রযোগ করুন না কেন, দখলকারীদের মধ্যে প্রথমটা তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। ওরা কেউ কেউ একটু নড়েচড়ে বসলো মাত্র, জনকতক এদিক থেকে উঠে গিয়ে আবার অন্যদিকে বসে পড়লো। এবার আমরাও যোগ দিলাম সত্যদা'র সঙ্গে। বিভিন্ন কণ্ঠে অনুরোধের সুরটা যেন এবার একটু বেসুরো হয়ে উঠলো, কেউ কেউ এটা যে প্লীজ করবার মিনতি, সেটা ভুলে গিয়ে প্রায় আদেশের কণ্ঠই প্রয়োগ করতে লাগলো।

এবার পিল পিল করে নেমে গেল সবাই বারান্দা থেকে। কিন্তু নীচেই দাঁড়িয়ে রইলো। ইতিমধ্যে গরম গরম ভাত এসে গেছে। ডাল, তরকারি ও মাছ তো আগে থেকেই আছে। হাতা, পত্তি ও চামচে নিয়ে আমরা ষ্টোরে প্রবেশ করলাম।

পরিবেশনের পাত্রগুলোতে ঢালাঢালি করে আমরা সবে গোছগাছ করে

নিচ্ছি, এমন সময় বারান্দার নীচে থেকে কার কণ্ঠ শোনা গেল : এমনি selfish তো আর দেখিনি, সবাইকে তুলে দিয়ে নিজেদের পেট ভরাতে বসে গেল ?

কান খাড়া করলাম।

আবার কে যেন মন্তব্য করলো : জানিসনে, 'বি' কোম্পানী যে পোষ্যপুত্তুর তার পেট আগে ভরাতে হবে না ?

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ : ঝাঁটা মারি তোর পোষ্যপুত্তুরকে ! এমনি partiality আমরা বরদাস্ত করবো না। কেন, আমরা ভলান্টিয়ার নই ? অমনি মেজর অনেক দেখেছি।

থমকে দাঁড়ালাম। গোছগাছ বন্ধ হয়ে গেল। যারা পাতা পেতে বসেছিল, তাদের চাঞ্চল্যও অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

বাইরে থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল। জনকয়েকের মিলিত হাসি। তারপর কে যেন বলে উঠলো : তোরা উঠে এলি কেন ? কেন নেমে এলি সুড় সুড় করে ?

আর-একজন বললো : বসে থাকলেই পারতিস, দেখতাম কেমন মেজর সাহেবের ক্ষ্যামতা !

আবার মিলিত হাসি। একজন বিদ্রূপ করলো : মেজর সাহেব ! কলকাতা শহরে অমনি মেজর কর্পোরেশনের ডাষ্টবিনে পাওয়া যায়। আবার সমবেত বিদ্রূপাত্মক হাসি।

বারান্দায় বেরিয়ে এলাম হাতা খন্তি হাতেই। সত্যদা' লম্বা বারান্দার অপর প্রান্তে ছেলেদের ভালো করে বসিয়ে দেবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। নিশ্চয়ই এদের মন্তব্য ও হাসি শুনতে পাননি। আমাদের হাতা খন্তি দেখতে পেয়ে ছুটে এলেন : এ কি, তোমরা যে দাঁড়িয়ে রয়েছ ? খাবার distribute সুরু করে দাও—

নীচের ওরা তাঁকে দেখতে পেয়ে এবার সোজাসুজি সত্যদা'কে উদ্দেশ করেই বলে বসলো : দেখ সত্য গুপ্ত, এটা ঢাকা শহর নয়, কলকাতা। ঐ ঢাকার মাতব্বরি এখানে চলবে না—

থমকে দাঁড়ালেন মেজর গুপ্ত। আমরা তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতেই হুকুম করলেন : I say hoot them out !

ব্যস, আর যায় কোথা ! আমরা এই হুকুমেরই প্রতীক্ষা করছিলাম। হাতা ও খন্তি হাতিয়ারের মতো উঁচিয়ে ধরে মুহূর্তে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওদের ওপর। চললো হাতিয়ার এলোপাথারি। .....

কার কোথায় আঘাত লেগেছিল জানিনা। পরে শুনেছিলাম জন সাতেক জখম হয়েছে।

প্রথম দিনেব এই অপ্রীতিকর ঘটনায় আমরা যে একেবারেই দুঃখিত হলাম না, তা নয়। কিন্তু সত্যদা'কে আদৌ বিচলিত দেখা গেল না। সামরিক বাহিনীর রীতি-নীতি সম্বন্ধে কংগ্রেস শিবিবে যোগদানের পূর্ব্বে দক্ষিণ কলকাতার দৈনন্দিন কুচকাওয়াজের সময় যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে মনে হচ্ছিল, জি ও-সি সুভাষচন্দ্র এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হবেন এবং হয়তো অন্ততঃ ভৎর্সনা করবার জন্য মেজরকে ডেকে পাঠাবেন হেড কোয়ার্টার্সে।

ডেকে পাঠালেন সত্যি। ভৎর্সনা করবাব জন্যই হয়তো ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কারণ অন্যান্য কোম্পানীব ভলান্টিয়ারবা একটি বিবাট বাহিনীরই অন্তর্ভুক্ত 'বি' কোম্পানীর মতো। অন্যায়ভাবে যদি তাবা খাবার আসন দখল কবে বসেছিল, তাহলে সেটা জানানো উচিত ছিল উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে। নিজেব হাতেই আইন নিয়ে ওদের ওপব চড়াও হওয়া গর্হিত কাজ হয়েছে। আবাব, সত্যদা'কেও শুধু কর্ম্মে নয়, মর্ম্মে মর্ম্মে চিনি। একখণ্ড ইস্পাত! ট্যাম্পার্ড ষ্টীল। সামান্যতম আঘাতেও তাঁতে ঠুক্ কবে নয়, ঠন্ করে আওয়াজ শোনা যায়। যাকে অন্যায় বলে মনে হবে, এই ইস্পাতের ছুরি তা দু'ফাঁক করে কেটে ফেলবে।—না শুধু দু'ফাঁক নয়। কুচি কুচি কবে কেটে টুকবো টুকবো কাগজের মতো বাতাসে উড়িয়ে দেবে।

তাই শঙ্কিতমনে অপেক্ষা করছিলাম শিবিরে। জি-ও-সির সঙ্গে হয়তো ঝগড়া করেই ফিরে আসবেন মেজর সত্য গুপ্ত। এলেনও অনেকক্ষণ পর গভীর রাত্রে।

কিন্তু জানতে পেরে নিশ্চিন্ত হলাম যে, ভৎর্সনা করতে গিয়ে জি-ও-সি মেজরকে বন্ধু করে ফেলেছেন।

বোধহয় ইস্পাতের সন্ধান পেয়ে গেছেন সুভাষচন্দ্র!

কিন্তু কংগ্রেসের, যতদূর মনে পড়ে, তৃতীয় দিনের অধিবেশনে সন্ধ্যার দিকে একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেল।

'বি' কোম্পানীর সেদিন রিজার্ভ ডিউটি। তাই আমরা সভামণ্ডপের অভ্যন্তরে প্রধান রাস্তার দু'পাশে সার বেঁধে বসেছিলাম মুফতি-তে অর্থাৎ সাদা

পোষাকে। মেজর গুপ্তও ঘোরাঘুরি করছিলেন সাদা পোষাকে। আমি বসেছিলাম সভামঞ্চের নীচেই। সভামঞ্চের ওপর মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল নেহেরু, সর্দ্দার প্যাটেল প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে জি-ও-সি সুভাষচন্দ্রও বসেছিলেন সাদা পোষাকে। সেদিনই তিনি তাঁর সেই অবিস্মরণীয় প্রস্তাব উত্থাপন করবেন, যাতে বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের আলটিমেটাম দেবার কথা ছিল এবং বলা হয়েছিল যে, বৃটিশ গভর্ণমেন্ট নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ দেশ ত্যাগ করে চলে না গেলে দেশে প্যারালাল গভর্ণমেন্ট স্থাপন করে আরও জোরদার আন্দোলন চালানো হবে।

হঠাৎ দেখলাম, অভ্যর্থনা সমিতির জনৈক অ-বাঙালী মহিলা সদস্য তাঁদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করে একেবারে মঞ্চের সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং হাত নেড়ে ক্রুদ্ধ স্বরে কাকে উদ্দেশ করে কি বলছেন। তখন বক্তৃতা করছেন জওহরলাল।

জি-ও-সি উঠলেন। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন কাগজ-পত্র-ফাইল হাতে নিয়েই। দেখলাম, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসেছেন এ-আই-সি-সির সদস্য আমাদের বড়দা' হেমচন্দ্র ঘোষ। আমিও একটু এগিয়ে গেলাম।

সুভাষচন্দ্র বড়দা'কে বললেন: আপনি একবারটি যান তো, মেডিক্যাল ভলান্টিয়ারদের গিয়ে বলুন যে, মহিলাদের এলাকায় লেডি ভলান্টিয়াররাই থাকবে। ফার্ষ্ট এড যদি দরকার হয়, তাহলে তাদেরকে খবর দেয়া হবে। ওদিকে তাঁরা যেন ঘোরাঘুরি না করেন।—দেখছেন তো, এই মহিলাটি exception নিয়েছেন।

মহিলাটি সুভাষচন্দ্রের আশ্বাস পেয়ে বড়দা'র পশ্চাতে চলে গেলেন। আমি এসে আবার নিজের স্থানটিতে নীরবে বসে পড়লাম। দূরে দেখলাম, সত্যদা' মণ্ডপে প্রবেশ করে এদিকেই আসছেন।

মিনিট দশেক পরেই অকস্মাৎ দেখলাম, চোখমুখ রক্তবর্ণ করে ত্রস্তপদে ফিরে আসছেন বড়দা'। সিঁড়ির নীচে আসতেই আবার ত্রস্তপদে নেমে এলেন সুভাষচন্দ্র। ইতিমধ্যে সত্যদা'ও প্রায় এসে পড়েছেন। আমিও উৎকর্ণ হলাম।

বড়দা' বললেন: আপনার কোনো নির্দ্দেশই মেডিক্যাল ভলান্টিয়াররা শুনতে রাজী নয়। তারা বলছে, আমরা সব জায়গায় যাব। মেয়েদের এলাকায় যেতে না-দেবার আদেশ আমরা মানবো না।

এমনি কথা! বলে উঠলেন সুভাষচন্দ্র: ওদের মেজর কোথায়?

শুধু কি তাই ? বললেন বড়দা': আপনার নির্দেশ জানাতে গিয়ে আমি insulted হয়েছি।

Insulted ! সম্মুখে এগিয়ে গেলেন সত্যদা': কে insult করেছে ? কোথায় সে ?

দেখলাম সত্যদা'ও যেমন ক্রোধে কাঁপছেন, তেমনি কাঁপছেন বড়দা'। বড়দা' সত্যদা'কে দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন: সত্য, মেডিকাল ভলান্টিয়াররা আমায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে—

ধাক্কা দিয়েছে ! ফেলে দিয়েছে ! those scoundrels ! গর্জ্জন করে উঠলেন সত্যদা'।

তারপরের পনেরো মিনিট বোধহয় পনেরো সেকেণ্ডেই শেষ হয়ে গেল। 'বি' কোম্পানীর রিজার্ভ বাহিনী মণ্ডপ ত্যাগ করে বাইরে চলে এল। শিবিরে সংবাদ চলে গেল। সেখানে কোয়ার্টার মাষ্টার বিনয় রায় ম্যাগাজিন খুলে দিলেন, সবাই লাঠি তুলে নিল। শিবিরের বাইরে রাস্তায় ফল্-ইন। সংবাদ এল, মেডিক্যাল ভলান্টিয়াররাও রেডি হয়ে অপেক্ষা করছে তাদের হেড কোয়ার্টার্সের সন্নিকটে শিবির হাসপাতালে। সুতরাং—

সুতরাং এগিয়ে চললো 'বি' কোম্পানী মার্চ্চ করে। সম্মুখে অধিনায়ক মেজর সত্য গুপ্ত আর পেছনে আমরা চারজন সার্জ্জেণ্ট। মণ্ডপের পাশের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় লাউডস্পীকারে শোনা যাচ্ছে তখন সুভাষচন্দ্রের ভাষণ ··

তখন চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। রাস্তার আলোগুলি জ্বলে উঠছে। আমরা এগিয়ে চলেছি মেডিক্যাল ভলান্টিয়ারদের মোকাবিলা করবার জন্য।

শিবির হাসপাতালের সম্মুখে এসে বাহিনী হল্ট্ করলো। মেজরের হুকুম শোনা গেল: লেফ্‌ট্ টার্ণ—চার্জ্জ ! হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম শিবিরের অভ্যন্তরে। লাথি চললো, লাঠি চললো, চললো পেতলের পাঞ্চ। ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি, হল্লা ও চীৎকারে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটে গেল। তারপরই আবার শোনা গেল মেজরের হুকুম: সিজ এ্যাটাক্ ! ফল্-ইন ! রাইট টার্ণ ! কুইক-মার্চ্চ ! আবার মার্চ্চ করে চললো 'বি' কোম্পানী নিজেদের শিবিরাভিমুখে।

প্রাচীর-ঘেরা যে স্থানটিতে আমাদের শিবির পড়েছিল, তার প্রধান গেট-এ ক'জন ভলান্টিয়ার দাঁড়িয়ে গেল আর তাদের নায়ক নিযুক্ত হলেন সার্জ্জেণ্ট দেবেন বোস। সে যুগে ভবানীপুর অঞ্চলে দেবেনবাবুকে চিনতেন না, এমন

লোকই ছিল না। যেমন দীর্ঘায়ত স্বাস্থ্যসমুন্নত চেহারা, তেমনি বে হিসাবী সাহস। সে যুগে তিনি ঐ অঞ্চলে '.দবা গুণ্ডা' নামে বিখ্যাত ছিলেন। জনসাধারণেব শ্রদ্ধাভবে দেয়া নাম।

একই শিবিরে ছিলাম সত্যদা' ও আমি। তাঁব আদেশে শুধু শিবিবেব আলো নয়, শিবিরেব বাইরেকাব আলোগুলোও নিভিয়ে দেয়া হযেছে। সংবাদ পাওয়া গেছে যে, মেডিক্যাল ভলাণ্টিয়াবদেব বাবো চোদ্দজন আহত হয়েছে এবং এই অপমানের হাতে হাতে শোধ নেবাব জন্য তাবা মেডিক্যাল কলেজেও জকরী বার্তা পাঠিয়েছে। সেখান থেকে আরও লোক এসে গেলেই সদলবলে তারা 'বি' কোম্পানীব শিবির আক্রমণ করবে। অন্ধকার শিবিরে প্রস্তুত হয়ে বসে আমরা সেই আক্রমণেবই প্রতীক্ষা কবছিলাম।

অকস্মাৎ বাইরে খট্ কবে বুটেব আওয়াজ পাওয়া গেল। মেজর গুপ্ত বাইবে আসতেই সার্জেন্ট বোস স্যালুট করে বললেন যে, জি ও-সি ও এ্যাডজুটেন্ট প্রফুল্ল ভট্টাচার্য্য এসেছেন। গেট-এ তাঁদেব আটকে রাখা হয়েছে। মেজরের হুকুম ছাড়া আসতে দেয়া যাবে না।

মেজর অনুমতি দিলেন। আবাব খট্—স্যালুট—সার্জেন্ট খট খট কবে চলে গেলেন। আমবা অন্ধকার শিবিবে প্রবেশ কবলাম। ঐ অন্ধকারেই একজন ভলাণ্টিয়াব অন্যান্য শিবিবে সংবাদ দিয়ে এল, জি-ও-সি আসছেন।

একটু পরেই অকস্মাৎ বাইরে জলদগম্ভীব স্বরে আদেশ শোনা গেল: 'বি' কোম্পানী, ফল্-ইন।

কিন্তু এ তো মেজর সত্য গুপ্তের আদেশ নয়। সুতরাং একটি ভলাণ্টিয়ারও শিবিব ত্যাগ কবে বাইবে এল না।

সামরিক রীতি অনুযায়ী জি-ও-সি যদি কোনো কোম্পানীকে ফল্-ইন করাতে চান, তাহলে ঐ কোম্পানীর অধিনায়ক মেজরকে তিনি হুকুম করবেন আর মেজর তৎক্ষণাৎ সে হুকুম পালন করবেন। সামরিক রীতি-নীতি খুব ভালো করেই জানেন সুভাষচন্দ্র, কিন্তু বুঝতে পারলাম একটু আগের ঘটনাতে তিনি অত্যন্ত বিচলিত, তাই নিজেই অর্ডার দিয়ে বসেছেন। ভুল হলেও তা জি-ও-সির অর্ডার। তাই মেজর গুপ্ত তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলেন, সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে এবার তিনি নিজে উচ্চৈঃস্বরে আদেশ করলেন: 'বি' কোম্পানী, ফল্-ইন।

তৎক্ষণাৎ ফল্-ইন করলো 'বি' কোম্পানী, প্রতিটি অফিসার, প্রতিটি ভলান্টিয়ার জি-ও-সির সম্মুখে।

কোথাও কোনো আলো জ্বালা হয়নি তখনও। দূরে রাস্তার আলোর আভা এসে পড়েছে প্রাঙ্গণে, জি ও-সির মুখে, ভলান্টিয়াবদের হাতের দীর্ঘ লাঠিতে।

সুভাষচন্দ্রের গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল: আজ সন্ধ্যায় আপনারা একটি অন্যায় কাজ করেছেন।

ক্ষণেক নীরবতা। সুভাষচন্দ্র বললেন: আপনারা মেডিক্যাল ভলান্টিয়ারদের অফিস আক্রমণ করেছেন, বহু দামী দামী ওষুধ নষ্ট করেছেন, আপনাদের লাঠির আঘাতে চোদ্দজন মেডিক্যাল ভলান্টিয়ার আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজনের আঘাত গুরুতর। আপনারা ঘোবতর অন্যায় করেছেন।

নিশ্চয়ই অন্যায় করিনি—এক পা এগিয়ে গেলেন মেজর গুপ্ত: মহিলাদের সম্মান রক্ষা করে যারা চলতে জানে না, তাদের ওপর যারা হামলা করে, তাদের আমরা উচিত শিক্ষা দিয়েছি—

কিন্তু আপনারা হাসপাতাল আক্রমণ করছেন—

নিশ্চয়ই করেছি, কারণ অন্যায়কারীরা ঐ হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিল। জবাব দিলেন মেজব: আপনি যদি মনে করেন আপনার আদেশ লঙ্ঘন করা হয়েছে—I agree and I declare I am a rebel—

সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে গর্জ্জন করে উঠলো 'বি' কোম্পানীর প্রত্যেকটি জোয়ান: We are also rebels, we are also rebels—

স্তব্ধ হয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র। গৌরবর্ণ প্রশস্ত ললাটে কোনো রেখা ফুটে উঠেছিল কিনা, পুরু কাচের অন্তরালে আয়ত চক্ষুদুটিতে ক্ষোভের অগ্নিকণা চক চক করে উঠেছিল কিনা, স্তিমিত আলোর আভায় তা স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। কিন্তু বেশ বুঝতে পারলাম, একটি একটি করে সেকেণ্ড কেটে যাচ্ছে আর পরিস্থিতি মারাত্মক থেকে মারাত্মকতর হয়ে উঠছে। কিংবা হয়তো তা হচ্ছে না। চলিষ্ণু সময় থেমে গেছে। কালের ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। এখনই হয়তো সমস্ত বাতাস নিঃশেষ হয়ে যাবে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুভাষচন্দ্র।

অকস্মাৎ এগিয়ে এলেন প্রতুল ভট্টাচার্য্য। সত্যদা'কে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে অস্ফুটস্বরে যা বললেন, সবটাই স্পষ্ট শুনতে পেলাম: শোন্ সত্য,

কংগ্রেসের পর সুভাষবাবু সারা বাংলা দেশে স্থায়ী ভলান্টিয়ার বাহিনী তৈরী করবেন। তোর কথা আমি ওঁকে সব বলেছি। ওঁকে এখন বাধা দিসনে! ওঁর পরিকল্পনাটা তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে। প্লীজ—

ব্যস্, এতেই কাজ হয়ে এল। আবার এগিয়ে গেলেন মেজর গুপ্ত, জি-ও-সিকে সম্বোধন করে বললেন: স্যার, আমার কথা আমি withdraw করছি, যা ঘটেছে তার সমস্ত দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি and I surrender myself to you—

তৎক্ষণাৎ 'বি' কোম্পানীর জোয়ানদের কণ্ঠ প্রতিধ্বনি তুললো: We also surrender, we also surrender—

পাথরের মূর্তি এবার নড়ে উঠলো, মূর্তির প্রস্তরীভূত অধরে ভাষা ফুটলো। শোনা গেল আবার গম্ভীর স্বর: রেগুলার যুদ্ধেও কখনো হাসপাতালের ওপর আক্রমণ চালানো হয় না। বোম্বার বিমান রেডক্রশ আঁকা হসপিট্যাল শিপগুলিকে এড়িয়ে যায়। আপনারা হাসপাতাল আক্রমণ করেছেন and even some patients have been wounded! আপনারা অন্যায় করেছেন।

নীরবে জি-ও-সির ভর্ৎসনা মেনে নিলাম। একটু পর তিনি আবার বলতে লাগলেন: যদি আমাদের এই ভলান্টিয়ার বাহিনী রেগুলার আর্মি হতো, তাহলে এই অন্যায়ের জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁদের কোর্ট মার্শাল হতো। কিন্তু এটা আমাদের জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। তাই, এই অন্যায়ের জন্য যাঁরা দায়ী, আমি তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাব—

এগিয়ে গেলেন মেজর গুপ্ত: আমি দায়ী।

এগিয়ে গেলেন কোয়ার্টার মাষ্টার বিনয় রায়: আমিও দায়ী।

এগিয়ে গেলেন সার্জেন্ট দেবেন বোস: আমিও।

তারপর আমি এগিয়ে গেলাম, আমার সঙ্গে অন্যান্য সার্জেন্ট ও সেকশন কমাণ্ডাররাও: আমরাও দায়ী।

সমগ্র 'বি' কোম্পানী এক-পা এগিয়ে এল এবং সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করলো: এই কাজের জন্য আমরা সবাই দায়ী। We surrender to you—

সুভাষ বললেন: আপনাদের discipline ও moral courage-এর আমি প্রশংসা করি। কিন্তু সবাইকে আমি গ্রেপ্তার করবো না। আমি গ্রেপ্তার করলাম মেজর সত্য গুপ্ত, কোয়ার্টার মাষ্টার বিনয় রায় ও সার্জেন্ট দেবেন

বোসকে। তারপরই শোনা গেল জি-ও-সির আদেশ : These three of you, follow me!

জি-ও-সির পশ্চাতে মার্চ্চ করে বেরিয়ে গেলেন তাঁরা। আমরা শিবিরে এসে প্রবেশ করলাম।

আসল কথা, বহরমপুর বন্দী শিবিরের নেতৃস্থানীয় যাঁরা, সামরিক শিক্ষার কথা তাঁরা কিছু দিন ধরেই বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বাইরে জেলায় জেলায় যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, শিবিরে আসবার পর সে শিক্ষাদান স্থগিত থাকবে কেন? সমগ্র বাংলা দেশের বিপ্লবী কর্ম্মীরা এখানে এসে জমায়েৎ হয়েছেন। থিওরী যতখানিই জানা থাক না কেন, প্যারেড ও ব্যায়ামের মাধ্যমে হাতে কলমে সামরিক নিয়মানুবর্ত্তিতা ও কুচকাওয়াজ আদ্যোপান্ত শিক্ষালাভ করে স্ব স্ব কর্ম্ম এলাকায় ফিরে গিয়ে তাঁরা এমনি স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে তোলবার সুযোগ পাবেন। এতে সামরিক মনোবৃত্তি গঠন করা সহজ হবে। হিংসায় বিশ্বাসী বিপ্লবীদের সৈনিকের হিম্মৎ থাকা আবশ্যক।

অনুশীলনের সদস্যেরা সংখ্যায় আমাদের এক-তৃতীয়াংশ হলেও এবং তাঁদের পৃথক্ কিচেন ও পৃথক্ ব্যারাক হলেও স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন ব্যাপারে তাঁরা যুগান্তরের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিতে দ্বিধা করলেন না।

অতএব, ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসের এক শান্ত সকালবেলায় অকস্মাৎ শিবির কম্পিত করে বেজে উঠলো স্নানের ঘণ্টা নয়, খাবার ঘণ্টা নয়, ঢাকা জেলের সেই পাগলা ঘন্টিও নয়, বহরমপুর ডিটেনশন ক্যাম্প ইনফ্যান্ট্রির কুচকাওয়াজের ঘন্টা। আর হুড় হুড় করে বেরিয়ে এসে সবাই ফল্-ইন করলো ইস্টার্ণ ব্যারাকের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণের মাঠটিতে। সংখ্যায় তারা প্রায় আড়াইশো। অনুশীলন আছে, যুগান্তর আছে, দল আছে, উপদল আছে, গ্রুপ আছে, স্বতন্ত্রেরা আছে, পরিচয়হীনরা আছে, রিভোল্ট আছে, এমন কি কম্যুনিষ্টরাও আছে, আর, সবার সম্মুখে উন্নত বক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে ইনফ্যান্ট্রির জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং, সর্ব্বাধিনায়ক দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়। আমার প্রধান অভারলি সেই রহস্যময় চক্ষু উদাসীন দার্শনিক অমর চাটার্জ্জী।

কিন্তু বিভ্রাট বেধে গেল প্রথম দিনেই।

ঠিক সাতটাতে ঘণ্টা বাজাবার কথা ছিল। কিচেন ম্যানেজারের ঘণ্টা। যখন পাঁচ মিনিট বাকি, তখন অমরকে আসতে না দেখে কামাখ্যাদা' পাছে দেরী হয়ে যায়, এজন্য নিজেই ঘণ্টা বাজিয়ে দেন। কিন্তু তখনো তিন মিনিট বাকি ছিল। যথাসময়ে অমর সেখানে এসে তাঁকে ঘড়ি দেখিয়ে দেয়।

সামরিক নিয়মানুবর্ত্তিতা অত্যন্ত কঠোর। সেখানে তিন মিনিট হেলায়-ফেলায় উড়িয়ে দেবার মতো নয়, প্রতিটি সেকেণ্ড মূল্যবান!

সুতরাং—

সুতরাং জি-ও-সির হুকুম এলো: কমরেড্স, এ্যাটেন—শন্।

পাথরের মতো সবাই দাঁড়িয়ে গেল। একেবারে নিশ্চল, নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা সন্দেহ।

জি-ও-সি খট্ করে বুটের আওয়াজ করে প্রত্যেকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার পোষাক পরিচ্ছদ, বেল্ট প্রভৃতির সামান্য ত্রুটিগুলি শুধরে দিতে লাগলেন। কিছু সৈন্য প্রথম দিনেই সামরিক খাঁকি পোষাক সংগ্রহ করে উঠতে পারেনি, জনকতক বয়স্ক লোক সঙ্কোচবশে সংগ্রহ করেও পরিধান করেননি।

Number: জি-ও-সির আদেশ এল। ওয়ান, টু, থ্রি করে সংখ্যা উচ্চারিত হতে হতে এসে ঠেকলো দু'শো আঠারো।

তারপর মুহূর্ত্তমাত্র নীরবে থেকে হুকুম এল: Orderly fall out!

লাইন থেকে এক পা এগিয়ে এসে অমর বুটের আওয়াজ তুলল: খট্।

—Who rang the bell earlier?

অমর ঘটনা যথাযথভাবে বিবৃত করলো এবং আদেশ পেয়ে আবার লাইনে ফিরে গেল।

এবার কামাখ্যাদা'র পালা। দলীয় নিয়মানুবর্ত্তিতায় কামাখ্যাচরণ রায় আমার দাদা—শ্রদ্ধেয় ও সম্মানার্হ। সেখানে সর্ব্বদাই তাঁকে সমীহ করে চলাই আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু প্যারেড গ্রাউণ্ডে আমি জি-ও-সি, বি-ডি-সি-আইয়ের সর্ব্বাধিনায়ক আর কামাখ্যাচরণ রায় সেই ইনফ্যান্ট্রির সামান্য প্রাইভেট। কামাখ্যাদা' আর দ্বিজেন নয়, এখানে মেজর জেনারেল গ্যাংগুলী আর প্রাইভেট রয়। সামরিক সংবিধানে দাদা-ভাই নেই। অতএব—

—Private Roy, fall out.

কামাখ্যাদা' সামরিক কায়দায় লাইন থেকে বেরিয়ে এলেন। সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম উন্নতবক্ষে প্রস্তরকঠিন মুখ নিয়ে। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম তাঁর চোখের পানে।

—Why did you ring the bell ?

কামাখ্যাদা' বললেন যে, পাছে দেরী হয়ে যায়, সেজন্যে তিনি নিজেই ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য তাঁর সঙ্গে ঘড়ি ছিল না, তাই সময় দেখতে পারেননি।

—The bell was rung three minutes earlier. Did you not commit an offence ?

—Yes, Sir, it was an offence.

—Was it not a breach of military discipline ?

—Yes, Sir

—Are you not liable to punishment ?

—Certainly, Sir.

চরম মুহূর্ত এসে গেছে! বেশ বুঝতে পারলাম সেই দু'শো আঠারো জন বন্দী রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে আমার পরবর্তী আদেশের। জলদগম্ভীর স্বরে কোন্ কঠিন শাস্তির আদেশ-বাণী আমি উচ্চারণ করি আমারই দলীয় দাদার প্রতি, সমবেত বন্দীরা যে তারই প্রতীক্ষা করছে, তা স্পষ্ট অনুভব করলাম।

কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বললাম : This is the birthday of the Infantry and this is your first offence. Hence, you are let off with a very grave warning. Don't you follow ?

—Yes, Sir.

—To you lines !

দাবানলের মতো এই সংবাদ সমগ্র বন্দীশিবিরে রাষ্ট্র হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

দুপুরে খাবার হল্-এ এসে প্রবেশ করতেই কামাখ্যাদা' সবার সমক্ষেই একবারে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন আমায়। সবলে আলিঙ্গন করে বলে উঠলেন : That's like a real G. O. C., ভারী খুশী হয়েছি তোমার দৃঢ়তায়। এই তো চাই। আমায় শাস্তি দিলেও অবনত মস্তকে মেনে নিতাম তা।

লজ্জিত মুখে নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করতে যেতেই কামাখ্যাদা' আবার আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বরিশাল শঙ্কর মঠের ধীরেনদা'ও পেছনে আসছিলেন কিচেন ম্যানেজারের কাছে। তিনি বলে উঠলেন: হবে না কেন? কার হাতের তৈরী দেখতে হবে তো!

সঙ্গী রমেশ দাস প্রশ্ন করলো: কার?

মেজর সত্য গুপ্ত। সেই "চ্যালেঞ্জ ফিপটি!" একাই হকি ষ্টীক নিয়ে যিনি পঞ্চাশ জনের মহড়া নেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। জানিস্‌নে বুঝি সে কাহিনী? শোন তবে—

পনেরো

বরিশাল শঙ্কর মঠের ধীরেন সেন সবারই দাদা—ধীরেনদা'। কন্‌ফারমড্‌ ব্যাচেলরই শুধু নন, স্বপাক আহার করেন এবং তাও বিশুদ্ধ নিরামিষ। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার নিশিপালন ও একাদশীর উপবাস নিয়মিতভাবে করেন তিনি। ষ্টোভে দু'বেলা নিজের ঘরেই রান্না হয়। নিরামিষাশী বলেই তাঁর ঘি ও মাখন একটু বেশী প্রয়োজন হয়, আর সেরখানেক দুধের পায়েস তৈরী করতে হয় গোটা কতক কিশমিশ ও পেস্তা দিয়ে আর বেশ খানিকটে এলাচগুঁড়ো ছড়িয়ে। নিরামিষাশী বলেই তাঁর জন্য আধ সের চিনি-পাতা দৈ-এর ব্যবস্থা আছে আর গোটাকয়েক মিষ্টি। ক্ষয়শীল শরীর এই সামান্যতেই কি টেঁকে? তাই রাত্রে খাবার পর তাঁর জন্য কিছু ফলমূল আসে—দু'টো কমলা, একটা আপেল, একটা ন্যাসপাতি, আধ পো' আঙুর, কিছু মনাক্কা ও একটি নারায়ণগঞ্জের লেমনেড নয়, সোডা।

জীবনধারণের জন্য নেহাৎ যা না হলে চলে না, মাত্র তাই তিনি নিয়ে থাকেন, উদাসভাবে এমনি মন্তব্য করে আকাশের পানে চেয়ে থাকেন তিনি। প্রতি মাসে কিচেন ম্যানেজার বদলি হয় বটে, কিন্তু ধীরেনদা'র এই সামান্য খাদ্য-তালিকার পরিবর্ত্তন নেই!

সমগ্রভাবে দল-উপদল-নির্ব্বিশেষে রাজবন্দীরা একটা মস্ত উপকার পেয়ে থাকেন তাঁর কাছ থেকে, আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে সে কথা স্মরণ করি। বন্দীদের পরীক্ষা দেবার হুজুগ তিনিই তোলেন। বাইরে রাজনৈতিক কাজের চাপে

যারা পরীক্ষার জন্য মাথা ঘামাতে পারেননি, এখানে তাঁদের মাথা ধার দেবার জন্য ধীরেনদা' এগিয়ে এলেন! বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখালেখি করে, বার বার কম্যাণ্ডাণ্ট টবিনের অফিসে হানা দিয়ে তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন যে, শিবিরের মধ্যেই রাজবন্দীদের প্রতিদিন ক্লাস হবে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আর বাইরের কলেজের বিভিন্ন অধ্যাপক এসে বিভিন্ন বিষয়ে পড়িয়ে যাবেন। ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী থেকে বই আসবার ব্যবস্থাও তাঁরই ব্যবস্থাপনায় সম্ভব হলো।

পড়া ও পরীক্ষার জটিল বিষয়টির পরিচালনার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন ধীরেনদা'। তিনি সেকালের গ্রাজুয়েট এবং কাজেকাজেই প্রত্যেক চিঠিতেই নীচে নামের পর ছোট করে রেজিষ্টার্ড নম্বরটি উল্লেখ করতে কিন্তু ভুলতেন না।

রাজনীতির কথা উল্লেখ করলেই ক্ষেপে যেতেন তিনি। শুদ্ধ বরিশালের ভাষায় যা বলতেন, তা তাঁর দেশের সৌজন্য ও নম্রতার নমুনা হলেও আমাদের মনে হতো ধীরেনদা' বুঝি গাল দিচ্ছেন।

বন্দিজীবনটা যাতে আহার ও নিদ্রায় অপব্যয়িত না হয়, সে জন্য কম-বেশী সবারই চেষ্টা ছিল জ্ঞান অর্জ্জনের, শরীর গঠনের এবং নানাবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য পালনের।

পরিষ্কার বুঝতে পারি, সে যুগের দেশপ্রেমের সঙ্গে আজকের দেশপ্রেমের তফাৎ কোথায় ও কতখানি। সে যুগে দেশপ্রেমকে বলা হতো স্বদেশী আর এ যুগে একে বলা হয় পলিটিক্স্। পলিটিক্স্-এর বাংলা পরিভাষা নেই। অন্ততঃ ব্যবহৃত হয় না। স্বদেশী আর পলিটিক্স শুধু বিভিন্ন নয়, প্রায় পরস্পরবিরোধী। স্বদেশীর পাঠ গ্রহণ করতে হতো শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে, বিবেকানন্দ-বাণীতে, ঋষি বঙ্কিমের আনন্দমঠে এবং অশ্বিনী দত্তের ভক্তিযোগে কিংবা শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম্ম ও জাতীয়তায়। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করে উঠে করতে হতো প্রার্থনা, ধ্যান, প্রাণায়াম ও ব্যায়াম। ব্রহ্মচারীর মতো শয়ন করতে হতো ভূমিশয্যায়, গ্রহণ করতে হতো নিছক সাত্ত্বিক আহার, সর্ব্বদা কৌপীন এঁটে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করতে হতো। নারীজাতি স্বদেশীদের কাছে ছিল ভগিনী নয়, মাতা! দেশমাতারই প্রতীক বলে মনে করতো তারা নারীকে। কার্য্যোদ্ধারের জন্য হয়তো তারা কথনো কথনো নীচে নেমে আসতো। যারা ভিতরকার মানুষটির সঠিক পরিচয় জানতো না, তারা মনে করতো, যতখানি নেমে গেছে সে, বোধহয় আর উঠতে

পারবে না। হয়তো ফেঁসে যাবে, তলিয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু সে যে কত বড় ভুল, তা টের পেত তারা তখনই, যখন বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে আবার একদিন দেখতো, সে ভেসে উঠেছে, উঠে এসেছে এবং কার্য্যোদ্ধারের সাফল্যে আবার এগিয়ে চলেছে। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ নির্ম্মল ব্যক্তিগত চরিত্র ব্যতীত দেশসেবার অধিকারই নেই বলে মনে করতো সে যুগের স্বদেশীরা। গীতা স্পর্শ করে তারা বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতো।

আর এ যুগের পলিটিক্‌সের প্রশ্নঃ চরিত্র কি, নির্ম্মলতার সংজ্ঞা কি, চরিত্রের সঙ্গে দেশসেবার সম্পর্ক কোথায়, দেশপ্রেমের মধ্যে নিছক জড়বাদ ব্যতীত আধ্যাত্মবাদের স্থান আছে কি? পলিটিক্‌স স্বদেশীদের ভাবাবেগের অনুশাসনকে উপেক্ষা করে এগিয়ে এসেছে বস্তুতন্ত্রবাদের উষর ময়দানে। গীতা ও কৌপীনকে এঁরা পেছনে ফেলে এসেছে। সমবেত প্রয়াসে পলিটিক্‌স-এ ষ্ট্রাটেজিকেই বড় করে দেখা হয়, স্বতন্ত্রভাবে প্রয়াসীদেরকে নয়। তাই ব্যক্তির দুর্ব্বলতাকে পলিটিক্‌স্ থোড়াই কেয়ার করে চলে।

পলিটিক্‌স্-এর মধ্যে খানিকটে গন্ধ পাই কূটনীতি ও চালাকির আর স্বদেশী একেবারে দিনের আলোর মত স্পষ্ট। কোষবদ্ধ অসির মতো পলিটিক্‌স্ সুযোগের অপেক্ষা রাখে আর নাঙ্গা খড়্গের মতো স্বদেশী সর্ব্বদাই উদ্যত, উন্মুখ। স্বদেশীর তাসগুলো সবই বিছানো টেবিলের 'পরে আর পলিটিক্‌স্ তাস চালানের কসরৎ করে। পলিটিক্‌স্ যাঁরা করেন, সবার ওপরে স্থান দেন তাঁরা আদর্শকে আর স্বদেশীরা সেই সঙ্গে যাচাই করে নিতে চায় আদর্শবাদীকেও। প্রশংসাপত্র দেখে নয়, বক্তৃতা শুনে নয়; বাজিয়ে, ওজন করে, অনুভব করে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যানালাইস্ করে। ছলে, বলে, কৌশলে অভীষ্ট অর্জ্জনই পলিটিক্‌সের কাম্য, স্বদেশী কিন্তু উদ্দেশ্যের সাধুতা, প্রচেষ্টার ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে একটু বেশীরকম সতর্ক।

স্বদেশীতে স্থান নেই কোনো রেণুরই, না শহরের, না গ্রামের, আর পলিটিক্‌সে এঁরা শুধু সাথিনী নন, সখীও!

উৎকর্ষ বিচার নয়, আজকের পলিটিক্‌স্ হয়তো গতকালের স্বদেশীরই সার্থক পরিণতি। অঙ্কুরের সঙ্গে কাণ্ডের আর মিল নেই। না থাকতে পারে। কিন্তু মাটির নীচেকার সৌকুমার্য্যহীন শিকড়কে অস্বীকার করে পারে কি নব নব কিশলয় দিকে দিকে তার শ্যামলিমা বিকীরণ করতে?……

পরীক্ষা পাশের পড়া ছাড়াও ক্লাস হতো নানা রকমের—কোনোটা ইতিহাসের, কোনটা অর্থনীতির, আবার কোনোটা আন্তর্জাতিক রাজনীতির। পণ্ডিত রাজবন্দীরা এই সব ক্লাস নিতেন এবং কথনো দল নির্ব্বিশেষে, কথনো-বা দলবিশেষে শিক্ষানবিশ বন্দীরা তাতে যোগদান করতেন। যাঁরা আর্ট স্কুলে পড়তেন, তাঁরা প্রচুর ছবি আঁকতেন এবং আঁকা শেখাতেন।

সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক নানা নামীয় ও নানা জাতীয় হাতেলেখা পত্রিকা বেরুতো। প্রত্যেকখানাই ছিল কোনো বিশেষ দলের মুখপত্র। পাঠক রাজবন্দীরাই। প্রত্যেক দলই তার অন্তরের কথা যুক্তিসহ করে প্রচার করতো বন্দীদের মধ্যে হয়তো সংখ্যাবৃদ্ধির আশায়। কিংবা নয়। পত্রিকা-গুলিতে যেমন অনেক ছবি প্রকাশিত হতো, তেমনি হতো অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ। কোনো কোনো পত্রিকা আবার যে দলের মুখপত্র, সেই দলের বিশেষ সভায় আদ্যপান্ত পাঠ করা হতো।

কিন্তু দলনির্ব্বিশেষে একখানাও পত্রিকা নেই। রাজবন্দীরা এর অভাব অনুভব করতে লাগলেন। কোনো দলের নিন্দা নয়, কুৎসা নয়, কারুর প্রতি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির লড়াই নয়, অন্ধের মতো কোনো বিশেষ একটা মতকে অপরের স্কন্ধে চাপিয়ে দেবার অভিসন্ধি নয়,—নিরপেক্ষ, বলিষ্ঠ ও নির্ভীক একখানি পত্রিকা বন্দীশিবিরে থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সভা হলো এবং পত্রিকার নামকরণ হলো 'শৃঙ্খল'। পত্রিকাখানি একটি সর্ব্বদলীয় সাহিত্যসভার পরিচালনাধীনে জনৈক সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর এই সম্পাদক পরিবর্তন করা হবে।

মনে আছে প্রথম সম্পাদক হলেন বরিশালের বিনয় সেন, আর পত্রিকাখানি লেখার ভার পড়লো আমার ওপর। সাহিত্যসভার সদস্যদের সবার নাম আজ আর মনে পড়ে না, তবে এঁদের মধ্যে ছিলেন দেবজ্যোতি বর্ম্মণ, নিবারণ দত্ত, বিনয় সেন, সুধীন সরকার, রাখাল ঘোষ, করালীকান্ত বিশ্বাস, অনন্ত দে ও আমি।

সমস্ত রাজবন্দীর এক মহতী সভায় সমগ্র পত্রিকাখানি নয়, এ থেকে নির্ব্বাচিত কয়েকটি প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা পাঠ করা হতো এবং সর্ব্বশেষে সম্পাদক সম্পাদকীয় পাঠ করতেন। সভান্তে কিচেন ম্যানেজারগণ অবশ্যই জলযোগের ব্যবস্থা রাখতেন।

একদা ঢাকা জেলে রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতার প্যারোডি শুনিয়েই ভক্ষণ সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ প্রায় অধিকার করে ফেলেছিলাম তরণীবাবুকে বঞ্চিত করে। তারপর অবশ্য সভাপতি সুরেনদা'র বিশেষ অধিকার প্রয়োগের ফলে নির্ব্বাচিত আমায় বঞ্চিত করে মনোনীত তরণী সোমই গদী আঁকড়ে রইলেন।

এখানেও 'শৃঙ্খলে'র প্রথম সংখ্যাতেই বেরুলো আর একটি প্যারোডি—"দাদার দাদা"। প্রথম সভাতে সুর করে সেই কবিতাটিই আবৃত্তি করলাম যেই মুহূর্ত্তে, সেই মুহূর্ত্তে সারা শিবিরে রটে গেল যে, জি-ও-সি শুধু কাটখোট্টা মিলিটারীম্যান নয়, কাব্যও জাগে তার মনে। কবিতাটি পাঠকদের উপহার দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

একটু উপক্রমণিকা প্রয়োজন। সে যুগে দল গড়ার হুজুগ খুব বেশী ছিল। একটি দল তাই অসংখ্য উপদল ও গ্রুপে বিভক্ত ছিল। বৃহত্তর প্রয়োজনে সবাই হাত ও কাঁধ মেলাতে পরাঙ্মুখ না হলেও, ইংরেজ আমলের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মতো এদের স্বাতন্ত্র্যও যে খানিকটে ছিল, এবং না থাকলেও তারা যে নিরমোত্তর অধিকার হিসাবে তা ভোগ করতো, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ফলে, বন্দীশিবিরে গ্রুপ-লীডার অর্থাৎ দাদা ছিল সংখ্যাতীত। এই সংখ্যাতীত দাদাদের ব্যঙ্গ করেই লেখা হয়েছিল আমার কবিতা কবি রবীন্দ্রনাথের "কৃষ্ণকলি" ভিত্তি করে। এখন আর পারি না বটে, কিন্তু সে যুগে এমন প্যারোডি বা গান লিখতে পারতাম খুব সহজে এবং বন্ধুরা তার প্রশংসাও করতেন।

সভাপতি হিমাংশু আইন ময়মনসিংহের উকিল। আইনজ্ঞই শুধু নন, পার্লামেন্টি নিয়মকানুন একেবারে কণ্ঠস্থ তাঁর। রুলিংগুলো যেমন নিয়মানুগ, তেমনি ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই তা প্রয়োগ করেন তিনি। দেবজ্যোতি বর্ম্মণের একটি সারগর্ভ অর্থনৈতিক প্রবন্ধ পাঠের পর হিমাংশু আইন ঘোষণা করলেন: অর্থনীতির জটিল প্যাঁচে নিশ্চয়ই আপনারা গম্ভীর হয়ে উঠেছেন, এবারে এক কাপ গরম কফির মতো একটি কবিতা আপনাদের উপহার দিচ্ছি—"দাদার দাদা।" পাঠ করবেন রচয়িতা স্বয়ং এবং দেখে বিস্মিত হবেন না যে, তিনি আমাদের জি-ও-সি। প্রবল হাততালির মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি সুরু করলাম:

দাদার দাদা তারেই আমি বলি,
ছ্যাবলা তারে বলে দুষ্ট লোক,
রাত্রিবেলা দেখেছিলাম মাঠে
কালো ফ্রেমে চশমা আঁটা চোখ।
জামা গায়ে ছিল না তার মোটে
শুধু চাদর পিঠের 'পরে লোটে,
ক্যাবলা? তা সে যতই ক্যাবলা হোক
দেখেছি তার চশমা আঁটা চোখ

রাত্রে বেড়ে দশটা হলো যেই
উঠলো বেজে টবিন চাচার বাঁশী,
দাদার দাদা ভাইকে ছেড়ে দিয়ে
ব্যারাক ঘরে এসে উঠে আসে।
ঘড়ির পানে বারেক চাহি মুখ
শয্যা নিয়ে পঠন করে সুরু।
মূর্খ? তা সে যতই মূর্খ হোক
দেখেছি তার দাদা হবার ঝোঁক

পূবের আলো এলো জানলা-পথে
সিপাই এসে দিল খুলে তালা,
ভাইকে এসে তুললো দাদা ডেকে
এবার সুরু বকবকানির পালা।
কারুর পানে দেখলে নাকো চেয়ে,
ভাবের ঘোরে নামলো মাঠে ধেয়ে।
বাবুচন্দর? যতই গরু হোক
তবুও সে আস্ত চিনে জোঁক।

এমনি করে আসছে কত দাদা,
ভর্তি হয়ে উঠলো বন্দীশালা,
ভাই বলে আর থাকবে না যে কেউ
দাদার গলায় পরিয়ে দিতে মালা।

এ সব ভেবে হঠাৎ রজনীতে
দুখের কালো ঘনিয়ে আসে চিতে
ফালতু? তা সে যতই ফালতু হোক্,
দাদার দাদা তাকেই বলে লোক।

মনে পড়ে, সভান্তে আড়ালে ডেকে নিয়ে সত্যবাবু আমার কয়েকটা অতিরিক্ত কাচাগোল্লা খাইয়েছিলেন প্রশংসাপত্রের পরিবর্তে।

ফুটবল খুব তাড়াতাড়িই নামিয়ে দিলাম আমরা। সম্পাদক নির্বাচিত হলেন কমরেড কুশা রায়। কমরেড তাঁকে কেন বলা হতো জানিনে। কম্যুনিজম এর যে ক্ষীণ ধারা তখন সবে এসেছে, কুশাবাবুর মনে তো তার রং লাগেনি। তবে?

একটা কথা মনে পড়ে, কম্যুনিজমকে অত্যন্ত ধারালো ব্যঙ্গোক্তির সম্মুখীন হতে হতো তখন। একজনের তেল, সাবান, টুথপেষ্ট প্রভৃতি অপরে নিয়ে গেলেই তাকে ব্যঙ্গ করে বলা হতোঃ এই যে, কম্যুনিজম চালাচ্ছে! মন্তব্য করা হতো একেবারে প্রকাশ্যেই: কম্যুনিষ্টদের কি সুবিধে দেখেছিস? পরের ওপর দিয়ে বেশ দিব্যি তেলটা সাবানটা চলছে আর এদিকে নিজের এ্যালাউন্সের টাকা দিয়ে কেনা হচ্ছে, Capital, Memoires of Lenin আর Ten Days That Shook The World—বেশ মজা, নয়?

খুব সমঝে চলতেন কম্যুনিষ্টরা সে যুগে। আকাশচুম্বী সমুদ্রে বারিবিন্দুসম তিন শতাধিক রাজবন্দীর মধ্যে মাত্র দশ বারো জন। যেমন মাথা নীচু করে এসে তাঁরা খাবার ঘরে প্রবেশ করতেন ব্রীড়াবনতা গ্রাম্যবধূর মতো, তেমনি নিঃশব্দে আহারান্তে বেরিয়ে যেতেন শেয়ার মার্কেটে সর্ব্বস্বান্ত ঝুনঝুনওয়ালার মতো।

বিতর্কমূলক সর্ব্বপ্রকার আলোচনাকেই তাঁরা সযত্নে চলতেন পাশ কাটিয়ে। কিন্তু এই দশ বারো জনের জন্যেই ছিল পৃথক্ একটি চৌকা। এঁরাই স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির উন্মাদনায় এমনি পৃথক্ হাঁড়ির আশ্রয় নিয়েছেন, না সাধারণ বন্দীরাই এঁদের অপাংক্তেয় করে দিয়েছিল, তা জানা যায়নি। বক্রদৃষ্টিক্ষেপে আমিও যে তাঁদের বিঁধতাম না তা নয়, কিন্তু আজ স্বীকার করতে সঙ্কোচ নেই যে

উত্তরকালে তাঁদের মধ্যে থেকেই অনন্যসাধারণ একাধিক কর্ম্মীর সৃষ্টি হতে দেখেছি।……

খেলার মাঠটি দৈর্ঘ্যে ছোট! একদিকের গোটাকয়েক আম গাছ কেটে ফেলার প্রস্তাব নিয়ে আমাদের প্রতিনিধিরা একদিন প্রভাত নাগের নেতৃত্বে কমাণ্ডাণ্ট টবিনের অফিসে গিয়ে হাজির হলেন।

মিলিটারী ম্যান টবিন। একেবারে সদ্য ইয়োরোপ থেকে আমদানী। তাঁকে বোঝানো হয়েছে যে, আমরা সব War prisoners—যুদ্ধবন্দী। কোথায় ও কবে এই যুদ্ধ হলো, এই প্রশ্ন টবিনের মনে জাগতে পারে বলে তাঁকে এ-ও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আমরা গোপনে যুদ্ধের আয়োজন করছিলাম জার্ম্মানীর সহযোগিতায়। ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেছে ইংরেজ গুপ্তচরদের কর্ম্মতৎপরতায়।

সুতরাং প্রতিনিধি দলকে অপেক্ষা করতে হলো কেবিনের বাইরে। সাহেব কার সঙ্গে কথা কইছেন।

গোপাল গুপ্ত একটু উগ্র রকমের লোক। বললেন: চলুন না, প্রভাতবাবু, দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ি। ব্যাটা আমার লাট সাহেবের বাচ্চা আর কি!

অনন্ত দে ধীর প্রকৃতির মানুষ। বাধা দিলেন: একটুখানি দেখাই যাক না, গোপালবাবু। বেশী দেরী করলে তখন সে পথ আমাদের আটকায় কে?

প্রভাত নাগ সমর্থন করলেন: আর এসেছি যখন স্বার্থোদ্ধারে। সুতরাং কৌশলে—

সুধীন সরকার বললেন: ও সব কৌশল-টৌশল টবিন চাচার কাছে অচল, প্রভাতবাবু! দেখবেন ওঁর গোঁ!

মিনিট দশেক পর টবিনের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সহকারী কমাণ্ডাণ্ট গিরিজা দত্ত এক বোঝা ফাইল নিয়ে। অপেক্ষমান প্রতিনিধিদের দেখে একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়লেন: আরে, আপনারা! অনেকক্ষণ এসেছেন বুঝি? সাহেবের কাছে যাবেন? একটু অপেক্ষা করুন প্লিজ, এক সেকেণ্ড! এই ফাইলগুলো রেখে আসছি।

পঁয়তাল্লিশ বছরের গিরিজা পঁচিশ বছরের যুবকের মতো যেমন তড়াক করে নিজের দপ্তরে প্রবেশ করলেন ফাইলের বোঝা নিয়ে, তেমনি আবার সড়াক করে বেরিয়ে এলেন হাত খালি করে। চোখ দুটো কপালে তুলে বললেন:

ছি, ছি, ছি! আপনারা এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন এখানে? কতক্ষণ এসেছেন, প্রভাতবাবু?

জবাব দিলেন গোপাল গুপ্ত: তা পনেরো মিনিট তো হবেই। সাহেব হয়তো কাজে ব্যস্ত, একটু অপেক্ষা করতে হবে! কিন্তু বসবার জায়গা—

বিলক্ষণ, সে কথা আর বলতে!—গিরিজা সীমাহীন বিস্ময়ে চশমা-ঢাকা চোখদু'টি একেবারে কপালে তুললেন: পনেরো মিনিট এমনিভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন? কেন, বেয়ারাগুলো কি সব মরেছে নাকি?—এই দল বাহাদুর, ইধার আও!

দল বাহাদুর এসে বুটের আওয়াজ তুললো। গিরিজা কণ্ঠস্বরে প্রভুর গাম্ভীর্য্য এনে জিজ্ঞেস করলেন: ইন্ বাবুলোগ কব্ আয়া থা?

সায়েব, আধা ঘণ্টা হোগা!—দল বাহাদুর নিবেদন করলো।

এত্না টাইম তক্ বৈঠনে কেঁও নেই দিয়া তুম্?

দল বাহাদুর মিনমিন করতে লাগলো। ভাবখানা এই: বলেছিলাম বসতে, কিন্তু এঁরা—

ঝুটা হায়।—গর্জ্জে উঠলেন গিরিজা: তুম বেয়াকুপ হায়, উল্লু হায়। ফের এইসা হোনেসে তুমারা নকরি হাম খতম কর দে গা।—যাও।

চলে গেল দল বাহাদুর আবার বুটের আওয়াজ তুলে। মহাদুঃখে গিরিজা একেবারে হতাশ হয়ে পড়লেন: আর বলেন কেন, প্রভাতবাবু! এই সব জংলী নিয়ে কাজ করা যে কী হ্যাঙ্গাম, তা আর বলে শেষ করা যায় না। কোন্ জঙ্গল থেকে যে—

বাধা দিয়ে সুধীন সরকার বললেন: যাক্ সে কথা। এখন সাহেবের কাছে যাওয়া যাবে কি না তাই বলুন।

বিলক্ষণ, সে কথা আর বলতে!—গিরিজা প্রতিনিধি দলকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে টবিনের কেবিনে প্রবেশ করলেন।

এই গিরিজা দত্ত। ঝানু লোক। যেমন প্রখর বুদ্ধি, তেমনি কৌশলে কাজ হাঁসিল করে নেবার ফন্দী এঁর কণ্ঠস্থ। আশ্চর্য্য, অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতেও এঁর মাথা একেবারে ঠাণ্ডা থাকে। টবিনের সামরিক গোঁয়ার-তুমিকে যুক্তি ও কৌশলের প্রলেপ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখাই এঁর প্রধান কাজ। কূটবুদ্ধিতে ইংরেজের দোসর নেই। তাই সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে

সাহেবদের নিয়োগ করে তাদের সহকারী বা মন্ত্রণাদাতা হিসেবে বসিয়ে রাখতো বাঙালীদের। বাঙালী রাজবন্দীদের ভাবগতিক এঁরাই তো নির্ভুলভাবে বিচার করতে পারবেন। পান থেকে চুন খসলেই রাইফেল চালাবার বিদ্যায় টবিন পটু, কিন্তু পড়ে-যাওয়া চুনকে তুলে নিয়ে আবার এক খিলি মিঠে পান তৈরীর কূট চালে গিরিজা দত্তের তুলনা নেই।

টবিন মনে করতেন রাজবন্দীদের তরফ থেকে কোনো আবেদন এলেই তা অগ্রাহ্য করতে হবে, নইলে সরকারী প্রেষ্টিজ ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। তাই, আমাদের আম গাছ কাটবার প্রস্তাব প্রথমটা তিনি কানেই তুললেন না, তারপর sweet mango fruit বলে নানা ওজরআপত্তি তুললেন, তারপর অকস্মাৎ গিরিজার চোখে চোখ পড়তেই সুর নরম করে বললেন ঃ আচ্ছা, দেখা যাবে।

পরদিন সত্যিই দেখা গেল। গাছগুলো কেটে ফেলার ফলে আমাদের মাঠ প্রায় বিশ হাত বেড়ে গেল দৈর্ঘ্যে।

টিম তৈরী হলো অনেকগুলো। ব্যারাক ও দলনির্ব্বিশেষে যে যাকে পারে টেনে নিয়ে টিম গঠন করে ফেললো। কয়েকটি টিমের নাম মনে আছে, যথা, Y. L. R. (Young Light Runners), N. Y. R. (Nine Young Runners), Red-white, Retired Nine, Winners Nine এবং Biswagutani (বিশ্বগুঁতানি)। এর মধ্যে বিশ্বগুঁতানি টিমটির একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। এর খেলোয়াড় হবার যোগ্যতা সকলের ভাগ্যে জুটতো না। খেলা জানা না-জানা ছিল গৌণ ব্যাপার, এ টিমে যোগদানের প্রধানতম যোগ্যতা অর্জ্জন করতো তারাই, যাদের বুকের ছাতি অন্ততঃ চল্লিশ ইঞ্চি। বলকে লাথি মারলেই দূরে সরে যায় এবং প্রতিপক্ষকে নেহাৎ কুস্তি বা জুজুৎসুর প্যাঁচ না মেরে পা ছুঁড়ে রুখতে হবে—এই দু'টি সত্য অন্তরে গেঁথে রাখলেই বিশ্বগুঁতানির সভ্য হওয়া চলতো। এঁদের দলপতি ছিলেন বরিশালের অজিত দাস, আর সভ্য ছিলেন টিটু নাহা, অনিল চক্রবর্ত্তী, দিলীপ দাস, সুধীর গুহ, রমেশ চক্রবর্ত্তী, অনিল চক্রবর্ত্তী ও আরও কয়েক জন।

দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে এপ্রিল মাসেই ফুটবল লীগ সুরু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাসিক পত্রিকা 'শৃঙ্খলে'র বিশেষ দৈনিক সংখ্যা প্রকাশিত হতে লাগলো এই খেলাকে উপলক্ষ্য করে। সম্পাদক ছিলেন বরিশালের বিনয় সেন এবং প্রকাশক আমি। মুদ্রাকরও আমায় বলা যায় এবং কম্পোজিটরও।

কারণ সারা পত্রিকাখানা আমারই হাতে লেখা। প্রতিদিন অপরাহ্ণে খেলার মাঠের পাশের দেয়ালে সেঁটে দেয়া হতো দৈনিক 'শৃঙ্খল'। ভিড় পড়ে যেত পড়বার জন্য। খেলার ও খেলোয়াড়ের তীক্ষ্ণ সমালোচনা ছাড়াও থাকতো চমৎকার কার্টুন ছবি—খেলোয়াড়, রেফারী বা দর্শকদের নিয়ে। বীরেন ঘোষ একদিন হেড করতে লাফিয়ে উঠে বল নাগাল না পেয়ে নির্ব্বিবাদে দু'হাত তুলে ভলি মেরে বসলো।—ব্যস্, আর যায় কোথা! পরদিনের 'শৃঙ্খলে' দেখা গেল তার ছবি। নীচে লেখা 'ষ্টাফ ক্যামেরাম্যান কর্ত্তৃক গৃহীত' আর ক্যাপশন: Oh! my old days of Volley!

মাঠের একদিকে ছিল চাঁটাই-করা মেহেদির বেড়া; লাইন থেকে প্রায় দশ হাত দূরে। তাহলে কি হবে, হরিদাস সেন একদিন অমিয় মজুমদারকে চার্জ্জ করে একেবারে সেই বেড়ার ওপরে নিয়ে গিয়ে পড়লো। অমনি পরদিন বেরুলো ষ্টাফ ক্যামেরাম্যানের ছবি আর ক্যাপশন: বেড়া সরাইয়া দিবার জন্য ট'বনের নিকট আবেদন জানানো হইয়াছে। এই জাতীয় কার্টুন অঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন টিটু নাহা, অতুল গুপ্ত, নরেন সরকার প্রভৃতি।

বাইরে লীগ খেলায় যা হয়, আমাদের এখানেও তাই হতে লাগলো। পার্কার বা লেদার ট্রাঙ্কের লোভ দেখিয়ে খেলোয়াড় ভাগানো, রেফারীর ক্রটিপূর্ণ পরিচালনা, প্রতিবাদ, প্রতিবাদের প্রতিবাদ, লীগ কমিটির অবিশ্রান্ত অধিবেশন, জরুরী বৈঠক, বিরোধী দলের সভাকক্ষ ত্যাগ প্রভৃতি সবই চলতে লাগলো।

আমাদের টিমের নাম ছিল Y. L. R. এর শশাঙ্ক (ওরফে কমেট) দাশগুপ্ত ছিল এর অধিনায়ক। খেলতো অশোক রায়, দীনেন ভট্টাচার্য্য, অমিয় মজুমদার, জ্যোৎস্না সরকার, বিভূতি চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, ভোলা বসাক, কমরেড কুশা রায় ও আমি। দীনেন ভট্টাচার্য্য, অমিয় মজুমদার, কমরেড কুশা রায় ও অশোক রায় ময়মনসিংহ পণ্ডিতপাড়া টিমে খেলতেন। এই টিম সে যুগে দুর্দ্ধর্ষ মোহনবাগানের বিরুদ্ধেও পাল্লা দিত। কমেট ঢাকার একজন নামজাদা খেলোয়াড় ছিল। আর সারা বিক্রমপুরেই তখন আমার খ্যাতি ছিল। সুতরাং লীগ চ্যাম্পিয়নশীপ আমাদের ভাগ্যেই যে জুটবে, তাতে আর সন্দেহ কি?

চ্যাম্পিয়নশীপ নির্দ্ধারণের শেষ খেলাটি ছিল ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩২ সাল। ভোরেই দেয়ালে দেয়ালে কতকগুলো বেনামী প্রাচীরপত্র দেখা গেল: প্রবল জনরব যে, ওয়াই এল আরের অধিনায়ক কমেট দাশগুপ্ত প্রতিপক্ষ রেড-হোয়াইট

দলের অধিনায়ক অনন্ত দে'র হোল্ডঅল দানের প্রতিশ্রুতিতে ভুলিয়া অসুস্থতার ওজর দেখাইয়া অত্রকার খেলায় অংশ গ্রহণ করিবেন না। এমনি রোমাঞ্চকর আরো কতকগুলি।

শিবিরের একমাত্র নির্দলীয়, নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সংবাদপত্র 'শৃঙ্খলে'র দপ্তর বসে গেল। বিনয় সেনের বুলি আর আমার কলম। কলম হাতে নেয়া আর আগুনে হাত দেয়াকে বিনয় সেন একই রকম শক্ত কাজ মনে করতেন। অথচ ভদ্রলোক মুখে মুখে বলতেন চমৎকার কবিতা, সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও মুখরোচক সমালোচনা। এক তা' ফুলস্‌কাপ কাগজ নিয়ে পার্কার পেনটি খুলে সবে লেখা সুরু করেছি, এমনি সময়ে অকস্মাৎ কুমিল্লার সুকুমার ভৌমিক একখানা 'ষ্টেটস্‌ম্যান' এনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলেন: হো গিয়া, দ্বিজেনবাবু, কেল্লা ফতে হো গিয়া। মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ডগলাস শট ডেড্।

অ্যা, কই দেখি।—বলে 'ষ্টেটস্‌ম্যান'খানা হাতে তুলে নিতেই সুকুমার-বাবু বললেন: ওতে কোথায় পাবেন? সাবধানে ওটুকুতে কাঁচি চালিয়েছে শালা পবিত্র।—এই দেখুন।

প্রশ্ন করলেন বিনয় সেন: তবে সংবাদ পেলেন কি করে?

এদিক ওদিক দেখে নিয়ে সুকুমারবাবু জবাব দিলেন অনুচ্চকণ্ঠে: কম্পাউণ্ডার একখানা আনন্দবাজার এনেছে লুকিয়ে।

সুতরাং বিপদে পড়া গেল। লীগ ফাইন্যালের গুরুত্ব যতই থাক, 'শৃঙ্খলের' তাগিদ যতই থাক, এমনি উত্তেজনাকর সংবাদ পাবার পর বিনয় সেনের ভাষাও যেমন গেল ফুরিয়ে, তেমনি আমার কলমেরও যেন কালি গেল শুকিয়ে।

অবিশ্বাসী সম্পাদক তথাপি প্রশ্ন করলেন: আজকের লীগ খেলাটা পণ্ড করে দেবার জন্যে অনিষ্টকারীদের এও একটা গুলবাজি নয় তো? আজকের প্রতিযোগী দল দু'টির একটিতে যে আপনি আছেন, সুকুমারবাবু!

কিন্তু গুলবাজি মোটেই নয়। দাবানলের মতো এই সংবাদ রটে গেল যে, মেদিনীপুরের নিহত ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ণেল পেডির শূন্য আসনে এসেছিলেন মিঃ আর. ডগলাস। ৩০শে এপ্রিল জেলা বোর্ডের একটি সভায় সভাপাতত্ব করেছিলেন তিনি। জেলার নানা জাতীয় জটিল বিষয় নিয়ে যখন তাঁরা আলোচনায় নিমগ্ন, তখন অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করে দু'টি কিশোর, বালকও বলা যায়। ডগলাসের পশ্চাতে দেহরক্ষী ও জনকতক আর্দালী ছিল দাঁড়িয়ে।

এদেরই দলে এসে দাঁড়ায় এরা নীরব দর্শক বা শ্রোতার মতো। ডগলাস সাহেব একবার যেই সোজা হয়ে বসে কোনও ব্যাপারে সভাপতির গুরুত্বপূর্ণ রুলিং দিচ্ছিলেন, এমন সময় অকস্মাৎ পর পর রিভলভার গর্জে উঠলো দু'জনের হাতে। একটি গুলী এসে বিদ্ধ হলো চেয়ারে হেলান দেবার কাঠে, আর একাধিক গুলী পিঠের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে ডগলাস সাহেবের ফুসফুস ফুটো করে দিল। সাহেব ঢলে পড়লেন প্রথমে চেয়ারে, তারপর মেঝেতে।

দেহরক্ষী ভ্যাবাচাকা খেয়ে হাত দিল বিভলভারে। কিন্তু ততক্ষণে আততায়ীদ্বয় পগার পার! সুতরাং সে দাঁড়িয়ে গেল প্রভুর মৃতদেহ রক্ষার জন্য। আর্দ্দালী ও অন্যান্য লোক দু'জনকে তাড়া করে অবশেষে একজনকে ধরে ফেলে, তার নাম প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য বলে জানা গেছে।

—পড়ে রইলো দৈনিক 'শৃঙ্খলে'র বিশেষ সংখ্যা। বিনয় সেন গেলেন ইষ্টার্ণ ব্যারাকের দিকে, সুকুমারবাবু তো পূর্ব্বেই উধাও, আর আমি ধীরে ধীরে গিয়ে হাজির হলাম ডবলিউ-বি চোদ্দ নম্বরে।

লীগ ফাইন্যাল পরদিন হবে বলে কমরেড কুশা এক জরুরী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন, সত্যবাবু বিশেষ ঘোষণা জানিয়ে দিলেন ব্যারাকে ব্যারাকে: আজ রাত্রিকালে প্রত্যেকের জন্য একটি করে বেলে হাঁসের রোষ্ট তৈরী হবে। রোষ্ট যাঁরা খান না, তাঁরা পূর্ব্বাহ্নে কিচেন ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করুন।

রাত দশটা পনেরো মিনিটে দরজা বন্ধ হয়ে গেলে অমরকে ডাকলাম। সে নিঃশব্দে এসে আমার টেবিলের পাশে চেয়ারে বসলো। আড়চোখে চেয়ে দেখলাম সমরেন্দ্র পাল ঘুমোবার উদ্যোগ করছেন। সুধাংশুবাবুও তাই। নিম্নস্বরে প্রশ্ন করলাম: প্রদ্যোৎ কেমন?

অমর রহস্যপূর্ণ চোখ তুলে চেয়ে রইলো আমার পানে, জবাব দিল না কিছু।

বললাম: কিন্তু আজকের সভা ও বৈঠকগুলোর সংবাদ পেয়েছ তো? প্রত্যেকটা গ্রুপই দাবী করছে এ কাজ তাদের ছেলেরাই করেছে। এমন কি, অনুশীলনের হুগলী গ্রুপ তো একটা প্রস্তাবই গ্রহণ করেছে যে, বাইরে যারা এখনো আছে, তাদের কাছে নির্দ্দেশ পাঠাবে প্রদ্যোতের মামলা চালাবার জন্যে একটা তহবিল গঠন করবার। শুনেছ তো সব কিছু?

এবার অমর মৃদু হাস্য করলো মাত্র। এমনিই সে। এ সব বিষয়ে তার মুখ খোলানো দুরূহ কাজ। আবার মন্তব্য করলাম : কিন্তু আই বি ওকে দারুণ ঠ্যাঙ্গাবে। পর পর দু'টো ম্যাজিস্ট্রেট গেল! সোজা কথা নয়! পেডি সাহেবও যায় গত এপ্রিলে। ঠিক একবছর।

অমর এইবার কথা কইলো : ঠ্যাঙ্গালেও কিছু বেরুবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু এই সব চালিয়াৎদের সভা ও প্রস্তাবের অবসানের জন্যে আরও বিস্তৃত সংবাদ প্রয়োজন, তাই না? ক্রেডিট নেবার হুজুগ তাহলে একদিনেই যায় থেমে।

অমর নিঃশব্দে হাসলো এবং পুরু কাঁচের আড়াল থেকে রহস্যময় চোখদু'টি মেলে আবার চেয়ে রইলো আমার চোখের পানে।

এর কয়েক দিন পরই সকল সন্দেহ ও গবেষণার সমাপ্তি ঘোষণা করে, ফাঁকি দিয়ে যারা ক্রেডিট নিচ্ছিলো, তাদের সবার মুখে চুনকালি লেপন করে, আলোচনাসভা ও প্রস্তাবের মূলে কুঠার হেনে কম্পাউণ্ডার মারফৎ আনিত আর একখানা আনন্দবাজারে সংবাদ পাওয়া গেল যে, প্রদ্যোৎ পুলিসের নিকট যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে জানা যায়, মাত্র এক বছর পূর্ব্বে তার সহপাঠী অমর চট্টোপাধ্যায় বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দেবার জন্যে তাকে নিয়ে যায় পরিমল রায়ের কাছে। তারই মুখে সে শুনেছিল যে, ঢাকা-বিক্রমপুর থেকে কে একজন দাশগুপ্ত নাকি সর্ব্বপ্রথম মেদিনীপুরে এসে পরিমল রায়কেই সর্ব্বাগ্রে দলে ভর্ত্তি করে। এও শোনা গিয়েছিল যে, দাশগুপ্ত ঢাকার বি ভি দলের সভ্য।

ব্যস্, থেমে গেল দল ও উপদলের গুনগুনানি। সবাই বক্র দৃষ্টিক্ষেপে আমাদের ঘরের দিকে তাকিয়ে সরে পড়তে লাগলো একে একে। পরিমল রায় তখনো এই শিবিরেই আছে, আর অমর তো আমার ঘরে আমারই পাশের সীটে বাস করে!······

ষোল

শুধু কম্পাউণ্ডার কেন, গোটা কয়েক গাড়োয়ালী সিপাইকেই আমরা রিক্রুট করে ফেলেছিলাম, যারা বাইরের যাবতীয় সংবাদ ও খানকতক নিষিদ্ধ সংবাদপত্র সরবরাহ করতো নিয়মিতভাবে। কিন্তু এই গুপ্ত সংবাদ জানতো রাজবন্দীদের মধ্যে মাত্র ক'জন। সংবাদপত্র পড়বার সৌভাগ্যও জুটতো বাছা বাছা বন্দীদের। অপরে পেত খবর মুখে মুখে। দিবাকর সেনগুপ্তের সাকরেদ যারা বন্দী হয়ে এসে আমাদের গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে "যথাস্থানে" প্রেরণ করতো, তারা দারুণ একটা সন্দেহ পোষণ করলেও ঠিক কোন্ পথে যে এই স্মাগলিং চলছে, তা হদিস করতে পারতো না।

পারবে কোত্থেকে? কম্পাউণ্ডার বঙ্কিমবাবু এমনি গম্ভীর হয়ে থাকেন যে, দেখে বিরক্ত হতে হয়। ডাক্তার সরকার সাধারণ ডাক্তাদেরই মতো খুব আলাপী এবং ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে তিনি মেসোপোটিমিয়ার কোন্ রণাঙ্গণে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, প্রায়ই তার কাহিনী সালঙ্কারে আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি করে থাকেন। আর বঙ্কিমবাবু নীরবে এগিয়ে এসে টেবিলের পাশে থাকেন দাঁড়িয়ে। বন্দীরা কদাপি মিকশ্চার খান না, তাই কম্পাউণ্ডারের কাজ হচ্ছে প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী আলমারী খুলে পেটেণ্ট ওষুধের বোতল বা শিশি বার করে দেয়া মাত্র!

কিন্তু এরই মধ্যে অকস্মাৎ রোগী যতীশ গুহ বলে উঠলেন: যাই বলেন ডাক্তারবাবু, ঐ এ্যাগারল হোক বা এ্যাগারয়েলই হোক, আপনার কারমিনেটিভ মিকশ্চারই আমার পক্ষে বেশ ভালো। রাত্রে খাবার পরে এক দাগ খেয়ে ঘুমুলেই আর দেখতে হবে না—সকাল বেলা অল্ ক্লিয়ার।

ডাঃ সরকারের বাঁধানো দাঁতের প্রায় বত্রিশটাই দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে যতীশ গুহ কম্পাউণ্ডারের পশ্চাতে তাঁর কম্পাউণ্ডিং কক্ষে প্রবেশ করলেন। সেখানে বঙ্কিমবাবু শুধু কারমিনেটিভই দিলেন, না আরও কিছু হস্তান্তর করলেন, তা জানা গেল না। এদিকে আমরা ডাঃ সরকারের মধ্যপ্রাচ্যের লোমহর্ষণকারী অভিজ্ঞতার কথা আবার শোনবার জন্যে তাঁকে উসকিয়ে দিয়েছি; সুতরাং চলছে মেশিন বক্ বক্ করে। ওদিকে কাজ হাঁসিল হয়ে গেল।

রাত বারোটায় সমগ্র শিবির যখন গভীর ঘুমে অচেতন, তখন বারান্দায় পাহারারত বন্দুকধারী একটি সিপাই ইষ্টার্ণ ব্যারাকের চার নম্বরের দরজার শিকের সমুখে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত রকমের গলার শব্দ করলো, অনেকটা খুসখুসে কাসির মতো। সুধাংশু ভট্টাচার্য্যের মশারিতে সে শব্দ প্রতিধ্বনি তুললো। অন্ধকারেই বেরিয়ে এলেন ভট্টাচার্য্য মশাই। প্যাকেট নিয়ে এসে আবার প্রবেশ করলেন মশারির অভ্যন্তরে।

কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিদিন সকালে সেন্সর করবার পর পাঠাতেন অনেকগুলো 'ষ্টেটস্ম্যান'। সেন্সর করবার জন্যে আই বি অফিসার পবিত্র সরকার ওখানে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত ছিলেন। যে কোন সংবাদ তাঁর কাছে আপত্তিজনক মনে হতো, সেটুকুই তিনি সাবধানে কাঁচি চালিয়ে কেটে নিতেন, অপর পৃষ্ঠার ক্ষতির প্রতি দৃক্‌পাত করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন না তিনি। এমনি অস্ত্রোপচার করা জানালা-দরজাওয়ালা পত্রিকা আমাদের ভাগ্যে প্রায়ই জুটতো।

জুন মাসের প্রায় মাঝামাঝি গোপনে আমদানী একটি পত্রিকায় মারাত্মক একটি সংবাদ পাওয়া গেল। চট্টগ্রামের ধলঘাট গ্রামের একটি গৃহে একদল গুর্খা সেনা হানা দেয় ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের নেতৃত্বে। সেই গৃহে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার জনাকতক পলাতক আসামী ছিলেন আর তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদেদার, নির্ম্মল সেন, অপূর্ব্ব সেন ও স্বয়ং মাষ্টারদা'। কয়েক ঘণ্টা উভয় পক্ষ থেকে গুলীবর্ষণের পর দেখা যায় ক্যাপ্টেন ক্যামেরন বিপ্লবীদের গুলীতে নিহত আর গুর্খা সেনার গুলীতে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন বিপ্লবী অপূর্ব্ব ও নির্ম্মল সেন। প্রীতি ও মাষ্টারদা' সতর্ক ও সশস্ত্র পুলিশবেষ্টনীর মধ্যে দিয়েই নির্ব্বিঘ্নে পলাতক।......

সে দিন রাত্রে ভালো করে ঘুমই এলো না আমার। বার বার মনে হতে লাগলো মাষ্টারদা'র কথা। চট্টগ্রামের অনেক বন্দী ছিলেন। তাঁদের মুখে এই লোকটির অসমসাহসিক ক্রিয়াকলাপের কাহিনী বহু শুনেছি। পুলিশের সতর্ক তল্লাসীকে ফাঁকি দিয়ে তাঁরা দু'একখানা ছবিও এনেছেন তাঁর। দেখেছিলাম সে ছবি। টাক-পড়া মাথা, চোয়াল উঁচু, গাল তোবড়ানো, ভগ্নস্বাস্থ্য আর শুনেছি খর্ব্বকায়। শুধু সাধারণ নয়, অতি শোচনীয়ভাবে নিম্নশ্রেণীর লোক বলে মনে হয়। ব্যক্তিত্ব তো দূরের কথা, দশজনের সমুখে দাঁড়িয়ে কথা কইবার হিম্মৎ আছে বলে মনে হয় না। গলাবন্ধ কোটের নীচে পাতলা

চামড়া দিয়ে ঢাকা খানকয়েক সরু হাড়ের কোটরে ধুক্ ধুক্ করে যে যন্ত্রটি চলছে, ছবি দেখে মনে হয় ক্যামেরনের একটা হুমকিতেই সেটা ঠক্ করে থেমে যাওয়া উচিত ছিল। শ্রদ্ধা তো দূরের কথা আকৃতি দেখে মনে খানিকটে অবজ্ঞা জাগলেও নালিশ করবার কিছু নেই।

কিন্তু আশ্চর্য্য এবং বিশ্বের আশ্চর্য্যতম সত্য যে, এই অতি সাধারণ ইস্কুল-মাষ্টারটি চমক লাগিয়ে দিয়েছেন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে। একটি চুম্বকের মতো দুর্নিবার বেগে টেনে এনেছেন চট্টগ্রামের জাগ্রত যৌবনকে, অকস্মাৎ বৈদ্যুতিক অভ্যুত্থানে কুকুরের মতো বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন সেখানকার পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে। ড্যাবডেবে দু'টি চক্ষুর নীল সাগরের কোন্ অন্ধতলে আগ্নেয়গিরির অগ্নিকণা লুকিয়ে আছে, ছবি দেখলে আদৌ হদিস পাওয়া যায় না তার। যেন একটি অনির্ব্বাণ বয়লার; মোটা ইস্পাতের পাত দিয়ে ঢেকে অন্ধকার করে রাখা হয়েছে।

চট্টগ্রামের সূর্য্য সেন বাংলার তথা ভারতের বিপ্লব-সূর্য্যের একটি উত্তপ্ত রশ্মি। চট্টল-গগনে তাঁর উদয়। অস্ত নেই তাঁর। যুগে যুগে কালে কালে বিপ্লবীর রক্তরাঙা পথে সেই অম্লান রশ্মি আলোক বিকীরণ করবে!·· ···

বহরমপুর বন্দীশিবিরের বন্দীবাহিনী বিপ্লবী নির্ম্মল ও অপূর্ব্ব সেনের উদ্দেশ্যে গার্ড অব অনার প্রদর্শন করলো। ওয়েষ্টার্ণ এনেক্সি ও ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের মধ্যস্থলে সুউচ্চ বেদীর ওপর অপূর্ব্ব ও নির্ম্মল সেনের প্রতিকৃতি। এঁকেছেন তাঁরই কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পাশে হিমাংশু সেন এবং আরো উনিশ জন শহীদের নামফলক।

এ সব ব্যাপারে কোনো সভাপতি থাকেন না, বক্তৃতাও হয় না। সেনাদল বেদীর পানে মুখ করে এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়ায়। জি-ও-সি মুখপাত্ররূপে চার পা এগিয়ে যান বেদীর পানে, তারপর ঠকাস্ করে বুটের শব্দ করে হুকুম করেন: **In profound respect to the deathless martyrs Sa—lute!**

জি-ও-সির সঙ্গে সঙ্গে সবাই স্যালুট করে।

তার পর জি ও জি বেদীর পরে ওঠেন। বেদীর উপর রক্ষিত প্রতিকৃতি ও নামফলকগুলির আবরণ উন্মোচন করে মাত্র এক মিনিট বক্তৃতা করেন: কমরেডস্, আজ দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করছি, কমরেড নির্ম্মল ও অপূর্ব্ব সেন

ইংরেজের গুলীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, প্রীতিলতা ও মাষ্টারদা' ক্যাপ্টেন ক্যামেরনকে হত্যা করে পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন। আজ আমরা স্মরণ করি শহীদ নির্ম্মলকে, শহীদ অপূর্ব্বকে আর বাংলা ও ভারতের অগণিত শহীদদের। আমাদের বিপ্লবপ্রচেষ্টায় তাঁরা আশীর্ব্বাদ করুন, এই কামনা।

In memory of the innumerable martyrs, Comrades Sa—lute !

সবাই স্যালুট করে।

সেদিনকার গার্ড অব অনার প্রদর্শনের শেষে চট্টগ্রামের জ্যোতিশ্বর চক্রবর্ত্তী আমায় একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন : The real G. O. C. of the Liberation Army of India। সত্যই আপনার সৈন্যবাহিনী পরিচালনা ও সমগ্র অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করবার বলিষ্ঠ রীতি বিপ্লবীদের পক্ষে অনুকরণীয়। আন্তরিক ধন্যবাদ !

বিশেষণে সবিশেষ লজ্জিত হলাম।

সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজ হতো প্রতিদিন ভোর ছ'টায়। সাড়ে পাঁচটায় সিপাই এসে দরজা খুলে দেবার পর মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে মাঠে এসে হাজির হওয়া কঠিন বলে সবাইকেই শয্যাত্যাগ করতে হতো রাত চারটেতে। যখন আর দশ মিনিট বাকি, তখন অর্ডারলি অমর চ্যাটার্জ্জী প্রত্যেক ব্যারাকের নিকটে গিয়ে বাঁশী বাজিয়ে সতর্ক করে দিয়ে আসতো।

শুধু মিনিটের কাঁটাই নয়, সেকেণ্ডের কাঁটাটিও যখন ষাটের কোঠায় এসে ঠেকতো, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে জলদগম্ভীর স্বর শোনা যেত জি-ও-সির : কমরেড্‌স্‌, ফল্‌-ইন।

তারপর এক ঘণ্টা চলতো কুচকাওয়াজ। এক সেকেণ্ড দেরী হলেও কেউ রেহাই পেত না।

একদিন হরিদাস সেন দেরী করে আসাতে দশ মিনিট তাঁকে ডবল মার্চ্চ করতে হয়। আর একদিন করালী বিশ্বাসকে অভিনব শাস্তি নিতে হয়। বাহিনীকে মার্চ্চ করবার হুকুম দিয়ে করালীকে নির্দ্দেশ দেয়া হলো সর্ব্বদাই

সমগ্র বাহিনীর বিশ গজ সমুখে থেকে তাঁকে মার্চ্চ করতে হবে। লীডারের মতো মাতব্বরি পদক্ষেপে বেশ চলছিলেন করালীকান্ত। কিন্তু যেই বাহিনী অ্যাবাউট টার্ণ করলো, অমনি চোঁ দৌড়ে করালীকে এসে আবার বিশ গজ সামনে স্থান নিয়ে মার্চ্চ করতে হলো। বাহিনী এবার রাইট টার্ণ করলো, আবার করালী দৌড়ে এসে স্থান নিলেন। এর পর বাহিনী বার বার দিক পরিবর্তন করতে সুরু করলো আর বার বারই করালীকে দৌড়ে এসে পুরো ভাগে স্থান নিতে হলো। এমনি দৌড়াদৌড়ির শাস্তি পনেরো মিনিট ভোগের পর করালী রেহাই পেলেন সেদিনকার মত।

নিয়মিত কুচকাওয়াজে বন্দীদের মধ্যে এই বাহিনী যেমন হয়ে উঠেছিল জনপ্রিয়, তেমনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হতো সামরিক নিয়মাবলী। প্যারেডের মাঠে দ্বিজেন গাঙ্গুলী যে সর্ব্বাধিনায়ক জি-ও-সি, একথা প্রতি পদক্ষেপে মেনে চলেন সবাই। দলীয় চেতনা যাঁর যতই উৎকট থাক, সমগ্র শিবিরে যতই নেতৃস্থানীয় হোন না কেন যিনি, সিনিয়রিটি যাঁর যত বেশীই থাক, তথাপি একথা তাঁরা অন্তর দিয়ে মেনে চলতেন যে, বহরমপুর বন্দীশিবিরের সেনাবাহিনীর জি-ও-সি একজন আর সে দ্বিজেন গাঙ্গুলী।

মেহেদির বেড়াকে প্রথমে মনে করা হতো অনতিক্রম্য বাধা। সেনাদল মার্চ্চ করে তার সম্মুখীন হয়ে মার্ক টাইম করতো পরবর্ত্তী নির্দ্দেশের অপেক্ষায়। কিন্তু পরে শিক্ষা দেয়া হলো এই সামান্য বাধা লম্ফ দিয়ে উৎরে যেতে হবে। ফলে, অনেকেরই পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল মেহেদির কাঁটায়।

সমগ্র আবহাওয়ার মধ্যেই এল নিয়মানুবর্ত্তিতা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা। সামরিক কুচকাওয়াজের মধ্যে দিয়ে যুবকদের সৈনিকের মতো গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছিল এই বাহিনী। তাই জেলা হিসাবে বেছে বেছে জনকতককে সেকশন-কমাণ্ডার নিয়োগ করা হলো—কমেট, বীরেন ঘোষ, বিভূতি চৌধুরী, রংপুরের বিমল মৈত্র, ময়মনসিংহের বিমল চক্রবর্ত্তী, কুমিল্লার সমরেন্দ্র পাল, চট্টগ্রামের ত্রৈলোক্য বিশ্বাস, নোয়াখালীর হরিভূষণ মজুমদার, দিনাজপুরের করালী বিশ্বাস প্রভৃতি। মুক্তির পর এঁরা নিজেদের জেলায় এমনি সেনাবাহিনী গড়ে তুলবেন, এই ছিল উদ্দেশ্য।

একদিন সকালে কুচকাওয়াজের শেষে ঘরে এসে চা খাচ্ছি, এমন সময় একজন বেয়ারা এল অফিস থেকে। নিবেদন করলো, বড় সাহেব আমার

একবার 'সেলাম' দিয়েছেন। আমি সেই সামরিক পোষাকেই অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম, 'সেলাম' দিয়েছেন বড় সাহেব নন, তাঁর মন্ত্রী গবুচন্দ্র—গিরিজা দত্ত।

মহা সমাদরে বসিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে সুরু করলেন গিরিজা: সত্যি, ভারী চমৎকার প্যারেড করান আপনি। আমার সেপাইরা দেখেছে। ওরা বলে, একেবারে হাবিলদারের মতো। আপনি বুঝি ইউনিভারসিটি কোর্-এ ছিলেন?

বললাম: না তো। ইউনিভারসিটিতে এখনও প্রবেশের সুযোগই পাইনি আমি। আটাশ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরী হয়, আমি তাতে 'বি' কোম্পানীর সার্জেণ্ট ছিলাম।

গিরিজা বলে যেতে লাগলেন: আমি আপনার প্যারেড না দেখলেও আপনার গলার আওয়াজ শুনি। আমার বাড়ী থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। আপনার ফুসফুসে বেশ জোর আছে তো। একদিন অফিস থেকে সাহেবই আপনার গলা শুনতে পেয়ে আমায় ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। মিলিটারী ম্যান কিনা, তাই প্যারেড ওরা ভারী পছন্দ করে।

বলে গিরিজা দত্ত অহেতুক চারিদিকে একবার চেয়ে নিলেন, কেউ নিকটে আছে কি না। অহেতুক এ জন্যে যে একদিকে দেয়াল ও তিন দিকে কাঠের পার্টিশন দিয়ে ঘেরা তাঁর কক্ষ, কক্ষের মধ্যে তিনি ও আমি। পার্টিশনের বাইরে যারা অন্য কাজে রত, তাদের আর দেখা যাবে কি করে? বোধহয় পরের কথাগুলিতে গুরুত্ব সংযোজনা করবার জন্যেই অকস্মাৎ গলা খাটো করে বললেন: কিন্তু জানেন তো, দ্বিজেনবাবু, একজন টিকটিকি এখানে বসে আছেন শ্যেন দৃষ্টি মেলে, অতি সহজ জিনিসকে বাঁকা করে দেখাই যাঁর একমাত্র কাজ। আর শুধু কি দেখা, সঙ্গে সঙ্গে নলিনী মজুমদারের কানে তুলে না দিলে তাঁর ঘুমই আসে না।

গিরিজা দত্তের উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলাম: কী আর এমন কথা তিনি কানে তুলবেন?

বিস্ময় প্রকাশ করলেন গিরিজা: বিলক্ষণ! বলেন কি, দ্বিজেনবাবু? এখানকার সূঁচ পড়ার সংবাদটিও সযত্নে উনি ওপরওয়ালায় কানে বজ্রপতন হয়েছে বলে তুলে দিলে শুধু যে কর্ত্তব্য সম্পাদনই হবে তাই নয়, ওঁর

প্রমোশনের পথ বেশ খোলসা হয়ে আসবে! এই জন্যেই, মশায়, আই বিতে কখনো গেলামই না আমার এই আটাশ বছর চাকরিতে। চান্স কি কম পেয়েছিলাম, মশাই? ওখানে গিয়ে যে সব নেমকহারামি কাজ করতে হয়, তা মশাই, আমার ধাতে সয় না। ভদ্রলোকের ছেলে তো সবাই!

আসল কথায় আসার তাগিদ দিলাম: কি করেছেন পবিত্র সরকার? বিরক্তিতে গিরিজার কণ্ঠ প্রায় ক্রুদ্ধের মতো শোনা গেল: কি আর করবেন! আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে বেশ ভালোই আছেন দেখে তাঁর সইবে কেন? অতএব বাহাদুরী নিলেন এবার আপনাদের ঐ প্যারেডের খবরটি বেফাঁস করে দিয়ে।

চমকে উঠলাম: কি হয়েছে?

ওপর থেকে নির্দেশ এসেছে আপনাদের প্যারেড নিষিদ্ধ করে দেবার। কেন, এতে দোষটা কি হচ্ছিলো বলুন তো? স্বাস্থ্যরক্ষা ছাড়া এর আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, আমার এই আটাশ বছরের চাকরি নিয়েও তো বুঝতে পারছি না। ক্যাম্পের মধ্যে এটাকে সংঘবদ্ধ ব্যায়াম ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?—আর আপত্তিজনক কিছু দেখলে আমরাই তো পারি আপনাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটা আপোষ-রফা করতে—

প্রশ্ন করলাম: কি, গভর্ণমেন্ট আমাদের প্যারেড বন্ধ করবার হুকুম জানিয়েছেন নাকি?

আজ্ঞে, তাই তো দেখছি!—বলে গিরিজা মহা অপরাধীর মতো বলতে লাগলেন: মানে এমনিভাবে ইনি লাগিয়েছেন যে, আমাদের ডিসক্রিশনের কোন সুযোগই আর দেয়নি। আর এতে Administration ও discipline-এর সত্যিই ক্ষতি হচ্ছে কিনা, সে তো বুঝবো আমরা, যারা প্রতিদিন আপনাদের সুখদুঃখের ভাগ নিচ্ছি।—ছিঃ, ছি, ছিঃ কী আর বলবো, দ্বিজেন-বাবু, এই করেই তো গেল বাঙালী জাতটা! ইস, এতগুলো টাকা ব্যয় করে আপনারা পোষাক তৈরী করালেন, এখন যদি প্যারেড না হয়—

বাধা দিলাম: প্যারেড বন্ধ হয়ে যাবে কে বললে?

গভর্ণমেণ্ট যে বন্ধ করে দিয়েছেন দ্বিজেনবাবু!

জবাব দিলাম: প্যারেড করি আমরা, গভর্ণমেন্ট নয়। আমরা তো বন্ধ করিনি। এই তো এখনই করে এলাম।

গিরিজা দু'চোখ কপালে তুলে ফেললেন : বিলক্ষণ, বলেন কি ! সরকারী হুকুম না মানলে আমাদের যে চাকরি যাবে, দ্বিজেনবাবু—

বললাম : তা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের আত্মমর্য্যাদার মূল্য আপনাদের চাকরির চাইতে অনেক বেশী।

গিরিজা এবার অফিসিয়েল মুখোশ পরবার চেষ্টা করলেন : কিন্তু হুকুম তামিল করা ছাড়া গত্যন্তর নেই আমাদের।

হুকুম তামিল-করা ভৃত্যদের আরো কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় কি কাজে স্বয়ং কমাণ্ডাণ্ট টবিন এসে গিরিজার কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে দেখেই বলে উঠলেন : হ্যালো জি-ও-সি, perhaps you have received the Government order ?

It has been communicated to me just now—জবাব দিলাম।

টবিন ক্রুর হাসিতে ঠোঁট দু'খানি একটুখানি প্রসারিত করে এবং নীল চোখে হাসির আভা ফুটিয়ে তুলে প্রশ্ন করলেন : Would you stop the Drill just from today ?

উঠে দাঁড়ালাম, জবাব দিলাম : Certainly not. It shall go on as usual.

আহত টবিনের কণ্ঠে এবার বৃটিশ-সিংহের গর্জ্জন শোনা গেল : Do you realise I am the Commandant of this Camp and I know how to make you stop it ?

সিংহ-গর্জ্জনেরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল জি-ও-সির কণ্ঠে : And do you realise I am the G. O. C. of the Berhampore Detention Camp Infantry and I know how to defy your orders ?

দেরী নয়। গট গট করে বেরিয়ে চলে এলাম। গেটের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল অর্ডারলি অমর। সাংঘাতিক কিছু একটা অনুমান করে নিয়েই প্রশ্ন করলো : গণ্ডগোল হলো নাকি কিছু ?

হলো এবং আরও হতে পারে।—সবটা বললাম অমরকে।—ঘরে ফিরে আসবার আধঘণ্টার মধ্যেই প্রেসিডেন্ট পরেশ সান্ন্যাল সমর পরিষদের জরুরী বৈঠক আহ্বান করলেন। ঐদিন বিকেলেই স্পেশাল প্যারেডের প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। ফল্-ইন্ চারটেতে। চললো বাহিনীর মার্চ্চ—লেফট রাইট লেফট, লেফট রাইট লেফট !

সংবাদ নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে বৃটিশ-সিংহের কানে। কানে পড়েছে গরম সিসে! প্রকাণ্ড গেটের মধ্যে দিয়ে এসে ঢুকলো একদল রাইফেলধারী সিপাই। কুচকাওয়াজ মাঠের প্রান্তে এসে দাঁড়ালো। ৎৎ পেতে রইলো নেকড়ে বাঘের মতো!

চেয়ে দেখলাম। এ তো জানা কথাই। রাইফেলে নিশ্চয়ই গুলী ভরা আছে। প্রয়োজন শুধু জমাদারের হুকুম। সে হুকুমও কঠিন কিছু নয়।

কিন্তু মার্চ আমরা করেই চলেছি অবিচ্ছিন্নভাবে—লেফট রাইট লেফট, লেফট রাইট লেফট·· ···

নির্ভীক, নিঃশঙ্ক, ভয়-লেশহীন!

সতেরো

পূর্ব্বেই বলেছি, হবুচন্দ্র রাজার গো যখন ব্যারোমিটারের পারাকে লাথি মেরে মেরে ওপরে তুলছে, গবুচন্দ্র মন্ত্রী তখন বিপর্যয়ের আশঙ্কায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন বৃহৎ একখণ্ড বরফ নিয়ে। যুক্তি-পরামর্শের ঠাণ্ডা লজিক তখন উঠতি পারাকে নামিয়ে আনে ধীরে ধীরে।

এ ক্ষেত্রেও হলো তাই। বন্দুকধারী সান্ত্রীগুলো শুধু দৃষ্টি দিয়েই লোলুপতা প্রকাশ করলো, ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটাতে পারলো না। কারণ, বোধহয় অবশেষে ঝানু কূটনীতিবিদ্ গিরিজার হুকুম এলো টবিনের হুকুমকে সংশোধন করে—অ্যাবাউট টার্ণ, কুইক মার্চ্চ!

সিপাইরা চলে গেল: জয়লাভ করলো আমাদের সেনাবাহিনী।

এমনি করে সেনাবাহিনীর যেমন বৃদ্ধি পেলো জনপ্রিয়তা, তেমনি সর্ব্বাধিনায়ক হিসেবে আমিও সবার স্নেহ প্রীতি আকর্ষণ করলাম। বয়স আমার মাত্র একুশ। আমার বয়সী বন্দীর ভিড় ছিল। তথাপি সামরিক নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রবর্ত্তনের ব্যাপারে আমার ব্যক্তিত্বকে বহরমপুর বন্দী শিবিরের সবাই মেনে চলতেন।

কিন্তু কি জানি কেন, ১৯৩২ সালের জুন মাসের শেষদিকে অনুশীলনের বন্দীরা পৃথক্ বাহিনী গঠনের সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। কেন করলেন,

তার যুক্তিপূর্ণ কোনো কারণ সেদিনও যেমন খুঁজে পাইনি, এতকাল পরে আজও তেমনি মনে করতে পারি না। সেকালের বন্দীরা আমার এই কাহিনী পাঠ করে হয়তো ক্ষুণ্ণ হবেন, কিন্তু তৃতীয় পক্ষ হিসেবে নিরপেক্ষ অভিমত দিতে হলেও আমি বলতে বাধ্য যে, উগ্র দলগত চেতনা ও হীনমন্যতাই ছিল এর একমাত্র কারণ।

ব্যারাক তাঁদের পৃথক ছিল সত্য, তেমনি চৌকাও। তাঁদের প্রতিনিধি পৃথক্‌ভাবে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন দৈনন্দিন চাওয়া ও পাওয়া নিয়ে। একই শিবিরে বাস করলেও অন্তরঙ্গতা কঠিনভাবে সীমাবদ্ধ থাকতো দলীয় পরিধির মাঝখানে। চাই বা না চাই, একটা অদৃশ্য দেয়াল শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল অনুশীলন ও যুগান্তর দলের সীমানায়!

কিন্তু একথা কোনো বন্দীই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, বহরমপুরে এই বন্দীবাহিনী ছিল দলীয় স্বার্থ বা চিন্তার অনেক উর্দ্ধে। একটি বৃহত্তর পরিকল্পনা নিয়েই এর জন্মলাভ এবং এর সর্ব্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল যে সমর পরিষদের ওপর, তাতে অনুশীলনেরও যথেষ্ট সংখ্যক সদস্য ছিলেন এবং তাঁদেরও ছিল পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার। সামরিক আওতার মধ্যে কোথাও দলীয় স্বার্থের গন্ধ ছিল না। তাঁরাও তা অনুভব করতেন।

তথাপি অনুশীলনের বন্দীরা আমাদের ত্যাগ করলেন। অবশ্য এর ফলে সংখ্যা আমাদের তেমন উল্লেযোগ্যভাবে কমলো না, কারণ এই পৃথকীকরণের ছুরিকাঘাতে যতটুকু ক্ষত হলো, নতুন নতুন বন্দীরা এসে যোগদান করে তা অচিরে নিরাময় করে দিলেন।

অনুশীলনের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা যখন ত্রিশের কোঠায় এবং সপ্তাহে মাত্র দু'দিন প্যারেড-মাঠে তারা আত্মপ্রকাশ করে, যুগান্তরে তখন নিয়মিত প্রতিদিনকার কুচকাওয়াজে যোগদান করে শতাধিক নওজোয়ান!···অনুশীলনের বাহিনী পরে একেবারেই ভেঙ্গে দেয়া হয় যখন, যুগান্তর দলে তখন সৈন্য-সংখ্যা প্রায় দু'শো।

দিন একরকম কেটে যাচ্ছিল। ভালোভাবে না একঘেয়ে ধরনে, আজ আর তা মনে করতে পারি না। বাইরে যাদের ফেলে এসেছি, মন থেকে তাদের একেবারে মুছে ফেলতে না পারলেও বার বারই মনে হয়েছে, তারা

বাস করে এক পৃথক্ জগতে। আমাদের বন্দী শিবিরে বন্দী-জগতের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। থাকলেও কোনোদিন সে চিন্তা মনকে আচ্ছন্ন করা দূরে থাক, মনের স্ফটিক চত্বরে তার ছায়াও ফেলতে পারেনি। পুব দিকের ঐ প্রকাণ্ড শিমুল গাছটার কোণ ঘেঁসে সকালের সূর্য্য যখন দেখা দেয়, জানি, আমাদের গ্রামের মাখন মুদীর দোকানে তখন ক্রেতাদের ভিড় লেগে গেছে। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বহরমপুরের শুষ্ক উত্তপ্ত হাওয়া যখন শরীরের রক্তবিন্দুগুলিকে শুকিয়ে দেবার চেষ্টা করে, জানি, আমাদের বাড়ীর দক্ষিণের কোঠায় তখন হু হু করা দখিন হাওয়ার মাতামাতি। রাত দশটা বাজতেই এখানে যখন ঘরে ফিরে যাবার বিউগল বেজে ওঠে, বেশ জানি, আমাদের বাড়ীর ছাঁদে তখনো বৌদিদের ও পড়শীদের ভিড়।

কিন্তু সব জেনেও মনে হয় ও সব জানতে নেই, মনে রাখতে নেই, রেখে-আসা দিনের কথা ভাবতে নেই। অজস্র ও অসংখ্য নিজের ও পরের কাজে ব্যাপৃত থেকে নিমেষের জন্যও কখনও মনকে বসে থাকতে দিই না, পাছে হৃদয়াবেগের ভূত তার স্কন্ধে চেপে বসে। বহরমপুর বন্দীশালার গেট বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে মনের সবগুলো বাতায়নই শুধু বন্ধ করে দিইনি, তাতে তুলে দিয়েছি অর্গল, ঝুলিয়ে দিয়েছি পুরু পরদা। বাহিরকে আর ভেতরে আসতে না দেবার কঠোর ব্রত গ্রহণ করেছি।

তবুও লোহার নিশ্ছিদ্র কুঠরির মধ্যেও কিজানি কি করে সাপ এসে পড়ে, সাপ লক্ষীন্দরকে দংশন করে, সে দংশনে তার মৃত্যু হয়!···সজাগ সতর্ক প্রহরাকে ফাঁকি দিয়ে কী করে কখন্ কোন্ পথে অকস্মাৎ এসে পড়ে হয়তো একমুঠো ফুলেল হাওয়া, এক ঝলক দক্ষিণা মলয়। সাজানো-গোছানো সুকঠিন তপশ্চর্য্যার পারিপাট্যে অকস্মাৎ আঘাত লাগে, তাতে দাগ ধরে, বিপর্য্যয় কাণ্ড বেধে যাবার উপক্রম হয়। ফুলেল হাওয়া তুলে ধরে কালবৈশাখীর কালো ফণা!······

অকস্মাৎ একদিন নীল খামে একখানা চিঠি এল। নীল রংয়ের কাগজে চমৎকার হরফে লেখা দীর্ঘ পত্র, চারটি পৃষ্ঠা ভর্ত্তি। লিখেছে লতিকা। লতিকা দাশগুপ্তা। বেথুনের বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী। একেবারে স্পষ্ট নির্লজ্জ প্রেমপত্র। কোনো উপক্রমণিকা নেই, প্রস্তাবনা নেই, যবনিকা ওঠবার প্রাক্কালে কোন ঐক্যতান নেই। একেবারেই নির্জলা নাটক!···"আমি

তোমায় চাই, একান্ত করে, নিজস্ব করে চাই। শুধু ভালো লাগেনি, তোমায় ভালোবেসেছি সারা অন্তর দিয়ে। তোমায় না পেলে ব্যর্থ হবে আমার জীবন, ব্যর্থতা নিয়ে বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা নেই।'

পরিশেষে এই ক'টি কথা লিখে শেষ করেছে: 'আমার কোন খোঁজ তুমি আর না নিলেও আমি নিয়মিত তোমার সংবাদ সংগ্রহ করি বীণার কাছ থেকে প্রতি রবিবার নীলমণি মিত্র লেনে গিয়ে। অপেক্ষা করবো আমি, তুমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত। পথ চেয়ে থাকবো তোমারই প্রতীক্ষায়। ইতি—

—তোমারই লতিকা'

আমারই লতিকা!! আমার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত ক্ষোভে দুঃখে একেবারে আর্ত্তনাদ করে উঠলো!...একেবারে উপন্যাস সৃষ্টি করে ফেলেছে লতিকা। চার পৃষ্ঠাকে টেনে নিয়ে অনায়াসে এবার কলম চালিয়ে যাওয়া যায় চারশো পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, কিংবা উদাস নয়নে আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে কাটিয়ে দেয়া যায় সারাটা দিন। কিন্তু কী মারাত্মক কাণ্ড করে বসলো লতিকা! সে কি জানে না, একেবারে বোকা বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী, যে, আমাদের প্রত্যেকখানা চিঠি আমাদের হাতে এসে পৌছোবার পূর্ব্বে খোলে পবিত্র সরকার? পড়ে পড়ে একেবারে কণ্ঠস্থ করে ফেলে সেন্সর করবার নামে?—ছিঃ ছিঃ ছিঃ, ব্যাটা এমনি চিঠি পেয়ে হয়তো গিরিজাকে দেখিয়েছে, গিরিজা হয়তো বলেছেন টবিনকে। তারপর তিনজনে মিলে কত হাসিই না হেসেছেন, আর বলেছেন, এই হচ্ছে জি-ও-সি! বাইরে কড়া মিলিটারী খোলস আর ভেতরে ভেতরে রসের সাগর।...বন্দীরাই বা কেউ জেনেছে কি না কে জানে! হয়তো এতক্ষণে সংবাদ এসে গেছে, ব্যারাকে ব্যারাকে চলছে কানাঘুষা, হাসিঠাট্টা, জটলা, গুপ্ত বৈঠক। এইবার সব আসবে একে একে জি-ও-সিকে অভিনন্দন জানাতে, শ্লেষের তীরে বিঁধতে, মুখের ওপর অপমান করে যেতে!...উঃ, আর ভাবতে পারি না। মাথার রগ দু'টো ঠক্ ঠক্ করে লাফাচ্ছে!......

এই উত্তপ্ত মধ্যাহ্নেই চাদরখানায় আপাদমস্তক ঢেকে চোখ বুঁজে সটান শুয়ে পড়লাম। কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। কিন্তু যখন জাগলাম, তখন দেখি সেটা ১৯২৯ সাল, কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ. ক্লাসের ছাত্র আমি।...

মার্টিন কোম্পানীর চাকুরে সুন্দরদা' অর্থাৎ সুখময় গাঙ্গুলী বিপদে পড়লেন আমায় নিয়ে। পেছনে টিকটিকি লেগেছে। তাঁর রামাপুরার বাড়ীতে আমার অনুপস্থিতিতে হানা দিয়েছে ক'বার, অফিসেও গেছে।

কি সুখময়বাবু, চাকরিটি খোয়াবার ইচ্ছে আছে নাকি?

সুন্দরদা' প্রশ্ন করেন: কেন, বলুন তো?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বলেন: আর কেন। বাড়ীতে পুষছেন কাল সাপ, সে সংবাদ রাখেন কি?

কাল সাপ?

হঁ্যা, কাল সাপ। আপনার কলকাতা থেকে-আসা ভ্রাতাটি একটি আস্ত টেরোরিষ্ট। গায়ে দিয়েছেন অবিশ্যি কংগ্রেসী ছদ্মবেশ। বাঙালীটোলা কংগ্রেসের সহ-সম্পাদক আর বিবেকানন্দ সেবাসমিতির সম্পাদক হয়ে যতই কেন না ফাঁকি দেবার চেষ্টা করুন, আমাদের দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর।

সুন্দরদা' তাঁকে নিয়ে অফিসের বাইরে বারান্দায় এলেন। একটা সিগারেট অফার করে চিন্তিতমুখে প্রশ্ন কবলেন: কেন, কিছু করেছে নাকি?

ভদ্রলোক জবাব দিলেন: করেনি, কিন্তু করবার ফিকিরে আছে। সারনাথ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী যায়, সেখানে আসে ত্রিলোক সিং আর অমরনাথ মেহরোত্র। সারারাত জটলা চলে। আর বাঙালীটোলা কংগ্রেসের সম্পাদক কে জানেন তো? জিতেন লাহিড়ী। কাঁকোরী মামলার ফাঁসীর আসামী রাজেন লাহিড়ীর দাদা।

সুন্দরদা' গম্ভীর হয়ে গেলেন। এত খবর তো তিনি রাখেন না। ভোর হতেই চলে আসেন অফিসে। দুপুরে ফিরে গিয়ে স্নানাহারের পর ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে আবার চলে আসতে হয় অফিসে। ফেরেন রাত্রে। প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা হয় না। বৌদিই আমার তদারক করেন। কংগ্রেসে যোগদানে তেমন আপত্তি ছিল না সুন্দরদা'র, কারণ আপত্তিজনক তেমন কিছু তখনো কংগ্রেসের কর্ম্মসূচীতে স্থান পায়নি। আর বাঙালীটোলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন তখন কিরণচাঁদ দরবেশ। আমার আপন মামা, মায়ের ছোট ভাই। আসল নাম, কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাকিন গ্রাম খালিয়া, পোষ্ট অফিস—ঐ, থানা রাজৈর, মহকুমা মাদারীপুর, জেলা ফরিদপুর। খালিয়ার অন্যতম জমিদার কুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ শ্রীশচন্দ্র জমিদারী

চালাতেন, তাঁর দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত আর কনিষ্ঠ পায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াতো। অকস্মাৎ সেই ফুলবাবুটি দীক্ষা নিয়ে বসলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে। ফলে, বিলাস-ব্যসন গেল, নিভে গেল জমিদারী মেজাজ, শুধু ঘরই ছাড়লেন না তিনি, কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিরণচাঁদ দরবেশে রূপান্তরিত হলেন এবং এসে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন সুদূর কাশীতে।

তাঁর গায়েও একদা স্বদেশীর আঁচড় লেগেছিল। কি করে জানি না, বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন তিনি এবং তাঁদের কাজে সহযোগিতা করেন। তারপর দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি অকপটভাবেই স্বদেশী ত্যাগ করে পূজা-অর্চ্চনা নিয়ে সময় কাটাতেন। হিংসায় আর বিশ্বাস করতেন না। ১৯২৯ সালে কাশীতে পড়বার সময় আমার পাল্লায় পড়ে মামা বাঙালীটোলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হতে রাজী হয়েছিলেন। কয়েকটা সভাতে যোগদানও করেছিলেন। কিন্তু আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে, কংগ্রেসের আংরাখার নীচে যেন বিপ্লবের ছুরি না শানাই। .....

সুন্দরদা এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে প্রশ্ন করলেন : কি করা যায় তাহলে ?

কি করা যেতে পারে ও কি করা উচিত, সে সম্বন্ধে ভদ্রলোক এমনি সারগর্ভ এক বক্তৃতা দিলেন যে, সেদিনই রাত্রে সুন্দরদা', বৌদি ও আমার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, অতঃপর আমি বসবাস করবো পৃথক্ স্থানে, শুধু দু'বেলা এসে এখানে খেয়ে যাবো।

সুতরাং দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে একটি গলিতে একখানা পুরোনো বাড়ীর দোতলায় একখানা ঘর নিলাম।

জিতেন লাহিড়ীর হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দোকান ষ্টার কোম্পানীতেই ময়মনসিংহের হরেন রায়ের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং অতিক্রত সেই পরিচয় রূপায়িত হয় প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতায়। হরেনদা' আর দ্বিজেনবাবু, আপনি ও তুমিতে এসে ঠেকলো। হরেনদা'র বাসায় গিয়ে পেয়েছিলাম এক দিদি, হরেনদা'র বড় বোন। কিন্তু আমার কাছে তিনি ছিলেন শুধু দিদি নন, মা-ও! আমার জন্যে তাঁর স্বতঃ-উৎসারিত নিবিড় স্নেহের কথা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আজও স্মরণ করি।

দিদির ওখানেই পরিচয় হয় বীণার সঙ্গে। আঠারো বছর, আমার

সমবয়সী। বিবাহিতা, একটি মেয়ে হয়েছে। কলকাতা থেকে কাশীতে এসেছে স্বাস্থ্যোদ্ধারে মাকে নিয়ে। যেমনি সরলা, তেমনি আলাপী। কিন্তু আলাপ কোনো একটি বিষয়ে নয়। মুখে খৈ ফুটবে বটে, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে বিষয়বস্তু বদলে যাচ্ছে। যথা: দ্বিজেনদা', আপনি বলে চায়ে চিনি কম খান? আমার তো পুরো দু'চামচে চাই-ই আর তেমনি দুধ—যাবেন আজ বিকেলে দশাশ্বমেধে, নৌকো করে বেড়াবো'খন? ঐ কালীকীর্ত্তন শুনতে এত ভালো লাগে আমার।—মা, বেশ তো লোক তুমি, দ্বিজেনদা' এসেছেন আর এখনো চায়ের জলটা ষ্টোভে চড়িয়ে দিতে পারোনি?—আর পারি না, বাপু, একা সব দিক সামলাতে। যেদিকে না দেখবো, সেদিকেই—মিলি, ও মিলি, কোথায় গেলে, ছাদ থেকে কাপড়গুলো এখনো নামিয়ে আনোনি?

—দ্বিজেনদা', একটা বিয়ে করুন না, দ্বিজেনদা'।

এত শাগ্‌ণির ?—হেসে হয়তো প্রশ্ন করি।

বীণা জবাব দেয়: কেন, আঠারো বছরে মেয়েদের বিয়ে হয়, আর ছেলেদের হয় না বুঝি?—ঐ যাঃ, ডলটা তো বাথরুমে ফেলে এসেছি।—বলেই হয়তো ফস করে চলে যায়। ফিরে এসে বলে: বুধবার আমরা কিন্তু চলে যাচ্ছি, দ্বিজেনদা'। কলকাতা গেলে যেন দেখা করতে ভুলে যাবেন না।

বীণাকে আমার ভালো লাগতো, খুব ভালো লাগতো। ওর প্রাণপাচুর্য্য, অনর্গল হাসি, অবিশ্রান্ত মুখে খৈ ফোটানো, এর পশ্চাতে আছে একটি অতি নির্ম্মম সত্য—মদ্যপ স্বামী তার রক্ষিতা নিয়ে মত্ত, বীণার দিকে ফিরে চাইবার অবসর নেই তার। মাসিমার কাছে যেদিন এই করুণ কাহিনী শুনি, সেদিনই স্থির করেছিলাম কলকাতা ফিরে গেলেই একবার হানা দেবো হাওড়ায় উপেন সরকার মশায়ের বাসায়।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলেজের পর ফেরবার পথে পড়তো বীণাদের বাসা। প্রত্যেক দিন আমার সাইকেল সেখানে হল্‌ট্‌ করতো এবং অনেক দিনই ঘুরে আসতাম বীণাকে সঙ্গে করে বৈকালিক ভ্রমণে। সেখানে চা চলতো, খাবার চলতো এবং বীণার মুখে খৈ ফুটতে ফুটতে কখন্ যে বেলা পড়ে গিয়ে অন্ধকার করে আসতো, টেরই পেতাম না। তখন তো আর সুন্দরদা'র বাসায় থাকতাম না; তাই আর বৌদির জেরার সম্মুখীন হবার আশঙ্কা ছিল না।

১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। বাঙালীটোলা কংগ্রেসকর্ম্মীদের উদ্‌যোগে মহা আড়ম্বরের সঙ্গে সরস্বতী পুজোর আয়োজন হলো। শুধু পুজো নয়, জলসা, নাটকাভিনয় ও তৃতীয় দিবসে সাহিত্য সভা। মণিকর্ণিকা ঘাটের কাছাকাছি কোনো একটা বাড়ীর তেতলার ছাদে এই সাহিত্য সভার অধিবেশন হবে। নামে উদ্‌যোক্তা কংগ্রেসকর্ম্মীরা, আসলে জিতেনবাবু ও আমি।

বিকেল চারটেতে সভা সুরু। সভানেত্রীত্ব করবেন জ্যোতির্ম্ময়ী রায়। সে সময় কলকাতা থেকে কাশীতে বেড়াতে এসেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল প্রভৃতি। আরও উপস্থিত আছেন সুরেশ চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্র রায়, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সভানেত্রীকে নিয়ে আসবার ভার পড়লো আমার ওপর।

গাড়ী নিয়ে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। পরিচয় হলো এবং নাম শুনেই অকস্মাৎ তিনি আগ্রহান্বিত হয়ে আমার বাবা-মা-ভাই-বোনদেরও সংবাদ নিতে লাগলেন। কফি এল এবং সঙ্গে দু'টি ভেজিটেবল স্যাণ্ডউইচ। নিয়ে এল কোনো বয় বা চাকর নয়, একটি মেয়ে। অবিবাহিতা আর অপূর্ব্ব রূপসী। সরু জরিপাড় একেবারে দুধের মতো সাদা মলমল পরেছে। খাটো করে কাটা রুখু চুলের সম্ভার ক্লিপ এঁটে এঁটে সংহত ও সংযত করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী পরিচয় করিয়ে দিলেন: অশোকা, জিতেনবাবুর কাছে তুমি যাঁর এত সুখ্যাতি শুনেছ, life blood of the whole organisation, ইনি হচ্ছেন সেই দ্বিজেন গাঙ্গুলী, আর আমার মেয়ে অশোকা, আই. এ. পড়ছে।

পরিচয় হলো, আলাপ হলো, হাসি-পরিহাসও হলো এবং অবশেষে মোটরে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যখন আমায় একেবারে অশোকার পাশে বসবার জন্যে জিদ করতে লাগলেন, তখনই অকস্মাৎ আমার মনে পড়ে গেল আমিও অবিবাহিত এবং রূপবান স্বাস্থ্যবান যুবক! আশ্চর্য্য সুন্দরী এই অশোকা, পরীর মতো অনৈসর্গিক, সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখবার মতো অলৌকিক! হাত দিয়ে স্পর্শ করতে ভয় হয়, পাছে সৌন্দর্য্যের রেণুগুলি হাতের ময়লা আঠায় লেগে উঠে আসে!......

সাহিত্যসভায় গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ হলো। আবৃত্তিও হলো কয়েকটা। পরিশেষে আমার লেখা "নিরুপায়।" সর্ব্বশেষে গান গাইলো যে

মেয়েটি, শুনলাম তার নাম লতিকা দাশগুপ্তা। কলকাতার মেয়ে, বেড়াতে এসেছে ক'দিনের জন্যে। জিতেনবাবুর কোন্ বন্ধুর আত্মীয়া।

কিন্তু কী অপূর্ব্ব সঙ্গীত! গানের কথা হুবহু আজ আর মনে না পড়লেও সেখানা যে বিরহিণী শ্রীরাধিকার কীর্ত্তন, তা ভুলিনি। কেঁদে কেঁদে বলছেন শ্রীরাধিকা: 'সখি, আর কত সইবো বল্! আসবে বলে চলে গিয়ে আজো সে এল না ফিরে। আকাশের নীলে দেখি তাকে, কোকিলের কাকলিতে শুনি তার কণ্ঠ, নদীর কলধ্বনিতে নিশিদিন শুনি তার বাঁশী! কিন্তু কৈ সখি, সে তো এলো না।···কী মূল্য তবে আমার জীবনের, কী সার্থকতা আমার এই ভরা যৌবনের, কী হবে আমার এই বুকভরা প্রেমের? দে সখি, আমায় বিষ এনে দে, নীল বিষ পান করে আমি নীলেতে লীন হয়ে যাই।···'

লতিকার গান শুনলাম না, শুনলাম মদনপীড়ায় জর্জ্জরিতা বিরহিণী শ্রীরাধিকার পাঁজরা-ভাঙ্গা আকূতি···নীল বিষ পান করে লীন হয়ে যাই! তাল, মান, লয় সম্বন্ধে ধারণা আমার খুব নির্ভুল ছিল না সত্য, কিন্তু সর্ব্বসত্তা বিলিয়ে, তনুমনপ্রাণ দিয়ে প্রিয়ের তরে যে অশ্রুসজল আবেদন, সে আবেদনের মরমী কণ্ঠ আমি চিনি। সেই মায়াবী কণ্ঠে গান গাইলো লতিকা। শুধু শুনলাম, আলাপ পরিচয়ের অবকাশ বা সুযোগ ছিল না আমার।

ফিরে যাবার সময় আবার জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সঙ্গে যেতে হলো আমায় অশোকার পাশে বসে। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ চক্রবর্ত্তী, সৌমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, মহেন্দ্র রায় প্রভৃতি সবার কাছ থেকে সস্মিতমুখে বিদায় নিয়ে অশোকার পাশে যখন উঠে বসলাম জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জিদে, কে জানতো কোন্ আড়াল থেকে লতিকা তা লক্ষ্য করেছিল? ···

আঠারো

মাত্র দিনকয়েক পর। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরবার পথে কাশী শহরে এসে পৌঁছোবার পরই অকস্মাৎ একদিন গেল সাইকেলের টিউব ফুটো হয়ে। কাছে কোথাও সাইকেল সারাইয়ের দোকান পেলাম না। তাই প্রায় দু'মাইল রাস্তা সেই ফুটো সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে হাঁটু-সমান ধুলো নিয়ে এসে হাজির হলাম বীণাদের বাসায়।

দোতলায় উঠে দেখি কন্যা ও দিদিমা নিদ্রিতা, বীণা কোথাও নেই। বাথরুমে জলের শব্দ পেলাম। কিন্তু এমনিভাবে সব খুলে ফেলে রেখে বাথরুমে ? কোনো সাড়াশব্দ না দিয়ে বীণার কক্ষে ঢুকে হাঁটু-সমান ধুলোমাখা পা দু'খানা সটান মেলে দিয়ে শুয়ে পড়লাম এবং ঘুমের ভান করে রইলাম পড়ে।

কিন্তু বীণা আমায় জানে। বাথরুম থেকে এসে একেবারে হাত ধরে টেনে তুললো আমায়ঃ জানো, দ্বিজেনদা', তোমার জন্যে একটা সুখবর আছে। বল, কি খাওয়াবে? নইলে বলবো না। কিন্তু, আগেই বলে দিচ্ছি।—একটু দাঁড়াও, আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।

সরলা অনভিজ্ঞা বীণা পরে এল সায়া, সাড়ী আর শুধু মাত্র হাতওয়ালা বডিস। বললোঃ বল, কি খাওয়াবে?

যা খেতে চাইবে।

যদি চাই আকাশের চাঁদ?

তা দোব। তুমি যদি খেতেই পার, তাহলে না হয় আঁকশি দিয়ে চাঁদটাকে পেড়ে আনবার কষ্ট স্বীকার করা যাবে।

দু'জনেই হেসে উঠলাম।

একটু পরে প্রশ্ন করলামঃ কিন্তু খবরটা সত্যিই যদি সুখবর না হয়? তুমি মনে করছো সুখবর, আর আমি হয়তো তাকেই বলবো কুখবর—ও, হয়েছে হয়েছে, উপেনবাবুর চিঠি এসেছে, তাই না?

বীণা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করলোঃ তাই হবে। তারপর?

বললামঃ লিখেছেন এবার তোমায় নিয়ে যাবেন। মন তাঁর ভালো হয়ে গেছে, মত তাঁর গেছে বদলে, তাই না?

ছাই।—বলে বীণা মুখ ফিরিয়ে নিলে। তারপর অকস্মাৎ আমার হাতখানা টেনে নিয়ে বলে উঠলো: দাঁড়াও, হাত দেখতে পারি আমি। দেখি—ভেনাসের একটা চক্র পড়েছে আর শুক্রের স্থানটিও বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে—সত্যি কথা বলবে?

মজা দেখতে ইচ্ছে হলো: বলবো। কর জিজ্ঞেস।

সীমাহীন অভিনিবেশ সহকারে রেখাগুলো আর একবার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষা করে ভ্রূকুঞ্চন করে বীণা অকস্মাৎ প্রশ্ন করে বললো: নিশ্চয়ই কাউকে ভালোবেসেছ তুমি? বল, সত্যি কি না?

জিজ্ঞেস করলাম: কাকে?

লতিকাকে—লতিকা দাশগুপ্তা।

চমকে উঠলাম। লতিকা দাশগুপ্তা? সেই গায়িকা, বিবর্তিনী শ্রীবাসিকা? বীণা তাকে চেনে কি করে?

তারপর শুনলাম কি করে চেনে। শুধু চেনে নয়, দু'জনে বন্ধু। আর এখানে এসে নয় সেই কলকাতা থেকে। সাহিত্যসভার কথা লতিকা সব বলেছে বীণাকে, আর সেই সঙ্গে আমার কথাও উল্লেখ করতে ভোলেনি। আমার লেখা "নিরুপায়" লতিকার নাকি খুব ভালো লেগেছে, আর চুপি চুপি জানালো বীণা, সেই সঙ্গে লেখককেও। অতএব, বীণা হুকুম করলো আমার সেই খাতাখানা তার চাই এবং সেই সঙ্গে আমাকেও।

প্রশ্ন করলাম: আমাকেও?

হ্যাঁ, তোমাকেও। আজই মির্শিরপোখরায় একটা বিয়েবাড়ীতে রাত্রে আসবে লতিকা তোমার খাতা নেবার জন্যে আর তোমার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে। তোমায় যেতে হবে, দ্বিজেনদা'।

আশ্চর্যান্বিত হলাম: বাঃ, বেশ তো! অজানা এক বিয়েবাড়ীতে যাবো অজানা একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে? তোমার প্রস্তাবটি যেমন নতুন, তেমনি উদ্ভট।

কিন্তু অসম্ভব নয়, আর তা আমি হতেই দোব না। তুমি কাঠের পুতুল হলে কি হবে, লতিকা সত্যিই তোমায় ভালোবেসেছে।—বলে বীণা আলমারি থেকে বার করলো লতিকার লেখা একটা চিরকুট, চোখের সামনে মেলে ধরে বললো: এই দেখ, বীণা তো তোমায় শুধু মিছে কথাই বলে। এবার

বিশ্বাস হলো তো যে, এটা আর উদ্ভট উপন্যাস নয়? আমি বলে এসেছি তোমায়ও নিয়ে যাবো নিশ্চয়ই।—বল, কথা দিলে, দ্বিজেনদা'!—বলে বীণা একেবারে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়ালো।

কিন্তু আমার কথার জন্যে বয়েই গেছে বীণার। রাত দশটায় টেনে নিয়ে গেল সেই বিয়ে-বাড়ীতে খাতাখানা বগলদাবা করে। পরিচয় হলো লতিকার সঙ্গে।

তার পরের ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ত হলেও গতিশীল ও রোমাঞ্চময়। কলেজ থেকে ফেরবার পথে বীণার বাসাতে বহু বিকেল রাত করে ফেললাম, ছুটির দিনে রেস্তোরাঁয় বসে বসে চা ও কেকের সঙ্গে অনেক সকাল একেবারে দুপুর হয়ে গেল, অনেকগুলো সন্ধ্যা নদীর বুকে ভাসমান নৌকোয় কাটলো। কখনো সাক্ষী রইলো বীণা, কখনো শুধু লতিকা ও আমি, আমি ও লতিকা! তখনকার সাক্ষী রইলেন হয়তো অশরীরী কোনো দেবতা!······

আমাদের স্বর্ণ সুযোগ দিয়ে অনেক সময়ই বীণা সরে যেত। কিন্তু সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার মতো মন কোথায় আমার? কোথায় আমার সে সময়? ভালো তাকে লেগেছিল সত্যি, কিন্তু ভালোবাসতে পারলাম কই?

অশোকার সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। অশোকাকে নিয়ে ফ্রেস্‌কো আঁকা চলে, কিন্তু লতিকার পঁয়ত্রিশ মিলিমিটারের ক্ষুদ্র এক টুকরো ছবি বুক-পকেটে ভরে রাখতে ইচ্ছে করে। অশোকার স্বর্ণপদক পেনডেন্টের মতো গলায় ঝুলিয়ে বীরদর্পে যাওয়া যায় ক্লাবে, হোটেলে, সভা-সমিতিতে, আর লতিকার সঙ্গে চুরি করে কথা কইতে ভালো লাগে পার্কের আধো-অন্ধকার কোণের বেঞ্চিতে বসে। অশোকার সান্নিধ্য মনোরম আর লতিকা রক্তকণিকা-গুলিকে নাচিয়ে তোলে। অশোকার সৌন্দর্য্য অনৈসর্গিক আর লতিকার রূপ রসালো রক্ত ও মাংস দিয়ে গড়া। অশোকাকে মনে থাকে, আর লতিকা সারা মন জুড়ে বসে থাকে।······

কিন্তু আমার সর্ব্ব অন্তর পূর্ব্বেই যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে এক সুকঠিন ব্রত উদ্‌যাপনের দায়িত্বে! সেখানে আর তিলমাত্রও স্থান আছে কি?···

সে যুগে কোনো অশোকা, কোনো লতিকাকেই ভালোবাসবার সময় ছিল না বিপ্লবীদের; বুকে জ্বলছে তাদের দেশপ্রেমের আগুন, মাথায় অবিশ্রাম খেলছে বৃটিশ সিংহ শিকারের নানা কৌশল, সারা জীবন তাদের মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।

তাদের ভাবনা-চিন্তা, আলাপ-আলোচনা ও চলা-ফেরা নিয়ন্ত্রণ করতো সেই অনড় প্রতিজ্ঞা, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। এমন একটিও অলস মুহূর্ত্ত তাদের জীবনে ছিল না, যখন তারা রঙীন কিছু কল্পনা করবার অবসর পেত। নরনারীর ভালোবাসাকে অবজ্ঞা করবার কোনো কারণ না থাকলেও সেই স্বর্ণশৃঙ্খলে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবার ঝোঁক কোনোদিনই ছিল না তাদের।

আর এ তো আশাই করিনি আমি। ঊনত্রিশ সালের স্বপ্ন বত্রিশ সালে কখন্ চূর্ণ হয়ে গেছে, চাকা ঘুরে ঘুরে কোথাকার ঘটনা পুরোনো বাসি হয়ে কোথায়, কোন্ ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে একেবারে অবলুপ্ত হয়ে গেছে, কে তার সংবাদ রাখে? হরেনদা'রা ঘটনাস্রোতে কোথায় চলে গেছেন, উপেন সরকারের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত বীণার আপস-রফা হয়ে গেছে কিনা, আই. এ. পাশ করে লতিকা বি. এ. পড়ছে কিনা, তা জানবার আমার যেমন নেই উৎসাহ, তেমনি সময়েরও অভাব।

এই দুনিয়া-ছাড়া দুনিয়ায় অকস্মাৎ চেনা দিনের সুগন্ধ কেন? লোহার ঘরে কোন্ পথে প্রবেশ করলো কাল সাপ?···

কোথায় একটা কাঁটা বিঁধতে লাগলো, কোথা থেকে যেন কার চাপা গোঙানির শব্দ কানে আসতে লাগলো, অনুভব করলাম একটা আলোড়ন অন্তর-সমুদ্রে!

তুলে রাখলাম নীল চিঠি সযত্নে বাক্সের তলায় কাপড়ের ভাঁজে। নীল বিষ পান করে লতিকা লীন হয়ে যেতে চেয়েছিল। আমার কাছে নীল খামখানা একটি নীল অপরাজিতা মনে হলো, সদ্য বাগান থেকে চয়ন-করা অনাঘ্রাত ফুল!

উনিশ

সত্যিই, একটা ঘা খেলাম। দু' এক দিনের মধ্যেই অবশ্য বুঝতে পারা গেল যে বন্ধুরা কেউ মাঝপথে আর খোলেনি এই চিঠি, তথাপি নিজকে কেমন যেন অপরাধী মনে হতে লাগলো। রাগ করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম কোথায়? চোখ বাঙালেই দেখতে পাই, বেল ফুলের কুঁড়ির মতো দাঁতগুলোর আভাস দেখিয়ে যেন লতিকা খিলখিল করে হাসছে ছোট্ট ফ্রকপরা মেয়ের মতো।

একদিন বলেছিলাম রাগ করে: কাল থেকে আবার ফ্রক-পরা সুরু করো তুমি, বুঝলে?

প্রশ্ন এলো: কেন?

ব্যাখ্যা করলাম: কেন, এমনি তল-কাপানো হাসি সাড়ীপরা মেয়েকে কখখনো মানায় না। বয় দু'বার উঁকি মেরে গেছে, লক্ষ্য করেছ? অন্যান্য কেবিনেও তো লোক আছে সেটা বুঝি ভুলে যাও?

গম্ভীর হয়ে গেল লতিকা: তাহলে কি করতে হবে? হাসি বন্ধ করতে হবে?

বললাম: তা হবে।

মাথা নেড়ে লতিকা বললো: না, তা হবে না। ফ্রক-পরার হাসি ধুতি-পরার সঙ্গে চলতেই পারে না।

আশ্চর্য হলাম: মানে?

মানে খুব সহজ। তোমায় হাফপ্যান্ট পরতে হবে আর হাতে নিতে হবে একটা গুলতি, বুঝলে?

বিস্ময় বেড়ে গেল আমার: হাফপ্যান্ট! গুলতি!

কাঁটা বিঁধিয়ে এক টুকরো কাটলেট আমার প্লেটে ছেড়ে দিতে দিতে বললো লতিকা: বাঃ, তা নইলে ফ্রক-পরার সঙ্গে ভালোবাসা জমবে কি করে শুনি?

এবারে চোখ দু'টো একেবারে কপালে উঠে গেল: ভালোবাসা!

হ্যা, ভালোবাসা।—বেশ সহজভাবেই বললো লতিকা: আমায় যে ভালোবেসে ফেলেছ, সে কথা অস্বীকার করতে পার? গায়ের জোরে না না করে চীৎকার করতে পার বটে, কিন্তু তাতে মনের প্রতিধ্বনি পাবে না। কিন্তু ফ্রককে

দেখে ভুলে যেতে পারে কে, ধুতি নয়, হাফপ্যাণ্ট, বুঝলে? তাই বলছি তুমি হাফপ্যাণ্ট পরলে আমি পরবো ফ্রক।

কৌতুক অনুভব করলাম: কিন্তু ঐ গুলতি?

গম্ভীর হয়ে জবাব দিল সে: বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দুর্গ রক্ষার দলমাদল কামান। জানোই তো, দুনিয়ায় একটি ছেলে ও একটি মেয়ে কোথাও নেই। হয় দু'টি মেয়ে একটি ছেলেকে কিংবা দু'টি ছেলে একটি মেয়েকে ভালোবাসে। যেমনি ছড়াছড়ি ওসমান-জগৎসিংহের, তেমনি ভিড় সূর্য্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর। তাই তোমার হাতে থাকবে গুলতি। 'হয় কর্ণ, নয় পার্থ ধরা হতে লইবে বিদায়।'

বলেই সেই ফুলের হাসি। ছোট ছোট সাদা দাঁতে হৃদ্‌-কাঁপানো শব্দ!

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী কিন্তু আর বেশী আগ্রহ দেখাননি। অবশ্য সেই সাহিত্য-সভার পরে দিনকয়েক তাঁর ওখানে আমায় চায়ের নেমন্তন্ন করেছিলেন। কিন্তু কোথায় যেন বাধো-বাধো ঠেকলো, সম্মানজনক ব্যবধানটি বিশ্রীভাবে হাঁ করে রইলো। ভারী মিষ্টি মেয়ে অশোকা, অষ্ট্রেলিয়ান মধুর মতো। আর লতিকা একেবারে স্যাকারিন। স্রেফ স্যাকারিন। মিষ্টি বিষ!

সে সময় লাহোর কংগ্রেস থেকে ফেরবার পথে কাশীতে প্রতুল গাঙ্গুলী নেমেছিলেন। এক যুগান্তকারী সংবাদ দিলেন আমায় যে, ঢাকার বিপ্লবী দলের মধ্যে বৈপ্লবিক কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ে দু'টো ভাগ হয়ে গেছে সম্প্রতি। এক দলের নেতা অনিল রায়, লীলা নাগ প্রভৃতি, আর অপর দলের নেতা হচ্ছেন সত্য গুপ্ত, ভূপেন রক্ষিত, রসময় সুর, মণি রায়, প্রফুল্ল দত্ত, প্রভাত নাগ (লীলা নাগের ভাই) প্রভৃতি।

সংবাদ পেয়ে সেদিনকার ট্রেণে সোজা চলে এলাম কলকাতায় সত্য গুপ্তের কাছে। স্বাভাবতঃই অশোকা তখন একেবারেই হারিয়ে যায়। লতিকাও যে ধীরে ধীরে শুকিয়ে গিয়েছিল আমার মনে, তাও সত্য। কিন্তু আমি ভুলে গেলে কি হবে? সে কি আমায় ভুলে গেছে? ভুলতে পেরেছে? নাছোড়বান্দা কাবুলীওয়ালার মতো আবার আমার দরজার গোড়ায় বসে নেই তো? বেরুলেই আবার তার খপ্পরে পড়বো কিনা কে জানে। মিনি না হলে কি হয়, আমাকেই হয়তো বলে উঠবে: এ খোঁখা, হাফপ্যাণ্ট লিবে আউর লিবে গুলতি……

এই নবীন তরঙ্গের তোড় কমে যেতে সময় লাগলো অবশ্য মাত্র ক'দিন।

জীর্ণ বস্ত্রের মতো ক্ষণিকের এই চিন্তা-বিলাস ঝেড়ে ফেলে দিলাম মন থেকে। প্যাবেড, খেলাধূলা, আব 'শৃঙ্খল' নিয়ে একেবারে মেতে উঠলাম। নীল অপরাজিতা বাক্সের তলায় কোন্ কাপড়ের ভাঁজে মুখ থুবরে পড়ে পড়ে শুকিয়ে গেল, মনে পড়লো না তা।

২৯শে জুন পাওয়া গেল আর একটি উত্তেজনাকর সংবাদ: ঢাকা শহরের একটি পোষ্ট অফিসে ২৮ তারিখে কালীপদ মুখার্জ্জী নামে একটি যুবক একখানা 'তার' করতে আসে—Operation successful—পোষ্টমাষ্টারের সন্দেহ হয়। তিনি তাকে একটু দেরী করতে বলেন কাজের ভিড়ের অজুহাত দেখিয়ে। আর গোপনে সংবাদ পাঠান আই বি অফিসে। পুলিশ সন্তর্পণে এসে কালীপদকে গ্রেপ্তার করে। কালীপদ তাতে বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্য না দেখিয়ে পুলিশকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে তার মেসে এবং স্পষ্টভাবে পরে যে বিবৃতি দেয়, তাতে স্বীকার করে যে, আগের দিন অর্থাৎ ২৭ তারিখ রাত্রে স্পেশাল অফিসার কামাখ্যা সেনকে নিদ্রিতাবস্থায় সে-ই হত্যা করেছে। রাত তখন গভীর। বাইরের রাস্তায় মাঝে মাঝে টহলদার সিপাইয়ের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাগানের নীচু দেয়াল টপকে কালীপদ নাকি নিঃশব্দে প্রবেশ করে। জানালাও খোলা ছিল; তাই সে এসে হাজির হয় একেবারে নিদ্রিত কামাখ্যা সেনের খাটের পাশে। তারপর মশারিটি তুলে একবার···দু'বার···তিন বার···ব্যস্, জানালা টপকে, দেয়াল টপকে আবার সে নির্বিবাদে সরে পড়ে।

কামাখ্যা সেন!!···অকস্মাৎ রক্তবিন্দুগুলি যেন সাপের মত কিলবিল করে উঠলো। সেই নোটোরিয়াস কামাখ্যা? সেই স্কাউণ্ড্রেল?···১৯৩০ সালে এই নরপুঙ্গব স্পেশ্যাল অফিসাররূপে সমগ্র বিক্রমপুর চষে ফেলেছিল!···

অসহযোগ আন্দোলন তখন ভীষণ আকার ধারণ করেছে। আইন-সভার সদস্যগণ একে একে করছেন পদত্যাগ, স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে, 'ষ্টেটস্‌ম্যান' জাতীয় এক-আধখানা সংবাদপত্র ব্যতীত সমস্ত সংবাদপত্রের প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়েছে সরকারী জুলুমের প্রতিবাদে, পথেঘাটে তৈরী হচ্ছে লবণ, প্রকাশ্য সভায় বাজেয়াপ্ত পুস্তক পাঠ চলছে, ১৪৪ ধারা সর্বত্রই অমান্য করা হচ্ছে, উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গের মত জাগ্রত জনতা সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলেছে তুচ্ছ করে পুলিশের লাঠি ও চাবুক, গুলী ও বেয়নেট।

ঠিক সেই সময় সাব ডেপুটি কামাখ্যার ওপর ভার পড়লো বিক্রমপুরকে,

বিশেষ করে শ্রীনগর, সেরাজদীঘা, তালতলা প্রভৃতি কয়েকটি থানার অধিবাসীদের শায়েস্তা করবার। কামাখ্যা পেল হাতে স্বর্গ! কারণ সে জানতো কৃতিত্ব দেখিয়ে প্রমোশন পাবার এই সুবর্ণ সুযোগ হারানো মূঢ়তা। সুতরাং সপাং সপাং গর্জ্জে উঠলো তার হাতের চাবুক, গুড়ুম্ গুড়ুম্ গর্জ্জে উঠলো তার কোমরবন্ধের রিভলভার। মহিলাদেরও কসুর করলো না কামাখ্যা সেন!···

সে সময় ঢাকা শহরে অকস্মাৎ দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলমানে গলা-কাটাকাটি। সরকার পক্ষের প্ররোচনায় সেই দাঙ্গা তীব্রতর হয়ে বিক্রমপুরের কোনো কোনো গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু এর পূর্ব্বেই ঢাকা শহরের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের অফিসারেরা, মেজর বিনয় বোস, ক্যাপ্টেন দীনেশ গুপ্ত, লেফটেন্যান্ট বাদল গুপ্ত, সার্জ্জেন্ট ননী চৌধুরী প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে সফর করে গড়ে তুলেছিলেন ভলান্টিয়ার বাহিনী, যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে এনেছিলেন নব জাগরণ। তার ফলে ঢাকা শহরের এই দাঙ্গার সময়ই বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে যুব সংগঠন সৃষ্টি হয় ভলান্টিয়ার বাহিনীর নেতৃত্বে। কোথাও বিপদ আসন্ন হলেই কাঁসর বাজানো হতো আর দিকে দিকে প্রেরণ করা হতো বার্ত্তাবহ। দেখতে দেখতে যে-কোনো হাতিয়ার নিয়ে এসে হাজির হতো হাজারো অধিবাসী। এমনি সুশৃঙ্খল সংগঠনের ফলেই কিন্তু সরকারী শত প্ররোচনাতেও সে বার শহরের দাঙ্গা গ্রামের দিকে ততটা মারাত্মকভাবে সংক্রামিত হতে পারেনি। সে সময় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের ঢাকা রেঞ্জের অধিনায়ক ছিলেন তেজোময় ঘোষ আর সহকারী ছিলেন জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার।

কলকাতা থেকে আমায় পাঠানো হলো বিক্রমপুরে আমাদের গ্রামে। অচিরেই সেখানে তৈরী হলো ভলান্টিয়ার বাহিনী। সর্ব্বশ্রেণীর যুবক তাতে যোগদান করলো। দৈনন্দিন কুচকাওয়াজ ও গ্রামের মেঠো পথে পথে লাঠি নিয়ে বাহিনীর মার্চ্চ দেখে শান্তিকামীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও প্রমাদ গনলেন বাবা, মা, কাকা ও জ্যেঠারা! দাঙ্গা ঠেকিয়ে রাখতে পারলেও পুলিশকে ঠেকানো যাবে না। বিশেষ করে যদি কামাখ্যা সেন—

বললাম: কে কামাখ্যা সেন, তাকে চিনি না, দেখিওনি কোনোদিন। কিন্তু আমাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করলে তাকেও রেহাই দোব না আমরা।

নিজের লাঠিখানা দু'মুঠোয় ধরে একেবারে স্তব্ধ হয়ে বাবা বসেছিলেন। পুত্রের জিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

কিন্তু পাড়ার মুখপাত্র বিলাস কাকা সহজে ছাড়বেন কেন? বললেন: দেখ দ্বিজেন, আজকালকার ছেলে তোমরা। যদি আমাদের, বুড়োদের কথা না মান, তাহলে কিছুই বলবার নেই। তবে তোমাদের বিপদ এলে তা সবার চাইতে বড় হয়ে লাগে আমাদেরই বুকে। তাই সময় সময় গায়ে পড়েও উপদেশ দিতে এগিয়ে আসতে হয়।

বলে তিনি একটু থামলেন। দেবেন কাকা হুঁকোটা তাঁর হাতে তুলে দিতেই তিনি কুলীনদা'র অর্থাৎ আমার বাবার বয়স ও সম্পর্কের মর্য্যাদা রাখবার জন্য হুঁকো নিয়ে বাইরে গেলেন ও এক মিনিট পর ফিরে এসে বসলেন।

দেবেন কাকা বিলাস কাকার বক্তব্যটাই আরো একটু পরিষ্কার করলেন: দেখ, আমাদের গ্রামের শতকরা আশীজনই মুসলমান। আমাদের অনুগত প্রজা হিসেবে পুরুষের পর পুরুষ ধরে এরা আমাদের শ্রদ্ধা করে আসছে। দেখেছ তো সদাকে, বন্দরালাকে? আজও এদের মনে কোনো দ্বিধা দেখা দেয়নি। সুতরাং আমাদের গ্রামে যখন কোনো আশঙ্কা নেই, তখন এমনি ভলান্টিয়ার দল তৈরী করে কি পুলিশকেই ডেকে আনা হবে না?

অশ্বিনী কাকা নারায়ণগঞ্জে পাটের অফিসে অনেক কাল চাকরি করেছিলেন। কার্য্য-কারণ সম্পর্কে তাঁর একটু ধারণা আছে বলে তিনি মনে করেন। বললেন: তোমরা বল পুলিশই নাকি এই দাঙ্গা বাধাচ্ছে। তাই যদি হয়, তাহলে সেই পুলিশকেই কেন এদিকে টানছো? গ্রামের নিরাপত্তা কি তাতে করে রক্ষা করা যাবে? তারপর অন্য গ্রামে যদি দাঙ্গা লাগে, তবে তা থামাবার দায়িত্ব শুধু তোমার নয় বা আমাদের গ্রামের নয়। সে গ্রামেও তো লোক আছে।

এঁদের লজিকের পরেও কী বলে একেবারে চুপ করিয়ে দিতে হয় এঁদের, তা আমার বেশ জানা ছিল। আমাদের বাহিনী যে সাম্প্রদায়িক নয়, সম্প্রদায়-নির্বিশেষে যে-কোনো গ্রামকে সাহায্য করাই যে এর উদ্দেশ্য, তা এঁদের বেশ করে বুঝিয়ে দিতে পারতাম। আর পুলিশের খাতায় আমার নাম আছে বলেই যে সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য আমি কোনো ঝুঁকি নোব না বা অপরাপর সাহসী যুবকেরাও এগিয়ে আসবে না আমার পাশে, এমনি উপসংহারের পেছনে যে যুক্তি ও মানবতার নামগন্ধ নেই, তাও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবো ভেবেছিলাম।

কিন্তু কিছুই পারা গেল না। অকস্মাৎ মজুমদার বাড়ীর ছাদ থেকে ভীষণ জোরে কাঁসর বেজে উঠলো। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালাম: বিলাস কাকা,

আপনাদের সঙ্গে আমি আজ আর আলোচনা করতে পারলাম না। দেখি, কোথায় আবাব লেগে গেল। একটি মুহূর্ত আর এখানে অপেক্ষা করো চলবে না আমার।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হন্তদন্ত হয়ে একজন ভদ্রলোক সাইকেলে এসে নামলেন। ঘর্ম্মে তাঁর সারা শরীর সিক্ত, উত্তেজনায় সারা মুখমণ্ডল আরক্তিম। কম্পিত কণ্ঠে জানালেন, ষোলঘর বাজার লুঠ সুরু হয়ে গেছে। আপনারা আমাদের বাঁচান।

বলে দিলাম : আমি এখ্খুনি যাচ্ছি! আপনি হাঁসাড়ায় শাস্তি সোমের কাছে চলে যান। গিয়ে বলুন আর আমাব কথাও জানাবেন যে, দ্বিজেনবাবুও দলবল নিয়ে গেছেন সেখানে।

লোকটি চলে গেল। আমিও ফিরে এলাম বাড়ীতে। খাকি মিলিটারী হাফ সার্টটা গায়ে দিলাম, মাথায় দিলাম হাইল্যাণ্ডার্স ক্যাপ, তাতে পিতল ফলকে লেখা বি ভি। বাঁশীটি নিলাম আর হাতে নিলাম একটি ষ্টিক-সোর্ড।

ঝড়েব বেগে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, দক্ষিণের পুকুর ঘাটের পাশে মা'র সঙ্গে দেখা।

আবার চলেছিস বুঝি?

থমকে দাঁড়ালাম : হ্যাঁ।

কোথায়?

ষোলঘর বাজার লুঠ হচ্ছে, এতক্ষণে বোধহয় গ্রামেও লেগে গেছে।—অদূরে সদর সড়কে লোকজন ছুটাছুটি ক'রে চলেছে ষোলঘরের দিকে। দেখিয়ে বললাম : ঐ দেখ মা, সবাই যাচ্ছে। সবে বাজার বসেছে এমনি সময়—

বলে চলে যাচ্ছি, আবাব মা ডাকলেন : শোন্! কখন্ ফিরবি?

কি করে বলি, না গিয়ে তো আর অবস্থাটা বুঝতে পারছি না।

ছুটলাম। পেছনে মা'র কণ্ঠ শোনা গেল : তোর ভাত নিয়ে কিন্তু বসে থাকবো রে! তাড়াতাড়ি আসিস্।

ষোলঘরগামী সড়কে এসে দেখি প্রায় শ'খানেক লোক জমে গেছে নানা রকম হাতিয়ার নিযে, লাঠি, হাণ্টার, ছোরা, রামদা, ষ্টিক-সোর্ড, ভোজালি, পূব-পাড়ার রমেশের হাতে একখানা খাপখোলা তরবারি। উভয় পার্শ্বের মুসলমান বাড়ীগুলো থেকে ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ী সবাই ভয়ে ভয়ে দেখছে। অকস্মাৎ কোথা থেকে ছুটে এল বছিরদ্দি।

কর্ত্তা!

জবাব দিল অপরে: যা, ভালোয় ভালোয় বাড়ী যা। এখন আর ঘাঁটাতে আসিসনি। নইলে মরবি।

তবু বছিরদ্দি গেল না। আমার সম্মুখে এল। বললাম: ঘোলঘরে মুসলমানরা নাকি বাজার লুঠ করছে।

আমি যামু কর্ত্তা!

বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে প্রশ্ন করলো ভূপেন: তুই?

জবাব দিল বছিরদ্দি: ক্যান? কর্ত্তাই তো কইছেন, দাঙ্গা যে বোনাইর পো-রা করে, সেই হালারা হিন্দুই হোক আর মোছলমানই হোক, মাইনষের শত্রু। সেই শ্বশুরের পো'রে ঠাণ্ডা করনের কাম সক্কলেরই, কি হিন্দু, কি মোছলমানের। তাই না কর্ত্তা?

অ্যাঁ, বলে কি বছিরদ্দি! বছিরদ্দি শেখ!

নৃপেন প্রশ্ন করলো: জাত ভাইকে পারবি মারতে?

বছিরদ্দি সহজভাবেই জবাব দিল: দাঙ্গা যে করে, মা-বইনের গায়ে যে হাত উঠায়, সেই হালারে জাত ভাই বইলা স্বীকার করি না আমি।—যাই কর্ত্তা আপনার লগে?

সম্মতি দিলাম। বছিরদ্দি শেখ হিন্দু নয়, মুসলমানও নয় সে। জাতি ধর্ম্ম বর্ণ ও সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে সে মুক্ত পুরুষ। দুষ্কৃত বিনাশের জন্য যুগে যুগে এই বছিরদ্দি শেখদের আবির্ভাব হয়!······ নিমেষে সে বাড়ি থেকে নিয়ে এল পুরো আঠারো ইঞ্চি দীর্ঘ একখানা নেপালী কুকরি। গেঞ্জির নীচে খাপখানা টেনে বাঁধলো গামছা দিয়ে। তারপর হাঁক দিল: এই ঘইনা, গরুগুলারে জাবনা দিস। আমার ফিরা আইতে দেরী হইবো কইলাম। কইস তর মায়েরে।—

তারপর আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললো: আছি কর্ত্তা আমি আপনার লগে-লগে। কুকরি যা নিছি, এক্কেরে কচু কাটা করতে পারবেন।

ডবল মার্চ্চ করে বেরিয়ে পড়লো কেয়টখালী গ্রামের শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক।

গ্রামের সড়ক ক্ষেতের পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে গেছে। সে পথে গেলে দেরী হয়ে যেতে পারে বলে হুকুম দিলাম সোজা আমায় অনুসরণ করবার জন্য। নেমে পড়লাম ক্ষেতে, জল-কাদা, কাঁটা গাছ, দীর্ঘ পাট গাছের ঝোপ সব অগ্রাহ্য

করে একেবারে সোজা ছুটতে লাগলাম ঘোলঘরের দিকে। পাশেই বছিরদ্দি, লুঙ্গিটা সে হাঁটুর ওপর তুলে নিয়েছে।

ঘোলঘর বাজারে এসে দেখি, টিনের ঝাঁপ ফেলে ফেলে দোকানগুলো সব বন্ধ। বাজারে ক্রেতাও নেই, বিক্রেতাও নেই। কিন্তু ভলান্টিয়ারে একেবারে ভর্তি, নানা স্থান থেকে ছুটে এসেছে সবাই। ব্যাপার কি? লুণ্ঠনকারীরা তবে কি লুঠ শেষ করে সরে পড়েছে? কোথায় গেল? কোন্ দিকে?

কিন্তু ঘটনা যা শোনা গেল, তা চমকপ্রদ। ঘোলঘর গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মুরারি ঘোষ কিছুদিন ধরেই অতি দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলেন শুধু দুর্নীতি ও স্বজনপ্রিয়তার দোষেই নয়, নারীঘটিত দুর্বলতার জন্যও। কাজী বাড়ীর মুসলমান জমিদারেরা ছিল তাঁর উগ্র সমর্থক। কিন্তু তাহলে কি হবে? হিন্দু ও মুসলমান সবার কাছেই মুরারি প্রায় সমাজচ্যুত হয়ে উঠেছিলেন।

বাজারে আজ অতি বৃহৎ রোহিত মৎস্য উঠেছে শুনে মুরারি স্বয়ং পদার্পণ করেছিলেন ভুঁড়ি দুলিয়ে। সঙ্গে ছিল জনকতক মুসলমান মোসাহেব। দরে বনলো না, কারণ তিনি মনে করেছিলেন স্বয়ং মুরারিকে দেখে জেলে হয়তো মূল্য হাঁকবার দুঃসাহসই দেখাতে চেষ্টা করবে না। কিন্তু না-বেচার মতলব এঁটেই জেলে দাবী করলো অযৌক্তিক মূল্য। আর যায় কোথা! মুরারির মোসাহেব দল এগিয়ে এল। তর্কবিতর্ক, বচসা, গালাগাল, তারপর হাতাহাতি, ছড়োহুড়ি, মারামারি।······বাজারে দৌড়াদৌড়ি পড়ে গেল। মুসলমান মোসাহেব আর হিন্দু জেলে—ব্যস, তৎক্ষণাৎ বাতাসের মুখে রটে গেল এটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা!!

বেগতিক দেখে মোসাহেব-পরিবৃত মুরারি ঘোষ গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন কাজী বাড়ীতে। কিন্তু মুরারি পলায়ন করলেও আছে তাঁর বাড়ী, বৃহৎ অট্টালিকা, তাঁর পরিবার, তাঁর পরিজন। শয়তান গৃহস্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত তারা করতে বাধ্য!

নিশ্চয়ই!—অকস্মাৎ সেই ক্রুদ্ধ উত্তেজিত জনতা চীৎকার করে উঠলো: নিশ্চয়ই। মুরারিকে না পেলেও তার বাড়ীটা তো পাওয়া যাবে। এত বড় বদমায়েসের সাজা দিতে—

প্রতিধ্বনি শোনা গেল : নিশ্চয়ই। চল সব, মুরারির বাড়ী লুঠ করিগে।

বন্যার মতো সেই বিশাল জনতা এগিয়ে চললো। এই সাগরতরঙ্গ রুখবে কে? কার আছে সে ব্যক্তিত্ব, সে সাহস, সে বাগ্মিতা, সে যুক্তি?

বিচলিত হলাম! কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম মুহূর্তের জন্য। শান্তি সোম দলবল নিয়ে এসে গেছেন ততক্ষণে। বললাম সব। কিন্তু আমরা দু'জনেই বা কি করতে পারি? কতটুকু শক্তি আমাদের দু'টো গ্রামের? সেই সীমাহীন উদ্বেলিত সমুদ্রে মাত্র দু'টি তরঙ্গ বৈ তো নয়!……

তবুও চেষ্টা করতে হবে। বদ্দিবদ্দি কোথা থেকে মাথায় করে একটা টুল ও একখানা টেবিল নিয়ে এল। স্বনির্বাচিত সভাপতির মতো টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে সেই উত্তেজিত জনতাকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন শান্তি সোম: বন্ধুগণ, উত্তেজনায় অধীর হয়ে যুক্তি হারিয়ে ফেলবেন না আপনারা। মুরারিবাবু সমাজের ও গ্রামের কলঙ্ক হলেও তাঁর পরিবারের মহিলারা আমাদেরই মা ও বোন। তাঁরা কি দোষ করেছেন আমাদের কাছে? একের অপরাধে অপরের গর্দান নেয়া হতো কাজীর আদালতে। এখন সেদিন নেই। মহিলাদের গায়ে কেন হাত দিতে যাবো আমরা?

এই প্রশ্নের জবাব কেউ দিল না। পক্ষান্তরে, শোনা যেতে লাগলো অসন্তোষের মৃদু গুঞ্জন। বেশ বোঝা গেল শান্তি সোমের যুক্তি ক্রুদ্ধ জনতার হৃদয় আদৌ স্পর্শ করেনি। তথাপি তিনি বলতে লাগলেন: দাঙ্গা থামানো আমাদের কাজ, বাধানো নয়। বন্ধুগণ, ভিন গ্রামের লোক হয়ে আপনারা যদি এই গ্রামের একখানি বাড়ীও লুঠ করেন, তবে তার ফলাফলের কথা একবার ভেবে দেখবেন। তাতে কি খোলঘরে আমরাই এসে দাঙ্গা সৃষ্টি করবো না?

এ প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া গেল না। মৃদু গুঞ্জন এবার তীক্ষ্ণ প্রতিবাদে আত্মপ্রকাশ করলো: আপনারা বেদ ও পুরাণের উদারতা পকেটে ভরে রাখুন, শান্তিবাবু।

অপর কোণ থেকে এল ধারালো প্রশ্ন: এ কি স্কুলে মাষ্টারের বক্তৃতা শুনছি নাকি?

কানের পাশে কে একজন গর্জে উঠলো: বক্তৃতা দিয়ে পেট ভরে না মশাই! আমরা চাই খাদ্য! শালা মুরারির দশটা গোলাভর্তি ধান আছে।—চল সব।

প্রতিধ্বনি শোনা গেল: চল।

তারপরই হল্লা সুরু হয়ে গেল। নানা ভাবে ও ভাষায় একসঙ্গে সবাই চীৎকার করে নিজের নিজের বক্তব্য বলতে সুরু করলো। মাথার ওপর সংখ্যাতীত হাতিয়ার উঁচু করে সেই বিক্ষুব্ধ জনতা এমনি হুড়োহুড়ি সুরু করে দিল যে, শান্তি সোম বৃথাই কয়েক বার এদের বোঝাবার চেষ্টা করে অবশেষে হতাশ হয়ে আমার পানে চাইলেন: কী করা যায়, গাঙ্গুলী?

সত্যিই কি করা যায়? কী করা যেতে পারে? দৃষ্টিক্ষেপ করলাম চতুর্দ্দিকে। সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে সর্ব্বত্র প্রবলতম উষ্মার অভিব্যক্তি। বাঁধ ভেঙে ফেলবার পূর্ব্বক্ষণে বন্যার জল যেমন ফুলে ফুলে ওঠে, তেমনি গগনস্পর্শী হয়ে উঠেছে এদের ক্রোধ। যুক্তির তৃণখণ্ড কি করতে পারবে? …হাঁসাড়ার জনকতক ছেলেকে দেখলাম, কিন্তু কেয়টখালীর ছেলেরা সেই জনসমুদ্রে কোথায় হারিয়ে গেছে! জনতার প্রবল চাপ মাঝে মাঝে আমাদের ঠেলে ফেলবার উপক্রম করতে লাগলো। পাশে দেখলাম শুধু বছিরদ্দিকে, ছায়ার মত লেগে রয়েছে আমার সঙ্গে। ডান হাতখানা গেঞ্জির নীচে ঢুকিয়ে নেকড়ে বাঘের মতো ওৎ পেতে রয়েছে। শুধু একটুখানি ইশারার অপেক্ষা!

শান্তি সোম আবার ডাকলেন: দ্বিজেন!

অকস্মাৎ লম্ফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। টুলের ওপর নয়, একেবারে টেবিলের ওপর। চীৎকার করে ডাকলাম: এই, কোথায় চলেছেন সব? কোথায় চলেছেন, তাই জিজ্ঞেস করছি। মুরারির বাড়ী লুঠ করতে? সে বাড়ীর মেয়েদের গায়ে হাত দিতে? তাদের হত্যা করতে? কী অধিকার আছে আপনাদের, শুনি? মুরারি কাজী বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে বলে তার বাড়ী লুঠ করতে চান?—কেন, চলুন না, যাই একবার কাজী বাড়ীতে? কাজী বাড়ী লুঠ করতে পারবেন? সে হিম্মৎ আছে? ওদের তিন-তিনটে বন্দুককে অগ্রাহ্য করে কোন্ কোন্ গ্রাম আমাদের সঙ্গে কাজী বাড়ী লুঠ করতে যেতে চান, আসুন এগিয়ে।

দ্বিধাগ্রস্ত দেখা গেল এবার জনতাকে। ওষুধ ধরেছে! যুক্তি নয়, শালীনতা নয়, বাগ্মিতা নয়, আমার স্পষ্ট কথার হুমকি ওদের বুকে ঘা দিয়েছে বোঝা গেল। যারা হল্লা করছিল, থেমে গেল তারা, যারা এগিয়ে চলেছিল, ফিরে দাঁড়াল। এই তো সুবর্ণসুযোগ! বদ্ধমুষ্টি শূন্যে আস্ফালন করে আবার সুরু করলাম: সিংহের মতো যারা বন্দুকের সম্মুখীন হতে পারে না, লজ্জা করে না

তাদের শৃগালের মতো নিরস্ত্র মেয়েদের ঘরে ছোরা নিয়ে ঢুকতে?—কে আবার বড় গলায় বলছিলেন মুরারির বাড়ীতে দশটা ধানের গোলা আছে। হ্যাঁ, তা আছে। কিন্তু কাজী বাড়ীতে আছে বিশটা ধানের গোলা। আর শুধু ধানের গোলা কেন, আসামী মুরারিও সেখানে আছে। আরও আছে তিনটে বন্দুক। —চলুন না, যাই সেখানে। ধান পাওয়া যাবে, মুরারিকে পাওয়া যাবে আর লাভ হবে তিন-তিনটে বন্দুক। যাবেন? যাবেন সেখানে?—হাত তুলুন কে কে যেতে চান কাজী বাড়ীতে।—এইখানে, এই টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে আমি স্পষ্ট ভাষায় চ্যালেঞ্জ করছি, কেউ আমাদের সঙ্গে আসুন আর না-ই আসুন, মুরারি ঘোষের বাড়ি যে লুঠ করতে যাবে—বলে একটু ইতস্ততঃ করছিলাম কীভাবে শেষ করবো এই চ্যালেঞ্জের ভাষাটা, এমন সময় মুর্খ বছিরদ্দি দেখিয়ে দিল পথ। ঘ্যাচ করে টেনে বার করলো কোমর থেকে সেই নেপালী কুকরিখানা, এগিয়ে দিল আমার হাতে। সেই আঠারো ইঞ্চি কুকরিখানা মাথার ওপর তুলে ধরে চীৎকার করে বললাম: এই কুকরি রইলো তোলা তার জন্য।—আসুন, আসুন এগিয়ে, দেখি কার কত বড় বুকের পাটা। এই পথ রোধ করে দাঁড়ালো হাঁসাড়া আর কেয়টখালীর ছেলেরা।

বলেই বাঁ হাতে বাঁশী বার করে বাজিয়ে দিলাম তিনবার:

টা—ডট্

টা—ডট্

টা—ডট্

অর্থাৎ বিপদের সংকেত! কেয়টখালী ও হাঁসাড়া গ্রামের স্বেচ্ছাসেবকেরা যে যেখানে ছিল, ভিড় ঠেলে ব্যস্তে এসে জমায়েৎ হলো টেবিলের চারিপার্শ্বে। তাদের সংখ্যা প্রায় দু'শো।

কিন্তু এমন সময় অকস্মাৎ আবার চাঞ্চল্য দেখা দিল জনতার মধ্যে। কে যেন বলে উঠলো, পুলিশ এসেছে শ্রীনগর থানা থেকে, সঙ্গে কামাখ্যা সেন। সত্যিই, এমনি চরম মুহূর্তে আবির্ভূত হলো সেই স্বনামধন্য স্পেশ্যাল অফিসার কামাখ্যা সেন। এতকাল শুধু নামই শুনেছিলাম, আজ চাক্ষুষ দেখা হলো।

দেখা নয়, একেবারে মুখোমুখি হলো। জনতা দু'পাশে সরে গিয়ে পথ করে দিল, কামাখ্যা সেন পাঁচ জন বন্দুকধারী সিপাই নিয়ে একেবারে সোজা এসে হাজির হলো আমার টেবিলের পাশে।

আপনার নাম ?—গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

দ্বিজেন গাঙ্গুলী।

কোন্ গ্রামে বাড়ী ?

কেয়টখালী।

কামাখ্যা একবার স্তব্ধ জনতার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করলো। তারপর আবার প্রশ্ন : ভোজালি হাতে নিয়ে দাঙ্গা করবার জন্য আপনি সবাইকে উত্তেজিত করেছেন ?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন শান্তি সোম : না। দাঙ্গা যাতে না বেধে যায়, তার জন্য চেষ্টা করছি আমরা।

শান্তি সোমকে কামাখ্যা সেন বিলক্ষণ চিনতো। বললো : আপনিও এসে গেছেন দেখছি। ভালোই হলো, এবার পিস্ কমিটিতে বসা যাবে। গণ্ডগোল যখন কিছু হয়নি, তখন যাতে আর না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

অকস্মাৎ আমার ক্যাপটার দিকে লক্ষ্য পড়লো কামাখ্যার : ওটা কাদের ক্যাপ ?

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের।

খুলুন তো, দেখি।

দৃঢ়স্বরে জবাব দিলাম : শুধু মৃতের প্রতি সম্মান দেখাবার কালেই বি ভি টুপী খোলে।

বি ভি ! চমকে উঠলো কামাখ্যা। নরপুঙ্গব স্পেশ্যাল অফিসার কামাখ্যা সেন। বললো : বি ভি। মানে ঢাকার বি ভি ? মানে তেজোময় ঘোষ, সত্য গুপ্ত ? অর্থাৎ—

বাধা দিলাম : কারেক্ট করে বলুন মেজর সত্য গুপ্ত।

অ্যাঁ !—চোখ তুলে চাইলো কামাখ্যা আমার পানে। তাতে শুধু অসীম বিস্ময় নয়, ক্রোধের অগ্নিকণাও দেখতে পেলাম।

কিন্তু সে আগুনে আর লঙ্কাকাণ্ড হলো না। কারণ সঙ্গে ছিলেন শান্তি সোম। অত্যন্ত স্থির ও যুক্তিবাদী শান্তি সোম। আর কামাখ্যা সেনও বোধহয় নেপালী কুকরিখানার দৈর্ঘ্য মনে মনে হিসাব করে দেখছিল। খুব ভালো লাগেনি।

কামাখ্যা সেনের সঙ্গে এই আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ। তারপর আজ পেলাম তার হত্যার সংবাদ। কালীপদ মুখার্জ্জীকে চিনি না। কিন্তু বাংলার বিপ্লবী দলের অনেক দিনের পরিকল্পনা আজ তিনি কার্য্যে রূপায়িত করতে পেরেছেন বলে মনে মনে তাঁকে জানালাম সশ্রদ্ধ অভিবাদন।······কিন্তু টেলিগ্রাম কেন করতে গেলেন তিনি? এমনি দুর্বুদ্ধি কেন হলো তাঁর? কিংবা এমনি নির্দ্দেশ কে দিয়েছিল তাঁকে?······এমনিধারা অনেকগুলো প্রশ্ন জাগলো মনে, যার উত্তর পেলাম না খুঁজে!

কুড়ি

বহরমপুরের গরমের কথা আজও মনে পড়ে। সারাজীবন মনে থাকবে। এখানে একশো ডিগ্রি উঠলেই সাধারণতঃ আমরা আঁকুপাঁকু করতে থাকি। তারপর যদি আরও দু'চার ডিগ্রি বেড়ে যায়, তাহলে তো ছাত্রদল প্রাতঃকালীন স্কুলের জন্য ধর্ম্মঘট করে বসে, আর চাকুরেরা জানালায় ও দরজায় ঝুলিয়ে দেন খস্‌খস্। কিন্তু উত্তাপ যদি আরো বেশ কয়েক ডিগ্রি বেড়ে যায়, ব্যারোমিটারের পারা একেবারে বারো বা তেরোয় গিয়ে ঠেকে, তাহলে? তাহলে এখানকার আমরা হয়তো আলুসেদ্ধই হয়ে যাবো কিংবা বেগুন-পোড়া!

কিন্তু বহরমপুর বন্দীশিবির স্কুল ছিল না আর আমরা ছিলাম না চাকুরে, মহামান্য ইংলণ্ডের রাজা ও ভারতের সম্রাটের সম্মানিত অতিথি। জানালায়-দরজায় খস্‌খস্ নয়, আছে চিক্। সাবধানে সেই চিক্‌গুলো ফেলে দিতাম আমরা এবং নর্দ্দমা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে বালতির পর বালতি জল ঢেলে তৈরী করা হতো কৃত্রিম লেক! সেই লেকের তক্তপোশ-দ্বীপে বকের মতো সমাধিস্থ হয়ে বসে বসে কাটাতে হতো আমাদের প্রত্যেকটি দুপুর।

ব্র্যাকেটের ওপর জামাগুলো যেন সদ্য উনুন থেকে নামানো পটেটো চিপ্‌স্, গায়ে দিলে গা পুড়ে যেতে পারে! জুতোগুলো যেন বয়লার থেকে বার করা কয়লার টুকরো, জলে না ভিজিয়ে নিলে ছোঁবার উপায় নেই। তেমনি টেবিল, তেমনি চেয়ার, তেমনি বই, তেমনি সব!

হু হু করে বইছে হাওয়া এলোপাতাড়ি, কিন্তু তাতে আগুনের হল্‌কা শাহারা বা গোবির। চিল্কার মিষ্টি হাওয়া সেখানে রূপকথা! অগ্নিপুচ্ছ দুলিয়ে দুলিয়ে

সেই হাওয়া সর্ব্বত্র ছড়িয়ে যাচ্ছে অগ্নিকণা! কিন্তু রক্ষা যে, হাওয়ায় আর্দ্রতা একেবারে নেই বললেই হয়। তাই গরমে আগুন হয়ে উঠি, ঘেমে আর নেয়ে উঠতে হয় না।

রাত্রিটা কিন্তু তেমন অসহ নয়। দুপুরের সেই গরম হাওয়াটাই রাত্রে কেমন নরম হয়ে আসে অনেক ক্রোধের পর মুচকি হাসির মতো। আর রাত বারোটার পর থেকেই সেই নরম হাওয়া কেমন ভিজে ভিজে লাগে দরদী অশ্রুর মতো। তখন চাদরখানা টেনে নিলে মন্দ লাগে না।

সুতরাং এই উত্তাপের রাজ্যে বর্ষার জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। আকাশে মেঘ দেখলেই ময়ূরের মতো পেখম ধরে নৃত্য সুরু করিনি অবশ্য, কিন্তু আনন্দে যে আটখানা না হয়ে, একেবারে তিন-আটা-চব্বিশখানা হয়ে পড়তাম এবং আসন্ন আনন্দোৎসবের প্রারম্ভিক ঐক্যতানের মতো সকলেই যে চার-আটা-বত্রিশটি দন্ত বিকশিত করে সরবে ও সবিস্তারে সকলের কাছেই এই আনন্দ-সন্দেশ পৌঁছে দিতাম, সে কথা বেশ মনে পড়ে। মেঘের গর্জ্জন আমাদের কানে বাঁশীর সুর হয়ে উঠতো, দমকা হাওয়ার দাপাদাপিকে মনে হতো গৌরীশঙ্কর ডিঙ্গিয়ে-আসা মোলায়েম মৌসুমী বায়ু, আর আকাশ চিরে চিরে সর্পিল বিজলী আমাদের মনেও চমক্ মারতো!

তারপর যেই ঝরঝর করে নেমে এল বারিধারা, বেরিয়ে পড়লাম আমরা সকালিক, মাধ্যাহ্নিক, বৈকালিক, সান্ধ্য অথবা নৈশ, অর্থাৎ ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত যে কোনো সময়ের আনন্দভ্রমণে। ডবলিউ বি চোদ্দ নম্বরের সবাই বেরুতো, তারপর অমর ও আমি, মতি সিং ও নৃপেন পাল, নীরেন সেন ও কুসুম গোঁসাই, সত্যবাবু, করালীকান্ত, রমেশ দাশ, রবি, জীবন, জ্যোৎস্না, গুর্‌থা—কে নয়? দেখাদেখি উৎসাহিত হয়ে বেরিয়ে পড়তো টালা ব্যারাকেরও অনেকে। লাল সুড়িছড়ানো রাস্তায় চলতো দলে দলে ভ্রমণ। ছাতা নিয়ে নয়, বর্ষাতি নিয়ে নয়, এমন কি, ছেঁড়া জামাকাপড পরে নয়। অফিসে যেতে হলে যেমন ধোপদুরস্ত ধুতি ও পাট-ভাঙ্গা জামা পরে যাই, যেমন পালিশ-করা জুতো পায়ে দিই, ঠিক তেমনিভাবে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, জল জমে প্রথমে জুতো ও পরে হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবে গেল, তবুও নির্ব্বিকার ভাবে চলেছে আমাদের আনন্দভ্রমণ।

সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজও কিন্তু এই বর্ষায় বন্ধ তো থাকতোই না, এমন

কি, একটি সেকেণ্ডও পিছিয়ে দেয়া হতো না। ফিটফাট পোষাক এঁটে জুতো-মোজা পরে এই দারুণ বৃষ্টির মধ্যেই চলতো আমাদের প্যারেড আর বর্ষাতি গায়ে এঁটে রাইফেলধারী সান্ত্রী আমাদের এই পাগলামি নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখতো জলের ঝাপটায় ভিজে দাঁড়কাকের মতো। কিন্তু প্রবল বর্ষায় আমাদের নিউমোনিয়া দেখা না দিলেও অসহ্য গরমে আমাদের মাথা ধরিয়ে দিত।

ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের তেরো নম্বরে থাকতো গণেশ সাহা। ময়মনসিংহের অধিবাসী। বড়লোকের ছেলে। স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ। রাজবন্দীদের মধ্যে একদলের ছিল দারুণ পড়বার ঝোঁক। যে কোনো বই পড়া সুরু করলেই হলো, আর তা যদি মূল্যবান কোনো বই হয় আর একবার ভালো লেগে যায়, তাহলে আর রক্ষে নেই। নাওয়া বাদ, খাবার ঘরে খেতে যাওয়া বাদ, এমন কি নিদ্রা বা বিশ্রামও বাদ, চললো পাঠ ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সকালের পর বিকেলে, বিকেলের পর রাত্রি, তারপর আবার সকাল, আবার বিকেল······অর্থাৎ একেবারে মলাট থেকে সুরু করে মলাটে না পৌছানো পর্য্যন্ত একটানা। টিপয়ের ওপর চাকর দিয়ে যাচ্ছে চা ও জলখাবার, দুপুরের ডিস ও রাত্রের প্লেট।

অদ্ভুত পড়ুয়াদেরই একজন এই গণেশ সাহা।

হঠাৎ একদিন ভোর বেলা গণেশ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই চোদ্দ নম্বরে প্রবেশ করলো। কমেটের মশারি তুলে ডেকে তুললো তাকে বিশেষ কথা আছে জানিয়ে।

কমেট মিলিটারী ম্যানের মত চট্ করে উঠে বসলো। জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইতেই গণেশ বললো: দেখুন কমেটবাবু, আমাদের ভেতরকার কথা যাতে কর্ত্তৃপক্ষের কানে না যায়, তাই করা উচিত নয় কি?

কমেট তৎক্ষণাৎ সায় দিল। গণেশ বলতে লাগলো: আমিও তাই বলি। আমাদের কথা আমাদের মধ্যেই থাকা উচিত। টবিনের কানে যদি একবার যায়, তাহলে কী ভাববে টবিন, বলুন তো? কী লজ্জার কথা হয়ে দাঁড়াবে তাহলে? এমনি লজ্জা দেবার সুযোগ কেন দোব আমরা ওকে? অতএব, আমাদের কথা কারুকেই না জানানো উচিত। তাই না, কমেটবাবু?

কমেট আবার সায় দিয়ে একটু বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলো: কেন, টবিন কোনো কথা জেনে ফেলেছে নাকি?

না, জানেনি এখনও। হয়তো কখনও জানতে পারবে না।—বলে সংশয় প্রকাশ করলো গণেশ : কিন্তু তবু সতর্ক হতে হবে তো! দেয়ালেরও কান আছে। কোথাকার কথা কোথায় চলে যায় বাতাসের মুখে। কিন্তু তাই বলে কথা না বলে তো থাকতে পারবে না মানুষ! কথাই তো জীবন। কিন্তু সেকথা টবিনের কানে কেন যাবে, কমেটবাবু? কেন ও বলবার সুযোগ পাবে—ওগো, তোমাদের সব কথা জানি।

বলেই অকস্মাৎ গণেশ মাথা ঘুরিয়ে এদিক ওদিক ভালো করে দেখে নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে অনুরোধ জানালো : আমার সেই কথাটা কিন্তু কাউকেও বলবেন না, কমেটবাবু।

কি কথা?—প্রশ্ন করলো বিস্মিত কমেট।

কিন্তু সে প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে আবার অনুনয় বিনয় করতে লাগলো গণেশ : সত্যি, তাহলে টবিনের কাছে আর মুখ দেখানো যাবে না। বলবেন না তো? কথা দিচ্ছেন তো কমেটবাবু?

কিন্তু কথা না নিয়েই সে উঠে দাঁড়ালো এবং যতীশবাবু, মনোরঞ্জন, নীতীশ, সবাইকে একে একে ডেকে তুলে সবিনয়ে জানাতে লাগলো ঐ একই অনুরোধ : আমার সেই কথাটা কিন্তু কাউকেও দয়া করে বলবেন না।

বাইরে বারান্দায় যার সঙ্গে দেখা হতে লাগলো, তাকেই ঐ একই অনুরোধ জানিয়ে যেতে লাগলো। দূর দিয়ে যে চলে যাচ্ছিল, হাঁক দিয়ে তাকে ডেকে এনে জানাতে লাগলো সেই একই অনুরোধ। শিবিরের চাকর-বাকর, ধোপা-নাপিত সবাইকে ডেকে ডেকে ঐ একই বক্তব্য পেশ করতে লাগলো। যাকে একবার বলেছে, তাকে আবার এবং বার বার বলতে লাগলো। এমনি করে সারা শিবিরের প্রত্যেক ঘরে গিয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকলো এবং এই জুলাইয়ের গ্রীষ্মে একটা পুলওভার গায়ে চড়িয়ে সটান শুয়ে পড়ে গণেশ হাত-পাখা চালিয়ে হাওয়া খেতে লাগলো।

পরিষ্কার বোঝা গেল যে, পাগল হয়ে গেছে গণেশ! দেখা গেল, তার টেবিলে আধ-খোলা হয়ে পড়ে আছে Psychoanalysis of Mind সম্বন্ধে লেখা খুব মোটা একখানা দুর্বোধ্য বই। পাশেই নোটখাতা। মর্ম উপলব্ধি করে নোট লিখছিল সে। মনোবিকলন অধ্যয়ন করতে করতে কখন্ যে তার

নিজেরই মন যুক্তিময় বুদ্ধির রাশ ছিন্ন করে মস্তিষ্কের গ্রন্থিগুলি বিকল করে দিয়েছে, টের পায়নি গণেশ।

পাগল হয়ে গেছে গণেশ।

পাগল হয়ে গেছে!

সর্ব্বত্র আতঙ্ক দেখা দিল। সংবাদ নিয়ে জানা গেল, পূর্ব্বে এই বন্দী-শিবির ছিল পাগলা গারদ। দুর্দ্দান্ত শ্রেণীর বন্দীরাই থাকতো এখানে। মোটা শিকল দিয়ে মেঝের সঙ্গে বেঁধে রাখা হতো তাদের। মাঝে মাঝে চাবুকও চালানো হতো তাদের ওপর। কিন্তু পাগলামির কি কোনো বীজাণু আছে? চুনকাম করবার পরও দেয়ালে দেয়ালে তারা বেঁচে থাকতে পারে কি?··· অদ্ভুত আতঙ্ক! কিন্তু যুক্তিহীন এই আতঙ্কে এমনিই অভিভূত হয়ে পড়লাম আমরা যে, দেখতে দেখতে অধ্যয়নের উৎকট উৎসাহ সাধারণভাবে কমে গেল। আর প্রতিদিনই ভোরে উঠে একে অপরের কথা বা কাজ লক্ষ্য করতো গভীর অভিনিবেশসহকারে, পরখ্ করে দেখতে চেষ্টা করতো গণেশের হাওয়া লেগেছে কি না।···

বন্ধুরা অবশ্য দলে দলে এসে যুক্তিজাল বিস্তার করে বা বিতর্কে কোণঠাসা করে চেষ্টা করলেন গণেশের পাগলামি রোগ সারাতে। কিন্তু কোনো ফল দেখা গেল না। গণেশ সময় মত নাওয়াখাওয়া বা শোওয়া সম্বন্ধে বেশ সচেতন, অথচ যার সঙ্গে দেখা হয়, তাকেই অত্যন্ত গম্ভীর মুখে একবার অনুরোধ জানায়ঃ দেখুন, আমার সেই কথাটা দয়া করে টবিনের কানে তুলবেন না। বুঝলেন, my earnest request···

ধীরেনদা' ছুটে এলেন, দেখলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেলেন। গণেশ এবার আই. এ. পরীক্ষা দেবে। ধীরেনদা'র অনেক অনুরোধে সম্মতি দিয়েছিল সে। একজন ছাত্র কমে গেল।

গণেশের বাড়ীতে ও গভর্ণমেন্টের কাছে টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হলো। ওর বাবার অনুরোধে ও তদ্বিরে গণেশকে স্থানান্তরিত করা হলো ময়মনসিংহ জেলে। বাবা চিকিৎসা করাবেন কবিরাজী মতে।

গণেশের চলে যাবার দিনটি আজো মনে আছে আমার। বেচারার জিনিষপত্র সবই অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সিপাই এসেছে ওকে নিয়ে যেতে। গণেশ বেরিয়ে এসেই কমেটকে সবলে জড়িয়ে ধরে হাঁউমাউ করে

কেঁদে ফেললো। কমেট জিজ্ঞেস করলো: এ কি, কাঁদছিস কেন রে? বাড়ীতে যাচ্ছিস্ তো!

ক্রন্দনভাঙ্গা স্বরে জবাব দিল গণেশ: কেন আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন, কমেট-বাবু? আমি তো কারুর কথা অফিসে লাগাইনি।

না, না, তাড়ানো নয়। আপনার স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে। আপনার চিকিৎসা করাবেন কি না, তাই ময়মনসিংহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আপনাকে। —বললো মনোরঞ্জন।

বাধা দিয়ে বললো গণেশ: ওসব সান্ত্বনা দেবেন না আমায়, মনোরঞ্জন-বাবু! জানি, ওরা আমায় অফিসে নিয়ে গিয়ে মারবে হ্যাণ্ডকাফ লাগিয়ে।—কিন্তু আমি কি কোনো গোপন কথা বলে দিয়েছি যে এই শাস্তি আমার?

তারপর একসময় গণেশ অফিসের গেটে এল। প্রত্যেককে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলো, চোখের জলে প্রত্যেকের জামা ভিজিয়ে দিল, প্রত্যেককে মনে রাখবার জন্য জানালো আকুল আবেদন, আর ওর সেই কথাটি না বলবার জন্য জানিয়ে গেল কাতর অনুরোধ।

গেট বন্ধ হলে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। কিন্তু কেমন খালি খালি মনে হতে লাগলো। কী যেন হারিয়ে গেছে!……

এই দারুণ গ্রীষ্মেই একদিন একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটে গেল। পূর্ব্বেই বলেছি, টবিন মনে করতেন, যা আমরা চাইবো তাতে সম্মতি না দিলেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হবে। তাঁর আরও একটা নীতি ছিল, রাজবন্দী হ'লেও আমরা যে বন্দী, আইন ও শৃঙ্খলার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই বৃটিশ গভর্ণমেন্টের পরম শত্রু, এই অনির্ব্বাণ সত্য মনে রেখে তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করতেন আমাদের তা বুঝিয়ে দিতে। তাঁর অফিসে গিয়ে কিছু বলবার পূর্ব্বেই ঝপ্ করে তাঁর সম্মুখে চেয়ারে বসে পড়ে সিগারেটে মোক্ষম টান মেরে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে তারপর কথা সুরু করাটাকে লেফটেনাণ্ট কর্ণেল টবিন খুব অপমানজনক মনে করতেন। লড়াইপ্রত্যাগত ইংরেজের বাচ্চার প্রেষ্টিজ জ্ঞান ছিল সীমাহীন উৎকট! আমরাও তাই সুযোগ পেলেই একটা ঘা দিয়ে মজা দেখতাম।

একদিন দ্বিপ্রহরে আই. এ. ক্লাসের ইংরাজী পড়ানো হচ্ছে। বাইরে থেকে প্রফেসর এসেছেন। আমরা প্রায় ত্রিশ জন ছাত্র তাঁর বক্তৃতা শুনছি।

প্রফেসর একমাত্র পড়ার বিষয় ছাড়া অন্য কোনো কথা বলবার অধিকারী নন। সঙ্গে একজন হাবিলদার এসেছেন লক্ষ্য রাখবার জন্য।

অসহ্য গরম, তাই চিকগুলো সব ফেলে দেয়া হয়েছে। মনোযোগ দিয়ে যেমন কথা শুনছিলাম, তেমনি টেরই পাইনি কখন্ টবিন চাচা এই দারুণ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে সারপ্রাইজ ভিজিটে বেরিয়েছেন সদলবলে। দু'চার জায়গায় ঢুঁ মারবার পর আমাদের এখানে কোনো আইন অমান্য করা হচ্ছে কিনা, তা পরখ করবার জন্য একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে সোজা এসে আমাদের ক্লাসে প্রবেশ করলেন।

প্রফেসর মধ্যপথে বক্তৃতা থামিয়ে অভিবাদন জানালে টবিন স্মিতহাস্যে তা গ্রহণ করে পরমুহূর্তে আমাদের পানে চেয়েই একেবারে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমরা সবাই নীরবে বসে আছি। কী সাংঘাতিক কথা! সম্মুখে দণ্ডায়মান মহামান্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি, আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, আর আমরা পরম নিশ্চিন্তে রয়েছি তখনো বসে! সিংহকে দেখে ভেড়ার পাল বিন্দুমাত্রও বিচলিত নয়! প্রেষ্টিজ বুঝি রসাতলে যায়!

গর্জ্জন করে উঠলেন টবিন: Will you stand up?

গর্জ্জনের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

হাতের বেটন উঁচিয়ে টবিন আবার করলেন প্রশ্ন: Won't you stand up?

বেশ কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল। জবাব দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো না একটি ছাত্রও।

টবিনের এবার ধৈর্য্যের সীমারেখা প্রায় অতিক্রম হয়ে এল। বাইরের একশো বারোর অনেক বেশী উঠলো ওঁর মাথার মধ্যেকার পারা। চোখমুখ লাল, কান দু'টি একেবারে রক্তে টুসটুসে, কাঁপছেন টবিন।

এক পা এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর বেটনের একটা প্রচণ্ড ঘা মেরে চীৎকার করে উঠলেন: You people, I know how to make you stand up—

তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেল জ্যোৎস্না সরকার। জানিয়ে দিল তৎক্ষণাৎ সর্ব্বসম্মত অভিমত: No, we shall not stand up—বলে বসে পড়লো।

NO !!—ক্রোধে, বিস্ময়ে টবিন দিশেহারা-প্রায় ।—You still dare to sit down All right, I shall see—

বলেই গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেলেন—পশ্চাতে ব্যাঘ্রাচার্যোর বৃহল্লাঙ্গুলের মতো সড়াক্ করে বেরিয়ে গেল ডজন খানেক সিপাই ! কিন্তু দরজার বাইরে যাওয়া মাত্র ক্লাসের ত্রিশজনই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠলো। পুরো এক মিনিট স্থায়ী সেই অট্টহাসি।

নিশ্চয়ই এই বিদ্রূপ টবিনের কানে গেছে।

প্রফেসর বেচারা কিন্তু ঘাবড়ে গেলেন। বার বার অনুরোধেও বক্তৃতা আর তেমন জমাতে পারলেন না। আর সব চেয়ে মজা এই যে, আমাদের ঘর-কাঁপানো অট্টহাসিতে তাঁর মুখের কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। সর্ব্ব অবয়বে একটা প্রস্তরের বর্ম্ম এঁটে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। মহা অপরাধ যেন করে ফেলেছেন তিনিই।

টবিনের রেগে প্রস্থানের ফল মিনিট দশেকের মধ্যেই পাওয়া গেল। অফিস থেকে তলব এল প্রফেসরের। সেই যে তিনি গেলেন, ব্যস, আর ফিরলেন না। আপসরফার জন্য ধীরেনদা' অবশ্য ছুটে গেলেন অফিসে। কি কথা হলো জানিনে। অন্ততঃ সুফল যে কিছুই হয়নি, তা ধীরেনদা'র মুখ দেখেই টের পাওয়া গেল। বেশ বোঝা গেল, রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েটের বরিশালীয় যুক্তি লাল মুখের প্রেষ্টিজের ইস্পাতে ঘা খেয়ে ফিরে এসেছে। শোনা গেল, গবুচন্দ্রও ছিলেন পাশেই, কিন্তু হবুচন্দ্র এবার যেন ৯৩ ধারার ক্ষমতাবলে শাসনযন্ত্র নিজের মুষ্টিবদ্ধই করে রাখলেন। টললেন না এক-চুলও !… …

একুশ

ভাবলাম, যাক্, বাঁচা গেল। ধীরেনদা'র তাগাদায় ও তিরস্কারে সপ্তাহে দু'দিন উত্তপ্ত ও অসহ্য দ্বিপ্রহরে এসে এই নাবস আই. এ. ক্লাস করতে হতো। এবার সে হাঙ্গামা চুকে গেল।

কিন্তু একটা কিছু না নিয়ে যে বন্দীরা কিছুতেই চুপ করে বসে থাকবে না। কিছু না পেলে তারাই একটা কিছু সৃষ্টি করে নেয়, তারপর টানতে থাকে তার জের।

একদিন উষা পাল ও ধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এসে হাজির গোপাল ঘোষকে সঙ্গে করে। থিয়েটার করতে হবে। জিজ্ঞেস করলাম: তা এতে আমার কি করবার আছে?

বলেন কি!—বিস্ময় প্রকাশ করল উষা: সংবাদ কি আমরা সংগ্রহ না করেই এসেছি? বিক্রমপুরের হাঁসাড়া-কেয়টখালীর দিকে অভিনয়ে যে আপনার নামডাক খুব, তা আমরা জেনে গেছি। গোপালদা' যদি আপনার সঙ্গে জোটেন, তাহলে এখানেই তো আমরা ষ্টার-মিনার্ভা সৃষ্টি করে দেখিয়ে দিতে পারি—

বাধা দিলাম: কিন্তু দেখাবে কাকে? আমাদের দর্শক কোথায়?

ধীরঞ্জন বললো: এই তিনশো ত্রিশজনের ত্রিশজনই না হয় থাকবে ষ্টেজে, বাকি তিনশো'জন দর্শক তো পাওয়া যাবে। তাছাড়া চাকর-নাকর আছে, ধোপা-নাপিত আছে, সিপাইরাও কি আর দেখতে আসবে না? চাই কি, গিরিজাও আসতে পারেন সপরিবারে।

কি বই?

সীতা আর মন্ত্রশক্তি।—বললো উষা।

রাজি না হয়ে আর উপায় আছে? সুতরাং মহলা সুরু হয়ে গেল নিয়মিত-ভাবে। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক "মিউট মিলটনের" সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়লো। দেখা গেল, আমাদের মধ্যে শক্তিশালী নটেরও অভাব নেই।

কিন্তু অ্যামেচার ক্লাবে যা হয়, এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। ভূমিকালিপি প্রতিদিনই পরিবর্তিত হতে লাগলো এবং মহলায় জনসমাগম শনৈঃ শনৈঃ হ্রাস পেতে লাগলো। দেখা গেল, হরিপদ চক্রবর্তীর যেমন

নায়কোচিত চেহারা ও স্বাস্থ্য, অভিনয়েও তিনি তেমন পারদর্শী। 'শৃঙ্খলে'র সম্পাদক বিনয় সেনও চমৎকার অভিনয় করেন, তেমনি উষা এবং সতীশ। নারী-চরিত্রের অদ্বিতীয় অভিনেতা হচ্ছেন রবি লাহিড়ী, তারপর ধীরঞ্জন, সুধীর ঘোষ ইত্যাদি।

ঘন ঘন পরিবর্ত্তনের পর চূড়ান্তভাবে যে ভূমিকালিপি দাঁড়ালো, তাতে সীতা নাটকে আমার ভূমিকা নির্দ্দিষ্ট হলো লব, আর মন্ত্রশক্তিতে মৃগাঙ্ক। রামের ভূমিকাই ছিল, কিন্তু সীতারূপী ধীরঞ্জনের নাকি আমায় "প্রাণেশ্বর" বলে ডাকতে ভারী হাসি পায়। তাই গোপাল ঘোষ এলেন রফাকর্ত্তারূপে বাল্মীকির ভূমিকা বিনয় সেনকে দিয়ে। ব্যবস্থাপনার অধি-নায়করূপে এগিয়ে এলেন কামাখ্যা রায় অর্থাৎ কামাখ্যাদা'।

কিন্তু এই নাটকাভিনয়ের পূর্ব্বেই একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন হলো। তাতে অর্কেষ্ট্রা পার্টির ঐক্যতান, বাঁশী, সেতার, এস্রাজ, বেহালা প্রভৃতির একক বাজনা, আবৃত্তি এবং অবশেষে বিভিন্ন নাটকের নির্ব্বাচিত দৃশ্যের অভিনয়। দীনবন্ধু ঘোষাল কেরিকেচারের ভার নিল। রাখাল ঘোষ এরও পর একটি একাঙ্কিকা কৌতুক নাটকের ব্যবস্থা করলেন।

সাজাহান নাটকের নির্ব্বাচিত দৃশ্যের অভিনয়ে আমি নাটমঞ্চে দেখা দিলাম সাজাহানরূপে। লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের মতো ন্যুব্জদেহ, বাম অঙ্গ পক্ষাঘাতে পঙ্গু ও সর্ব্বদা কম্পমান এবং খঞ্জের মতো চলাফেরা, অথচ চক্ষে আগুনের ফুলকি আর কণ্ঠস্বরে বজ্রের নির্ঘোষ! সে যুগে এই ভূমিকায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরীর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। তাঁর অভিনয় তখনো আমার দেখবার সৌভাগ্য না হলেও বিশ্ববিশ্রুত প্রশংসা আমি শুনেছি এবং এই দুরূহ ভূমিকাটি কেমন অদ্ভুত সাফল্যের সঙ্গে তিনি অভিনয় করে থাকেন, তাও বহুমুখে জানতে পেরেছি। এই শোনা ও জানার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে এবং সেই সঙ্গে নিজের চিন্তা, যুক্তি ও মৌলিকতা মিলিয়ে এমনি অভিনয় আমি সেদিন করে ফেললাম যে, পরের মাসের 'শৃঙ্খল' পত্রিকায় আমোদ-প্রমোদ বিভাগে লিখবার জন্য এগিয়ে এলেন স্বয়ং বিনয় সেন পার্কার হাতে নিয়ে। ঘোষণা করলেন, সমালোচনা লিখবেন তিনি নিজে এবং প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যা লিখেছিলেন, হুবহু ভাষা তার মনে না থাকলেও ভাবার্থ আজো ভুলিনি। তিনি লিখেছিলেন: 'দ্বিজেনবাবুর অনবদ্য অভিনয় দেখতে দেখতে

মাঝে মাঝে অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় দেখছি বলে আমাদের ভ্রম হয়েছে। স্বাস্থ্যবান যুবক হয়ে এবং বিশেষ করে সেনাবাহিনীর জি-ও-সি হয়ে কীভাবে যে তিনি এক লোলচর্ম্ম অশীতিপর বৃদ্ধের ভূমিকায় এমনি অনন্যসাধারণ অভিনয় করলেন, তা মনে করে বিস্মিত হতে হয়।'

সুতরাং সীতা ও মন্ত্রশক্তির অভিনয়কালে দর্শকের ভিড় পড়ে গেল এবং স্বয়ং গিরিজা দত্তও এলেন সপরিবারে এবং টবিন সাহেবকেও সঙ্গে নিয়ে। অবশ্য অভিনয় সুরু হবার কিছুক্ষণ পর টবিন স্মিতহাস্যে বিদায় নিলেও গিরিজা সপরিবারে বসে রইলেন একেবারে শেষ পর্য্যন্ত। পরদিন আমায় অফিসে ডাকিয়ে অজস্র প্রশংসা করলেন।

আমাদের নাটকাভিনয় এত জমে গেল যে এর পর জনকতক বন্দী উৎসাহী হয়ে একটা ষ্টেজই তৈরী করবার সঙ্কল্প করলেন এবং চাঁদা তোলা তৎক্ষণাৎ সুরু হয়ে গেল।

টবিনের সঙ্গে খিটিমিটি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। চিঠি লেখা নিয়ে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিয়ে, পীড়িত বন্দীদের চিকিৎসা নিয়ে, ঠিকাদার কর্ত্তৃক জিনিষপত্র সরবরাহ নিয়ে—কী নিয়ে নয়?

পূর্ব্বেই বলেছি টবিন যুক্তির ধার ধারতেন না। কোন ব্যাপারে বেশীক্ষণ আলোচনা চললেই তাঁর মিলিটারী মস্তিষ্কের সেলগুলিতে রক্তের প্লাবন দেখা দিত। শিক্ষিত বন্দীদের প্যাঁচালো যুক্তির কোদাল পায়ের তলায় মাটি কেটে দিচ্ছে বলে মনে হতো তাঁর। সুতরাং প্রায়ই আলোচনার মাঝখানটিতেই লাল মুখ আরও লাল করে অকস্মাৎ যবনিকা টেনে দিয়ে নিতান্ত অভদ্রের মতো এমনি আচরণ করতেন যে, গোপাল গুপ্ত তো একদিন পায়ের স্যাণ্ডেলই প্রায় খুলে ফেলেছিলেন। সঙ্গে ঠাণ্ডা-মেজাজী সুধীন সরকার না থাকলে সেদিনই একটা মারাত্মক কাণ্ড বেধে যেত! আমাদের দাবীগুলো নিয়ে প্রতিনিধিদল যখন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে গেলেন, টবিন তখন প্রথম দিকে বেশ ভারিক্কি চালে আলাপ সুরু করলেন। কিন্তু গোঁয়ারতুমি-ভর্ত্তি তাঁর মন্তব্যগুলো ক্ষুরধার যুক্তির ফলকে প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য সুধাংশু ভট্টাচার্য্য যখন কেটে ফেলতে সুরু করলেন, তখন একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ টবিন উঠে

দাঁড়িয়ে তাঁর উদ্ধত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন : তোমাদের দাবীগুলো একেবারেই অযৌক্তিক। অতএব, এবার পথ দেখতে পার।

সেই পথ নির্ব্বাচনের মারাত্মক সভাটাই হলো আগষ্ট মাসের শেষ দিকে। দলভেদ, মতভেদ, পথভেদ যতই থাক, পৃথক্ পৃথক্ চৌকায় camp politics অর্থাৎ ঘরোয়া রাজনীতির কচকচি যতই চলুক না কেন, অনুশীলন-যুগান্তরের ধূমায়িত রেষারেষি যতই থাক না কেন,—বৃহত্তর প্রয়োজনে, যেখানে সমগ্র বন্দীশিবিরের ব্যাপার জড়িত, যেখানে সাধারণভাবে বন্দীদের আত্মমর্য্যাদা আহত, সেখানে, সেকালে দেখেছি, সবাই দল উপদল-নির্ব্বিশেষে এসে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছেন, হাতে হাত রেখে সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করেছেন।

একালে অগ্রগামী চিন্তাধারা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তিবাদ সৃষ্টি করেছে এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোষ, অপরের ওপর নির্ভর করবার ক্ষীণতম দুর্দ্দিনও যার দেখা দেয় না কোনোকালেই। শম্বুকের মতো নিজের চারদিকে যে অনতিক্রম্য গণ্ডী তুলে রেখেছে, সেই স্বল্প পরিসরতার মাঝেই লাভ করে সে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দ। চরম শান্তি তার সেইখানেই সমাহিত। প্রাণের বিপুলতা ক্ষ্যাপা বন্যায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলেও কোনোকালেই তা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে যাবার উদ্দামতা দেখাবে না। একালে তাই দেখতে পাই ফাইল-দুরস্ত ঐক্য, শতাধিক সর্ত্তযুক্ত মিলন। একালে তাই জনমতেরই লজ্জাকর পরাজয় ঘটেছে বার বার ব্যক্তির প্রতিযোগিতার আসরে। সেকালের দল সংগঠনের মূলে আবেগ ছিল অনেকখানি, মন দিয়ে মন জয় করবার সংকল্প ছিল দুর্জ্জয়, পরিণামের অনিশ্চয়তা স্বীকার করে নিয়েই সেকালে আন্তর্দলীয় সহযোগিতার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হতো। বস্তুতন্ত্রবাদের হাপরে পুড়িয়ে একালের নিছক কলা-কৌশলের খেলা নয়, সেকালের ষ্ট্র্যাটেজির পশ্চাতে ছিল সৈনিকের ভাবাবেগময় সংকল্প, তার সর্ব্বান্তরিক শপথ!

তাই তো দেখলাম, বিনা প্রতিবাদে, বিনা বিতর্কে, বিনা আলোচনায় আগষ্টের সেই স্মরণীয় সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো মারাত্মক এক প্রস্তাব : পনেরো দিনের সময় দিয়ে টবিনকে দেয়া হবে এক চরম পত্র। আমাদের দাবীগুলো যদি না মেনে নেয় সে, তাহলে আজ থেকে ষোড়শ দিবসেই প্রয়োগ করা হবে একেবারেই বন্দীর তীক্ষ্ণতম অস্ত্র—অনশন। আমৃত্যু অনশন! প্রথম

সুরু করবে বিশ জন, তার পর প্রতি সপ্তাহে নতুন দশ জন করে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

একটি শক্তিশালী সর্ব্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে সেদিনকার মত সভার কাজ শেষ হলো।

চরম পত্রকে টবিন কিন্তু পরম কৌতুক সহকারে গ্রহণ করে প্রথমটা বেশ নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন : Are you determined to die ?

জবাব দিলেন প্রভাত নাগ : Of course, if our demands are not conceded to.

পাগল যেমন অকারণে খিলখিল করে হেসে ওঠে, তেমনি করে উচ্চহাস্য করে উঠলেন টবিন। বেরিয়ে যাবার মুখে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে গেলেন : I am sorry you will have to lose your life then.

গিরিজা কিন্তু গ্রহণ করলেন সাপ্রু-জয়াকরের গৌরবময় ভূমিকা। দু'টি পরস্পরবিরোধী ফোর্সের একটির যদি সামান্য একটু কম বেগ থাকে, তাহলেই তো একটা রেজাল্টেন্ট বার করা যেতে পারে। আর সেটা যদি সহনীয় হয় তাহলেই তো গ্রহণীয় বলে উভয় পক্ষকেই আবেদন জানানো যায়। বিস্তর মাথা ঘামিয়ে ফেললেন গিরিজা দত্ত। গোটাকতক দাবী তো এখনই মিটিয়ে দেয়া যায়, কয়েকটার সম্বন্ধে সাহেবের সঙ্গে একটু পরামর্শ দরকার, দু'তিনটে দাবী যা আছে, তা গভর্ণমেণ্টকে না জানিয়ে কিছু করা সঙ্গত হবে না, আর বাকি তিনটে ?—ও তিনটে ছেড়ে দিন প্রভাতবাবু, একটা মিটমাট হয়ে যাক।

জবাব দিলেন অনন্ত দে : অনশনে দু'চার জন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার পর ছাড়াছাড়ি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে, গিরিজাবাবু। আজ উঠি।

বিলক্ষণ, তা কি হয় ?—হাল ছাড়তে চাইলেন না গিরিজা : স্বীকার করি আমাদের অনেক ত্রুটি আছে। কারণ আমাদের হাত পা বাঁধা। কিন্তু সবগুলিই কি আমাদের দোষ, সেটাই বিবেচনা করে দেখবার জন্য অনুরোধ জানাই আপনাদের। এক জায়গায় বাস করে কেন ঝগড়া করবো আমরা, সেটাই আমি বুঝতে পারছিনি। মীমাংসার পথ তো বার করতে হবেই।

সে তো খোলাই আছে।—জবাব দিলেন দেবজ্যোতি : সব পথই গেছে বন্ধ হয়ে, খোলা আছে একটি মাত্র দিক্। সেই দিকেই তো যাবো বলে স্থির করেছি আমরা। আলোচনা অনেক হয়ে গেছে এই শিবির খোলবার পর

থেকেই। এত বেশী যে, সবই শেষ পর্যন্ত আলোচনাতেই পর্য্যবসিত হয়ে যায়।

যতীশ গুহ যোগ দিলেন : তাই এবার একটা কাজ করা যাক্, কি বলেন গিরিজাবাবু? কাজের ঝুঁকিটা অবশ্য বেশী হয়ে গেছে। তা আর কি করা যাবে। ক্ষুদিরামের কাছে না গিয়ে হয়তো যাওয়া যাবে যতীন দাসের কাছে। কিন্তু তাঁরা ওখানে গিয়ে বোধহয় এক ঘরেই থাকেন। তাই না, গিরিজাবাবু? ওখানে তো টবিন নেই।

গম্ভীর হয়ে গেলেন গিরিজা ও-দু'টি নাম শুনে। শুধু বললেন : দিয়ে যান অ্যাপলিকেশন। দেখা যাক্ কোনো মীমাংসা সম্ভব কিনা।

কিন্তু কোনো মীমাংসাই সম্ভব হলো না। আমাদের পুরো প্রস্তুতি চলতে লাগলো। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনশন-সংগ্রামের প্রস্তুতি। ভিড় পড়ে গেল প্রথম দলের তালিকা তৈরীর সময়। যতীন দাসের বংশধরেরা মৃত্যুর উল্লাসে নৃত্য করে উঠলো। যতীন দাস ছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সেরই মেজর। সুতরাং বি ভি দলের কাছে এসে পৌছোলো যেন স্বর্গতঃ সেই অমর শহীদের অনুচ্চারিত আদেশ!……

সংগ্রাম পরিষদ নিজেরা বাছাই করে যে তালিকা প্রস্তুত করলেন, তাতে স্থান পেল পঁয়ত্রিশ জন। বি ভি-র ছিল শুধু বীরেন ঘোষ। মুষ্টিযোদ্ধা, ইস্পাতদেহী, বহরমপুর বন্দীশিবির সেনাবাহিনীর অন্যতম সেকশন কমাণ্ডার বি. ঘোষ।

সমগ্র শিবিরে নেমে এল থমথমে ভাব! আসন্ন কালবৈশাখীর উপক্রমণিকার মতো। বুলেটের বিরুদ্ধে বুলেট নয়, আঘাতের উত্তরে প্রত্যাঘাত নয়। একেবারে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। হৃদয় দিয়ে, মনোবল দিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করার চেষ্টা। পরিষ্কার গান্ধীজীর টেক্‌নিক! প্ররোচনায় উত্তেজিত হলে চলবে না। ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে, ভেবেচিন্তে প্রতিটি পদক্ষেপ! শত্রুপক্ষ চাইবে আমাদের ক্ষেপিয়ে তুলতে। যুক্তিহীন কথার ঝড় সৃষ্টি করে, বিতর্কের ঝগড়া লাগিয়ে, হয়তো আড়াল থেকে দু'খানা ইট ফেলে দিয়েই চাইবে আমাদের হিংস্র করে তুলতে। তারপরই হুকুম হবে : ফায়ার!

অবশ্য, আমরা জানতাম, আমাদেরই মতো ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে, বিন্দুমাত্র প্ররোচনা ব্যতীতই ইংরেজের বাচ্চা টবিন অনায়াসে গুলী চালাবার হুকুম দিতে পারে। জিভে তার এতটুকু জড়তা দেখা দেবে না।

অনশনকারীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবার জন্য এবং তাঁদের উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে সকল বন্দীই পত্র লেখার সুযোগ ত্যাগ করলেন, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিলেন, রান্নাঘরের কর্তৃত্ব ত্যাগ করা হলো, খেলাধুলা একেবারে বন্ধ করে দেয়া হলো, হাতখরচের টাকা থেকে একটি জিনিসও কেউ আর কিনলেন না, গান-বাজনা, ঐক্যতানবাদন সব থেমে গেল। কোলাহলমুখর শিবিরে নেমে এল মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা। সবারই মুখের হাসি শুকিয়ে গেছে, কথা ফুরিয়ে গেছে। সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ স্থগিত। শুধু প্রতিদিন 'শৃঙ্খল' পত্রিকার বিশেষ দৈনিক সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে অনশনকারী বন্ধুদের অবস্থা ও কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতার বার্তা নিয়ে। কার্টুন নয়, রস-রচনা নয়, ছুরির ফলার মতো ধারালো মাত্র কয়েকটি সংবাদ—কার বমনোদ্রেক দেখা দিয়েছে, কে শয্যাগ্রহণ করেছেন, কার টেমপারেচার হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে উদ্ধৃত টবিনের স্পর্দ্ধোদ্ধত মন্তব্য : Let them die !

সত্যিই, একটি একটি করে দিন গড়িয়ে যাচ্ছে আর একটু একটু করে এগিয়ে চলেছেন এঁরা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। আত্মসম্মান যেখানে আহত, ন্যূনতম অধিকার যেখানে পদদলিত, জীবনের মূল্য সেখানে অকিঞ্চিৎকর—এই এঁদের সর্ব্বঅন্তরের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করে গেছেন টেরেন্স ম্যাকসুইনী, তারপর মেজর যতীন দাস গেঁথেছেন তা পাকা করে, আর আজ পঁয়ত্রিশ জন বিপ্লবী বন্দী খাড়া করে তুলছেন অটল বিশ্বাসের ইমারত।

রাত্রে বিছানায় গা এলিয়ে দিতাম বটে, কিন্তু ঘুম আসতো না বহুক্ষণ। বার বারই মনে হয়েছে এই পঁয়ত্রিশটি পরিবারের কথা। ক্ষীণায়মান আশা নিয়ে আজো তাঁরা অপেক্ষা করছেন সুপ্রভাতের। কিন্তু দীর্ঘ রজনী যে দীর্ঘতর হতে চলেছে এবং পুঞ্জীভূত অন্ধকার অজগরের মতো ফণা তুলে যে সব কিছু গ্রাস করতে ধেয়ে আসছে, সে দুঃসংবাদ কি পৌঁছেছে তাঁদের কাছে?......

বাইশ

কেটে গেল পুরো একটি সপ্তাহ। প্রথম প্রথম অনশনব্রতীরা দল বেঁধে বিকেলে, সূর্য্যাস্তের অনেক পর আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে এলে বেড়াতে বেরুতেন। দিন সাতেক পর থেকে আর তা সম্ভব হলো না; হলেও বন্ধু বন্দীরা তা বন্ধ করে দিলেন। প্রথম সপ্তাহশেষে আবার কাড়াকাড়ি পড়ে গেল এই দলে যোগ দেবার জন্য। সংগ্রাম পরিষদ বাছাই করলেন তা থেকে এবার পঁচিশ জনকে। প্রথম সপ্তাহের পর ত্রিশ জন বৈকালিক ভ্রমণ ত্যাগ করলেও দ্বিতীয় সপ্তাহের এঁরা আবার তা স্বরু করলেন।

অকস্মাৎ একদিন শোনা গেল অনুশীলনের অরবিন্দ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। সে মাত্র পনেরো মিনিট। ঘাবড়াবার কিছু নেই তাতে। আবার একদিন দেখলাম যুগান্তরের হিমাংশুর বেশ জ্বর দেখা দিয়েছে। ডাঃ সরকার এসেছেন। পরীক্ষা শেষ করে অনেক দ্বিধার সঙ্গে বললেন: অবশ্য আপনাদের নীতি নিয়ে তর্ক করবার অধিকার নেই আমার। কিন্তু হিমাংশুবাবু এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন যে, শুধু লেবু-জল দিয়ে কতখানি আর শক্তি দিতে পারবেন ওঁকে? Vitality কমে গেলে ওষুধ দিয়ে কি আর রোগ সারানো যায়, নিরঞ্জনবাবু?

সবাই চিন্তিত হয়ে উঠলো। নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো: কি করা যেতে পারে তাহলে?

ইতস্ততঃ করে সরকার বললেন: যদি বলেন, তাহলে না হয় কিছু গ্লুকোজ ইনজেকশন—

একশো তিন জ্বরের মধ্যেও হিমাংশু শুনতে পেয়েছে সে কথা। রক্তবর্ণ চক্ষু দু'টি উন্মীলন করে ধুঁকতে ধুঁকতে জবাব দিল সে নিজে: ইনজেকশনই যদি নিতে পারি, তাহলে খেতে দোষ কি, ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু ঘাবড়ে গেলেন: না, তা বলছি না, তবে—

তবে-টবে থাক্, ডাক্তারবাবু! যদি পারেন, খানিকটে বুদ্ধির ইনজেকশন দিয়ে দেবেন আপনাদের মনিবকে। বলবেন তাকে, বরিশালের ভাষাও যেমন মিঠে ভদ্রতার অপেক্ষা রাখে না, তেমনি বরিশালের গোঁ-ও একেবারে বজ্র

শূকরের গোঁ-এর মত। ষ্টার্ট করলে একেবারে ফিনিশ পর্য্যন্ত না গিয়ে সে নিশ্বাস ফেলতে জানে না।

নীরবে বিদায় নিলেন সরকার।

প্রথম দিনের অনশনব্রতীরা সবাই শয্যা গ্রহণ না করলেও আর বেরুতেন না মাঠে। ইজিচেয়ারে বসে বই পড়তেন। কেউ খেলতেন তাস, কেউ বা ক্যারাম। আমার আজো স্পষ্ট মনে পড়ে, অনশনের বোধহয় চতুর্দ্দশ দিবসেও বিকেলে মাঠে বেড়াতে দেখেছি বি ভি-র বীরেন ঘোষকে। সেই মুষ্টিযোদ্ধা বীরেন ঘোষ, ঢাকা জেলে যার প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে ধরাশায়ী হয়েছিলেন একদা ডেপুটি জেলর আশুবাবু।

খেলাধুলা বন্ধ, প্যারেডও স্থগিত। তাই পায়চারি করছিলাম মাঠে। দেখি হাসপাতালের পথ দিয়ে আসছে বীরেন। দেখা হতে জিজ্ঞেস করলাম ঃ শরীর কেমন ?

ঠিক আছে। জবাব দিল বীরেন।

চেয়ে দেখলাম। মুখমণ্ডলের সেই প্রাণ-প্রাচুর্য্যের দীপ্তি খানিকটে কমে গেছে। হাতের মোটা মোটা আঙুলগুলোও যেন একটু সরু মনে হলো! বিরাট থাবার ব্যাপ্তিও বুঝি কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত। কেমন যেন ঢ্যাঙ্গা-ঢ্যাঙ্গা মনে হচ্ছে ইস্পাতদেহী বীরেন ঘোষকে। কণ্ঠ যেন দীর্ঘ হয়ে গেছে। কিন্তু কণ্ঠস্বরে এখনো অনুরণিত সেই ঢাকা জেলের বীরেন ঘোষের অটল শপথ। ঘুষি দিয়ে নয়, এবার মনোবল নিয়ে একবার দেখে নেবে সে। পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কাকে বলে বীরেন তা জানে না।

সংগ্রাম পরিষদের সদস্যগণ এবং সাধারণভাবে সকল বন্দীই অনশনব্রতীদের খোঁজ-খবর নিতেন সারাদিন। সংগ্রামে যে আমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত, এই সুসংবাদ পরিবেশন করে উৎসাহিত করে তুলতেন তাঁদের। শুধু তাই নয়, এই পনেরো দিনের মধ্যে সারা শিবির দু'দিন খাদ্য প্রত্যাখ্যান করে নিরম্বু উপবাস করেছে সহবন্দীদের প্রতি সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ।

তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম দিন যে তালিকা প্রকাশিত হলো তাতে আমারও নাম রয়েছে। সুতরাং সকালবেলাই ভারী মাত্রায় ক্যাষ্টর অয়েলের জোলাপ নিলাম ও চাদরে দেহ আবৃত করে সটান বিছানায় শুয়ে থাকলাম। এবার অনশনব্রতীর সংখ্যা দাঁড়ালো আশী জন।

কোথা দিয়ে প্রথম দিন কেটে গেল, সকালের মিঠে রোদ পড়ন্ত বেলার বিষণ্ণ আলোয় নিষ্প্রভ হয়ে এল, কখন ধীরে ধীরে নেমে এল সন্ধ্যার আর্ত অন্ধকার, টেরই পেলাম না তা। ভাবাবেগের গতিবেগে প্রথম দিনটা যেন একেবারে ছুটে পালিয়ে গেল তাড়া-খাওয়া হরিণশিশুর মতো।

দ্বিতীয় দিনের সকালে ঘুম ভাঙতেই অকস্মাৎ মনে হলো গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। জল খেলাম পুরো দু'গ্লাস লেবুর রস দিয়ে। প্রথমে মনে হলো গলা পর্য্যন্ত ভরে গেছে, কিন্তু তারপরই পাকস্থলীর কোন্ কোণে ওটুকু জল যে তলিয়ে গেল, হদিস পেলাম না তার। ভেজা গলা শুকিয়ে গেল। মনে পড়লো, কাল খাইনি। কিন্তু দিনে ও রাতে কি খেতে পারতাম, মনে পড়লো তা। কিচেন সরকারী তত্ত্বাবধানে যাবার পর খাদ্যের অবনতি যে হয়েছে শোচনীয়ভাবে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু ওরাই যা দেয়, একেবারে অখাদ্য নয় তা। সকালে খানকয়েক লুচি আর আলুর তরকারি, দুপুরে ডাল, তরকারি, মাছ, দৈ আর রাত্রে মুড়িঘন্ট, ছোলার ডাল আর আলু-পটলের ডালনা। এই মেনু চলেছে সেই যেদিন আমরা চৌকার তত্ত্বাবধান ছেড়ে দিয়েছি সেদিন থেকে। কাল কিন্তু এগুলো খাইনি।

অনশন যাঁরা এখনো করেননি, তাঁরা গিয়ে খেয়ে আসেন, আর যাঁরা অনশনব্রতী, সরকারী তত্ত্বাবধানে তাঁদের পুরো খাদ্যও পরিপাটি করে সাজিয়ে এনে তাঁদের টেবিলে রেখে দেয়া হয়। না খেলে সকালের জলখাবার দুপুরে, দুপুরের খাবার বিকেলে আর রাত্রের খাবার পরদিন ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদের মনোবলের ওপর এটা একটা প্রচণ্ড আঘাত বৈ আর কিছু নয়। টেবিলে সাজানো থরে থরে সুস্বাদু আহার্য্য, অথচ স্পর্শও করবো না তা! প্রলোভন জয় করতে হবে।

দ্বিতীয় দিনের সকালে মনে হলো এমনি অটুট মনোবল কাল দেখিয়েছি আমি। দিনের বেলায় কী খাবার এনে রেখে গিয়েছিল, ভ্রূক্ষেপও করিনি তার প্রতি, কিন্তু রাত্রে খাবারগুলো চোখে পড়েছিল। মুড়িঘন্ট থেকে কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ নাকে আসতেই ফিরে একবারটি দেখেছিলাম। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম, কর্ম্মচারীরা পুকুর-চুরি চালাচ্ছে। পাশ করিয়ে নিচ্ছে হয়তো ঘি, গরম মসলা, কাটারিভোগের চিঁড়ে আর রুইয়ের মাথার বিলটি, আর দিচ্ছে গোটাকতক কাতলা বা মৃগেল মাছের মাথা আলু-পেঁয়াজ দিয়ে আচ্ছা করে ঘুঁটে,

কড়া ঝাল দিয়ে আর হাঁটুপ্রমাণ ঝোল রেখে। ঘি যাচ্ছে বোধহয় গিরিজা বা পবিত্রের বাড়ীতে। আর শুধু কি ঘি? তেলের টিনও নিশ্চয়ই জমাদারদের ও বাবুদের বাড়ীতে যায়। তাই ঐ কাতলা ও মৃগেলের মাথাগুলোই সাঁতলে নেয়নি ভালো করে। তাই তো এমনি বোটকা গন্ধ।

আর, আমরা কিচেন ছেড়ে দেবার পর আমাদের চাকরবাকর, বাবুর্চিরাও বেশ ফাঁকি দিচ্ছে। তাই তো দেখলাম আলু-পটলের ডালনাতে সব আস্ত আস্ত মসলার গুঁড়ো লেগে রয়েছে। আর কী রং ডালনার ঝোলের। ফ্যাকাশে!

রং সম্বন্ধে বাড়াতে সবার চাইতে বেশী খিটিমিটি করেন আমার মা। ফরিদপুর জেলার খালিয়া গ্রামের ধনী জমিদার কুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আদুরে কন্যা গিরিবালা। সেকালের জমিদার। নায়েব-গোমস্তা, পাইক-পেয়াদা, চাকর-বাকর ভর্তি খালিয়া গ্রামের বিখ্যাত "বড়বাড়ী"। জমিদারকন্যা যেমন পারতেন ঢেঁকিতে ধান ভানতে, বালি দিয়ে মুড়ি আর খৈ ভাজতে, তেমনি আহার্য্য সম্বন্ধেও ছিল তাঁর শ্যেন দৃষ্টি! হলুদ ও লঙ্কায় টকটকে রং না হলে মা তা ছুঁতেনই না। আর শুধু কি রং? বাজার থেকে যদি রুই মাছের পেটি এল, তাহলে সবার জন্য দু' ছটাক ওজনের এক-একটি পিস্-এর ঝোল হলেও মার জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা। সেই পিস্‌গুলো কড়া করে ভাজতে হবে, ভাজতে ভাজতে কড়ার মধ্যেই ভেঙ্গে থেঁতলে দিতে হবে, তারপর পেঁয়াজ, রসুন ও বেশ খানিকটে শুকনো লঙ্কা বাটা দিয়ে রান্না হবে। ঝোল নয়, ঝাল নয়, ঝাল চচ্চড়ির মতো। শুধু ভাতই লাল হয়ে যায় না, হাতেও রং লেগে থাকে। মায়ের খানিকটে রুচিপছন্দ ছেলেতেও যে সংক্রামিত হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সরকারী লোকগুলো জানেই তো যে, আমরা এই খাবার স্পর্শও করবো না, তাই বোধহয় নিজেরাও হেলায়ফেলায় যা খুশী তাই যেমন-তেমন করে নেড়ে-চেড়ে দিয়ে যায় যেমন থালা সাজিয়ে, তেমন ফিরিয়েও নিয়ে যায় থালা ভরে।

দ্বিতীয় দিনের রাত্রির কথা মনে পড়ে। অনেকক্ষণ ঘুম এলো না। বিকেলে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় বেশ ঠাণ্ডা। দিনের বেলায় বিছানা-বালিশ রোদে দিয়েছিল হরিমোহন। তাই বালিশে কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ আর ঝিমিয়ে-আসা উত্তাপটা কেমন আপন আপন মনে হয়। তবু ঘুম আসছে না কেন?······

সাধারণ অনশনের সপ্তদশ দিবসে আমার অনশনেব তৃতীয় দিন। আশ্চর্য্য, কর্তৃপক্ষের টনক আজো নড়েনি। টবিন একেবারে পুরো দস্তুর মিলিটারী দেখা যাচ্ছে।

সকালবেলা আমার ঘরে এলেন ভোলাবাবু, সংবাদ দিলেন, টবিন আজ প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

অকস্মাৎ অন্ধকারে যেন একটা লাইট হাউস দেখতে পেলাম। প্রতিনিধিদেব যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, নিশ্চয়ই টবিন তখন আপসের কথাই পাড়বেন। কিংবা ও ব্যাটা হয়তো গররাজীই ছিল, কিন্তু কলকাতা থেকে এসেছে সরকারী হুকুম। এবার চাঁদ যাবেন কোথায়?

ভোলাবাবু বললেন: অনুশীলনেব ননী সেনের দারুণ বমির ভাব দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। বমির ভাব এলেই ননী সেন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তাছাড়া ওঁদের আরো দু'জনের দারুণ জ্বর দেখা দিয়েছে। ডাঃ সরকার বলে গেছেন নিউমোনিয়া হতে পারে।

জিজ্ঞেস করলাম: তাহলে?

তাহলে আর কি! জলের মত বললেন ভোলাবাবু: আজ যদি মীমাংসা না হয়ে যায়, তাহলে অনশন চালানো মুশকিল হবে। গোপাল গুপ্ত তো স্পষ্টই বলেছেন, এই cause-এর জন্য তো ছেলেদের মরতে দিতে পারি না!

আবারও প্রশ্ন করলাম: তাহলে?

তাহলে করতে হবে honourable retreat, নইলে আরও দেরী করলে আমাদের মধ্যেই হয়তো মতভেদ দেখা দেবে আর কর্তৃপক্ষ তার সুযোগ নিয়ে divide and rule নীতি প্রয়োগ করবে। আরও, দিবাকরবাবুর বিছানার নীচে নাকি পেন্সিলে-লেখা কয়েক টুকরো কাগজ পাওয়া গেছে। তাতে নাকি পবিত্রকে সম্বোধন করে আমাদের মতভেদের কথা ও অনশন-সংগ্রাম আর বেশী দিন চালাতে না পারার কথা লেখা আছে।

দিবাকরের কী দশা হলো?

ভোলাবাবু জবাব দিলেন: আপাততঃ কিছু না। তবে বীরেনবাবু বলছেন, ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। আজকের আলোচনার ওপর সব নির্ভর করছে। আমি দেখিনি সে চিঠি। যতীশদা'র কাছে আছে।

ভোলাবাবুর কাছে আরও সংবাদ পেলাম আমাদের সর্ব্বদলীয় ঐক্যে ফাটল

দেখা দেবার উপক্রম হয়েছে। নানারূপ গুজব রটানো হচ্ছে। যে-কেউ অফিসে গেলেই তাকে চর বা সুবিধাপ্রত্যাশী বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। অনশন-ব্রতীদের মধ্যেও কেউ কেউ নাকি scientific hungerstrike চালাবার কথাও বলেছেন। বৈজ্ঞানিক অনশন, মানে খেয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে না-খাবার ভান করা। কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ দেবার জন্য প্রকাশ্যে অনশনব্রতীর মতো নিষ্ঠা দেখিয়ে গোপনে সামান্য কিছু করে আহার করে গেলে অনশনও চালানো যায় আরও দীর্ঘকাল।

ভোলাবাবু চলে যাবার পর আশা ও আশঙ্কায় মন আমার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। পরাজয় বরণ করে নিতে হবে? কি হয় দু'চার জন প্রাণত্যাগ করলে? কিন্তু গোপাল গুপ্ত যা বলেছেন, তাও তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—শয়তান গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদসাধনের জন্য যারা নিজেদের দিয়েছে বিলিয়ে, তারা কিনা অবশেষে কতকগুলি বাস্তব অসুবিধে ও খানিকটে অবমাননাকর আচরণের প্রতিবাদে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করে নেবে নিঃসহায়ের মতো? এমনি নীরব সত্যাগ্রহীর মৃত্যুই কি বিপ্লবীর কাম্য?

বেলা বারোটা না-বাজতেই দেখলাম, চাকর হরিমোহন এসে আমার খাবার টেবিলে রেখে গেল। সঙ্গে যে সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি আবার এক গ্লাস জল ভরে রাখবার হুকুমও জানিয়ে গেলেন। হরিমোহনও হাসি চেপে এক গ্লাস জল টেবিলের ওপর রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আজকে দেখছি আবার রান্না হয়েছে মুর্গীর মাংস। অর্থাৎ অন্ততঃপক্ষে আশী জনের বরাদ্দ মাংসটুকু বিকেলে হুল্লোড় করে অফিসে বসে যেমন সবাই খাবে, তেমনি ছাঁদা বেঁধে নিয়েও যাবে গিন্নী ও আণ্ডাবাচ্চাদের জন্য। খাবার লোক নেই, তার আবার মাংস। কিন্তু অকস্মাৎ এই মেনু পরিবর্ত্তন কেন? লোভ দেখানো আর ক্রমেই তা তীব্রতর করে দেখানো?

মনে পড়ে গেল, এই অনশন-সংগ্রাম সুরু হবার পূর্ব্বে যেদিনই সত্যবাবু মুর্গীর মাংসের ব্যবস্থা করতেন, সেদিন শুধু আমি নয়, ডবলিউ বি চোদ্দ নম্বরের সবাই যথারীতি সবার শেষে খেতে গিয়ে আর ভাত বা অন্য কিছু খেতাম না, খেতাম শুধু মাংস। বিলম্বে যাবার জন্য পাছে আমাদের ভাগ্যে অবশিষ্ট আলুর জুস্ ও গোটাকতক মাংসহীন ঠ্যাং মাত্র জোটে, তাই সত্যবাবু রান্না হওয়া মাত্রই বড় এক ডেকচি মাংস পৃথক্ করে রাখতেন আমাদের জন্য। সদাশয়

সত্যবাবু! খাইয়ে খুশী হতে যেমন ঢাকা জেলে দেখেছিলাম নীরেনবাবুকে, তেমনি এখানে দেখছি সত্যবাবুকে। মহানুভব ব্যক্তি!

আর আমরা এক-এক জন প্লেটের পর প্লেট সাবাড় করে চলেছি নিবিষ্ট মনে সাধনা করবার পোজ নিয়ে। অপরের প্লেটে মাংসের পাহাড় ধূলিসাৎ হলো কিনা, ভ্রূক্ষেপও নেই সেদিকে। সে-কাজ সত্যবাবুর, আমাদের হোষ্টের। প্লেটের পাশে জমছে শুধু চূর্ণীকৃত অস্থি। স্তূপ হয়ে উঠছে।

খাঁটি গাওয়া ঘি, পেয়াজ, রসুন ও ঝাল দিয়ে সত্যবাবু রান্নার যা ব্যবস্থা করতেন, মুর্শিদাবাদের নবাববাড়ীর বাবুর্চিও তার কাছে হার মেনে যায়। আহারের বিবরণ শুনে শুনে আমাদের কম্পাউণ্ডার বঙ্কিমবাবুর ভারী লোভ হলো একদিন স্বাদ গ্রহণের। রাত্রে চুরি করে এসে খেয়ে গেলেন মাংস আর পোলাউ। তারপর তাঁকে নাকি পেটের অসুখে ভুগতে হয়েছিল প্রায় দিন পনেরো। বললেন তিনি: ও কি মশাই ঝোল? শুধু ঘি আর তেল। পুরো একখানা লাক্স্ গেছে হাতের ঘি ছাড়াতে! পেটের আর দোষ কি বলুন!

ঘড়ি দেখলাম, প্রায় বারোটা বাজে। আর ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে নিশ্চয়ই টবিনের অর্ডারলি আসবে আমাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে যাবার জন্য। এই সতেরো দিনের অনশনে সমগ্র শিবিরে কেমন একটা বিপর্যয় অবস্থা দেখা দিয়েছে। নিয়মনিষ্ঠা একেবারে ভেঙে পড়েছে। শৃঙ্খলার লেশমাত্রও অবশিষ্ট নেই কোথাও। সর্ব্বোপরি, গোপাল গুপ্তের কথা ফেলে দেয়া যায় না। আমাদের দাবীগুলোর জন্য সংগ্রাম চালাতে প্রস্তুত আমরা, কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নেয়া যায় না। উচিতও নয়। বাইরে গিয়ে বিপ্লবীর অসংখ্য কাজ আছে। জেলের মধ্যে সারাজীবন কাটিয়ে দিলে সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে নাম ছাপতে পারে, সভা করে গলায় ফুলের মালা পড়তে পারে, অভিনন্দনপত্রও পাওয়া যেতে পারে সুদৃশ্য রূপোর কাসকেটে, কিন্তু দেশের কাজ তাতে কতখানি হবে, বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে সর্ব্বহারাদের কতটুকু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে, এ-প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। কঠিনতম যে দায়িত্ব কিশোর বয়সেই স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়ে যাত্রা সুরু করেছি, সে দায়িত্ব পালনে অণুমাত্রও শিথিলতা দেখালে দেশবাসীর কাছে তার কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য আমরা! জেলীয় জীবনের বিশ্রী অসুবিধাগুলির জন্য আমরা জানাতে পারি তীব্র প্রতিবাদ, দেখাতে পারি ক্রুদ্ধ বিক্ষোভ এবং এতেও যদি সুফল কিছু না হয়, তাহলে—আমার মনে হয়, একদিন সদলবলে

বিদ্রোহ করে জেল ভেঙে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে সশস্ত্র সিপাইয়ের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইতে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি। কিন্তু, নিরুপায়ের মতো শিবিরের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিনা প্রতিবাদে নেহাৎ গোবেচারা ভদ্রব্যক্তির মতো বর্ণহীন মৃত্যু আমাদের জন্য নয়! · ·

তবে আপস আজ হয়ে যাবেই। যদি হয়, তাহলে দু' একদিনের মধ্যেই আবার চৌকা আসবে আমাদের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে। আবার সত্যবাবুর হোটেল দ্য প্যারী! কিন্তু আর মাংস ভালো লাগে না। এবার বলবো শাকসব্জী ও তরকারি চালাতে। সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে পাতলা করে মুসুর ডাল। মাছ চলতে পারে। তবে আর রুই-কাতলা নয়, এবার ছোট মাছের ঝোল গোলমরিচ আর আদা দিয়ে আর কালজিড়ে ফোঁড়ন। পাতিলেবু তো থাকবেই।

গরম পড়েছে অসহ্য। ঘরের অন্যান্য অধিবাসীরা কে কোথায় পালিয়েছে একটুখানি ঠাণ্ডার প্রত্যাশায়। একা আমি। সময়ও যেন আর কাটতে চায় না। সেই কখন বিকেল হবে, আমাদের প্রতিনিধিরা যাবেন অফিসে। মিটমাটের সংবাদ হলেই হয়তো আজ রাত্রে পাওয়া যাবে ঘোলের সরবৎ, কমলালেবুর রস। কিন্তু সতেরো দিন যাঁরা অনশনে আছেন, তাঁদের কথা পৃথক। আমার তো সবে আজ তৃতীয় দিবস। ঘোলের সঙ্গে সরু চালের একমুঠো ভাতও আমার পক্ষে অন্যায় কিছু হবে না। এমন কি, ঐ যে মুর্গীর মাংস রেখে গেছে, ওথেকে দু'খানা আলু তুলে খেলেই কি অমনি আমাশা ধরে যাবে? মাত্র তিন দিনে শরীরের যন্ত্রগুলো এমন কিছু বেতো হয়ে যায়নি যে, দু'খানা আলুর টুকরোও হজম হবে না।

মাংসের বাটিটা হাতে তুলে নিলাম। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলাম, সত্যিই রান্না বিশ্রী, মাছের ঝোলের মত। বেশী সেদ্ধ করে ফেলেছে, হাড়-মাস আলাদা হয়ে গেছে। তবুও মুর্গীর মাংস, সেরা মাংস। আপস তো হয়ে যাবেই আজ, মাত্র দু'তিন ঘণ্টা বাকি। কী আর এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে যদি দু'খানা আলু তুলে মুখে দিই—

এমন সময় ঝড়ের বেগে এসে ঢুকলেন ভোলাবাবু।

দ্বিজেনবাবু, আপস হয়ে গেছে। টবিন নিজেই নোটিশ দিয়ে অনেক-গুলো দাবী মেনে নিয়েছে। বাকিগুলোর জন্য আমাদেরও বর্তমানে আর

তাগাদা নেই।—পরে হবে, এই স্থির হলো সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে এই মাত্র।—আমি আসছি আপনার সরবৎ আর লেবুর রস নিয়ে।

ভোলাবাবু বেরিয়ে যেতেই মনে হলো জীবনে এতবড় সুখকর সংবাদ কখনও পাইনি, আর বোধহয় পাবোও না। এবার আর চুরি করে দু'টো আলু কেন, সবগুলো আলুই খেতে পারি। আর পুরো বাটিটাই সাবাড় করে দিলে কার কি বলবার আছে? কারণ—The hungerstrike is over—ভাইসাই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে।

তেইশ

কিন্তু মহামান্য বৃটিশরাজের কাছ থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করেছি আমরা যে, সন্ধিপত্র is nothing more than a scrap of paper অর্থাৎ তুচ্ছ এক টুকরো কাগজমাত্র। সংগ্রাম যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন দিনকতক আলাপ-আলোচনার পর বিজেতা দলের ডিক্টেশন ও বিজিত দলের সাময়িক ভাবে নিরুপায় নতি-স্বীকারের ফলে কিছু কাল ও কিছু সময় অপব্যয় করে যে আপসনামা প্রণীত হয়, গাল-ভরা ভাষায় তাকেই তখন বলা হয় সন্ধিপত্র। এই সন্ধিপত্রের মর্য্যাদা আজ অবধি দুনিয়ায় কেউ মেনে নেয়নি, মেনে চলেনি; তাই তো দুনিয়ায় আজো হানাহানির নেই এতটুকু কমতি।

অবশ্য, ছাই চাপা দিয়ে আগুন ঢাকবার চেষ্টা হয়েছে বহুবার। যুক্তির শাণিত খড়্গে জমাট ভাবাবেগকে খান্ খান্ করে কেটে ফেলে দিয়ে অথবা তোষামোদ করে, হাতেপায়ে ধরে, বিনতি-মিনতির মরাকান্না কেঁদে অসংখ্য বার চেষ্টা করা হয়েছে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার। কিন্তু হায়, ছিপি-খুলে-রাখা শিশির মধ্যে থেকে কর্পূর উড়ে যাওয়ার মতো সদিচ্ছা ও সহনশীলতা, আপস-রফা ও সন্ধির সাধুতা কখন্ একসময় যে ছেড়ে চলে যায়, টের পাওয়া যায় তখন, যখন একেবারে শোনা যায় তূর্য্যধ্বনি, শুনতে পাওয়া যায় খাপখোলা তলোয়ারের ঝনৎকার, দিগ্‌দিগন্ত যখন প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে যুধ্যমান সেনাদলের বিজয়-গর্জ্জনে। কাগজের টুকরোখানা তখন সমাধিলাভ করে ওয়েষ্ট পেপারের ঝুড়িতে!

অনশন সংগ্রামে জয়লাভ করেছি আমরা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে।

একে কোনোক্রমেই জয় বলা যায় না। যে দাবীর তালিকা পেশ করতে গিয়ে একদিন উদাত্ত হয়ে উঠেছিল আমাদের কণ্ঠ মেঘ-গর্জ্জনের মতো, বিপর্য্যয় আসন্ন দেখে আর একদিন সেই কণ্ঠেরই স্বরগ্রাম আনলাম আমরা নামিয়ে, কমিয়ে আনলাম দাবীর সংখ্যা। তারপর একদিন নিজেরাই গরজ করে, আগ্রহ দেখিয়ে উদ্ধত টবিনের আপসের সর্ত্তগুলি এক-এক করে গলাধঃকরণ করতে হলো তিক্ত বটিকার মতো। মনে মনে অবশ্য খুশী হলো না একজনও। ফলে, এর পর থেকেই কর্ত্তৃপক্ষের সাথে কারণে-অকারণে হামেশাই আমাদের খিটিমিটি চলতে লাগলো।

রাত্রে ঘব বন্ধ করবার পূর্ব্বে ওরা যখন গুনতি করতে আসতো, প্রায়ই ভুল হতো ওদের। কারণ গুটানো বিছানাব মধ্যে একটি লোক কি ভাবে ঘণ্টাখানেক লুকিয়ে থাকতে পাবে, তা বোঝবার মতো বুদ্ধি গাড়োয়ালী মগজে ছিল না। তাই দরজায় তালা এঁটে ওরা সাবা শিবির তন্ন তন্ন করে তল্লাশী করে মরতো নিরুদ্দিষ্টের জন্যে। তারপর ব্যর্থমনোরথ হয়ে গলদ্ঘর্ম্ম শরীরে যখন আবার গুনতি করতো, সবিস্ময়ে এবার খাতা খুলে দেখতো যে গুনতি মিলে গেছে!

কিন্তু বেশী দিন চললো না এই খেলা। দিবাকর নিজেই বা তার কোনো উৎসাহী শাগরেদ কোনো ছুতো করে অফিসে গিয়ে হয়তো শ্রীমান্ পবিত্রের কর্ণকুহরে ঢেলে দিয়ে এসেছে এই গুপ্ত ক্রীড়ার রহস্য। তাই দেখা গেল, এবার ওবা বাইরের মাঠ তল্লাশী করবার পূর্ব্বে ঘরের বিছানা উল্টে দেখে, খাটের নীচে ও পায়খানাতেও উঁকি মারে।

গাড়োয়ালী সিপাইদের সঙ্গে আমাদের পুরাতন দোস্তালীর কথাও বোধহয় কি ভাবে টেব পেয়ে গেছেন পবিত্র সরকার। তাই, অকস্মাৎ একদিন দেখা গেল, গাড়োয়ালী সেনাদল বদলি হয়ে গেছে, আর তাদের স্থানে এসেছে আনকোরা পাঠান সিপাই। এদেব প্রত্যেকেই অন্ততঃ ছ'ফুট লম্বা, শরীরে মাংস ও মেদের চাইতে মোটা হাড়, খুব ষ্টাইল করে কামানো গোঁফ আর বব্ ছাঁটা চুলে ঘাড়-কামানো। সারা মুখমণ্ডলে কেমন যেন একটা রুক্ষতার ছাপ, দু'পাঁচ মিনিট কথা কইলেই তা আরও স্পষ্ট প্রকট হয়ে উঠতো। শিবিরে প্রবেশ করবার পূর্ব্বেই বোধহয় এদের ফল্ ইন্ করিয়ে কামাণ্ডান্ট টবিন শিবিরে যেসব সরকার-বিরোধী ডাকাত ও নরঘাতকদের আটকে রাখা

হয়েছে, প্রাঞ্জল ভাষায় তাদের কুকীর্ত্তিগুলো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং বিনা পরিশ্রমে আমাদের মাসিক খাদ্য ও অন্যান্য বায়বাবদ মোটা টাকা বেরিয়ে যায় বলেই যে সিপাইদের তলব বৃদ্ধির সদিচ্ছা সদাশয় সরকারের মনে সর্ব্বক্ষণ কাঁটার মতো বিঁধলেও তাঁরা কার্য্যে তা পরিণত করতে পারছেন না—গবুচন্দ্র গিরিজাও নিশ্চয়ই ঝোপ বুঝে এই কোপটি মেরে দিয়েছেন।

গেটের বাইরে এদের রুক্ষ মেজাজে যে মনোবৃত্তি ইনজেক্ট করে দেয়া হয়েছে, শিবিরের অভ্যন্তরে ডিউটিতে এসে তারই তিক্ত অভিব্যক্তি পাওয়া যেতে লাগলো প্রতি পদে।

আমাদের চাকর-বাকর রাঁধুনীদের গুনতি হতো দিনের মধ্যে দু'বার। গাড়োয়ালা সিপাইরা বস্তুই ঘরে ঢুকে সর্দ্দার কয়েদীর কাছ থেকেই সব তথ্য নিয়ে চলে যেতো, আমাদের দৈনন্দিন কাজে অনর্থক বাধা সৃষ্টি করতে চাইতো না। আর পাঠানরা এসেই সর্ব্বপ্রথম আইন প্রয়োগ করলো এদেরই বেলায়। হুকুম হলো, বারোটা বাজলেই হাতের সহস্র কাজ ফেলে রেখে জেলের নিয়মের মতো এই সব সাধারণ কয়েদীকে ফাইল করে বসতে হবে ব্যারাকের বারান্দায়-বারান্দায়। এই কয়েদীর সংখ্যা প্রায় দু'শো। সিপাইরা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এক এক করে এদের গুনতো—একবার নয়, একাধিক বার।

অর্থাৎ প্রায় একটি ঘণ্টা সময় নষ্ট হতো আমাদের। নয়া কিচেন ম্যানেজার দিলীপবাবুর সঙ্গে এই দুর্ব্যবস্থা নিয়েই প্রথম ওদের সেকশন কমাণ্ডারের সঙ্গে বেশ বিতর্ক হয়। কমাণ্ডার নিয়মের বাঁধন এতটুকু শিথিল করতে রাজী নয়; ফলে, অসুবিধে হতো সীমাহীন। অতগুলো লোকের কিচেনে রাবণের চুল্লীর ওপর সারি সারি বিরাটকায় ডেকচি ও কড়াইতে রান্না চলেছে, এমন সময় ঘণ্টা বেজে উঠলো—ব্যস, সবাই চলে গেল কিচেন ছেড়ে। ম্যানেজার দিলীপবাবুর তখন সঙ্গীন অবস্থা! কোন্‌টা সামলাবেন তিনি—কোন্ ডেকচিটা বা কোন্ কড়াইটা?

এ নিয়ে অফিসে রিপোর্ট করেও কোনো সুফল হয়নি। ওঁরা বলেন, নিয়মের ব্যতিক্রম তো ওরা কিছু করে না, শুধু একটু বেশী মেনে চলে। তা নিয়মভঙ্গের কথা আমরা উচ্চারণ করি কি ভাবে? ওদেরই একটু বলে-কয়ে দেখেন, আমরা বাধা দোব না।

কিন্তু বলা-কওয়া চলে তাদেরই সঙ্গে, যারা যুক্তি বোঝে ও মানে। এদের

কাছে সে আশা বৃথা। মেসিনের মতো এরা সর্ব্বঅবস্থায় ওপরওয়ালার হুকুম তামিল করে চলে অক্ষরে অক্ষরে। নিজের কিছু বুদ্ধি থাকলেও তা খাটাবার মতো মনোবৃত্তি বা সৎসাহস এদের নেই। তাই আমাদের সঙ্গে এদের ঠোকাঠুকি ক্রমে বেড়েই চললো।

একদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একটু ঘুমের আয়োজন করছি, এমন সময় অকস্মাৎ বাইরে গোলমাল শোনা গেল। দ্রুতপদে কমেট এসে বললো: শিগ্‌গির চলুন দ্বিজেনবাবু, ওদিকে সাংঘাতিক ব্যাপার লেগে গেছে।

ছুটে বাইরে এলাম। কিচেনের কাছে গিয়ে দেখি একটি ছোটখাটো জনসমাবেশ। জনকয়েক সিপাইকে ঘিরে একদল রাজবন্দী চীৎকার করে বচসা সুরু করে দিয়েছেন এবং সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম, সেই দলের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের ঘরের মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। তার হাতে একখানা স্যাণ্ডেল। ছয়ফুট দীর্ঘ সিপাইদের মুখের কাছে স্যাণ্ডেল তুলে বলছে সাড়ে চার ফুট দীর্ঘ মনোরঞ্জন: চাপ্‌ রও উল্লুক, বেশী বাত বোলেগা তো এক জুতিসে দাঁত তোড় দেগা।

আমরা দু'জন গিয়ে পড়তেই ঝগড়াটা শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্থানী বচসাতেই শেষ হয়ে গেল বটে কিন্তু বেশ অনুমান করলাম, কোনোদিন কোনোরকম সুযোগ পেলেই এই কাণ্ডজ্ঞানহীন হিংস্র সিপাইগুলো প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করবে না। আমাদের মধ্যেও সবাই এমন ধীর, স্থির ও যুক্তিবাদী ছিলেন না বা নিয়মানুগ ছিলেন না যে, সংঘর্ষ সর্ব্বদাই চলবেন এড়িয়ে আর যদিই বা অপ্রত্যাশিতভাবে তা এসে পড়ে, তা হলে ন্যূনতম বিতর্কের মধ্যেই তা সমাধিস্থ করবার চেষ্টা করবেন অথবা দরখাস্ত ও প্রতিনিধিত্ব দ্বারা বিভাগীয় শাস্তির দাবী জানাবেন।

ক্রমে ক্রমে এমনি দাঁড়ালো যে, যে কোনো অসতর্ক মুহূর্ত্তে সামান্য একটি দেশলাইয়ের কাঠি এসে পড়লেই এই বারুদখানা প্রচণ্ড নির্ঘোষে বিস্ফোরিত হবে। সুতরাং আমরা সেই কিয়ামৎ রাত্রির অপেক্ষা করতে লাগলাম রুদ্ধশ্বাসে। পুঞ্জীভূত মেঘের ভীম হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে, সর্পিল বিদ্যুতের আগ্নেয় ভ্রূকুটি তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে আকাশ চিরে চিরে ফেলছে, পাগলা হাওয়ার মাতাল গতিবেগ আসন্ন ঝটিকার আগমনী গাইছে······আর দেরী নেই। এখানেও হয়তো ঘটবে হিজলীর পুনরাবৃত্তি।····

একদিন বিকেলে আমি আর খেলার মাঠে যাইনি, ইজিচেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে পড়ছিলাম হিটলারের আত্মজীবনী। ঘরে আর কেউ ছিল না, হরিমোহন আবার ঝাঁট দিচ্ছিলো ঘরখানা।

এমন সময় অকস্মাৎ মতি সিংহ ছুটতে ছুটতে এসে বললেন : শীগগির যান দ্বিজেনবাবু, ওদিকে কমেটবাবুরা খেলার মাঠে একদল সিপাইকে ঠেঙিয়ে দিয়েছেন হকি ষ্টীক দিয়ে।

ছুটে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে এসেই দেখলাম রীতিমতো ছুটোছুটি পড়ে গেছে। দেখলাম, বীরেন ঘোষ মশারির টাঙ্গাবার লোহার সরু দু'খানা রড্ নিয়ে ছুটে চলেছে। ডাকতেই থামলো।

কী ব্যাপার? কোথায়?

এক নিশ্বাসে বলে গেল বীরেন ঘোষ : যাচ্ছি খেলার মাঠে। বিমলবাবু আর কমেট হকি ষ্টীক দিয়ে দুটো সিপাইয়ের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এতক্ষণে ওরা বোধহয় এসে গেছে দল বেঁধে লাঠি নিয়ে, আমরা গ্রহণ করেছি ওদের চ্যালেঞ্জ। খুনোখুনি একটা হবেই।—বলেই সে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলে গেল।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। এড়ানোর কথা এখন আর চিন্তা করা যায় না, ফলাফলের রক্তাক্ত অনিশ্চয়তা স্বীকার করেই এগিয়ে যেতে হবে। সূচনা করেছে কমেট অর্থাৎ বন্দীশিবির সেনাবাহিনীর অন্যতম সেক্‌শন কমাণ্ডার অর্থাৎ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের ভ্যানগার্ডের একজন সৈনিক! অতএব জি-ও-সির আর মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করবার কিছু নেই।

মাঠের প্রান্তে এসে দেখলাম, মাঠে লোকে লোকারণ্য। সবার হাতেই কোনো না কোনো হাতিয়ার। দুটো আহতকে কাঁধে করে নিয়ে যাবার সময় শাসিয়ে গেছে পাঠান সিপাই, আবার আসছে তারা তৈরী হয়ে। ডাকাতদের একবার দেখে নেবে! সেই দেখা দেবার সুযোগ দানের জন্যই প্রতীক্ষমাণ বন্দী-জনতা। চোখের কোণে কোণে দেখলাম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আবেগে ও উত্তেজনায় সবারই কণ্ঠ রুদ্ধ, আসন্ন সংঘর্ষের প্রতীক্ষায় সামান্যতম চাঞ্চল্যও কোথাও নেই!

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলাম সম্মুখে। কারুকে কিছু প্রশ্ন করবার সময় ছিল না। ভোলাবাবু নিঃশব্দে এসে আমার হাতে একখানা হকি ষ্টীক গুঁজে দিয়ে গেলেন।

কিন্তু, এমনি সময় অকস্মাৎ শিবির প্রকম্পিত করে পাগলা ঘন্টি বেজে উঠলো। চতুর্দ্দিকে বিপদ-সঙ্কেতসূচক বাঁশী শোনা যেতে লাগলো। বোঝা গেল, সম্মুখ সংগ্রামে এগিয়ে না এসে পাঠান সিপাই বেছে নিয়েছে আইনানুগ পথ। ঘন্টি শুনে তৎক্ষণাৎ ঘরে ফিরে আসবার বশ্যতা স্বীকার করবো না আমরা, তা হলেই আমাদের ওপর নির্ব্বিচারে বলপ্রয়োগের নিয়মতান্ত্রিক শক্তি ও সমর্থন ওরা পেয়ে যাবে। কিন্তু ওদের এই ষ্ট্রাটেজি উপলব্ধি করতে আদৌ দেরী হলো না আমাদের। নিমেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো এবং দ্রুতপদে যে যার ঘরে যে শুধু ফিরে এলাম তাই নয়, একেবারে নিরীহ সুবোধ বালকের মতো অন্য হাজারো কাজে ডুবে গেলাম। তাড়াহুড়োতে দশ নম্বরের বিমল চক্রবর্ত্তী আর ডাবলিউ বি চোদ্দ নম্বরের কমেট আর ভোলাবাবু এসে ঢুকে পড়লেন আমাদেরই ঘরে।

খট্ খট্ করে প্রত্যেকটি ঘর তালা বন্ধ হয়ে গেল এবং গট্ গট্ করে ডবল মার্চ্চ করে শিবিরের অভ্যন্তরে এসে প্রবেশ করলো সশস্ত্র পাঠানের বিরাট একটি দল। গুনতি সুরু হয়ে গেল।

সন্ধ্যা তখন সবে উৎরে গেছে। কমেট ও ভোলাবাবু তাঁদের রক্তমাখা জামা ও ধুতি বদলে নিয়ে নিবিষ্ট মনে দাবা খেলতে বসে গেছেন, শুধাংশুবাবু লিখছেন কোন্ জরুরী পত্র, সমরেন্দ্র পাল আর অমর খেলছে ক্যারম আর আমি আমার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আবার তুলে নিয়েছি হিটলারের আত্মজীবনী। বিমল চক্রবর্ত্তীও তাঁর রক্তমাখা ধুতি ছেড়ে ফেলে পরেছেন ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের একটি লুঙ্গি। খুলে বসেছেন একটি ভাঙ্গা হারমোনিয়াম। কেউ শুনুক বা না শুনুক, গান একখানা তিনি গাইবেনই। এখন হারমোনিয়াম তা সইতে পারে ভাল, না-হয় যাক্, ভেঙ্গে যাক্।

অভিনয় করছিলাম সবাই, তাই আমাদের কান ছিল অত্যন্ত সজাগ, মন ছিল অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। বার বারই মনে হচ্ছিলো, এবার তো প্রত্যেক ঘরে আমরা মাত্র চারজন বা ছয়জন। তালা খুলে একটি একটি ঘরে যদি ওরা হানা দেয়, তাহলে? পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো অন্যান্য ঘরের সবাই শুধু গর্জ্জনই করবে নিষ্ফল আক্রোশে, দংষ্ট্রাঘাতের সুবর্ণ সুযোগ আর পাবে না। আশঙ্কা হলো, নিশ্চয়ই ওরা এইবার খুঁজে বার করবে তাদের, এগিয়ে এসে যারা ইঁট চালিয়েছে বেপরোয়াভাবে।

অকস্মাৎ চমক ভাঙলো : হ্যাল্লো জি-ও-সি।

বারোজন পাঠানের একটি দল। এবার আমাদের ঘরে গুনতি হবে। বললাম : ইয়েস ?

আপনাকে না মাঠে দেখলাম হকি খেলতে ? ভারী ফার্স্ট ক্লাস খেলেন তো আপনি !

বুঝলাম, ওরা সনাক্ত করতে পারছে না। বললাম : ঐ একটা খেলাই আমি পারিনে স্নবাদার সাহেব ! আর শরীরটে আজ খারাপ, তাই এই বইখানাই পড়ছি দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর থেকে। A very good book—

যাঁরা আছেন, সবাই কি এই ঘরের ?

সুধাংশুবাবু বললেন : না সুবাদার সাহেব। পাগলা ঘন্টি পড়েছে তো, তাই যে যেখানে পেরেছে, ঢুকে পড়েছে। জনতিনেক বন্দী অন্য ঘরের।

বিমলবাবু এদের প্রতি দৃক্‌পাত না করে প্রাণপণে সুরের সঙ্গে স্বর মেলাবার কসরৎ করছেন। সুবাদারের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হলো।

আচ্ছা, উনি খুব ভাল গাইতে পারেন বুঝি ?

কমেট ফস্ করে হেসে জবাব দিল : ও ইয়েস। ধরা পড়বার আগে নিখিল ভারত মিউজিক কনফারেন্সে উনি বরাবর স্বর্ণপদক পেয়ে আসছিলেন। অনেকদিন চর্চা না থাকাতে গলাটা একটু ধরে গেছে—I mean—

কুটবুদ্ধি নাজির খাঁ এই পরিহাস বেশ বুঝতে পারলো। বলে উঠলো : I see—

তারপর সদলবলে বেরিয়ে গেল ! ভাবলাম, এ যাত্রা ফাঁড়া কাটলো। কিন্তু আধ ঘন্টা কেটে যেতেও দরজা খোলবার গরজ না দেখে আবার আশঙ্কা হতে লাগলো, সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয় এরা। আরও মিনিট পনেরো কেটে যেতেই পাশের কক্ষ থেকে নৃপেন পাল চেঁচিয়ে খাস কুমিল্লার ভাষায় জানিয়ে দিল সুধাংশুবাবুকে যে, এরা যাদের হাতে মার খেয়েছে, তাদের খুঁজছে। কুমিল্লার ভাষায় এ জন্য যে, বাংলা কিছু কিছু সমঝাতে পারলেও বাঙাল ভাষা ওদের কাছে গ্রীক্ !

সংগ্রামের জনতিনেক নায়কই তো আমাদের ঘরে। কৌশলে এঁদের বাঁচিয়ে দিতে হবে। বিমলবাবু অবশ্য এতে সহজে রাজি হলেন না। খাপখোলা ছুরির মতো বিমলবাবু। যেখানেই চলেন, কেটে দিয়ে রক্তস্নান করে যান। Via media বলে কোনো শব্দ তাঁর অভিধানে নেই। যদি

আরও শক্তিশালী ইস্পাতের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়, টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যেতে চান তিনি। কিন্তু পাশ কাটিয়ে যাবেন না কোনোমতেই। কোনো হিসেব, কোনো কৌশল, কোনো স্ট্রাটেজীর বালাই নেই তাঁর, বন্য শূকরের মতো দুর্নিবার তাঁর গতিবেগ! ·····

অনেক কষ্টে বুঝিয়ে শান্ত করা গেল বিমলবাবুকে। তিনি চুপ করে থাকবেন, কথা কইবো আমরা। বিশেষ করে সুধাংশুবাবু।

অনেকক্ষণ পর এবার বোধহয় একেবারে নিশ্চিত হয়ে আবার এসে আমাদের ঘরে প্রবেশ করলো দুর্বৃত্ত নাজির খাঁ আর তার সঙ্গীরা। এসেই আদেশের সুরে অনুরোধ জানালো: বিমলবাবু, চলুন, আপনাকে আপনার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বোঝা গেল কিসের এত গরজ, কেন এতখানি ভদ্রতা! শিবিরের অন্যতম প্রতিনিধি যুক্তিবিশারদ সুধাংশুবাবু এগিয়ে এলেন ধারালো যুক্তি নিয়ে। আমি এলাম নানা হাল্‌কা কথায় ওদের জিঘাংসার উত্তাপ খানিকটে কমিয়ে দিতে, সমরেন্দ্র পাল এলেন সামরিক কুচকাওয়াজের ঔৎসুক্যময় গল্প ফাঁদতে, কিন্তু দেখা গেল এবং দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম যে, ভবি ভোলবার নয়।

অগত্যা কমেট এগিয়ে এসে বললো: চলিয়ে, হাম ভি যায়েগা হামারা ডবলিউ বি চোদ নম্বরমে।

ভোলাবাবুও যেতে চাইলেন, কিন্তু নাজির খাঁ বলছে যে, সবার আগে সে বিমলবাবুকে তাঁর দশ নম্বরে পৌঁছে দেবে, তারপর—

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলাম নিমেষের জন্য। বিমলবাবুর হকি ষ্টীকের আঘাতেই যে একজনের মাথা ফেটে গেছে এবং জখম হয়েছে জনকতক, এতক্ষণে এরা তা বুঝতে পেরেছে এবং সন্দেহাতীতভাবে বুঝতে পেরেছে। ওরা সংখ্যায় দশ বারো জন, এবং ওদের হাতে বিলিতি বেতের মোটা রেগুলেশন ষ্টীক আর আমাদের একেবারে খালি হাত। তথাপি বিমলবাবুর রণহুঙ্কার আর প্রচণ্ডভাবে এলোপাথাড়ি ষ্টীক চালাবার বীভৎস দৃশ্য এখনো ওদের মনে ভাসছে। তাই বুঝি ওঁকে বারান্দায় একক করে নিয়ে······

বিমলবাবু কিন্তু তখনো পরম নিশ্চিন্তে হারমোনিয়ামের সঙ্গে কুস্তি করছেন আর মোটা কাঁচের আড়াল থেকে রহস্যময় চোখে সেদিকে চেয়ে অমনি মৃদু মৃদু হাসছে।

কী যে করবো এই নাছোড়বান্দা দস্যুদের সঙ্গে বুঝতে পারলাম না, এমন সময় বিমলবাবুই নেমে এলেন খাট থেকে: চলিয়ে সুবাদারজী, হামারা ঘরমেই চলিয়ে। বা কি বাত এহি হ্যায়, শুনতি তো মিল্ গিয়া, অভি তো নম্বর খোল দিয়া যায়গা।

কথা কইবার আর অবসর পেলাম না আমরা। বিমলবাবুকে নিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল। আমাদের দরজায় তালা পড়লো।

কিন্তু মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড হবে। তারপরই অকস্মাৎ এমনি একটা তীব্র চীৎকার দেয়ালে দেয়ালে আছাড় খেয়ে উঠলো যে, আমাদের অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলো! সে চীৎকার বর্ণনা করবার ভাষা আজো তৈরী হয়নি। আর্ত্তনাদ তাকে বলতে পারিনে, বলতে পারিনে অসহায় মেষশাবকের করুণ ক্রন্দন। রাইখষ্ট্যাগে প্রবেশের প্রাক্কালে রক্তাক্ত লালফৌজ হের হিটলারের সাক্ষাৎ পাবার অধীর আগ্রহে যে উল্লাসধ্বনি করে উঠেছিল, নরপিশাচ নাজির খাঁ ও তার পাঠান অনুচরদের কণ্ঠে যেন শুনেছিলাম তারই প্রতিধ্বনি! কিন্তু দুর্বৃত্তদের সমবেত বুটের ঠোক্করে, বেণ্টের ঘায়ে ও রেগুলেশন লাঠির নৃশংস আঘাতে নিরস্ত্র, নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় একজন সহ-বন্দীর কণ্ঠ থেকে যে অদ্ভুত একটা শব্দ বার হয়েছিল, তাতে ঠিকরে পড়ছিল তাঁর সর্ব্বঅন্তরের ঘৃণা, ধিক্কার, ক্রোধ ও দুঃখ। খাঁচায় ইঁদুরকে জলে ডুবিয়ে মারবার কাপুরুষতা ঐ সবকারী সেনাদলেরই শোভা পায়। বিমল চক্রবর্ত্তী ছিলেন খাঁটি ইস্পাত, সাময়িকভাবে হলেও দুমড়ে থাকবার রণনীতি তাঁর ধাতে সয় না।

তাই, একেবারে খালি গায়ে, খালি হাতে নেকড়ে বাঘের মতো যুঝেছেন তিনি এই বারোটি ছ'ফুট দীর্ঘ পাঠানের সঙ্গে, তারপর একসময় সংজ্ঞা হারিয়ে রক্তাক্ত কলেবরে লুটিয়ে পড়েছেন ব্যারাকের বারান্দায় উল্কা পতনের মতো, মহীরুহ পতনের মতো!

ইস্পাত ভেঙ্গে গেছে!······

চব্বিশ

সত্যিই, ভেঙ্গে গেছে।

পরদিন ভোরে দরজা খুলে দিতেই ছুটে গেলাম দশ নম্বরে। শুভ্র শয্যায় প্রসারিত বিমল চক্রবর্তীর ইস্পাত দেহ, ব্যাণ্ডেজে একেবারে ঢাকা। মাথার কয়েকটি ক্ষত নাকি প্রায় তিন ইঞ্চি দীর্ঘ আর তেমনি গভীর।

বললাম: না বেরিয়ে এলেই পারতেন। গোলমাল যা কিছু ঘরেই হতো, আমরা যোগ দিতে পারতাম।

ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলেন বিমলবাবু: সেই জন্যেই তো বেরিয়ে এলাম। কমেটবাবুর দিকে বার বার চাইছিলো ওরা, যদি চিনে ফেলে? এতগুলো লোকের হাঙ্গামা বাড়িয়ে লাভ নেই। তবে, এতটা হবে ভাবিনি।

সমস্ত বন্দীর ওপর ওদের যে আক্রোশ, তাই মিটিয়ে নিয়েছ একা আপনার ওপর দিয়ে।—বললো অমর।

হাসতে চেষ্টা করলেন বিমলবাবু: তা হয়তো হবে।

এমনিই এরা। সকলের বিপদ, সকলের ঝুঁকি, সকলের সঙ্কট বুক পেতে নেবার জন্যই যেন এদের জন্ম। ঘাড়ে জোয়ালের মত এসে পরের হাঙ্গামা চেপে বসে, না পারা যায় উপরে ফেলে দিতে, না পারা যায় শান্ত মনে সইতে, তারপর বাধ্য হয়েই কাঁধ লাগাতে হয়, একটু ঠেলাঠেলিও করতে হয়, শরীরের স্থানে স্থানে হয়তো ছড়েও যায়—এই অসহায় অবস্থার কথা জানি। আত্মীয়জনের জন্য আত্মনিগ্রহ, প্রেমিকের জন্য অস্তিত্ববিলোপ, পড়শীর জন্য জীবন বলিদান, এও জানি। কিন্তু এদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এরা, কোনো দিক্ দিয়ে এতটুকুও মিল নেই। জেলে এসে যাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়, জেলের বাইরে গিয়ে সারা জীবনে যাদের সঙ্গে দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের আদৌ সম্ভাবনা নেই, শুধু তাদেরই নয়, অচেনা, অজানা, অদেখা যে যেখানে আছে, তাদের সবার সবটুকু দুঃখ ও বেদনার পশরা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে মাথায় তুলে নেবার হিম্মৎ দেখেছি এমনি কনকতক বন্দীর। দুনিয়ার সবটুকু বিষ নিঃশেষে পান করবার মতো নীলকণ্ঠ এরাই। . . .

বেশী কথা কয় না, নেই হাঁকডাক, নেই আড়ম্বরের জলুস। একেবারে

অপ্রত্যাশিতভাবে আচমকা এদের আবির্ভাব ঘটে, তারপর যীশুখৃষ্টের মতো চলে এদের তিলে তিলে আত্মবলিদান। মৃত্যুর সঙ্গে এদেরই পাঞ্জা লড়াই চলছে নিশিদিন, প্রাণ দেবার জন্য এরাই করে কাড়াকাড়ি। পরাধীন দেশের অনামী এই দধীচিকুল, তোমাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করি সর্ব্বান্তরিক প্রণতি !......

দিন পনেরোর মধ্যেই বিমলবাবু অনেকটা আরোগ্য লাভ করলেন বটে, কিন্তু শিবিরের কমবয়সীদের মধ্যে একটা চাপা ক্রোধের আগুন ধূমায়িত হতে লাগলো। পাঠান সেনানায়ক সুবাদার নাজির খাঁকে একেবারে ধরাপৃষ্ঠ হতে সরিয়ে দেবার মারাত্মক পরিকল্পনাও কেউ কেউ আঁটতে লাগলেন গোপনে গোপনে। প্রতিনিধি দল অফিসে যাওয়া সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করলেন, রান্নাঘরের ব্যাপারেও দিলীপবাবুর উৎসাহ একেবারে কমে গেল, খেলার মাঠে খেলোয়াড়ের অভাব দেখা যেতে লাগলো, বিভিন্ন দলীয় পত্রিকায় নাজির খাঁর এই নৃশংসতার প্রতিশোধ নেবার জন্য গরম গরম সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগলো, 'শৃঙ্খল' পত্রিকায়ও করা হলো এর তীব্র নিন্দাবাদ।

সরকারীভাবে সংগ্রাম ঘোষণা না করলেও সংগ্রামী আবহাওয়ায় সারা বন্দীশিবির থম্ থম্ করতে লাগলো। টবিন এ সংবাদ নিশ্চয়ই পেয়ে গেছেন এবং গিরিজা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁকে যে, এই নালিশ-বিহীন উদাসীনতা আসন্ন ঝটিকারই পূর্ব্বাভাস, অতএব—

অতএব এক মাসের মধ্যেই পাঠান সেনাদল বদলি হয়ে গেল আর তাদের স্থানে এল বিহারী রেজিমেন্ট। আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি আজও যে, একদল বন্দী নাজির খাঁর কাপুরুষ আক্রমণের পশ্চাতে কমাণ্ডাণ্ট টবিনের পরোক্ষ সমর্থন উপলব্ধি করে বিপ্লবীদের কালো খাতায় মোটা হরফে তাঁর নাম তুলে দিয়েছিলেন এবং যে-করে-হোক জনতিনেক শিবির থেকে পলায়নের ফন্দী আঁটছিলেন। টবিন যদি আমাদের পরিদর্শন করতে আর না-ই আসেন কিংবা সেনাদলের পর যদি স্বয়ং টবিনকেই বদলি করে দিয়ে তাঁর রেহাই পাবার সুযোগ করে দেয়া হয়, তাই তিনজন বাইরে চলে যাবেন, যেখানেই টবিন থাকুন না কেন, সেখানেই গিয়ে তাঁকে ধরাপৃষ্ঠ হতে

বহিষ্কার করে দেবেন। তাঁদেরই দু'চারজন বন্ধু লোহার রড্ ও শাবল গোপনে সংগ্রহ করে সাগ্রহে টর্বিনের শিবির পরিদর্শনের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন।

অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ালো যে এক আধটা নরহত্যা রোধ করবার শক্তি তখন আর কারুর ছিল না। কিন্তু সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় চট্টগ্রামের পাহাড়তলী রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের ওপর 'জঘন্য' আক্রমণ চালাবার যে ক্ষুদ্র বিবরণ প্রকাশিত হলো, তার ফলে আমাদের মনে এলো এক নতুন চেতনা, সমগ্র বন্দীশিবিরে এল এক অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা। পত্রিকায় যা পড়েছিলাম এখন সবটুকু আজ আর মনে নেই। তবুও যেটুকু পরে জানতে পেরেছিলাম তা এই—

১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর। রাত্রিকাল। পাহাড়তলী রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের মোজাইক করা পালিশ মেঝের ওপর হাজারো আলোকের নিম্নে চলছে সাহেব মেমদের যুগল নৃত্য। রঙ্গ সজ্জা জাজ্। যেমনি যৌন আবেদনময় স্বল্প ও স্বচ্ছ পোশাক তেমনি নিতম্ব দোলানো ইঙ্গিতময় নৃত্য। সুরাসিক্ত রক্তিম অধরে যেমন অশ্লীল গানের জড়িত সুর, শ্রোতা ও দর্শকদের তেমনি অশ্রাব্য উচ্ছ্বাস। চটগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর প্রায় আড়াই বৎসর কেটে গেছে। সুতরাং নিশ্চিন্ত। একদা যারা আতঙ্কে সমুদ্র জাহাজে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তারাই আবার হাসিমুখে ফিরে এসেছে শহরে। বিপ্লবীদের কেউ কেউ সম্মুখ সংগ্রামে নিহত, আহত, আবার কেউবা আত্মগোপন করে উধাও হয়েছেন। শহরে তাই আবার স্ফূর্তির বাজনা বেজে উঠেছে চলছে আবেশময় নৃত্য—

অকস্মাৎ প্রত্যেকটি জানালা ও দরজায় দেখা গেল আগ্নেয়াস্ত্রধারী আক্রমণকারী। কেউ কিছু বলবার পূর্ব্বেই তাদের হাতের রিভলবার ও বন্দুক গুলি একসঙ্গে গর্জ্জে উঠলো—গুম গুম গুম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। বৈদ্যুতিক আলোকের ঝাড় চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে, সুরার পাত্র মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, ভাঙ্গা টেবিল চেয়ারে নৃত্যবাসর একেবারে কণ্টকিত নরনারীর আর্ত্ত চীৎকারে শুধু ইনষ্টিটিউট নয়, চারিদিকের পাহাড় পর্য্যন্ত মুখরিত।

অবিরাম গুলী ও বোমানিক্ষেপের ফলে নর্ত্তক ও নর্ত্তকীদের কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে, মরে গেছে, বিপ্লবীরা তার খবর

রাখে না। হাতে আছে অস্ত্রাগার থেকে লুণ্ঠন-করা আগ্নেয়াস্ত্র আর থলিতে আছে মারাত্মক বোমা। হুকুম হয়েছে, আক্রমণ কর। সে হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালিত হচ্ছে।

রেলিং-ঘেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিপ্লবীদের এই স্মরণীয় অভিযান পরিচালনা করছিলেন মহীয়সী বিপ্লবী নারী প্রীতিলতা ওয়াদেদার। সামরিক পোশাক-আঁটা বিপ্লবী বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়িকা।

মাষ্টারদা'র নির্দ্দেশ : ধরা দেবে না। কাজ হাঁসিল করে সরে পড়তে না পারলে আত্মহত্যা করবে।

কাজ হাঁসিল হয়ে গেছে। সবগুলো বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে, সব কটি বুলেট ব্যয় হয়ে গেছে। আলোকোদ্ভাসিত নৃত্যশালা, মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যেখানে উচ্ছল হয়ে উঠেছিল, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল সুরার বেলোয়ারী তরঙ্গ আর সাকীর রতি-নৃত্য—সেই প্রমোদ কক্ষ এখন অন্ধকারে মৃত, ধোঁয়া ও বারুদের উগ্র গন্ধে অসহনীয়। সেই অন্ধকারে শোনা যাচ্ছে শুধু মুমূর্ষু ইসাডোরা ডানকানদের করুণ ক্রন্দন, ক্ষতবিক্ষত ফ্রেড এ্যাষ্টায়ারদের আর্ত্ত চীৎকার। পলায়নের পথ রুদ্ধ, দুয়ারে দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে মূর্ত্তিমান যম। হতাহতের সংখ্যা নির্ণয় এখনই সম্ভব না হলেও সমগ্র দুনিয়াকে সমঝে দেয়া গেছে এই সত্য, এই নির্ম্মম সত্য যে, অস্ত্রাগার আক্রমণের পর নিশ্চিন্ত বিলাসের অবসর তোমাদের আজও আসেনি। কারণ ফেরারী হলেও মাষ্টারদা' আজও জীবিত আর এই চট্টগ্রামেই তিনি অবস্থান করছেন।

মাষ্টারদা'র নির্দ্দেশ : ধরা দেবে না, আত্মহত্যা করবে।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই সংবাদ পৌঁছে গেছে শহরে। আড়াই বৎসর পর এমনি বিদ্যুৎ-আক্রমণ কল্পনা করতে না পারলেও সেনাবাহিনীর প্রস্তুত হতে দেরী হবে না। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বিউগল বেজে উঠেছে, এ্যালার্মের সঙ্কেত পেয়ে শিবিরে শিবিরে পড়ে গেছে সাজো সাজো রব, এখনই হুড়মুড় করে এসে পড়বে লরী-লরী ভর্ত্তি রাইফেলধারী সৈনিক, আসবে মেসিন গান, লুইস গান, ষ্টেন গান······

মাষ্টারদা'র নির্দ্দেশ : ধরা দেবে না।

ঐ তো দূরে মোটরের অগনিত রোষকষায়িত চক্ষুগুলি আলো বিকীরণ করে ধেয়ে আসছে, শোনা যাচ্ছে ইঞ্জিনগুলির ক্রুদ্ধ গর্জ্জন, তারা আসছে, তারা

আসছে······সর্ব্বাধিনায়িকা হুকুম করলেন সবাইকে দূরে পার্ব্বত্য অঞ্চলে গিয়ে আত্মগোপন করতে······

মাষ্টারদা'র নির্দ্দেশ : ধরা দেবে না।

সামরিক জ্যাকেটের পকেট থেকে ক্ষুদ্র একটি প্যাকেট বার করে সাদা পাউডারটুকু মুখে ঢেলে দিলেন প্রীতিলতা।

মাষ্টারদা'র নির্দ্দেশ : ধরা দেবে না।

ধরা তো দিলাম না মাষ্টারদা'। তোমারই পায়ের তলায় বসে একদিন দীক্ষা নিয়েছিলাম যে অগ্নিমন্ত্রে, বুকের রক্ত দিয়ে তারই মর্য্যাদা রক্ষা করলাম। তোমার নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম। এগিয়ে যারা চলেছে, তাদের বলে 'দও মাষ্টারদা' যে, পথের প্রান্তে ঘুমিয়ে রইলো যে বোনটি, তার জন্য শোক করো না, চোখের জল ফেলো না, পরাধীন ভারত তাদের ডাকছে, আর্ত্তস্বরে। ডাকছেন দেশজননী : ইনক্লাব জিন্দাবাদ······

ঢলে পড়লেন প্রীতিলতা।

নীল ঠোঁট দু'খানিতে তাঁর লেগে রইলো সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের যুধ্যমান বিপ্লবীর রণহুঙ্কার : ইনক্লাব জিন্দাবাদ······

পাহাড়তলী ইনষ্টিটিউট আক্রমণের রক্তরাঙ্গা কাহিনী ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে রইলো······

টবিন-গিরিজা-পবিত্র এ্যাণ্ড কোম্পানীর মাথায় একটা সত্য ঢোকেনি যে, আমরা সব বনবিহঙ্গ, জোর করে শিকল এঁটে খাঁচায় ভরে রাখা হয়েছে। নবাবী খানা, মূল্যবান আসবাবপত্র, অখণ্ড বিশ্রাম, একটানা নিশ্চিন্ত জীবন-যাপনের সুযোগ করে দিয়ে অবশ্য সেই খাঁচাকে সোনার খাঁচার রূপ দেবার চেষ্টা করে বন্দিত্বের মধ্যেই একটা বেলোয়ারী আকর্ষণ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বনবিহঙ্গ খাঁচাকে ভালবাসতে শেখে কি? সামান্যতম দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত পেলেই যে সে পালিয়ে যাবে, ওরা তা ঠাওর করতে পারেনি। পবিত্র সরকার অবশ্য কোনোদিনই শিবিরের মধ্যে আসতো না। কিন্তু এখানে তো তার চর রয়েছে। একেবারে কিলবিল করছে বলতে পারিনে, তবুও দু'চারটি আমাদের জানা ও দু'চারটি অজানা শাগরেদ তো আছেই। তারাও কিন্তু এটা একেবারেই ধারণা করতে পারেনি।

ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের পনেরো নম্বর কক্ষের পশ্চিম দিকে যে গোটাতিনেক ক্ষুদ্র কুঠরি আছে, পূর্ব্বে তা ছিল না। অবশ্য পাগলাগারদকে রাজবন্দী শিবিরে পরিণত করবার পূর্ব্বেই ওগুলো তৈরী হয়েছে। কিন্তু ছিল না বলছি এ জন্য যে, তা না হলে পনেরো নম্বরের যে দু'টো বৃহদাকার ভেনটিলেটার দু'টো কুঠরির মধ্যেকার দেয়ালে আজও রয়ে গেছে, সে দু'টো রাখবার কোনো সার্থকতা নেই। যে দেয়ালে ভেনটিলেটার, সেই দেয়ালের বাইরেই ঘর তৈরী করবার পর এই ভেনটিলেটারের আর কি প্রয়োজন আছে?······

কর্ত্তৃপক্ষের এই মূঢ়তার সুযোগ আমরা পুরোপুরি নেবার সিদ্ধান্ত করলাম। ঐ কুঠরিগুলিতে নিরালায় নিবিষ্ট মনে পরীক্ষার পড়া পড়বার জন্য ক'জন পরীক্ষার্থী কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি সংগ্রহ করলো। একখানা টেবিল, একখানা বা দু'খানা চেয়ার ও বইখাতায় ঘরগুলো ভরে উঠলো। টবিন মেজাজ দেখিয়ে বললেন: ঘরের তালা তোমরা কিনে নেবে, কিন্তু তার চাবি থাকবে অফিসে।

তথাস্তু!

কিন্তু একটি তালার যে দু'টো চাবি থাকে, এই সহজ সত্যটি ওদের বোধহয় খেয়াল হলো না। তাই দ্বিতীয় চাবিটি পড়ুয়াদের বাক্সের তলায় আশ্রয় গ্রহণ করলো। ভোরে ঘরগুলো খুলে দেবার সময় সিপাই এই কুঠরিগুলোও খুলে দিয়ে যেত।

ফ্রেমে-আঁটা জালের ঢাকনি অবশ্য ভেনটিলেটারে ঝুলছে। কিন্তু তা খোলা যায় জালের দরজার মতোই। তালা লাগাবারও ব্যবস্থা আছে বটে পনেরো নম্বরের মধ্যে. কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি সিপাইদের ওদিকে একেবারেই নজর পড়েনি। কেন, তা তাদেরই জিজ্ঞেস করতে হয়।······

শীতকাল। মাস ও সঠিক তারিখ মনে নেই। বহরমপুরের শীতও প্রচণ্ড, রাত দশটা বাজবার অনেক পূর্ব্বেই বন্দীরা লেপের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। সিপাইরা যথাসময়ে এসে গুনতি করে যেত। মশারির নীচে লেপ মুড়ি দিয়ে নিদ্রিত বন্দীকে আর ডেকে তুলতো না বিহারী সুবাদার। শুধু উঁকি মেরে মুখখানা দেখেই চলে যেত। প্রত্যেক ঘরের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার প্রতিই ছিল তাদের কড়া নজর, অধিবাসীদের তারা চিনতে চাইতো না। বিশেষ করে পাঠান সিপাইদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর থেকে।

ফরিদপুরের সুধীন আর ময়মনসিংহের বারীন একদিন পনেরো নম্বরের কান্তি বর্দ্ধন আর সুশীল সরকারের সঙ্গে সেই রাত্রির মতো সীট বদলে নিল অর্থাৎ ওরা দু'জন এল পনেরো নম্বরে আর এরা দু'জন গেল ঘুমোতে ওদের ঘরে। রাত দশটা বেজে পনেরো মিনিট হতেই সিপাইরা এসে যথারীতি গুনতি করে দরজায় তালা এঁটে দিয়ে নিশ্চিন্তে চলে গেল। সুবিধে হচ্ছে, অতি দীর্ঘ ব্যারাকের প্রশস্ত বারান্দাটি মাত্র একদিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে। রাত্রের বন্দুকধারী সিপাই এই বারান্দা দিয়েই সারারাত পায়চারি করে, নীচে ঘাসে নেমে সারা ব্যারাকটি ঘুরে দেখবার নিরর্থক ঔৎসুক্য বোধ করে না।

রাত দু'টো বাজতেই উঠে পড়লো সুধীন আর বারীন, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের অপর দু'জনও। বারান্দার সিপাইয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখলো একজন মশারির মধ্যে বসেই। ঘরে আলো নেই বটে, কিন্তু বৃহদাকার জানালা ও দরজাগুলো খোলা থাকায় কেমন একটা স্তিমিত দ্যুতি। এতে ওদের বেশ সুবিধেই হলো।

পনেরো নম্বরই ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের একদিকের শেষ ঘর। সিপাই খট্ খট্ করে বুট বাজিয়ে পনেরো পর্য্যন্ত এসে এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর আবার এক পা এক-পা করে চলে যায় এক নম্বরের দিকে। অর্থাৎ একবার চলে গেলে ফিরে আসতে অন্ততঃ আট মিনিট সময় লাগে। এই আট মিনিটের মধ্যেই কাজ হাঁসিল করতে হবে।

সুধীন ও বারীন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র একখানা এনভেলাপে পুরে নিয়েছে, গোপনে সংগ্রহ-করা কয়েক শো টাকাও নিয়েছে দু'জনে—ব্যস্, এবার রেডি!

মশারির মধ্যে সন্তর্পণে বসে যে সিপাইর ওপর লক্ষ্য রেখেছিল, সিপাই চলে যেতেই সে সঙ্কেত জানালো, রেডি!

একটি ভেনটিলেটারের নীচে একটি টেবিল ও তার ওপর একখানা চেয়ার খাড়া করতেই নাগাল পাওয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়ালো ওরা। আলিঙ্গনের পালা শেষ হলো। ধীরেন বললো: Wish you safe journey ……ওপারে একটি পাঠ-কক্ষের মধ্যে অবলীলাক্রমে পর পর বারীন ও সুধীন নেমে গেল।

আবার চুপচাপ! আবার সিপাইকে একবার টহল দিয়ে যাবার সময় দিতে হবে। ইতিমধ্যে বারীন তালার দ্বিতীয় চাবি দিয়ে পাঠ-কক্ষের দিকের দরজা অর্গলমুক্ত করেছে।

সিপাই এসে ঘুরে চলে গেল। আবার সঙ্কেত জানানো হলো, রেডি!

কক্ষের দরজা নিঃশব্দে খুলে বেরিয়ে এল দু'জনে একখানা টেবিল নিয়ে। ত্রিশ গজের মধ্যেই বাইরের দেয়াল, মাত্র দশ ফুট উঁচু। দেয়ালের পাশে টেবিল, টেবিলের ওপর একখানা চেয়ার—ব্যস্, নাগাল মিলে গেল!

পর পর দু'জনে দেয়াল টপকে বেরিয়ে গেল।

ভোরে দরজা খুলে দিতেই দু'জন বন্দী গিয়ে দেয়ালের পাশের সেই টেবিল ও চেয়ার নিয়ে এসে আবার পাঠ-কক্ষে যথাস্থানে রেখে দিল।

শীতের ভোর। দরজা খুলে দেবার সময়ও বেশ অন্ধকার থাকে। তাই ওদের কেউ লক্ষ্য করলো না। ভাগ্যও সুপ্রসন্ন ছিল বলা যায়। তারপর বিহারী সিপাই অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ। দরজা খোলবার সময় তার দৃষ্টি নিবদ্ধ তালাটির প্রতি। বিংশ শতাব্দীর অর্জ্জুন, পাখীর চোখ দেখছে শুধু! কেন সে দৃষ্টিক্ষেপ করবে দেয়ালের দিকে? ওখানে কি আছে, চেয়ার আছে, না টেবিল আছে, এমন কি, দেয়ালটাই দাঁড়িয়ে আছে কিনা, তা লক্ষ্য করবার প্রয়োজন কি তার? তালা খোলার হুকুম, তালা খুলেছে। খুলতে খুলতে সে এক নম্বরের দিকে চলে গেল।

তার পরের দিন দিনের বেলাটা কাটলো বেশ নিশ্চিন্তে। বারীন ও সুধীন যে ততক্ষণে কলকাতাগামী ট্রেনে চেপে বসেছে, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম, কারণ কর্তৃপক্ষের বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

ছুতো করে দু'চারজন মাঝে মাঝে অফিসে গেলেন ওদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে। সারা অফিস নিয়মিত কাজ করে চলেছে। বোঝা গেল, আমাদের কাজ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়েছে।

পঁচিশ

কিন্তু ফ্যাসাদ বাধলো সেদিন রাত্রে। প্রথমতঃ গুনতি মিললো না বার বার গুনেও। তারপর খাতা নিয়ে এসে সুবেদার মিলিয়ে মিলিয়ে বার করলো যে, ইষ্টার্ণের এগারো নম্বরের বারীন দাস আর সাদার্ণের চার নম্বরের সুধীন ভট্টাচার্য্য অনুপস্থিত।

ওদের ঘরের অন্যান্যদের প্রশ্ন করে জানতে পারলো যে, রাত্রে খাবার ঘরেও নাকি ও দু'জনকে দেখা গেছে। দিলীপবাবুও সায় দিলেন। সুতরাং গোটাকয়েক পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ্চ নিয়ে সারা শিবির তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চললো। প্রত্যেকটি স্নানের ঘর, ব্যায়াম ঘর, শিবিরের প্রত্যেকটি বৃক্ষ, টালী ব্যারাকের ছাদ, কিচেন, খাবার ঘর, সরবৎ ঘর, খেলার মাঠের ধারে মেহেদি গাছের বেড়ার পাশে, এমন কি, বড় ড্রেনটাতেও পরীক্ষাকার্য্য শেষ করে প্রায় ত্রিশজন সিপাইয়ের একটি দল একেবারে গলদ্ঘর্ম্ম হয়ে এসে আমাদেরই ঘরের সম্মুখে বারান্দায় হাত পা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়লো।

এবার কী করা যায়? কী করা যেতে পারে? টবিন না হয় বাস করেন বন্দীশিবির থেকে অনেক দূরে। কিন্তু গিরিজা দত্তের বাড়ী তো এই পাশেই। বুড়ো রাত্রের গুনতি মেলার ঘণ্টাটি না শুনে ঘরের আলো নেবান না, ঠায় বসে থাকেন। ক'জন জমাদার, সুবাদার ও সুবাদার-মেজরের মধ্যে সলা-পরামর্শ হলো অনেকক্ষণ। তারপর দেখলাম, দল বেঁধে ওরা চলে গেল এবং একটু পরই মধুক্ষরা ঠং শব্দ শোনা গেল। বুঝলাম, গিরিজা দত্ত রাত্রের মতো চোখ বুজবেন, কিন্তু সকালের লোমহর্ষণকারী সংবাদ ওঁকে পাগল করে দেবে কিনা কে জানে!

পরদিন সকালে আমাদের কর্ম্মচাঞ্চল্য যথারীতি সুরু হয়ে গেল। যেন কিছুই কোথাও ঘটেনি, যা ছিল একেবারে হুবহু তাই আছে। আদৌ চিন্তিত হলাম না এদের উদ্বেগ ও তৎপরতা দেখে, কারণ বারীন ও সুধীন

ততক্ষণে নির্বিঘ্নে কলকাতা পৌঁছে গেছে। কাপড়জামা ওরা কিছু নিয়ে যায়নি। প্রথমতঃ নিয়ে যাওয়া অসুবিধে, তারপর ট্রেণে সাধারণ পোশাকে উঠলে অন্যান্য হাজারো ডেইলি প্যাসেঞ্জারের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দেয়া সহজ। আবার ওদের ফেলে-যাওয়া জিনিষপত্র সবই যদি তেমন সাজানো থাকে, তাহলে শেষ পর্য্যন্ত ওগুলো যাবে অফিসে, সেখান থেকে গুদামের নাম করে গুদাম-বাবুর বাড়ীতে। তাই, যাবার পূর্ব্বে ওরা দামী ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সবই বিলি করে দিয়ে গেছে বন্ধুদের মধ্যে।

বেলা নয়টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই এলো বিরাট তল্লাশী দল। শুধু বিহারী রেজিমেণ্ট নয়, বাইরের বি-পি মার্কা দারোগা, লাল পাগড়ি ও জনকতক আই বি অফিসারও এসেছেন। কয়েক ঘণ্টা ধরে চললো তল্লাশী। বাক্সের জিনিষপত্র মেঝেতে নামিয়ে, বিছানা খুলে ও তুলে, জলের কলসী উলটো করে, ধোপাবাড়ীর ধুতি ও জামার পাট খুলে, প্রত্যেকটি বই ও খাতার প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা—সে এক অভূতপূর্ব্ব তল্লাশী। বেলা সাড়ে বারোটায় যেসব আপত্তিকর মালপত্র ওরা নিয়ে গেল, তার মধ্যে দেখলাম, কাঁচের ভাঙ্গা গ্লাসের টুক্‌রো, খালি তেলের বোতল, কতকগুলি ইট, প্যাকিং কেসের লোহার পাত কিছু, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিকেলের দিকে আবার এলেন শহরের ও কলকাতা থেকে আমদানী-করা জনকতক আই বি অফিসার। সাদা পোশাকে এসে তাঁরা একেবারে সাদা কথাই বললেন যে, বারীন দাস ও সুধীন ভট্টাচার্য্য যে-করে হোক শিবির থেকে পলাতক। কীভাবে—সেটা বার করবার জন্য তাঁরা এসেছেন আমাদের কতকগুলো প্রশ্ন করতে।

অমনি প্রতিবাদ উঠলো উত্তাল হয়ে।

—আপনাদের কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে আমরা বাধ্য নই।

—বারীন ও সুধীন পালিয়ে গিয়ে থাকলে কি করে দেয়াল টপকে বা অন্য উপায়ে পালালো, তা বার করবার ডিউটি আপনাদের, আমাদের নয়।

—এ কি আপনাদের লর্ড সিংহ রোড পেয়েছেন?

—মণি বোসকেই কেয়ার করলাম না, বয়লার প্রুফ হয়ে বেরিয়ে চলে এলাম, তা আবার আপনারা!

এমনি অজস্র প্রতিবাদ ও শ্লেষ। কিন্তু বাপ-মা তুলে গালিগালাজ করলেও

আই বি-র লোকদের মেজাজ কখনো খারাপ হয় না এতটুকুও, আর তেমনি অটুট এঁদের ধৈর্য্য !

তথাপি প্রশ্ন : বেশ, আপনারা না-ই বললেন। কিন্তু ওঁদের ব্যক্তিগত বন্ধু কারা বলুন, আমরা তাঁদের কাছে যাই। দেখি তারা কী বলেন !

ধমক দিল বিভূতি : সবাই আমরা ওঁদের বন্ধু। তাই বিশেষ করে উল্লেখ করবার মতো কেউ নেই। আমাদের কোনো প্রশ্ন করলে আমরা তার কোনো জবাব দোব না। সুতরাং—

হ্যা, যাচ্ছি। তবে ওঁদের ঘর দু'খানা আমরা একবার দেখতে চাই। তা পারবো কি ?

নিশ্চয়ই।—বলে এঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন যতীনবাবু। ওঁরা চারিদিক ভাল করে নিরীক্ষণ করে ওদের চেয়ারে একবার বসে ও পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে, খাট ও টেবিলের নীচেটা ভাল করে পরীক্ষা করে, অবশেষে আই বি কুলকলঙ্কের মতো, অকাট মুর্খের মতো দরজা ও জানালার মোটা মোটা শিকগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর একসময় বিষণ্ণমুখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে গেলেন।

তার দু'দিন পর সুবাদার গোপনে আমায় বললো যে বাঙালী লোগ মন্ত্র জানে। তাই বিল্লি হয়ে ড্রেনসে পালিয়ে গেল। নইলে এত সান্ত্রী আছে, পালাবে কেমন করে ? আই বি লোগও তাই বল্লেন।

বিহারী রেজিমেণ্ট ও আই বি কর্ত্তাদের ধারালো বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সেদিন প্রাণ ভরে হেসেছিলাম মনে আছে। এবং আমার সঙ্গে অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন।

কিন্তু এদের তৎপরতা নিয়ে আদৌ ব্যস্ত ছিলাম না আমরা।

আই বি অফিসার আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে প্রায়ই বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করে যেত : আপনাদের বাতি জ্বালাতেও আর কাউকে বাইরে রাখবো না। The Revolutionary activities are completely checked by us—আমরা সব ঠাণ্ডা করে দিয়েছি।

কিন্তু আশ্চর্য্য, ওদের এই আত্মশ্লাঘাকে ধূলোয় লুটিয়ে দিয়ে ১৯৩২ সালেই এতগুলো বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করেছিল যে, বন্দীশিবিরে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করেও গোপনে এইসব সংবাদ পেয়ে আনন্দে ও গর্ব্বে আমরা অধীর হয়ে উঠতাম।

জানুয়ারী মাসে লাকসাম জংশনের কাছে শিকল টেনে ট্রেণ থামিয়ে ডাকের বগী থেকে রিভলভার দেখিয়ে ছয়জন যুবক ইনসিওর খামগুলো নিয়ে সরে পড়ে। চারজন যুবক ঢাকা শহরে পুলিশের জনৈক সার্জ্জেণ্টের রিভলভার ছিনিয়ে নেয়। ফেব্রুয়ারী মাসে দু'টো ডাকাতি হয়। মার্চ্চ মাসে ঢাকা জেলার দু'টি স্থান থেকে বন্দুক ও রিভলভার চুরি হয়। বন্দুকের মালিক টের পেয়ে বাধা দিতে এসে রিভলভারের গুলীতে নিহত হন। ফরিদপুর জেলার চরমুগুরিয়া পোষ্ট অফিসে পাঁচজন সশস্ত্র বিপ্লবী হানা দেয় ও অফিস লুঠ করে। এপ্রিল মাসে চারিটি স্থানে মেইল ডাকাতি হয়। রংপুরে একটি ট্রেণ ডাকাতি ও কলকাতায় একটি দোকানে ডাকাতি হয়। মে মাসে ঢাকা শহরের নিকট তেজগাঁওয়ে শিকল টেনে ট্রেণ থামানো হয় এবং জনকয়েক যুবক গার্ডকে রিভলভারের গুলীতে আহত করে জনৈক যাত্রীর কাছ থেকে ত্রিশ সহস্রাধিক টাকা নিয়ে একখানি ট্যাক্সিতে সরে পড়ে। ঢাকা শহরে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীর দেহরক্ষীকে আটক করে তার আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া হয়। জুন মাসে রংপুরে একটি জমিদারগৃহ থেকে কতকগুলি বন্দুক ও রিভলভার অপহৃত হয়।

২১শে জুলাই কুমিল্লায় সাইকেল-আরোহী জনৈক বিপ্লবীর রিভলভারের গুলীতে ত্রিপুরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ই. বি. ইলিসন মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পরে মারা যান। ৫ই আগষ্ট কলকাতায় 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার অফিসে প্রবেশ করবার সময়ে সম্পাদক স্যার এ্যালফ্রেড ওয়াটসনের প্রতি গুলী নিক্ষিপ্ত হয়। এই মাসেরই শেষদিকে ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্র্যাসবিকে গুলী করা হয়। তারপর পাহাড়তলীর স্মরণীয় ঘটনা। ২৮শে সেপ্টেম্বর স্যার এ্যালফ্রেডের গাড়ী থামিয়ে আবার তাঁর প্রতি গুলী নিক্ষিপ্ত হয়। ১৮ই নভেম্বর রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিনটেনডেণ্ট সি. এ. ডবলিউ. লিউকের মোটর থামিয়ে তিনজন বিপ্লবী তাঁকে গুলী করে। তিনি মারাত্মকরূপে আহত হন। ......

এই তালিকায় আরও অসংখ্য ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি। সে-সব মিলিয়ে হিসেব করলে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, বাইরে তখনো যারা রয়ে গেছে, বিপ্লবের ঝাণ্ডা একটি মুহূর্তের জন্যও তারা অবনমিত করেনি।

সুতরাং আই বি কর্ত্তাদের সহর্ষ ঘোষণা যে একটা নিছক ধাপ্পা ব্যতীত আর কিছুই নয়, ওটা যে আমাদের উৎসাহের অনির্ব্বাণ শিখায় জলসিঞ্চনেরই অপপ্রয়াস মাত্র, তা মনে মনে বেশ উপলব্ধি করতে পারতাম। মুখে অবশ্য দুঃখ ও বেদনার মুখোশ এঁটে ভয়ার্ত্ত কম্পিতকণ্ঠে নিবেদন করতাম: আপনাদেরই জয়জয়কার! এবার তাহলে······

ছাব্বিশ

১৯৩৩ সাল পড়তেই অকস্মাৎ নতুন করে মনে পড়লো আমি একজন পরীক্ষার্থী এবং আর মাস দেড়েক পরই সুরু হবে সেই আই. এ. পরীক্ষা। ১৯২৬ সালে ম্যাট্রিক পাস করবার সাত বৎসর পর এই তেইশ বৎসর বয়সেও আমি আই. এ. পরীক্ষা দোব। দোব বললে ভুল বলা হবে, দিতে হবে। ধীরেনদা'র আদেশ। বই কিন্তু নিজের একখানাও নেই, পাঠ্য বই কিনে টাকার অপব্যয়ও করতে রাজী নই আর তারপর শিবিরের হাজারো কাজে ও অকাজে ব্যাপৃত থাকার দরুণ নিবিষ্ট মনে পড়বার সময়ই-বা কোথায় আমার? তা হোক্। তথাপি……! এই তথাপির গোঁ কিছুতেই ছাড়লেন না বরিশালীয় দাদা। বললেন, পরীক্ষা দেবার জন্য আমার প্রয়োজন কালি, কলম ও খাতা, বইয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁর কাল্পনিক স্ত্রীর ভ্রাতার সম্মানিত আসনে বসিয়ে আমার লেখার ওপর তাদের আঁচড় কাটবার ক্ষমতার কথা যে কণ্ঠে, যে উৎপ্রেক্ষা দিয়ে, যে ভাষায়, যে নাদ-পদ্ধতিতে, যেভাবে বর্ণনা করলেন, আমি নিশ্চিত বলতে পারি, সিনেট হাউসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ধীরেনদা' যদি একদিন এমনি একটি অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা দেন, তাহলে সম্মুখে কলেজ স্কোয়ারের পুকুরে নিশ্চয়ই বন্যা দেখা দেবে এবং সিনেট হাউসের ঐ মোটা-মোটা থামগুলি চৌচির হয়ে ফেটে পড়বে। এমনি জ্বালাময়ী ভাষা!

একেই বলে বরিশালীয় ভাষা। বাংলা দেশে কেন, সমগ্র ভারতে, এমন কি, বোধহয় সমগ্র বিশ্বে এই একটিমাত্র জেলা আছে, যেখানে নব-পরিণীত স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে curtain lecture বলে কোনোও বস্তু নেই। কারণ ফিস্ ফিস্ করে কথা বললে বোধহয় সে দেশে কেউ শুনতে পায় না। আর যে বলে তাকে সমাজ-চ্যুত করা হয়, তার ধোপা-নাপিত বন্ধ করা হয় এবং হয়তো তাকে জেলা থেকে বার করে দেয়া হয়। বরিশালের সবিনয় অনুরোধ অন্য দেশে কমাণ্ডার-ইন-চীফের আদেশ। আর বরিশালের আদেশ অন্য দেশের ফাঁসীর হুকুম। এই একটিমাত্র জেলা—যেখানকার কথায় মোলায়েম শব্দ একটিও নেই, নরম সুর

নেই, উচ্চারণে আদৌ নেই সঙ্কোচ! সদ্য-ছড়ানো ঝামার খোয়ার ওপর দিয়ে ষ্টীমরোলার যেমন প্রচুর শব্দ করে ও ধাক্কা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে যায়, এবং চেপে, দুমড়ে, ভেঙে, সবকিছু একেবারে পালিশ করে দিয়ে যায়, ঠিক তেমনি বরিশালের বিশ্রম্ভালাপ শুনলে মনে হবে বুঝি বচসা হচ্ছে আর তর্ক শুনলে মনে হবে বুঝি হাতাহাতি সুরু হয়ে গেছে। কিন্তু বরিশালে হাতাহাতি বলে কোনো শব্দ নেই। ছোরা-ছুরি, লাঠালাঠি, আর তার চাইতে নরম কিছু মানেই ঘুষোঘুষি। কালিকলমের ব্যাপার সেখানে নেই কিছু। আপসরফার সুযোগ নেই। রক্তপাত ব্যতীত কোনো ঝগড়া মিটতে পারে বলে বরিশালবাসী বিশ্বাস করেন না।

কিন্তু দেখেছি এবং দেখে বিস্মিত হয়েছি, বরিশালের প্রত্যেকটি বন্দী শিশুর মতো সরল। সামান্যতম কূটনীতিজ্ঞানও নেই তাঁদের। রেখে-ঢেকে কথা তাঁরা বলতে জানেন না। শালীনতার অনুশাসনগুলি অক্ষরে অক্ষরে মেনে, স্থান, কাল, পাত্রের গুরুত্ব ওজন করে, হিসেব করে, বিচার করে বক্তব্য পেশ করবার রীতি তাঁদের রপ্ত নয়। খাপ-খোলা তলওয়ারের মতোই তাঁরা স্পষ্ট ও সত্য। এককথায় বলতে গেলে সে যুগে বরিশালের বন্দীরাই ছিল বাংলা দেশের হাইল্যাণ্ডার্স, জার্মানীর ষ্টীল হেলমেট্‌স্‌, রাশিয়ার কসাক্‌স্‌।······

সুতরাং ধীরেনদা'র নির্দেশ অনুযায়ী সহবন্দীদের বই ধার করে পাতা উল্টাতে সুরু করলাম। পরীক্ষা এসেছে দ্বারে।

সঙ্গে সঙ্গে নাটকও। অতি উৎসাহী ঊষা পাল আর ধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সাফল্যমণ্ডিত নাটক মন্ত্রশক্তি ও সীতার পুনরভিনয়। অগণিত দর্শকগণের তাগিদে মাত্র দুইরাত্রির জন্য। মৃগাঙ্ক ও লবের পার্ট আমার মুখস্থ আছে। তাহলেও কো-এ্যাক্টর? সুতরাং ঊষা ও ধীরঞ্জনের তাগিদে নিয়মিতভাবে না হলেও প্রায়ই মহলায় যোগদান করতে হয়। ধীরেনদা'র কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ভ্রূকুটি এক্ষেত্রে কিন্তু একেবারে শান্ত। কেউ চরের মতো এই মারাত্মক সংবাদ তাঁর কানে পৌঁছে দিলে তিনি নস্যি দিয়ে দন্তধাবন করতে করতে বিশ্ববিদ্যালয়কে আর একবার তাঁর কাল্পনিক স্ত্রীর ছোট ভ্রাতার আসনে বসিয়ে দিয়ে বলতেন: নে, হইছে। হেইয়া লইয়া তর মাথাডা না ঘামাইলেও চলবে, ছানে, বোঝছো মনু?

তৎক্ষণাৎ মনু হনুর মতো এক লম্ফে পগার পার হয়ে আত্মরক্ষা করতো! স্থির হলো, পরীক্ষার্থীদের অসুবিধার সৃষ্টি না করে পরীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে নাটক দু'খানি হবে দু'-দু'বার করে।

তথাস্তু।

কিন্তু এই ১৯৩৩ সালের এই ফেব্রুয়ারী মাসেই দূর চট্টগ্রামের অখ্যাত গৈরালা গ্রামে যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সংবাদ প্রথমে ক্ষুদ্রাকারে 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা মারফৎ এবং পরে বিস্তৃতভাবে অন্যান্য গুপ্তপথে বহরমপুর বন্দীশিবিরে এসে পৌছোলো, আমার স্পষ্ট মনে পড়ে তার ফলে সমগ্র শিবিরের শৃঙ্খলা ও সহজতা অন্ততঃ সাময়িকভাবে খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়লো।

মারাত্মক সংবাদ, মাষ্টারদা' ধরা পড়েছেন!......

গৈরালা গ্রামের দূরত্ব ধলঘাট থেকে মাত্র তিন মাইল। অস্ত্রাগার আক্রমণের পরও বিশেষ করে ধলঘাট যুদ্ধের পর এদিকটায় তখন গ্রামে গ্রামে সামরিক বাহিনীর তাঁবু পড়েছে। সারাদিন ও সারারাত তারা প্রকাশ্যভাবে গ্রামের পথে পথে ঘোরাঘুরি করে, সন্দেহ হলেই কোনো গ্রামবাসী বা পথিককে নানা রকম প্রশ্ন করে, সদুত্তর দিতে না পারলে তার আর লাঞ্ছনার অবধি থাকে না।

ঠিক এইসময় গৈরালা গ্রামের বিশ্বাসদের বাড়ীতে বিপ্লবীদের গুপ্ত আড্ডা। সেদিন সেখানে এসে জমায়েৎ হয়েছেন কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্ত্তী, মণি দত্ত, ও সুশীল দাশগুপ্ত। পলাতকদের এই গুপ্ত আশ্রয়-স্থলের তদারকের ভার ন্যস্ত আছে এই গ্রামেরই অধিবাসী নেত্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্লবী দলের সভ্য ব্রজেন সেনের ওপর।

প্রথমটা নেত্র কিছুই জানতো না, সন্দেহও হয়নি একটুও। কিন্তু লক্ষ্য করতো সে, ব্রজেন দু'বেলাই তার বৌদিকে দিয়ে খাবার প্রস্তুত করিয়ে নিয়ে যায় পাশেই এক বাড়ীতে, বিশ্বাসদের বাড়ীতে। কেন? কারা ওখানে আছেন? আমার বাড়ীতে এসে বসে খেতে তাঁদের অসুবিধা কিসের?...... অনুসন্ধিৎসা শনৈঃ শনৈঃ বেড়ে গেল নেত্র সেনের। স্ত্রীকে মিঠে কথায় ভুলিয়ে সেদিন তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে বেগ পেতে হলো না তাঁর যে, ওঁরা সবাই পলাতক, অস্ত্রাগার আক্রমণের দলীয় লোক আর ওঁদের মধ্যেই এসে আছেন পরম পূজনীয় সূর্য্য সেন!

সূর্য্য সেন?—চমকে উঠলো নেত্র। একেবারে সূর্য্য সেন? সেধে এসে

অতিথি হয়েছেন?……মানসনেত্রে দেখতে পেলো নেত্র সেন, যথাস্থানে সংবাদটি সে পরম যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে পৌঁছে দিয়েছে আর কর্ত্তৃপক্ষ খুশী মনে গুনে গুনে তার হাতে তুলে দিচ্ছে দশ হাজার টাকার কারেন্সী নোট!……লোভী ও পাপাসক্ত মন তার একেবারে লক্ লক্ করে উঠলো।

সম্মানিত অতিথিদের আরও যত্ন করে খাওয়াবার জন্য সে সরলা স্ত্রীর কাছে দাবী জানালো এবং প্রস্তাব করলো, সে সেদিনই শহরের হাটে গিয়ে কিনে আনবে নানারকম তরি-তরকারি ও মাছ। স্ত্রীর মন আনন্দে ও স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে উঠলো।

কনিষ্ঠ ব্রজেনও বুঝতে পারলো না দাদার এই শহরযাত্রার গূঢ় উদ্দেশ্য কি! আর ততটা তলিয়ে দেখতে চেষ্টাও করলো না সে, কারণ স্থির হয়ে আছে, সেদিনই গভীর রাত্রে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে সবাই চলে যাবেন আর একটি গুপ্ত আশ্রয়স্থলে।

রাত প্রায় এগারোটায় অনভিজ্ঞা বৌদি ও একনিষ্ঠ কর্ম্মী ব্রজেন যখন সম্মানিত অতিথিদের চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় নানাবিধ ব্যঞ্জন সাজিয়ে খাওয়াতে বসালেন, তখন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলেন না তাঁরা গ্রামের পায়ে-চলা মেঠো পথ এড়িয়ে ঝোপজঙ্গলের মধ্য দিয়ে অন্ধকারে ভল্লুকের মতো নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৈরলা গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছেন ক্যাপ্টেন ওয়াম্স্লি চল্লিশজন রাইফেলধারী গুর্খা সৈনিক ও অফিসার নিয়ে।…

আহার শেষ হতেই অকস্মাৎ বমি করে ফেললেন মাষ্টারদা'। কল্পনা দাদাকে ঠাট্টা করলো, কিন্তু ব্রজেন হয়ে উঠলো ব্যস্ত। ওষুধের ব্যবস্থা করা উচিত! এই রাতেই যে সরে যেতে হবে অন্যত্র!

ছুটে এল সে নিজেদের পাড়াতে। দাদা কোথায়? দাদা?…কিন্তু এ কী!! সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলো ব্রজেন, নেত্র সেন একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন শূন্যে তুলে ট্রেণের গার্ডদের সিগন্যাল দেবার মতো করে আন্দোলিত করছে। কেন? কেন?

চট্ করে সমস্ত রক্ত তার মাথায় উঠে এল! ছুটে এল সে সূর্য্য সেনের কাছে এই সংবাদ দিতে এবং পরামর্শ দিতে যে, আর একটি মুহূর্ত্তও নষ্ট না করে এখনই স্থান ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

তৎক্ষণাৎ সবাই প্রস্তুত হয়ে নিলেন।

But it was too late···দেরী হয়ে গেছে ! দেরী হয়ে গেছে !

অকস্মাৎ কয়েকটি রকেট বোমা ফেটে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার গ্রাম আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। লক্ষ্যবস্তু ও নিশানা ঠিক করে নিয়ে চল্লিশটি রাইফেল একসঙ্গে গর্জ্জে উঠে সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেললো।

চ্যালেঞ্জ, এসেছে চ্যালেঞ্জ ! ধলঘাট, জালালাবাদ, পাহাড়তলীর চ্যালেঞ্জ ! কিন্তু কৌশলী সূর্য্য সেন সম্মুখীন হবার সহজ সাহস না দেখিয়ে এবার আশ্রয় নিলেন ষ্ট্রাটেজীর ! শত্রুকে বিভ্রান্ত করে বোকা বানিয়ে এবার বার করতে হবে নিঃশব্দে পলায়নের পথ।

সবাই প্রস্তাব করলো, তারা যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখবে সেনাদলকে। সেই অবসরে সরে পড়বেন মাষ্টারদা' ! মাষ্টারদা' বললেন, না, তা হয় না। তিনি যাবেন সবার শেষে।

বাঁশের বেড়া ডিঙ্গিয়ে পাশেই যে ঝোপজঙ্গল, তাতে গা-ঢাকা দিতে হবে, তারপর বিশ্রী ময়লাপূর্ণ গড়টি হামাগুড়ি দিয়ে পার হয়ে একবার ওপারে যেতে পারলেই আর কে পারবে দেখতে আমাদের ?

সুশীল দাশগুপ্ত এগিয়ে এল। কল্পনাকে পার করে নিল পাঁজাকোল করে, তারপর আর একজন, তারপর আর একজন। এবার মাষ্টারদা'র পালা। তুলে নিল সে তাঁকে অবলীলাক্রমে। কিন্তু যেই বেড়া পার করে দেবে, এমন সময় অকস্মাৎ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত একটা গুলী এসে লাগলো তার হাতে। পারলো না বেচারা !

মাষ্টারদা' হামাগুড়ি দিয়ে সরে এলেন একটু দূরে। একটা প্রকাণ্ড গাছ বেয়ে উঠে ওপারে পড়তে পারলে আর শব্দ হবার আশঙ্কা নেই। নিঃশব্দে বেয়ে উঠলেন, নিঃশব্দে ওপারে নামলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন একজন রাইফেলধারী সৈনিকেরই গায়ে। প্রাণপণ শক্তিতে তাঁকে চেপে ধরে চীৎকার করে সাহায্য প্রার্থনা করলো সে।

আবার ফাটলো গোটাকয়েক রকেট বোমা, আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো বনভূমি। মাষ্টারদা' ধরা পড়লেন, সঙ্গে ধরা পড়লো ব্রজেন সেন।······

কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলাম সবাই। হাসি ও খুশী কে যেন কেড়ে

নিয়ে গেছে ! কী যে ভাবি সারাদিন, নেই তার মাথা, নেই মুণ্ডু। খেলতে ভালো লাগে না, নাটকের মহলাও বন্ধ হয়ে গেল লোকাভাবে। পড়ার বই খুলে বসলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। চট্টগ্রামের বন্দীরা তো জলস্পর্শই করলেন না দিনকয়েক। বাধা দিলাম না আমরা। যুক্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি করে গেলাম না বোঝাতে যে, শোক ত্যাগ করে শাঁখ তুলে নাও, তূর্য্যনিনাদে আহ্বান জানাও বাংলার সমস্ত বিপ্লবীদের, মাষ্টারদা'র গ্রেপ্তারের মূল্য আদায় কর কড়ায় গণ্ডায় !······নীরবে দূর থেকে শ্রদ্ধা জানালাম এই অশ্রুকে। জানি, এই অশ্রু একদিন উত্তপ্ত হয়ে উঠে টগবগ করে ফুটতে থাকবে, রূপায়িত হবে তাজা লাল রক্তে আর সেই রক্তেরই আলতা পরিয়ে দিতে হবে আমার দেশজননীকে। আজিকার এই অশ্রু সেই অনাগত সুদিনেরই পূর্ব্বাভাস ! তাই ঝরুক না বিন্দু বিন্দু !······

সেদিনকার সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে ষ্টেটসম্যান যা লিখেছিল তার কতকটা আজও মনে পড়ে। লোকটির আকৃতি এত সাধারণ, প্রকৃতি এমনি বৈশিষ্ট্যহীন আর তাঁর চলাফেরা এমনি গেঁয়ো যে, গোয়েন্দা বিভাগ দীর্ঘ তিন বৎসর আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাঁকে খুঁজে বার করতে পারেনি। অথচ সংবাদ পেয়েছে তারা এবং নির্ভুল সংবাদই পেয়েছে যে, সূর্য্য সেন চট্টগ্রামের বাইরে যাননি। কখনো কুলির বেশে, কখনো কৃষকের বেশে, কখনো-বা ঝাঁকামুটের বেশে এই লোকটি চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সাম্পানওয়ালার ছদ্মবেশে সূর্য্য সেন পার্ব্বত্য নদীতে নদীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সংগঠনের কাজে, এই সংবাদ পেয়েও গোয়েন্দা বিভাগ এঁকে চিনতে পারেনি, ধরতে পারেনি। আজ সেই মাষ্টারদা' ধরা পড়েছেন। মনে হলো আমাদেরও গলায় পড়েছে ফাঁসীর রজ্জু।······

কী যেন হারিয়েছি আমরা ? কী এক অমূল্য বস্তু ! শুধু পরম আত্মীয় নয়, পরম পূজ্য ! মনে হলো হারিয়েছি যেন নিজের হস্ত, নিজেরই চক্ষু, নিজেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আমাদেরও হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে যেন গৈরালা গ্রামের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত ক্যাপ্টেন ওয়ামস্লির রিভলভারের বুলেট !······

নেত্র সেন নিশ্চয়ই পেয়েছে দশ হাজার টাকা। কিন্তু টাকায় যার মূল্য নির্দ্ধারণ করতে পারা যায় না, এমনি কী এক অমূল্য বস্তু সে হারালো, জানতেও

পারলো না সে। সমগ্র বিপ্লবী জাতির পৃষ্ঠে অতর্কিতে মীরণের মতো কী করে যে সে ছুরিকাঘাত করলো, মূর্খ বোধহয় তা বুঝতেই পারলো না।

বৃটিশ গভর্ণমেন্টের খানাপিনা ও আনন্দ উৎসবের ফেনিল স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নেত্র সেন কল্পনাই করতে পারবে না যে, শৃঙ্খলিতা দেশজননীর চক্ষু দু'টির কোণে তখন তপ্ত রক্তাশ্রু চক্‌-চক্‌ করে উঠছে অন্ধকারে সাপের মাথার মণির মতো।......

সাতাশ

কিন্তু, কালের ব্যবধানে মানুষ নিকটতম আত্মীয়ের তীব্রতম বিয়োগব্যথাও ভুলে যায়।....

তাই, ধীরে ধীরে আবার কর্ম্মচাঞ্চল্য দেখা দিল বন্দীশিবিরে। পরীক্ষা দিলাম আমি এবং সঙ্গে সঙ্গে নাটকও হলো। নাটকে যথাপূর্ব্বং প্রশংসা অর্জ্জন করলাম বটে। কিন্তু প্রশ্নপত্রের জবাব কী রকম দিলাম, পরীক্ষকদের কতখানি মনোরঞ্জন তা করতে পারবে, তখনই তা জানবার পথ কোথায়? প্রত্যেক দিন প্রশ্নপত্র পেয়েই তৎক্ষণাৎ লেখা সুরু করতাম আমি, তারপর যখন দেখতাম পুরো নম্বরের জবাব দেয়া হয়ে গেছে, তখন ফাউনটেন পেন পকেটে গুঁজে উঠে দাঁড়াতাম, একটিবার রিভাইজ করবারও ধৈর্য্য থাকতো না। এমনই ছিল আমার স্বভাব!

পাশে বসে অনিল সেন প্রমাদ গুনতো! কারণ তাকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হতো আমারই লেখার ওপর। আড়চোখে চেয়ে চেয়ে যতখানি পারতো সে নকল করে নিতো পরম নিষ্ঠার সঙ্গে, তারপর শেষের পয়তাল্লিশ মিনিট আমার অনুপস্থিতিকালে সে বেচারা হয় ছবি আঁকতো, নয়তো প্রাণপণ চেষ্টা করতো এক-আধটা প্রশ্নের জবাবে অন্ততঃ এক-আধ লাইন লিখবার জন্য। আশ্চর্য্য, এই অনিল সেনও কিন্তু পাস করেছিল আই. এ. পরীক্ষায় তার তেরছা দৃষ্টির দৌলতে।

পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ায় অন্ততঃ ধীরেনদা'র চোখরাঙানি থেকে রক্ষা পেলাম এবং সেজন্যই স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলাম।

এরপরই সাহিত্য সভার পক্ষ থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে নকল অধিবেশন আহ্বান করা হয়, আজও তা স্পষ্ট মনে পড়ে।

ইসটার্ণ এ্যানেক্সি অর্থাৎ টালি ব্যারাকের সম্মুখে খোলা ময়দানের চতুর্দ্দিকে বিচিত্র রংয়ের সুজনী টাঙ্গিয়ে পরিষদ কক্ষ তৈরী করা হলো। তক্তপোশের ওপর টেবিল চেয়ার পেতে স্পীকারের আসন তৈরী হলো। তার নীচেই আসন নির্দ্দিষ্ট হলো পরিষদ সেক্রেটারীর। তারপর অর্দ্ধবৃত্তাকারে স্থান নির্দ্দিষ্ট হলো বিভিন্ন দলের, যথা—মুসলীম লীগ, কংগ্রেস, অনুন্নত সম্প্রদায়, স্বতন্ত্র দল, জাতীয়তাবাদী মুসলিম, হিন্দু মহাসভা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং ট্রেজারী বেঞ্চ আলোকিত করে বসলেন হোম মেম্বার, ডেপুটি হোম মেম্বার, সেক্রেটারী, মন্ত্রিগণ ইত্যাদি। সন্ত্রাসবাদীরা ভগৎ সিং-এর মতো পরিষদে বোমা নিক্ষেপ করতে পারে আশঙ্কায় সদস্যগণের নিরাপত্তার ভার দেওয়া হলো পুলিশ কমিশনার টেগার্টের ওপর। শুধু তাই নয়, সাদা পোশাকে আই বি ও এস বি-র কর্ত্তারাও সন্ত্রাসবাদীদের তল্লাশে তৎপর হয়ে উঠলেন। দর্শকদের প্রবেশ করতে দেয়া হবে বটে, কিন্তু দেহ তল্লাশীর পর।

১৯৩৩ সালের ১৭ই মার্চ্চ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন সুরু হলো বেলা দু'টোয়।

স্পীকার হিমাংশু আইন পরিষদ কক্ষে প্রবেশের প্রাক্কালে সেক্রেটারী পুষ্প চাটার্জী গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন : Gentlemen, Mr. President.

সদস্যেরা উঠে দাঁড়ালেন। স্পীকার আসন গ্রহণ করবার পর তারা উপবেশন করলেন। স্পীকারের আদেশে এবার সুরু হলো interpellations অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্নগুলি যথারীতি বিভিন্ন দলের নেতা সাহিত্য সভার কাছে পূর্ব্বেই পৌঁছে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন দল ও সরকারী দল মনোনীত হবার পর প্রশ্নগুলো হোম মেম্বার রাখাল ঘোষের হাতে দেয়া হয়েছিল।

প্রথমেই প্রশ্ন করবেন মুসলীম লীগের নেতা মতি সিং। যেমন বার্ণিশহীন আবলুসের মতো কালো, তেমনি অস্থিচর্ম্মসার দেহ। এরই ওপর তিনি বারো আনা দামের লুঙ্গি পরেছেন ও মাথায় জিন্না টুপী ও গালে কৃত্রিম দাড়ি এঁটেছেন। হাতে করে এনেছেন কিচেন ম্যানেজারের কাছ থেকে চেয়ে একটি কদু!

বিচিত্র সুরে কোরআনের একটা বয়াৎ উচ্চারণ করে তিনি প্রশ্ন করলেন : হোম মেম্বার মহোদয় দয়া করিয়া জানাইবেন কি সেক্রেটারীয়েটে গেজেটেড অফিসারের পদে শতকরা কতজন মোছলমান নিযুক্ত আছেন ?

রাখাল ঘোষ জবাব দিলেন : শতকরা ৮ জন।

—গভর্ণমেণ্ট এই সংখ্যা বৃদ্ধির কথা চিন্তা করিয়াছেন কি ?

—উপযুক্ত প্রার্থী পাইলেই চিন্তা করা হইবে।

চীফ হুইপ ধীরেন সোম অতিরিক্ত প্রশ্ন করলেন : উপযুক্ত প্রার্থীর জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় কি ?

হোম মেম্বার এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না। দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন না।

এরপর দাঁড়ালেন অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা নিবারণ দত্ত। উস্কো-খুস্কো চুল, ছেঁড়া খদ্দরের পাঞ্জাবি গায়ে, সারা মুখে বসন্তের দাগ, চোখে পুরু কাঁচের চশমা। Depressed ও Oppressed class-এর মুখপাত্র বার-কয়েক কেসে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে প্রশ্ন করলেন মাদ্রাজী উচ্চারণে ইংরেজী ভাষায় : Will the Hon'ble member in charge of Home (Police) Department please state the reason why all scheduled caste inhabitants of the village of Ratangarh in the district of Midnapur had to leave the village leaving behind their belongings ?

মন্ত্রী সুধীন সরকার তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন : Only a few have left for personal reasons.

—Is it not a fact that a caste Hindu Zamindar persecuted them mercilessly ?

—No.

—Oh, the Depressed and Oppressed class !—বলে অনুন্নত দলের দরদী নেতা একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বসে পড়লেন।

এবারে প্রশ্ন করবেন কংগ্রেসী দল অর্থাৎ পরিষদে শক্তিশালী বিরোধী দল। দলের মুখপাত্র কমরেড কুশা গান্ধী ক্যাপ মাথায় দিয়ে এসেছেন। হাঁটু অবধি মোটা খদ্দর, খালি পা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গায়ে জামা নেই, শুধু চাদর আর গলায় মোটা ময়লা যজ্ঞোপবীত।

প্রশ্ন : গভর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া বলিবেন কি, বর্তমানে বাংলায় কতজন বিনা বিচারে আটকবন্দী আছেন ?

জবাব : ৩২৫৮ জন।

প্রশ্ন : গ্রামে ও গৃহে অন্তরীণদেরও কি ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে ?

জবাব : আজ্ঞে হা।

—অনির্দিষ্ট কালের জন্য ইহাদের আটক রাখিবার কারণ কি ?

—কারণ, প্রাপ্ত কাগজপত্র হইতে গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস করিবার সঙ্গত কারণ দেখা দিয়াছে যে, ইঁহারা এমন সব প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সদস্য, যাহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে হিংসামূলক পন্থায় আইন ও শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত এই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধন করা।

বিরোধী পক্ষ থেকে 'শেম শেম' ধ্বনি শোনা গেল।

কমরেড কৃশা প্রশ্ন করলেন : কি কি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে গভর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া তাহা জানাইবেন কি ?

জবাব দিলেন হোম মেম্বার : না। জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।

আবার হল্লা সুরু হলো। সরকারী দল 'হিয়ার হিয়ার' করে উঠতেই বিরোধী দল খ্যাকশিয়ালের ডাক ডাকলো। দর্শকদের মধ্যেও গণ্ডগোল সুরু হলো। স্পীকার হিমাংশু আইন হাতুড়ি পিটলেন : অর্ডার অর্ডার।

হিন্দু মহাসভার একজন সদস্য নাক ডাকিয়ে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছিলেন। বৈধতার প্রশ্ন তুলে মুসলীম লীগের ডেপুটি লীডার অনন্ত সরকার স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। স্পীকার এই প্রশ্ন বাতিল করে দিয়ে বললেন : সংবিধানে নিদ্রা সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই সুতরাং পরিষদ গৃহে অধিবেশন চলতে থাকাকালে নিদ্রা আইনবিরুদ্ধ বলা যায় না।

আবার প্রশ্ন করলেন কংগ্রেসী দলের নেতা কমরেড কৃশা : ইহারা ডাকাতি, নরহত্যা, বোমাপ্রস্তুত প্রভৃতি অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন বলিয়া গভর্ণমেণ্ট মনে করেন কি ?

হোম মেম্বার জবাব দিলেন : তাহা প্রকাশিতব্য নয়।

প্রশ্ন : গভর্ণমেণ্ট কোন্ কোন্ সূত্রে এই সব সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন ? তাহার মধ্যে সবগুলিই কি বিশ্বাসযোগ্য ?

জবাব : জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারি না।

আবার 'হিয়ার হিয়ার', 'শেম শেম', হল্লা, চীৎকার ও অবশেষে স্পীকারের হাতুড়ির ঘা।

ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন যখন এইভাবে পূর্ণোদ্যমে চলছে, বাংলা দেশের বিপ্লবীরা তখন কিন্তু নীরব ছিল না। গোপনে তারা বোমা ও রিভলভার প্রস্তুতে রত। মাণিকতলায় নয়, কিচেনের কাছে আমতলায় ছাঁচ তৈরী করে রিভলভার তৈরী করছেন টিটু নাহা। এস বি দারোগা মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এই সংবাদ এনে পৌছে দিলেন পুলিশ কমিশনার দ্বিজেন গাঙ্গুলীর অফিসে। ব্যস, অমনি চললো একদল সশস্ত্র সিপাই, তল্লাশী হলো, কিন্তু আপত্তিকর পাওয়া গেল না কিছুই। পরিষদ কক্ষে তবুও প্রবেশের ব্যাপারে কড়াকড়ি বাড়িয়ে দেয়া হলো। দু'জন সার্জ্জেন্ট পাঠিয়ে দেয়া হলো স্পীকারের দেহরক্ষী হিসেবে আর প্রবেশ-দরজায় দাঁড়ালো চারজন।

বৃটিশ রাজত্বে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকতে পারে কি ?······

এবার স্পীকার আহ্বান জানালেন ডেপুটি হোম মেম্বার প্রভাত নাগকে তাঁর প্রস্তাব পরিষদে পেশ করবার জন্য।

প্রভাত নাগ উঠে দাঁড়ালেন। সুন্দর চেহারা, চশমা চোখে, তার ওপর সাহেবী পোশাক। স্বভাবতঃই তিনি সুরু করলেন ইংরেজীতে : I am just coming from my home at London. When I had been there I met Mr. Ramsey Macdonald—অর্থাৎ লণ্ডনে থাকাকালে ম্যাকডোনাল্ডের মেয়ের বিয়েতে একটি ভোজসভায় আমি নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে যখন তাকে Communal Award সম্বন্ধে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, জানাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম, তখন সে স্পষ্টই আমায় বলেছিল, ভারতে অসংখ্য সম্প্রদায়, সংখ্যাতীত তাদের ভাষা, একেবারে পরস্পরবিরোধী তাদের রীতিনীতি, আচারব্যবহার। সেখানে এক সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের লোকের হুঁকোতে তামাক খায় না। সুতরাং সম্প্রদায়গত অধিকারের কথা ভারতে অবশ্যই বিবেচ্য! ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর কল্যাণসাধনের যে পবিত্র দায়িত্ব বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেছেন, তা পালন করতে হলে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের। ······এমনিভাবে প্রাঞ্জল ইংরেজী ভাষায় মাঝে মাঝে হাস্যরসের সৃষ্টি করে

ডেপুটি হোম মেম্বার প্রভাত নাগ চমৎকার একটি বক্তৃতা দিয়ে শেষ দিকে গদগদ ভাষায় বললেন : এইজন্যই এসেছে এই সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ। ভারতীয় সম্প্রদায়গুলি নিজেরা আলাপ আলোচনা করে যখন কোনোও মীমাংসায় আসতে পারলো না, তখন অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে, নেহাৎ অনিচ্ছা-সত্ত্বেই ম্যাকডোনাল্ডকে এই শুষ্ক ও নীরস কর্ত্তব্য পালন করতে হয়েছে! ভারতবাসীর জন্য তার দরদ সীমাহীন !

Oppressed ও Depressed class-এর নায়ক নিবারণ দত্ত তাঁকে সমর্থন করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। বরিশালীয় বাংলা ও মাদ্রাজী ইংরেজী মিলিয়ে তিনি বারবারই অনুন্নত সম্প্রদায়ের ওপর বর্ণহিন্দুদের অসংখ্য অত্যাচারের কথা বর্ণনা করলেন এবং একমাত্র এই Communal Award যে সেই অত্যাচার রোধ করতে পারে, তাও ব্যক্ত করতে ভুললেন না।

এমনিভাবে প্রত্যেক দলই নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করবার পর যখন হিন্দু মহাসভার নেতা গোপাল গুপ্ত সপুষ্প শিখা দুলিয়ে, পৈতা দেখিয়ে, বৃহদাকার গীতা আন্দোলন করে, হাত পা ছুঁড়ে, একেবারে খাস ফরিদপুরী গ্রাম্য ভাষায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট, মুসলীম লীগ, অনুন্নত সম্প্রদায়, এমন কি স্পীকারকেও ম্লেচ্ছ নামে আখ্যাত করে গালিগালাজ সুরু করলেন, অধিবেশন তখন শুধু যে জমেই উঠলো তাই নয়, অতিদ্রুত তা এগিয়ে চললো ক্লাইমেক্সের পানে।

বাধা এলো চতুর্দ্দিক থেকে, বৈধতার প্রশ্ন, অধিকারের প্রশ্ন, অবমাননার প্রশ্ন উঠলো বহুবার। কেউ টেবিল চাপড়াতে লাগলেন, কেউ বেড়ালের ডাক ডাকতে লাগলেন, কেউ শুধু চীৎকারই করতে লাগলেন ; কিন্তু সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করে, বেদ ও পুরাণের কথা তুলে, চণ্ডী ও গীতার শ্লোক উচ্চারণ করে, যাজ্ঞবল্ক্য, অষ্টাবক্র, ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি মুনিদের অমর জীবনীর পর্য্যালোচনা করে হিন্দু মহাসভার যোগ্যতম নেতা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপাল গুপ্ত, তর্কচূড়ামণি, স্মৃতিতীর্থ, সার্ব্বভৌম, বিদ্যাবাগীশ ও ন্যায়রত্ন মহাশয় অগ্নিক্ষরা ভাষায় যে বক্তৃতা দিলেন—

এমন সময় অকস্মাৎ এক অঘটন ঘটে গেল! পুলিশ কমিশনারের সতর্ক প্রহরা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে কীভাবে একজন বিপ্লবী গোপনে রিভলভার নিয়ে প্রবেশ করে ভালো মানুষটির মতো দর্শকের আসনে বসে সুযোগের

অপেক্ষা করছিল। গোপাল গুপ্তকে থামিয়ে দেবার জন্য যেই হোম মেম্বার রাখাল ঘোষ উঠে দাঁড়িয়ে পার্লিয়ামেণ্ট-বিরোধী ভাষায় shut up বলে চীৎকার করে উঠলেন, অমনি সম্মুখে লাফিয়ে পড়ে সেই বিপ্লবী দস্ করে রিভলভার বার করে পর পর তিনবার গুলীবর্ষণ করলো। আমতলায় তৈরী রিভলভারের ট্রিগার এখানে বিপ্লবীর আঙ্গুলে টানলেও শব্দ হলো তার পাশের টালি ব্যারাকে। চাবির মধ্যে দেশলাইয়ের বারুদ পুরে টিটু নাগ যথাসময়ে আওয়াজ করে দিলেন। কিন্তু তাহলে কি হবে? রাখাল ঘোষকে যে মরতেই হবে, নইলে অমল মজুমদার শহীদ হবে কি করে? অতএব হোম মেম্বার Oh my God! Oh my Virgin Mary! বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। মুসলীম লীগের নেতা মাত সিং ইয়া আল্লাহ্ বলে দাড়ি এবং কড় ফেলে রেখেই পলায়ন করলেন। Depressed ও Oppressed classএর নেতা নিবারণ দত্ত টেবিলের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। গোপাল বিদ্যাভূষণ মহাশয় উন্মুক্ত কাছা কিছুতেই আর খুঁজে পেলেন না। হৈ-হৈ, চীৎকার ও ছুটোছুটির মাঝে বিপ্লবী পকেট থেকে পটাসিয়াম সায়নেড-এর প্যাকেট বার করে মুখে ঢেলে দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো শহীদ হয়ে এবং সেই সময় অকস্মাৎ বিউগলধ্বনির মাঝে সশস্ত্র সিপাইদল নিয়ে গট গট করে মার্চ করে প্রবেশ করলেন স্বয়ং পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট অর্থাৎ দ্বিজেন গাঙ্গুলী খোলা রিভলভার হাতে নিয়ে।

হুকুম হলো: Hands up everybody or I will shoot.

সকলেই গৌরাঙ্গের পোজ-এ দাঁড়িয়ে পড়লেন।

আটাশ

এমনিভাবে বন্দীজীবনে মাঝে মাঝেই ক্লাইমেক্স সৃষ্টি করা হতো একঘেয়েমি দূর করবার জন্য। এই একঘেয়েমিটা একটা দুরারোগ্য ব্যাধির মতো। নানাবিধ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দিলেও গভর্ণমেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে বপন করতেন একঘেয়েমির বীজ। হয়তো তা রাজসিক একঘেয়েমি। চারবেলা নবাবী খানা আর দায়িত্বহীন অফুরন্ত অবসর, প্রতিদিন একই লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, একই শয্যায় শয়ন—এই-যে অনড় একঘেয়েমি, এর কটূ প্রভাব প্রথমে আচ্ছন্ন করে সারা মন, মনকে পাণ্ডুর করে দিয়ে নেমে আসে সারা দেহে, প্রতি শিরা-উপশিরায়, প্রতি রক্তকণিকায়, অস্থিমজ্জায়। ব্যস্, তাহলেই সিদ্ধ হলো গভর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য। মরফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে অকেজো করে দিল তাজা ঘোড়াকে!......

এই অভীষ্ট সাধনে গভর্ণমেন্ট যে একেবারে ব্যর্থকাম হয়নি, তার প্রমাণ রবি লাহিড়ী। একদিন দুপুরে খেতে যাবো, এমন সময় শুনলাম, সাদার্ণ ব্যারাকে রংপুরের রবি লাহিড়ী নাকি খেতে যাবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে অকস্মাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেছে।

খেতে আর যাওয়া হলো না। এসে দেখলাম, দেবেশ ও বিমলবাবু মাথায় হাওয়া করছেন কপালে জলপটি দিয়ে।

রবি লাহিড়ী শিবিরের সুন্দর স্বাস্থ্যবান দেহধারীদের অন্যতম। অনেকবার সে পেশী নিয়ন্ত্রণ দেখিয়েছে বাইরে রংপুর শহরে এবং শিবিরে। বন্ধুরা সম্প্রতি কোনো অসুখের কথা জানে না বললেন। ভালো হয়ে রবি লাহিড়ী বললো যে, ক'দিন থেকে কেমন যেন দাঁড়ালেই হঠাৎ তার মাথাটা ঘুরে যায় আর চোখে অন্ধকার দেখে!

কিন্তু কেন? কেন এমনি হলো? কোনো সদুত্তর সে দিতে পারলো না, আমরাও কিছুই অনুমান করতে পারলাম না।

এমনি করে ফরিদপুরের পরেশ রায় একদিন পড়ে গেলেন। আর একদিন সত্য ব্যানার্জ্জীর দুই হাঁটুতেই বাতের ব্যথা দেখা দিল। এবং সর্ব্বশেষ একদিন রবি বসুর গলা দিয়ে ঝলকে ঝলকে উঠতে লাগলো রক্ত!

ছুটে গেলাম। দেখলাম, শয্যায় লম্বমান তার বলিষ্ঠ দেহ। কিন্তু এখন আর দেহ নেই মনে হলো, যেন দেহের একটা বিরাট খাঁচা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

থুথু ফেলার পাত্রে রক্ত, দু'কসেও তার শুষ্ক চিহ্ন দেখা গেল। ডাক্তার এলেন, দেখলেন, পরীক্ষা করলেন, বললেন, টি-বি at galloping stage!

বুঝতে পারলাম, রবির আর জীবনের আশা নেই। তথাপি টবিনের সঙ্গে পরামর্শ করে সেদিনই পাঠানো হলো তাকে শিউড়ি জেলে চিকিৎসা ও আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য। মুখে আশার কথা গালভরা ভাষায় প্রকাশ করলেও মনে মনে দারুণ উৎকণ্ঠায় একেবারে বিচলিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু সৌভাগ্য রবির, সেখানে অনেকটা ভালো হয়ে উঠছে বলে মাসখানেক পর সে নিজেই পত্র লিখেছে দেখলাম।

কোনো নির্দ্দিষ্ট অসুখই আমায় ধরেনি সত্যি, তথাপি কী জানি কেন, ওজন আমার নিয়মিতভাবে কমে যাচ্ছিল। একঘেয়েমি রোগ আমায় ধরতে পারেনি জানি। খেলা-ধূলায়, ব্যায়ামে, সর্ব্বপ্রকার সভা-সমিতিতে সর্ব্বত্রই আমি যোগদান করতাম এবং আমার অংশটি খুব অকিঞ্চিৎকর ছিল না কখনো। তথাপি, কী জানি কেন, ওজন আমার কমে যেতে লাগলো। স্লো পয়জনের কথা কোনো কোনো বন্ধু বললেন বটে, কিন্তু তরিতরকারী ও অন্যান্য খাদ্যবস্তু ঠিকাদার এনে অফিসে পৌঁছে দেবার পরই তো আমাদের ম্যানেজার সে সব ওজন করে ভেতরে নিয়ে আসেন, তাতে বিষ মেশাবার সুযোগ ওরা পাবে কোথা থেকে? আর বিষ মেশালে তার প্রক্রিয়া কি শুধু বাছা বাছা জনকতকের মধ্যেই দেখা যাবে?

অবশ্য এজন্য চিন্তিত হইনি আদৌ। কারণ জনকতক বন্ধুর যে যুক্তিহীন ও দুঃখজনক পরিণতি দেখলাম, তার সঙ্গে তুলনায় আমার কোনো কিছুই হয়েছে বলে স্বীকার করা যায় না। একদিন ডাঃ সরকারকে নিভৃতে পেয়ে সাধারণভাবে রাজবন্দীদের স্বাস্থ্যহানির কথা তাঁকে বললাম এবং টবিন চাচা নিজে বা কোনো এজেন্ট মারফৎ আমাদের খাদ্যে যে বিষও মিশিয়ে দিতে পারেন, এমনি একটা অভিমত ঝপ্ করে ছেড়ে দিয়ে ডাঃ সরকারের ভাবগতি লক্ষ্য করতে লাগলাম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। না, দেখলাম, আমার আশঙ্কা অমূলক। বেচারা কিছুই জানে না এবং এমনি নৃশংসতা যে হতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারে না।

তবে ডাঃ সরকার রবি লাহিড়ী, পরেশ রায় প্রভৃতির এমনি আকস্মিক দুর্বলতা ও সাধারণভাবে সবার ওজন হ্রাস ও কারুর কারুর এই বয়সেই বাত-ব্যাধি আক্রমণের কথা উল্লেখ করে এর পশ্চাতে একটি কারণের কথা ব্যক্ত করলেন এবং নানাভাবে যুক্তি দিয়ে তা সমর্থন করতে লাগলেন। সে দিন অবশ্য তাঁর যুক্তি শুনে খুব হেসেছিলাম।

কঠোর ব্রহ্মচর্যের বিরুদ্ধে ডাঃ সরকার সেদিন কঠোরতম অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই যে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা, তার উল্লেখ করে তিনি বললেন: ভগবান আছেন কি নেই, সে প্রশ্ন নয়, দ্বিজেনবাবু! এটা স্বতঃসিদ্ধের মতো সত্য যে, প্রকৃতি একটি বাঁধা-ধরা নিয়মে চলেন, একটি ছক-কাটা পথেই তাঁর আনাগোনা। এই প্রকৃতিই নরের পাশে এনে দিয়েছেন নারী এবং নারীর পাশে নর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাতে কোনোদিনই না দেউলে হয়ে যায়, শ্মশান হয়ে যায়, সেজন্য এই নর-নারীর মিলনে যেমন আঁতুড় ঘর হেসে ওঠে, তেমনি একদিন ফুলঝরার মতো তাদের ঝরে পড়তে হয় শ্মশানে। এই যে নিয়ম, আপনারা এই নিয়মের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন অহর্নিশ! কিন্তু দ্বিজেনবাবু, প্রকৃতির বিরোধিতা করলেই তো জয়লাভ অবধারিত বলে মেনে নেয়া যায় না। তাই কঠিন ব্রহ্মচর্য্য যাঁরা পালন করেন, অর্থাৎ আপনারা, তাঁদের অমনি সব যুক্তিহীন ব্যাধিতে কষ্ট পেতে হয়। Biological factকে অস্বীকার করলে ভূগর্ভের উত্তাপে জল পড়লে যা হয়, তাই হবে! সে বাষ্প একদিন উত্তাল হয়ে উঠে কোথা না কোথা দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে পড়বেই। একদিন কায়রোতে—

বলেই ডাঃ সরকার আবার তাঁর সেই মধ্য প্রাচ্যের অভিবস্তু ও থ্রিলিং অভিজ্ঞতার ইতিহাস খুলে বসলেন এবং আগামী যুদ্ধ কবে ও কার কার সঙ্গে বাধতে পারে, এবং তাহলে জয়লাভের সম্ভাবনা কার বেশী, সে সম্বন্ধে নানা তথ্য ও গবেষণামূলক এক দীর্ঘ বক্তৃতা সুরু করলেন! আমি বাধ্য হয়ে একটা ছুতো করে রণে ভঙ্গ দিলাম। ঘরে এসে হাসলাম প্রাণ ভরে। নরের পাশে যে নারী রেখেছেন প্রকৃতি দেবী, তা তো জানি; রেণু, লতিকা, বীণা ও অশোকার মধ্য দিয়ে তা মর্ম্মে মর্ম্মে জেনেছি; কিন্তু ওদিকে ভালো করে দৃষ্টিক্ষেপ করবার অবসর কোথায় আমাদের?

আমাদের পথ চলেছে যেদিকে, সেদিকে শুধু ময়না কাঁটার ঝাড় আর

বাবলা গাছের সারি। পথে ছড়ানো মরুভূমির বালি, উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে সেই তপ্ত বালুকারাশি এলোপাথাড়ি উড়তে থাকে। পথের ধারে নেই কোনো কাজলা দীঘি, নেই মানস সরোবর! সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখতে পাই বালির সমুদ্র অতি দূরে গিয়ে দিকচক্রবালের সঙ্গে মিশে গেছে। সেই পথে আমাদের যাত্রা! কখনো আকাশে শুনতে পাই কালবৈশাখীর রণহুঙ্কার, কখনো শীতের ঘন কুজ্ঝটিকা ভুলে পথে অনতিক্রম্য বাধা, কখনো নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার চতুর্দ্দিক থেকে এসে গ্রাস করে পাইথনের মতো।......তবুও আমরা চলেছি সেই পথে নিশিদিন, দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন। কী আমাদের লক্ষ্য, কোথায় আমাদের গন্তব্য স্থান, কবে শেষ হবে আমাদের এই অবিশ্রাম চলা, আদৌ জানিনে তা। কিন্তু এই চলার পথে যাত্রা করে ভুলে গেছি আমরা, কোথায় ফোটে শিউলি ফুল, কোথায় শোনা যায় ভ্রমরার গুনগুনানি, কোন্ কালো চোখের কোণে খেলে বিদ্যুৎ, কোন্ কোমল হৃদয়ে ডাকে ভাবাবেগের বন্যা!......

নারীকে আমরা করে চলেছি সম্পূর্ণ অস্বীকার!

অকস্মাৎ একদিন হুকুম এল যতীশ গুহকে সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে যেতে হবে অফিসে। বুঝলাম তাঁকে এবার নিয়ে যাচ্ছে হয় হিজলীতে, না হয় বক্সা দুর্গে। বলতে গেলে এই প্রথম বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্যদের প্রতি কর্তৃপক্ষের আঘাত।

কিন্তু বিস্মিত হলাম তাঁকে দল বেঁধে বিদায় দিতে গিয়ে। গভর্ণমেন্ট তাঁকে একেবারে বিনাসর্ত্তে মুক্তির আদেশ দিয়েছেন। দূরে দাঁড়িয়ে কিছুতেই বিশ্বাস হলো না আমাদের। কিন্তু যতীশবাবু হাসিমুখে একখানা দশ টাকার নোট আন্দোলিত করে দেখালেন। এবার আর অবিশ্বাস করবার কিছু রইলো না। যতীশবাবুর হাতে টাকা দিয়েছে মানেই হচ্ছে তাঁর যাবতীয় ভাড়া তাঁকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন তিনি মুক্ত!

মুক্ত! কথাটা কেমন যেন নতুন শোনাতে লাগলো। আর খানিকটে বেসুরোও বটে! আর কেউ নয়, স্বয়ং যতীশ গুহ। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের কতকগুলি Action-এর পরিকল্পনাই যে শুধু তাঁর ছিল, তা নয়, কয়েকটাতে

সক্রিয় অংশও গ্রহণ করেন। আমার এই আখ্যায়িকাতেই পরে আবার এই যতীশ গুহের উল্লেখ করতে হবে। তখনই জানা যাবে, গভর্ণমেন্ট এই লোকটিকে অকস্মাৎ ঐভাবে মুক্তি দিয়ে কী মহাভ্রমই না করেছিলেন এবং সেই ভুলের কী মর্ম্মান্তিক পরিণামই না তাঁদের হজম করতে হয়েছিল নীরবে !…

এই ধরনের অদ্ভুত মুক্তির পশ্চাতে গোয়েন্দা বিভাগের কী গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারতাম আমরা। মিহি জালে ছেঁকে ধরবার মতো প্রথমতঃ গোয়েন্দা বিভাগ দলে দলে গ্রেপ্তার করতো। স্বভাবতঃই তখন এই বিশেষ এলাকায় বিপ্লবীদের তৎপরতা ব্যাহত হতো। নিশ্চয়ই দু'একজন, যারা জাল থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে, তারা ভাঙ্গা আসর আবার জমিয়ে তোলবার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। তাই কিছুদিন অতিবাহিত হলে নেতৃস্থানীয় একজনকে অকস্মাৎ একেবারে বিনাসর্তে মুক্তি দিয়ে অত্যন্ত কঠোরভাবে তাঁর ওপর নজর রাখা হতো গোপনে—তিনি কোথায় কোথায় যান, কে কে আসেন তাঁর ওখানে, কি কি কথা হয়, এসব দেখবার ও জানবার চেষ্টা করা হতো। ফলে, হয়তো সন্ধান পাওয়া যেত আরও কিছু বিপ্লবীর। তখন আবার জাল ফেলা হতো।

কিন্তু আমরা এসব তথ্য বেশ জানতাম বলেই সমঝে ও সামলে চলতাম সর্ব্বদাই। যতীশ গুহ আবার সেই সমঝে ও সামলে চলবার দলের মুখপাত্র। সুতরাং খুশী হলাম মনে মনে গভর্ণমেন্টের এই নির্ব্বুদ্ধিতায়। আমরা কেউ দীর্ঘকাল বাইরে যেতে না পারলেও একা যতীশ গুহই যে বিপর্য্যয় সৃষ্টি করতে পারবেন, সে বিশ্বাস আমাদের আছে।

যতীশ গুহ বিদায় নেবার পরই চললো নানা গবেষণা ও বিতর্ক। গভর্ণমেণ্ট নাকি ধীরে ধীরে মুক্তি দেবার নীতি গ্রহণ করেছেন। ব্যারাকে ব্যারাকে এই বিষয়ে চললো ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা। কিন্তু হায়, শিকে ছিঁড়লো বোধহয় ঐ একটি বিড়ালেরই ভাগ্যে !

টবিন-গিরিজা এ্যাণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে তেমন আর ঠোকাঠুকি নেই। মোটের উপর একভাবে কেটে যাচ্ছে বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি। বোধহয়, শান্ত আবহাওয়াকে কোনো কূটনৈতিক কারণে আরও আনন্দময় করে তোলবার উদ্দেশ্যেই একদিন বিকেলে অকস্মাৎ দেখলাম এসেছে শিবিরের মধ্যে বেড়াতে চাকর সঙ্গে করে দু'টি ৬।৭ বছরের ফুটফুটে মেয়ে। শুনলাম দু'টি মেয়েই গিরিজার।

কিন্তু অনেকক্ষণ পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ওদের পানে। অনেক কাল পর যেন নতুন জিনিষ দেখতে পেলাম। দুনিয়ায় যে শুধু আমরা নেই, এরাও আছে, সেদিন যেন আবার নতুন করে অনুভব করতে শিখলাম। সৌন্দর্য্যের স্কেল দিয়ে মেপে দেখলে হয়তো মেয়ে দু'টির নাক মুখ চোখে অনেক গলদ আছে, রূপবতীর সংজ্ঞার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলাতে গেলে কিংবা এদের প্রতিটি অবয়ব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চুলচেরা পরীক্ষা করে দেখতে গেলে হয়তো এরা আদৌ সুন্দরী নয়, তাই প্রমাণিত হবে। কিন্তু বাস্তব পরীক্ষার কথা বাদ দিয়ে আমাদের নীরস শুষ্ক মনে অকস্মাৎ গোলাপ ফুলের মতো দলের পর দল মেলে ফুটে উঠে এই ছোট মেয়ে দু'টি যে আনন্দের শিহরণ এনে দিল, সত্যিই তা অনির্ব্বচনীয়!

আমাদের জগতে যেন নতুন জিনিষের অকস্মাৎ আমদানী হয়েছে, যা আমাদের অপরিচিত ও অবজ্ঞাত!······দু'চারটে কথা বলাবলির মধ্য দিয়ে সহজেই আমরা ওদের দু'জনকে আপন করে নিলাম এবং তারপর সবাই মিলে সমবেতভাবে এমনি আদর সুরু করে দিলাম যে, প্রায় এক ঘণ্টা পর সুধাংশুবাবু ও নৃপেন পাল মেয়ে দু'টিকে আমাদের আদরের কবল থেকে একরকম উদ্ধার করে নিয়ে চাকরকে দিয়ে একেবারে শিবিরের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন এবং বারণ করে দিলেন, যেন আর কোনোদিন এদের না নিয়ে আসে।

সত্যিই, একেবারেই যেন ভুলে গেছি বাইরের কথা, বাড়ীর কথা। প্রায় দেড়বছর হলো রেণুর বিয়ে হয়ে গেছে। যতই সে আমার জন্য ভাবুক, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে সেখানকার পরিবেশে ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে নিতে আদৌ ভুল হয় না মেয়েদের। তাই মনের দরদ এখন স্থানান্তরিত হয়েছে চিঠির ভাষায়। মাঝে মাঝে এখনো আসে বটে, তবে হয়তো এরপর আর আসবে না।

ছোট বোন হেনার বিয়ে হয়ে গেছে। এখান থেকেই খানকতক বই অবশ্য পাঠিয়েছি উপহারস্বরূপ, কিন্তু বই দিয়ে যেতে না পারার দুঃখ কি আর ভোলা যায়? পাড়ার ছেলেদের কথাও মনে পড়লো। সর্ব্বকার্য্যে যারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতো আমারই ওপর এবং নির্ভর করে পরম নিশ্চিন্তে যারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতো সাফল্য একেবারে নিশ্চিত জেনে, আজ তারা না জানি কত অসহায় হয়ে পড়েছে!

এমনি করে গ্রামের প্রত্যেকটি লোকের কথা আমার মনে ভেসে উঠলো। মনে হলো বহুদিন নয়, বহুকাল এদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। কে জানে, কবে, কতকাল পরে আবার তাদের সুখদুঃখের মধ্যে ফিরে যেতে পারবো?

কিন্তু বহরমপুর বন্দীশিবিরে সতীশ গুহ চলে যাবার কিছুকাল পর দ্বিতীয় যুগান্তরকারী সংবাদ এল, বরিশালের আরও দু'জন বন্দীসহ আমার প্রতি স্বগৃহে অন্তরীণের আদেশ।

স্বগৃহে বা গ্রামে অন্তরীণের আদেশকে কোনোদিনই আমরা ভাল চোখে দেখতাম না। কারণ এই অন্ধস্বাধীনতাকে নানাবিধ বিধি নিষেধ দিয়ে এমনি করে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয় যে, যে কোনো সময়ে একেবারে অনিচ্ছায়, এমনকি অজানতেও তার কোনোটা ভঙ্গ হয়ে যাবার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। তারপর বন্দীশিবিরে দু'একজন দিবাকর সেনগুপ্ত বন্দীর ছদ্মবেশে এসে আমাদের গোপন সংবাদ গোপনে কর্তৃপক্ষের কর্ণে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতে পারে বটে, কিন্তু গ্রামে বা স্বগৃহে চৌকিদার, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট থেকে সুরু করে গ্রামের প্রত্যেকটি লোকই সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অনায়াসে বিবেক বিক্রয় করে দিতে পারে।

তবে এ সত্যও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, জেলের মধ্যে যে কর্ম্ম-তৎপরতা একেবারে থাকে স্থগিত, বাইরে গিয়ে বুদ্ধির সঙ্গে, সতর্কতার সঙ্গে তা চালু করা যেতে পারে। বুদ্ধির লড়াইতে পুলিশ চিরকালই পরাজয় স্বীকার করেছে আমার কাছে। তাদের কাছে চিরদিনই আমার চ্যালেঞ্জ ছিল, কোনো ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে পার যদি, কর; ঐ অর্ডিন্যান্স, বিনা বিচারে রাজবন্দী করে রাখা, ও তো তোমাদের দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক। নির্দ্দিষ্ট কোনো অভিযোগ আদালতের সমক্ষে আনতে না পেরে কাল্পনিক সন্দেহবশে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক করে রাখা।

দীর্ঘ সাত বৎসরের বন্দিজীবনে আমার এই চ্যালেঞ্জ যে অটুটভাবে আমি রক্ষা করে চলেছি, এই কাহিনীতেই তার কতকটা আভাস পাওয়া যাবে। সঙ্গে সঙ্গে জানা যাবে, যে কোনো মামলায় জড়িয়ে দেবার জন্য পুলিশ ও আই বি কর্ত্তারাও কী পরিশ্রম ও ষড়যন্ত্রই না করেছিলেন!…

আমার বিদায়ের একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। সর্ব্বপ্রথম আমি বহরমপুর বন্দীশিবির সেনাবাহিনীর জি-ও-সি, তারপর সাহিত্যসভার সম্পাদক, তারপর নাটক, খেলাধুলা, ব্যায়াম ও সর্ব্ব ব্যাপারেই আমার বিশেষ যোগাযোগ ছিল। তাই সংবাদ পাবার দশ মিনিটের মধ্যেই এমনি অনেকগুলো সংক্ষিপ্ত বিদায়-সভার অনুষ্ঠান হলো। অবশেষে খেলার মাঠে গেলাম। সেনাবাহিনী সেখানে ফল্-ইন্ করে আমারই জন্য অপেক্ষা করছিল। মিলিটারী বোর্ডের চেয়ারম্যান পরেশ সান্যাল আমাকে নিয়ে গেলেন। আমি গার্ড অব অনার পরিদর্শন করলাম ও প্রত্যেকটি সৈনিকের সঙ্গে করমর্দ্দন করে বিদায় গ্রহণ করলাম।···

বহরমপুর ষ্টেশনে এসে জানা গেল ট্রেণের একটু দেরী আছে। তাই বিশ্রামাগারে নয়, বাইরে প্লাটফরমে মালপত্রের ওপর বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। নানাবয়সের ও নানাচেহারার অসংখ্য নরনারী চলাফেরা করছে। ষ্টেশনের কর্ম্মতৎপরতা দেখলাম। সবই যেন নতুন মনে হলো। শুধু ষ্টেশন কেন, বাইরের আকাশ, গাছপালা, কর্ম্মমুখর জগতের প্রত্যেকটি নর ও নারীকে একেবারে অভিনব ও অপরূপ মনে হতে লাগলো!······

একদল মহিলা কেন জানিনে বারবারই আমাদের লক্ষ্য করছেন। ওঁরাও যে বহরমপুর শহরের লোক নন, তা সহজেই অনুমান করলাম, নিশ্চয়ই কোনো বন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। উঠলাম কিন্তু আমরা একই ইণ্টারক্লাস বগিতে, তথাপি দৃষ্টিক্ষেপে তাদের আমার সঙ্গে কথা কইবার প্রবল আগ্রহ দেখা গেলেও বোধহয় সঙ্গী আই বি দারোগা ও সশস্ত্র সিপাইদের দেখে তারা ইতস্ততঃ করছিলেন।

কিন্তু গোয়ালন্দে এসে যখন ষ্টীমারেও আমরা একই ইণ্টারক্লাস কামরায় উঠলাম, তখন ওদের মধ্যে বর্ষীয়সা যিনি, তিনি এগিয়ে এলেন।

তুমি কি বহরমপুর থেকে আসছো, বাবা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমরাও ওখানে গিয়েছিলাম আমার ছেলেদের সঙ্গে দেখা করতে। প্রভাত গুপ্ত—প্রভাস গুপ্ত আমার ছেলে।

পদধূলি গ্রহণ করলাম। বললাম: আমি তাঁদের খুব চিনি।

তারপর তাঁরা সবাই আমায় ঘিরে বসলেন এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওখানকার খাওয়াথাকা, সুবিধে-অসুবিধে সম্বন্ধে নানাপ্রশ্ন করতে লাগলেন। স্বগৃহে

অন্তরীণের আদেশ পেয়ে যাচ্ছি শুনে মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেনঃ কী যে করেছ তোমরা, তা আমরা জানিনে, টেরও পাইনে। এমনি কাজ কেনই বা করতে যাও, বাবা? পারবে কি তোমরা ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে?

বললাম: সারা অন্তর দিয়ে আমরা কিন্তু মা তাই বিশ্বাস করি।

মা বললেনঃ বিশ্বাস করতে পার এবং বিশ্বাস রাখা ভাল। কিন্তু তোমরা তো জান না, তোমাদের এমনিভাবে জেলে নিয়ে গেলে মা বাবার মন কতখানি ভেঙ্গে পড়ে? সারারাত আমাদেব ঘুম হয় না। ভাবি, সেখানে কি জানি তোমাদের খেতে দিচ্ছে কিনা, শোবার জায়গা দিচ্ছে কিনা, কি জানি সেখানে তোমাদের ওপর নির্য্যাতন করছে কিনা। এইসব ভাবনাতেই আমাদের আয়ু যায় কমে আর বেঁচে থাকতেও সাধ হয় না।

মায়ের গলার স্বর ভারি হয়ে এল। জবাব আমি দিতে পারতাম, যুক্তি দেখাতে পারতাম প্রচুর, কিন্তু কিছুই করলাম না, কিছুই বললাম না। নীরবে বাংলাদেশের অসংখ্য মায়ের ভর্ৎসনা যেন শুনতে লাগলাম পরম শ্রদ্ধাভরে! .....

গৃহে ফিরে গেলে জানি, আমারও মা এমনিভাবে তিরস্কার করবেন আমায়, কত দুঃখ জানাবেন, এই সর্ব্বনাশা পথ ত্যাগের জন্য কত অনুরোধ জানাবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সারা অন্তর দিয়ে এ বিশ্বাসও রাখি, এই বাংলা দেশের মায়েরাই দামাল ছেলেদের রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়েছেন নিজেদের হাতে সাজিয়ে,—মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন উষ্ণীষ, কোমরে দুলিয়ে দিয়েছেন তীক্ষ্ণধার তরবারী, বক্ষে এঁটে দিয়েছেন বর্ম্ম আর ললাটে এঁকে দিয়েছেন রক্তাক্ত তিলক, তারপর আশিস্ চুম্বন দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন রণক্ষেত্রে। বাংলার বিপ্লবীদের অসামান্য সাফল্যের পশ্চাতে রয়েছে মায়েদেরই নীরব আশীর্ব্বাদ!......

এসে নামলাম সেই লৌহজংএ। তারপর নৌকাযোগে এলাম সেই শ্রীনগর থানায়, সেখানে একটু বিশ্রাম করে সেই পুঁটিমারা খাল দিয়ে এলাম আবার আমাদের গ্রামের সন্নিকটে। মাঝির মাথায় বাক্সবিছানা চাপিয়ে রওনা হলাম গ্রামের দিকে।

গ্রামে প্রবেশের প্রাক্কালে সর্ব্বাগ্রে দেখা হয়ে গেল আমার পুরাতন মাঝি বছিরদ্দি শেখের সঙ্গে। ব্যাটা বিরাট একটি ঘাসের বোঝা মাথায় করে যাচ্ছিল,

দূর থেকে ক্ষেতের আইল ধরে একজন ভদ্রলোককে মালপত্র নিয়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়ালো। তারপর যেই চিনতে পারলো, অমনি বোঝা ফেলে দিয়ে পাগলের মতো ছুটে এল কাছে। মাটিতে একেবারে সটান শুয়ে পড়ে দুই হাতে পদধূলি গ্রহণ করতে লাগলো। বাধা দিলাম, শুনলো না। বলতে লাগলো : আইছেন—আইছেন কত্তা ? হুঃ, কদ্দিন ভাবছি কত্তা কবে আইবো। গেরাম একেবারে খালি হইয়া গেছে। ভালোই লাগে না আর কোনো কিছু।—হেই মাঝি, দে ব্যাটা দে, বাক্সবিছানা আমার মাথায় তুইলা দে।

বলে সে মাঝিকে আর কোনো কথা বলতে না দিয়ে বাক্স ও বিছানা একরকম কেড়ে মাথায় তুলে নিয়ে অবলীলাক্রমে ছুটে চলে গেল গ্রামে ও আমাদের বাড়ীতে সুসংবাদটা পৌঁছে দিতে।

ধোপাবাড়ী ডাইনে রেখে প্রবেশ করলাম পাড়ায়। তারপর বাঁদিকে পড়লো গিরিশ কাকার বাড়ী, তারপর হেরম্বদা'র বাড়ী, তারপরই বিলাস কাকার সেই বৈঠকখানা, গ্রেপ্তারের প্রাক্কালে যেখানে ছোট-খাটো একটা সভা হয়েছিল। ডানদিকে ঘুরে একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে আমাদের বাড়ী। দেখলাম, আমায় অভ্যর্থনা জানাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন মা, বাবা, বৌদিরা, ছোট ভাই রঙ্গলাল !

বছিরদ্দি শেখ অনর্গল ভাষায় তখনো বক্তৃতা করে কি তাদের বোঝাচ্ছে।

সেইদিন থেকে সুরু হলো স্বগৃহে অন্তরীণের জীবন।···

ঊনত্রিশ

যাঁরা সঠিক সংবাদ রাখেন না, স্বগৃহে অন্তরীণের কথা শুনেই হয়তো তাঁরা উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন। এই ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন তাঁরা, থাকুক না, তবুও তো জেলে নয়, বরং ঘরে বাবা, মা, ভাই, বোন আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর সা[illegible] [illegible] মিলেছে। নেই এখানে [illegible] [illegible] [illegible]দের [illegible] [illegible] বাড়ি উঠতে বসতে খাবার থালার দোসর ও মশা [illegible] [illegible]। নেই [illegible] সাহেবের উর্দিধারী অসভ্য আচরণ, [illegible] নামে নেই [illegible] অফিসারদের অকথ্য গালাগালির ব্যবহার, নেই গুনতি আর লক-আপের [illegible] [illegible]।

[illegible] বসে এখানে বৌ-ছেলেদের সঙ্গে গল্প করেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, জ্যোৎস্নারাতে আমাদের ছাদে জমানো যাবে আবার সেই পারিবারিক অন্তরঙ্গ আড্ডা, সারাটা দিন পুকুরের পশ্চিম পাড়ে হিজল গাছের কোণে ছোট ছিপ নিয়ে বসে দিব্যি তোলা যাবে প্রায় প্রতিটানেই পুঁটি, ট্যাংরা, বেলে অথবা পাঁক। স্বভাবতঃই তারা ভাববেন, স্বগৃহে অন্তরীণের সঙ্গে মুক্তির পার্থক্য এ [illegible] [illegible]।

আসলে কিন্তু ভাবুন বন্দীশিবিরের সঙ্গে তুলনায় স্বগৃহে অন্তরীণাবস্থাকে আদৌ প্রীতির চক্ষে দেখতাম না আমরা। প্রকৃতক্ষেত্রেও যে সর্তহীন মুক্তিদানের পূর্বেই শুধু স্বগৃহে এনে কিছুদিন আটক রাখা হতো, তা একেবারেই সত্য নয়। আমার নিজের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে। বরং অসময়ে মুক্তির পশ্চাতে পুলিশের যে নীতি থাকে, স্বগৃহে অন্তরীণ করবার বেলাতেও তাই। অর্থাৎ, বিশেষ কোনো এলাকা থেকে গুপ্ত সমিতির আরও কিছু সদস্যকে মাটির তলা থেকে লোভ দেখিয়ে বাইরে এনে হাতকড়া লাগানোই এর উদ্দেশ্য। অনেকটা, খাঁচার মধ্যে ছাগল পুরে হিংস্র ব্যাঘ্রকে ফাঁদে আটকাবার চেষ্টা। আর এমনই ফাঁদ, চক্রব্যূহের মতো অভ্যর্থনার বেলায় যে সীমাহীন উদার, কিন্তু বিদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত কৃপণ।……

সরকারী অফিসারদের স্বাক্ষরযুক্ত যে হুকুমনামা হাতে দিয়ে স্বগৃহে অন্তরীণের আদেশ জারী করা হয়, তার দুইটি সর্ত এমনি :

এক : স্বগ্রামের সীমানার মধ্যে থাকতে হবে চব্বিশটি ঘন্টা আর সন্ধ্যে ছ'টা থেকে ভোর ছ'টা পর্য্যন্ত থাকতে হবে একেবারে স্বগৃহের চারখানি দেয়ালের মধ্যে।

দুই : কোনো ছাত্র, শিক্ষক অথবা ভিন্ন গ্রামের কারুর সঙ্গে কথা কওয়া নিষেধ।

আমার বেলায় কর্ত্তারা খেললেন আর একটি বিশেষ রকমের চাল। দিনের বেলা আমার চলাফেরার সীমানা নির্দ্দিষ্ট হলো শুধু আমাদের কেয়টখালী গ্রাম নয়, আশেপাশের দু'-চারখানা গ্রামও নয়—একেবারে গোটা বিক্রমপুর বলা চলে। পূবের সীমানা হলো তালতলা, পশ্চিমে নির্দ্দিষ্ট হলো আড়িয়ল বিল, দক্ষিণে লৌহজং এবং উত্তরে সীমানা হলো ধলেশ্বরী নদী। এই বিস্তীর্ণ এলাকার পরিধি অন্যূন ১৬৮ বর্গ মাইল।

যাঁরা ভেতরের সংবাদ রাখেন না, তাঁরা হয়তো খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠবেন একথা শুনে। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে—একটি বিরাট এলাকায় ঘোরাফেরা করবার সুযোগ দিয়ে অসংখ্য চর লাগিয়ে আমার গতিবিধির রিপোর্ট সংগ্রহ এবং সুযোগ বুঝে এক একটি করে আরও কর্ম্মীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করা।

এটা সহজেই ধরতে পেরেছিলাম আমি। দিনের বেলায় বিরাট এলাকায় অবাধে ঘোরাফেরার স্বাধীনতা দিয়ে আবার ভিন্ গাঁয়ের কারুর সাথে কথা কইতে বারণ করে দেবার পশ্চাতে যে গূঢ় অভিসন্ধি আছে, সহজ লজিকেই তা ধরা পড়ে। কিন্তু ধরা পড়বার এই সহজ সত্যটাই ঐ 'বুদ্ধি শাখা'র অশেষ বুদ্ধিশালীদের মগজে একটু বিলম্বে ঘা দেয়। ট্রাজেডি ঐখানেই!

বাড়ীতে এসে আমি বেশ বুঝতে পারলাম ওরা গভীর জলের আরো গোটাকতক মৎস্য শিকারের উদ্দেশ্যে সুগন্ধ 'চার' করে লোভনীয় 'টোপ' ফেলতে চায়। ফলে, এবার সুরু হলো আমার সঙ্গে ওদের বুদ্ধির লড়াই।

প্রথম দিনেই মনে মনে সংকল্প করলাম যে, আমার ও অন্যান্য বন্ধুদের অবর্ত্তমানে যে যোগাযোগ-গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, শুধু তাই জুড়ে দেয়া নয়, স্বগৃহে ফিরে আসার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে এমন একটা কিছু করতে হবে, যাতে মূর্খ Intelligence Branch অর্থাৎ আই বি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে ওদের

মারাত্মক ভুল কোথায়। বুদ্ধির লড়াইতে ওদের ধরাশায়ী করাই আমার ব্রত হয়ে দাঁড়ালো।

আমাদের বাড়ীতে একখানা একতলা দালান আছে। খুব বড় বড় কোঠা। তার দক্ষিণের কোঠাটি আমি দখল করলাম। আমাদের বাড়ীতে প্রবেশের সদর এদিকে। তাই মা আপত্তি করলেন না।

অন্যান্য দশজন শুভানুধ্যায়ীর মতোই বাবা সরকারী হুকুমনামা পাঠ করে আশান্বিত হয়ে উঠলেন, এবার ওরা ছেড়ে দেবে শুধু একটুখানি চুপ করে থাকলেই। কিন্তু মা আমায় জানতেন একটু বেশী নিবিড়ভাবে। তাই নিজে আশার আলোকরেখা দেখতে পেলেও আমার কাছে এলেন যাচাই করতে।

কি রকম দিলি আই এ পরীক্ষা?

হেসে জবাব দিলাম: পাশ করে যাবো।

শুধু পাশ!—মা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন: প্রশ্ন বুঝি খুব শক্ত এসেছিল আর জেলের মধ্যেও বোধহয় স্বদেশীর পোকা তোমায় কামড়ানো ছাড়েনি?

কৈফিয়েৎ দিতে চেষ্টা করলাম: না, না, পোকা নয়। আসল কথা, বই যে একখানাও কিনিনি। পরের বই ধার করে পড়ে শুধু পাশই করা চলে মা, ষ্ট্যাণ্ড করা যায় না।

পাশেই প্রকাণ্ড কাঁচের আলমারী ভর্ত্তি নতুন বইয়ের সারি দেখিয়ে মা জিজ্ঞেস করলেন: এই বাইরের বইগুলো কিনতে পারলি আর পাঠ্য বইগুলো—

বাধা না দিয়ে পারলাম না: শুধু কি তাই, বহরমপুরে রাজবন্দীদের প্রত্যেকটি কাজেই যে আমায় যেতে হতো—

মা গম্ভীর হলেন: কেন, ঐ তিনশো বন্দীর মধ্যে কি তুমি একাই ছিলে মাতব্বর?

কী জবাব দোব? চুপ করে থাকলাম। মা রেগেছেন, এবার বকবেন।

কিন্তু না তা নয়। মাথার বালিশের পাশে ঝপ্ করে বসে পড়ে আমার চুলের মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন: সে কথা যাক্। আমার একটা কথা রাখবি বল্?

কি কথা ?

আগে রাখবি বল্ ? কথা দে—

কি কথা, বল না !

না। আগে কথা দিতে হবে।

ইতস্ততঃ করে বললাম ঃ দিতে পারি শুধু একটি কথা বাদে। আর সেটা যে কী কথা, তা তো তুমি জানোই মা !

হাত থেমে গেল। গাঢ় গলায় মা বললেন ঃ তা জানি, তুমি কথা দেবে না। কত আশা ছিল তোমার বাবার, তুমি বিলেত যাবে, ব্যারিষ্টার হবে, বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। এখন দেখছি, তোমায় জেলের বাইরে রাখাই মুস্কিল।

আবহাওয়া হাল্কা করবার জন্য বলে উঠলাম ঃ কেন, এই তো জেলের বাইরে এসেছি। তোমার কোলে মাথা রেখেছি। গল্প করছি—

মা হেসে ফেললেন। বললেন ঃ কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে যারা চুপি চুপি এসে এই ঘরে ঢোকে, অন্ধকারেই বসে ফিস্ ফিস্ করে কথা কয়, আবার একসময় চোরের মতো পা টিপে টিপেয যারা বেরিয়ে যায়, তারা যে বেশীদিন তোমায় বাইরে থাকতে দেবে না, তা আমি জানি।

বললাম ঃ ওদের কী দোষ ?

মা বললেন ঃ দোষ ওদের নয়, দোষ তোর নিজের।

কিন্তু পুলিশ টের পাবে না। দেখো তুমি মা, কাজ আমাদের চলবেই আর ওরা ভাববে আমি গুড বয়ের মতো খাই আর ঘুমোই।

মা বুঝলেন হুকুমনামা দেখে বাবা উল্লসিত হয়ে উঠলেও তাঁর সে ভুল করবার দুর্দ্দিন এখনো আসেনি ! মা আমায় চেনেন।

সত্যিই, কালক্ষেপ না করে কাজ সুরু হয়ে গেল। গোপনে বৈঠক হলো অনেকগুলো। একসঙ্গে বসে বিতর্ক-সভা নয়—পৃথক্‌ভাবে। এলো সুবোধ চক্রবর্ত্তী, এলো মধু ভট্টাচার্য্য, ইন্দু সরকার ; এলো কানাই ব্যানার্জ্জী, বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী, ও পরাণ চ্যাটার্জ্জী। আর আমাদের গ্রামেই তৈরী হয়ে উঠলো বিপদভঞ্জন চ্যাটার্জ্জী, খগেন চক্রবর্ত্তী, অনাথ চক্রবর্ত্তী ও মণি চ্যাটার্জ্জী।

স্থির হলো সর্ব্বাগ্রে সংগঠন, তারপর ট্রেনিং, তারপর পরিকল্পনানুসারী

এ্যাক্‌শন! বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিশালী বিভাগের সঙ্গে সুরু হলো বুদ্ধির লড়াই। দুনিয়ার যে কোনো কামানের লড়াইয়ের মতোই এটা মারাত্মক ও ভয়াবহ। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় রেখেছি সজাগ কান-খাড়া বুলডগের মতো। শত্রুর অনুপ্রবেশের প্রত্যেকটি পথে অহর্নিশ রয়েছে অতন্দ্র পাহারা। অবিশ্বাস করছি দেয়ালকে, সন্দেহ করছি সন্দেহাতীত সুহৃদকে। নিজের ছায়াকে বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস নেই নিজের হাতকে! ক্ষুরধার বুদ্ধির কাঁটাগুলো উঁচিয়ে রেখেছি সজারুর মতো। সাপের মতো বুকে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে যেতে হবে শত্রু সীমানায়। সন্তর্পণ অনুসন্ধানে বার করতে হবে লক্ষীন্দরের লৌহ-গৃহের অসতর্ক ছিদ্র!······কামানের লড়াইয়ে তবু আছে বিরামের আশা, সন্ধির আশ্বাস, ভার্সাইয়ের পুনরাবৃত্তি! কিন্তু বুদ্ধির লড়াই চলে অবিশ্রাম একটানাভাবে। সুরু আছে এর, শেষ নেই। মজঃফরপুরে হয়েছে এর সূত্রপাত, পরিণতি লাভ করেছে ইম্ফল পাহাড়ের চূড়ায়, শেষ কবে হবে কে জানে!······

ত্রিশ

সংবাদ নিলাম, রেণু এখানে নেই, শ্বশুরবাড়ীতে। আসবার কথা আছে শীগ্‌গিরই। তার খোকা হয়েছে একটি।

কিন্তু কিছুতেই পারছিলাম না রেণুর মা'র সঙ্গে দেখা করতে তাঁদের বাড়ী গিয়ে। কারণ শুধু একটি এবং সে কারণটি এমনি মর্ম্মস্পর্শী যে, তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

রেণুর দাদা ত্রিলোকেশ, ওরফে মাণিক, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক কাজে সে-ই তখন ছিল আমার দক্ষিণ হস্ত। অনেকটা যেন সিংহের মতো। কথা বেশী কয় না, বেশী লোকজনের সান্নিধ্যও সর্ব্বদাই এড়িয়ে চলে। যখন যেখানে যে অবস্থায় যেতে বলা হবে, যা করতে বলা হবে, সে যাবেই এবং তা করবেই। কোনো কারচুপি, ষ্ট্র্যাটেজি বা কৌশলের ধার ধারে না মাণিক। এগিয়ে যেতে যেতে এক পা পেছিয়ে আসবার কূটনীতি তার অন্তর স্পর্শ করে না। কাজের শেষে সে যদি ফিরে না আসে, তাহলে বুঝতে হবে হয় কাজ শেষ হয়েছে, নইলে সে নিজে শেষ হয়ে গেছে! এর মধ্যে কোনো রফার অবকাশ নেই। Light Brigade-এর সৈনিকের মতো—

Their's not to reason why,
Their's but to do or die……

স্বেচ্ছায় সে নিয়েছিল আমার দেহরক্ষার কাজ। সর্ব্বত্রই সে ছায়ার মতো নিঃশব্দে আমার পাশে পাশে থাকতো। সর্ব্বদাই পকেটে বা বেল্টে থাকতো তার একটি রিভলবার। গুলী ভরা ছ'ঘরা রিভলবার। চালাতে হয়নি তাকে কোথাও আমার দেহরক্ষার জন্য, তা সত্যি! কিন্তু চালাবার ক্ষীণতম প্রয়োজন দেখা দিলেই যে বাঘের মতো মাণিক লাফিয়ে পড়বে সম্মুখে, তা সর্ব্ব অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতাম আমি।

ছ'বছর পূর্ব্বে আমি গ্রেপ্তার হবার কিছুদিন পর সেও গ্রেপ্তার হয় এবং রাজবন্দী করে তাকে বহরমপুরেই আমাদের পুরোনো বন্দীশিবিরের পাশেই একটি নতুন বন্দীশিবিরে অন্যান্যের সঙ্গে আনা হয়। কিছুদিন পরই পাঠানো হয় তাকে যশোহরের কোনো গণ্ডগ্রামে থানায় অন্তরীণ করে। বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে সে প্রাণত্যাগ করে বিনা চিকিৎসায় ও বিনা শুশ্রূষায়।

বাড়ীর বড় ছেলে। তাও আবার যার তার নয়, স্বয়ং বিলাস কাকার ছেলে। বৃদ্ধ কাকার হাত থেকে সংসারের সমস্ত ভার মাণিকই স্কন্ধে তুলে নেবে, এই ছিল তাঁদের কামনা! দেওভোগের সাউদের বলেও রেখেছিলেন কাকা যে, এবার মুক্তি পেয়ে এলেই তাকে বসিয়ে দেবেন কাছারিতে, নায়েবের কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খ শিখিয়ে দেবেন। কাকা আর ক'দিন? কাকীমাও সিংপাড়ার কোন্ এক ব্রাহ্মণকন্যার পিতাকে কথাই দিয়ে রেখেছিলেন যে, মাণিক এবার ফিরে এলেই হয়···আর কি মিশতে দেবেন গাঙ্গুলী বাড়ীর ঐ দ্বিজেন গাঙ্গুলীর সাথে?···

কিন্তু হায়, দ্বিজেন গাঙ্গুলী ফিরে এলো বাড়ীতে, মাণিক আর এলো না! কী করে যাই কাকীমাকে প্রণাম করতে? কী বলে সান্ত্বনা দোব তাকে? মৃত্যু যে অবধারিত নির্ম্মম সত্য, তা জানি, কিন্তু এমনি করে অজানা অচেনা দেশে নিজের ঘরে একা একা ধুঁকতে ধুঁকতে মরা, এর ধাক্কা কী করে সামলাবেন কাকীমা?

তবু গেলাম, অপরাধীর মতো নীরবে মাথা নীচু করে তীব্র ভর্ৎসনা গ্রহণ করবার জন্যই গেলাম! কাকীমা রান্নাঘরে রাঁধছিলেন। আমি হাঁক দিতেই ত্রস্তপদে বেরিয়ে এলেন। আমি পায়ের ধুলো নেবার জন্য নীচু হতেই শুধু একটি প্রশ্নই শুনলাম কানে: তুই তো ফিরে এলি, কিন্তু আমার মাণিককে কোথায় রেখে এলি রে?—

সংজ্ঞাহীন দেহ তাঁর মাটিতে লুটিযে পড়লো। জ্ঞান ফিরে আসা পর্য্যন্ত আর অপেক্ষা করলাম না আমি। কারণ, এমনি একটি প্রশ্ন কাকীমা উচ্চারণ করবার পূর্ব্বেই আমারও মনের কোণে দেখা দিচ্ছিল বিজলী চমকের মতো। মাণিক কোথায়? কোথায় আমার দেহরক্ষী? কোথায় আমার দক্ষিণ হস্ত? ······নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই পাইনি খুঁজে। তাই পালিয়ে এলাম।

মনে পড়ে কয়েক বছর পূর্ব্বেকার কথা। কলকাতা মিডিল্ রোডে থাকতো সে সহানুভূতিহীন কাকার বাসায়। বাবা পাঠিয়েছিলেন চাকরির চেষ্টা করবার জন্য। পাড়ার সুশীল চক্রবর্ত্তী কলকাতাতেই ভালো একটা চাকরি করতো। কাকার বাসায় মাণিকের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অবধি ছিল না; সময়মতো বাড়ীতে না ফিরে গেলে প্রায়-দিনই হয় তার জন্য খাবার থাকতো না বা কম থাকতো অথবা হয়তো একখানা থালায় সব ঢেলে দিয়ে এমনি অসাবধানতার সঙ্গে ফেলে

রাখা হতো যে, বেড়ালে সব খেয়ে যেতো। কিন্তু কাজের নেশায় এমনি মশগুল ছিল সে যে এসব অসুবিধাকে ভ্রূক্ষেপই করতো না। বহু জেরা করে করে সুশীল হয়তো একদিন জানতে পারতো যে গত ক'দিন মাণিকের খাওয়াই হয়নি। এই অর্দ্ধাশন ও অনশন থেকে বাঁচাবার জন্য সুশীল বিশেষ-ভাবে চেষ্টিত হয়ে উঠলো।

জুটলোও একটা চাকরি কলকাতার বাইরে খুলনাতে। কিন্তু মাণিক যেতে রাজী নয়। এদিকে সুশীল আমার গোপন সমর্থন পেয়ে মাণিকের বাড়ীতে সংবাদ পাঠিয়ে, নিজে ওর জামাকাপড় ও খাঁকি হাফ প্যাণ্ট কিনে দিয়ে এই ব্যাপারে এমনি অগ্রসর হয়ে পড়লো যে, মাণিকের আর প্রত্যাখ্যান করবার উপায় রইলো না। খুলনা যাবার দিন স্থির হয়ে গেলো। কোন্ একটি মোটর সারাই কারখানায় চাকরি। প্রারম্ভে লোভনীয় কিছু না পেলেও কামড়ে পড়ে থাকতে পারলে ভবিষ্যতে আশা আছে।

মাণিকের কলকাতা ত্যাগের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দলের কাজে অকস্মাৎ আমারও একবার বিক্রমপুরে যাবার প্রয়োজন দেখা দিল। ঢাকায় লোম্যান ও হডসন সাহেবকে গুলী করে বিনয় তখন পলাতক। নির্দেশ এসেছে, একটি রিভলবার নিয়ে বিক্রমপুরে গিয়ে সেটা বিনয়ের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। কী করে রিভলবার সঙ্গে করে কলকাতা থেকে কেয়টখালী পৌঁছোই? একটু ভাবনায় পড়লাম।······অসীম সাহসে ভর করে একদিন ট্রেনে গোয়ালন্দে শ্রীপদের কোয়ার্টার "আমীর" ষ্টীমারের ফ্ল্যাটে পৌঁছোলাম। সেখানে দু'একদিন অপেক্ষা করে সুযোগ বুঝে অকস্মাৎ একদিন নারায়ণগঞ্জ মেল ষ্টীমারে পাড়ি দোব স্থির করলাম।

কিন্তু পরদিন অকস্মাৎ কলকাতা থেকে মাণিক গোয়ালন্দ এসে হাজির! ক্ষুণ্ণ মনে প্রশ্ন করাতে সে তার স্পষ্ট জবাব দিল: আমার একটা চাকরি গেলে আবার চাকরি পাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বিনয় বোস বাংলা দেশে একজনই আছে। এই মহা সত্যটি ভুলো না, বুঝলে?

মাণিক রিভলবারটি নিয়ে কোমরের বেল্টে এঁটে নিল এবং ষ্টীমারে চড়ে বসলো। চাঁদপুর মেল ষ্টীমারে গেলাম আমরা যাতে কেয়টখালীতে অনেক রাতে পৌঁছোই। অর্থাৎ অসময়ে।

কাদিরপুর থেকে হাঁটা-পথে যখন আমরা কেয়টখালী পৌঁছোলাম, তখন রাত

বারোটা বেজে গেছে। আমাদের বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। গ্রামও নিস্তব্ধ। মাণিক চাকরিতে না গিয়ে বাড়ী চলে এসেছে আমার সঙ্গে, বিলাস কাকা এটা কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না জেনে মাণিককে আর ওদের বাড়ী যেতে দিলাম না।

মাকে ডেকে তুললাম, সোনাবৌদিও উঠলেন। বললাম, একজন অতিথি আছেন দক্ষিণের ঘরের অন্ধকারে বসে। তিনি খাবেন, আমিও খাবো।

মা জিজ্ঞেস করলেন: অন্ধকারে বসে? সে কেমন অতিথি রে?

গম্ভীর মুখে বললাম: তা জেনে তোমার কী প্রয়োজন মা? এখন আলু আর ডিম সেদ্ধ দিয়ে ভাত দাও চড়িয়ে। ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে।

সোনাবৌদি বললেন: তোমার অতিথিরা বেশ ঠাকুরপো! আসেন রাত বারোটায়, থাকেন অন্ধকারে বসে, খাবেনও নিশ্চয়ই অন্ধকারে এবং তারপর ভোর হবার পূর্বেই বোধহয় সম্মানিত অতিথি বিদায় নেবেন?

বললাম: হুবহু যা বলেছ! এবার দয়া করে যদি—

রান্না হলো। বৌদি বড় একথালা ভাত, ডিম ও আলু সেদ্ধ দিয়ে মেখে দিয়ে গেলেন দক্ষিণের ঘরের অন্ধকারে টেবিলের ওপর। খেলাম মাণিক ও আমি।

মা আবার জিজ্ঞেস করলেন ঘরের বাইরে থেকে: এই, অন্ধকারে খাচ্ছিস কেন, আলো জ্বালিয়ে নে না। অন্ধকারে খেতে নেই।

বললাম: তা পারলে তো অতিথির সঙ্গে তোমাদের পরিচয়ই করিয়ে দিতাম মা!

মাণিক নয় তো?—অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের মতো প্রশ্ন করলেন মা।

অবলীলাক্রমে সত্যের মতো করে বলে গেলাম: পাগল হয়েছ তুমি মা? মাণিক চাকরি পেয়েছে খুলনায়। কবে চলে গেছে সেখানে। আর চাকরি ফেলে কি ওকে আর এখানে আনা যায় কখনো? না আনা উচিত?

মা আর প্রশ্ন করলেন না। কিন্তু বিস্মিত হলাম মার শারলক্ হোমীয় বিচারবুদ্ধি দেখে!·····

সেই রাত্রেই পূব পাড়া থেকে অনাথকে ডেকে তুলে তাকে সঙ্গে করে পাঠিয়ে দিলাম মাণিককে তিন মাইল দূরে কোলা গ্রামের বিষ্ণু চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে।

মাণিক সম্বন্ধে এমনি অনেক কথা সেদিন যেমন মনে পড়েছিল, আজও তেমনি পড়ে। আমার জীবন-মন্দারকে ঘিরে রয়েছে মাণিকের স্মৃতি-সৌরভ!

মাণিক সত্যিই ছিল মাণিক। হীরা, চুনী বা পান্না নয়, মাণিক ছিল সাপের মাথার মাণিক! নিবিড় অন্ধকারে তার স্তিমিত দ্যুতি আলোকরেখা বিকিরণ করতো চলার পথে!

সেই মাণিক হারিয়ে গেছে, সেই হীরা সিংএর মৃত্যু হয়েছে।……

শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ সুরু হয়ে গেল। সংগঠনের কাজ। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে আমাদের সংগঠকরা হানা দিতে লাগলো স্ূঁচ হয়ে এবং অতি দ্রুত অথচ সীমাহীন সতর্কতার সঙ্গে একটি একটি করে ছেলে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলো আমার সাথে। ওদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হতো প্রায়ই বিরাট মাঠের মাঝখানে হয়তো কোনো গাছের ছায়ায় ঝোপের আড়ালে। এতে দারুণ সুবিধে ছিল একটা। চারিদিকে শোনবার মতো দেয়াল নেই, দরজা-জানালার আড়ালে লুকিয়ে লক্ষ্য করবার সুবিধে নেই। চারিদিকে বিরাট মাঠের কোথাও নেমে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেই বা আমাদের লক্ষ্য করলেই ধরা পড়বার নিশ্চয়তা আছে। অর্থাৎ, গুপ্তচরেরা আমার কোনো সংবাদই সংগ্রহ করতে পারতো না।

সে যুগে বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে অসংখ্য দিবাকর সেন চোখ ও কান সজাগ রেখে ঘোরাফেরা করতো হায়েনার মতো। এদের মধ্যে একদল ছিল, যারা সোজাসুজি ঢাকা আই বি অফিসের চাকুরে। একদল এদেরই নিয়োজিত চর, কমিশনে কাজ করতো। আর একদল ছিল, যারা এদের প্রায় সবাইকেই জানতো ও চিনতো এবং পাছে এদের বিরাগভাজন হলে হাতে হাতকড়া পরতে হয়, তাই তারা যুধিষ্ঠিরের মতো সত্য সংবাদগুলি এদের প্রশ্নের জবাবে অসঙ্কোচে বিবৃত করে যেতো! এ ছাড়াও কিছু লোক অদ্ভুত সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে পুলিশের কাছে বা গুপ্তচরদের কাছে অযাচিতভাবে স্বদেশীদের সম্বন্ধে যত সত্যকথা সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রকাশ করতো ফলাফলের কথা আদৌ চিন্তা না করেই।

অর্থাৎ নিয়োজিত, কমিশনপ্রাপ্ত, স্বেচ্ছাব্রত অথবা অসাধারণ সত্যবাদী অজস্র লোক বিক্রমপুরের প্রত্যেক গ্রামে কিলবিল করতো এবং তার ফলে কোন্ গণ্ডগ্রামের কোন্ অন্ধকার ঘরে কখন নিঃশব্দে একটি স্ূঁচ পড়েছিল, তার

গ্রাফিক সংবাদ যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছোতো ঢাকা শহরে গ্র্যাসবি সাহেবের দপ্তরে। বিশ্বাস করবার ঝুঁকি ছিল ভয়ানক, আস্থা-স্থাপনের বিপদ ছিল সীমাহীন। কিন্তু এইসব বাধা-বিপত্তি ও আশঙ্কার মধ্যেই চললো আমাদের সুনিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাময় গুপ্ত অভিযান। গভর্ণমেণ্ট যেমন চালাকি করে দিনের বেলায় ঘুরে বেড়াবার জন্য দিয়েছিল আমায় প্রায় গোটা বিক্রমপুর, আমিও তেমনি ওদের চালাকির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে সারাটা দিন ঘুরে বেড়াতাম গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। কিন্তু সন্ধ্যে হতেই পাখীরা যেমন কুলায়ে ফিরে যায়, আমিও তেমনি ফিরে আসতাম কেয়টখালীতে আমাদের বাড়ীতে আমার দক্ষিণের কোঠায়।

কিন্তু তাই বলে কি সারারাত গুড বয়ের মতো বিশ্রাম নিতাম আমি? লোক-দেখানো সাধুতা ছিল বটে, কিন্তু তারপরই, রাত একটু বেশী হলে গ্রামের কর্ম্মচাঞ্চল্য কমে এলে, পথঘাট নির্জ্জন হলে, শোবার ঘরের আলোগুলো নিবে গেলে হয়তো মান্দারবাড়ী শ্মশানঘাটের ওপারে বট গাছটার নীচে একটি টর্চ্চ জ্বলে উঠলো। ক্ষুদ্র টর্চ্চ, ফোকাস করা প্রদীপের আলোর মতো। টর্চ্চধারীর সংকেত বোঝা গেল, তাই খুলে গেল দক্ষিণের কোঠার দরজা নিঃশব্দে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বেরিয়ে এলাম। কোথায় গেলাম, কার কার সঙ্গে কথা বললাম এবং কখন আবার ভোর হবার পূর্ব্বেই ফিরে এসে নিজের জন্য সংরক্ষিত খাটখানায় দেহ প্রসারিত করে দিয়ে লক্ষ্মী ছেলেটির মতো শুয়ে পড়লাম, টিকটিকিরা আদৌ হদিসই করতে পারতো না।

প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে যাই থানায় হাজিরা দিতে। শ্রীনগর থানা আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় চার মাইল দূরে। যেতে হয় ষোলঘর গ্রামের মধ্য দিয়ে, স্কুলের পাশ দিয়ে, তারপর দেলভোগ গ্রামের সাউদের কাছারিবাড়ীর পুব দিকের সড়ক দিয়ে, তারপর থানার পাশেই খালের ওপরকার পোল পার হয়ে। কিন্তু এ যাওয়া-আসাও ব্যর্থ হতে দিই না। ষোলঘরে আমাদের শক্তিশালী একটা ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছে। ষোলঘর বাজারের বিলাস সাহার বিরাট চালের দোকানের বৃহৎ বাঁশের মাচার ওপর বসে বসে অতুল লক্ষ্য রাখতো পথের পানে। গোয়ালবাড়ীর নীচে দিয়ে বাজার এড়িয়েও যাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্ব ব্যবস্থামতো আমি ওপথে যাই না। চালের দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় অতুলের সঙ্গে আমার হয় দৃষ্টি-বিনিময়, অনুচ্চারিত ভাষায় হয়ে যায় আমাদের আলাপ। তারপর থানা থেকে ফেরবার পথে আমি বাজারের

কাছাকাছি এসে ধরি চন্দ্রমাধব ঘোষের বাড়ী যাবার রাস্তা। তাঁর বাড়ী ছাড়িয়ে একটু উত্তরে গেলেই একটি বৃহৎ দীঘি। সেই দীঘির পারে অনেকগুলো আম ও চালতে গাছ। অযত্নে তার নীচে জঙ্গল জন্মে গেছে। সেই আম ও চালতে বনে হয়তো ইতিমধ্যেই বসে গেছে জরুরী একটি বৈঠক। আমার যোগদানে তা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

একদিন এমনিভাবে থানায় যাবার পথে মাঠের মধ্যে ষোলঘর হাই-স্কুলটাকে দেখেই মনে হলো, এই স্কুলটাকে দখল করতে হবে। ষোলঘরে আমাদের ছেলেদের মধ্যে স্কুলের ছাত্র কেউ ছিল না, সুতরাং নিজেকেই পথ বার করতে হবে।

নির্দিষ্ট দিনে সঙ্গে নিলাম বিপদভঞ্জনকে। তারই বয়স একটু কম, স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে চট্ করে হয়তো পারবে মিশতে। তখন বেলা প্রায় বারোটা। পুরো দমে স্কুল সুরু হয়ে গেছে। ক্লাস এইটের যে-কোনো একজনকে সুযোগ বুঝে ডেকে আনবার নির্দেশ দিলাম বিপদভঞ্জনকে। অপেক্ষা করতে লাগলাম অনতিদূরে একটা কাঁঠাল গাছের ছায়ায়।

একটু পর একটি পিরিয়ড শেষ হবার ঘণ্টা বাজতেই দেখি, বিপদভঞ্জন একটি ছেলেকে সঙ্গে করে এগিয়ে আসছে। বুদ্ধিতে ও স্বাস্থ্যে দীপ্ত ছেলেটির চেহারা।.....বোঝা গেল, বিপদভঞ্জনের পছন্দ আছে।

কাছে এসে সে বিস্মিত নেত্রে আমার পানে চাইতেই বললাম : ভাই, কিছু মনে করো না। তুমি ক্লাস এইটে পড় তো? তোমাদের ক্লাসে সমীর বিশ্বাস নামে কোনো ছাত্র আছে কি?

সমীর?—ছেলেটি মনে করবার চেষ্টা করলো : না, মনে পড়ছে না তো! সমীর—সমীর—ও হ্যাঁ, একজন আছে, কিন্তু সে তো বিশ্বাস নয়, কুণ্ডু।

কুণ্ডু? নাঃ, আমি চাই সমীর বিশ্বাসকে।—আচ্ছা, কী রকম দেখতে বল তো?

ছেলেটি বিবরণ দিল : এই লম্বা-চওড়া চেহারা, খুব ভালো ফুটবল খেলে। পড়াশুনায় কিন্তু একেবারে গোল্লা।

বললাম নিরাশার স্বরে : নাঃ, সে ছেলেটি দেখতে ছোটখাটো, অনেকটা তোমার মতো।—তোমার নাম কি ভাই?

বিজনকুমার বসু।

কিন্তু ভারী মুস্কিলে পড়লাম তো ভাই ! সমীর আমাদের লাইব্রেরী থেকে একখানা বই পড়তে নিয়ে এসেছে সে আজ প্রায় এক মাস হবে। বলে এসেছিল ক্লাস এইটে সে পড়ে।

কোথায় আপনাদের লাইব্রেরী ?

ঐ তো বাঁড়ুয্যে পাড়ায়। চেন তুমি বাঁড়ুয্যে পাড়া ? তোমার বাড়া কোন্ দিকে ?

বিজন জবাব দিল : আমার বাড়ী ঘোলঘরে নয়, হরপাড়ায়।

বাঁচলাম !……বললাম : যেও না তুমি একদিন লাইব্রেরীতে, অনেক ভালো ভালো বই আছে, পড়তে পারবে।—এই তো লাইব্রেরীর সহকারী লাইব্রেরীয়ান। এর নাম রবীন সরকার।

বিপদভঞ্জনকে জিজ্ঞেস করলো বিজন : কখন আপনার লাইব্রেরী খোলা থাকে, রবীনবাবু ?

বিকেল চারটে থেকে রাত সাতটা পর্যান্ত ! আমি না থাকলেও তোমার অসুবিধে হবে না !—যাকে ওখানে পাবে, তাকেই বলবে, সেই তোমায় বই দেবে পড়তে।—বলে রবীন নামধারী বিপদভঞ্জন বিজনের কাঁধে একখানা হাত রেখে সস্নেহে বললো : তোমাদের ক্লাসে মাষ্টার গেছেন। এবার যাও। কাল ছুটির পর এসো পাঁচটায়—আমি থাকবো ! কেমন, আসবে তো ?

আচ্ছা।

বিজন চলে গেল।

এমনি করে ঘোলঘর স্কুলে প্রবেশ করা গেল বিজনের হাত দিয়ে এবং এমনি করেই কৌশলে আমরা গ্রামের পর গ্রামে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম। যে কোনো ছুতোয়, যে কোনো ওজর দেখিয়ে আমরা যে কোনো একজনের সঙ্গে আলাপ করতাম ও অন্তরঙ্গতা করে ফেলতাম। তারপর একটি-একটি করে টেনে টেনে এনে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দিতাম।……

একত্রিশ

হঠাৎ একদিন শুনতে পেলাম রেণু এসেছে।

বর্ষাকাল। ওদের পাড়া ও আমাদের বাড়ীর মধ্যেকার পথ বর্ষার জলে একেবারে ডুবে গেছে। নৌকো ব্যতীত তখন এক পা-ও কোথাও যাওয়া যায় না।

খোঁজ নিলাম। চাকর মহাদেব বেরিয়ে গেছে নৌকো নিয়ে কিছু গাব ফল পেড়ে আনতে। ভাবলাম, থাক গে, এত তাড়া কিসের? রেণুই তো আসবে জেল-ফেরৎ আমার সঙ্গে দেখা করে আমায় অভিনন্দন জানাতে! সবে তো এসেছে সে! নিশ্চয়ই একটু পরেই সে গুরুদাসকে সঙ্গে করে এসে হাজির হবে আমার ঘরে।

আবার 'আনন্দবাজার' পত্রিকাখানি তুলে নিলাম। কিন্তু পড়বো কি? ইংরাজী ভাষায় প্রাপ্ত সংবাদগুলির এমনি কটমট বাংলা তর্জমা করেছে পত্রিকার বার্ত্তা বিভাগের কর্ত্তারা যে, একেবারে পড়তেই ইচ্ছে করে না।...... বিরক্তির আর অবধি রইলো না। কাগজখানা ফেলে দিয়ে দক্ষিণের বড় লেবু গাছে লেবু আরও হচ্ছে কিনা দেখতে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে জানিনে কখন এসে পড়েছি একেবারে উত্তরদিকের দোতলার পশ্চিমের ঝুল বারান্দায়।......ঐ যে, রেণুদের ঘাটে বাঁধা রয়েছে সেই ছই-ওয়ালা নৌকোখানা। ছইয়ের মধ্যে এখনো বিছানাটা পড়ে আছে। একটা ছোট বালিশ ও দুটো ক্ষুদ্রাকার পাশ-বালিশ। রেণুর ছেলের বিছানা। কী নাম ওর? কেউ জানে না আমাদের বাড়ীতে?......থাক্ গে, না জানলো রেণু তো আসছেই একটু পরে, তখনই জানা যাবে।......প্রায় দেড় বছর পর এসেছি জেল থেকে। আসবে না রেণু দেখা করতে? তারই আসা উচিত নয় কি?

একটা লোক এসে ছোট বিছানাটা গুটিয়ে নিয়ে গেল। মরণি পিসিমা একপাঁজা বাসন নিয়ে এসে ঘাটে বসলেন কথার যন্ত্র খুলে। শ্রোতা থাক্ বা নাই থাক্, তারা কেউ উৎসাহ বা আগ্রহ বোধ করুক বা নাই করুক, মরণি পিসিমা বকে যাচ্ছেন অনর্গল! শ্রান্তি নেই, এমন কি বিরামেরও প্রয়োজন হয় না।......কিন্তু রেণু তো এটাও ভেবে বসতে পারে যে, আমিই ছুটে যাবো তার কাছে? মেয়েরা বড্ড অভিমানী হয়, বলা যায় না।

কিছুই স্থির করতে পারছিলাম না, কার যাওয়া উচিত, রেণুর, না আমার? আমার, না রেণুর?……এমন সময় ফুলবৌদি নীচে থেকে হাঁক দিল: ভাত দেয়া হয়েছে।

চমক ভাঙলো। নীচে নেমে এলাম। দেখা গেল রেণু যতই দেরী করছে, ততই আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হচ্ছে। আমি যে ফিরে এসেছি, তা কি এখনো জানতে পারেনি সে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কি এমন কেউ নেই যে, এই সুসংবাদটা রেণুকে জানিয়ে দেয়? সে যে কত খুশী হবে তা তো আমি সারা মর্ম্ম দিয়ে জানি।……

অবশেষে রেণু এলো, কিন্তু সেদিন নয়, পরদিন। ময়দা গুলে একটি কলা-পাতার টুকরো দিয়ে তা মুড়ে উনুনে পুড়িয়ে নিয়ে সবে মাছ ধরতে যাবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় রেণুকে নামিয়ে দিয়ে গেল ওদের চাকর। বর্ষাকাল। মাছ আর তেমন ওঠে না। তবু সেদিনটা ছিল একেবারেই ফাঁকা, কোনো এনগেজমেণ্ট ছিল না। তাই সময় কাটাবার জন্য নৌকো করে জলে-ডোবা ধান ক্ষেতের পাশে গিয়ে ইচ্ছে ছিল ছিপ ফেলে বসে থাকবো। যদি খায়।

রেণু বলে উঠলো: নিশ্চয়ই রাগ করেছ কাল আসিনি বলে, তাই না? কিন্তু সময় করে আসা যে কী মুস্কিল, তা তো আর জান না তুমি!

বললাম: রাগ তো করিনি আমি। আর আমি রাগ করলে কার কী যায় আসে?

মুচকি হেসে রেণু বললো: নিশ্চয়ই যায় আসে।—এসো তো এই ঘরে। ওসব ছিপ টিপ রাখো। এই মহাদেব, তোর বাবু এখন আর যাবেন না মাছ ধরতে।—বলে হাত থেকে ছিপ কেড়ে নিয়ে আমার হাত ধরে একেবারে দক্ষিণের ঘরে এসে প্রবেশ করলো।

বসলাম খাটে পাশাপাশি। অনেক কথা হলো। হালকা কথা, মান-অভিমানের কথা। তার কতগুলো পত্রের জবাব দিইনি আমি, পরিষ্কার হিসেব দিল রেণু। আমিও পাল্টা হিসেবে কতগুলো পত্রে সে মাত্র দু'চার লাইনে দায় উদ্ধার করেছে তার বিবরণ দিলাম। কথা কাটাকাটি সুরু হয়ে গেল।

রেণু বললো: তা তো বলবেই। শ্বশুরবাড়ীর হাজারো কাজের মধ্যে

সময় করে নিয়ে তোমায় লিখলাম, আর তুমি বলছো ওকে পত্রই বলে না। সংক্ষেপে ষোলো পৃষ্ঠা পত্র যিনি লিখতে পারবেন বিনিয়ে বিনিয়ে, তিনি আগে আসুন। তারপর দিন রাত শুধু শ্রীমতীর পত্র নিয়ে—

লম্বা বেণী ধরে হ্যাঁচকা একটা টান দিতেই রেণু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল আমার গায়ে। তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে উঠে বসলো বটে, কিন্তু আমার গায়ে তার শরীর ঘা খেয়ে গেল। হয়তো আজকের মন সেদিন ছিল না বলেই এই আঘাতে আদৌ চাঞ্চল্য বোধ করিনি। কিন্তু আজকের মন নিয়ে সেদিনের সেই দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করলে সত্যিই বিস্মিত হয়ে উঠি। কুড়ি বছরে রেণু বুড়ী হয়নি, হয়েছে যৌবনভারাবনতা। পদ্মপত্রের ওপর জলবিন্দুর মতো টলটল করেছে তার স্বচ্ছ যৌবন। উনিশটি বসন্তের মোহময় স্পর্শে যে দেহ-মন্দার প্রাণরসে হয়ে উঠেছিল ভরপুর, খোকা এসে প্রস্ফুটিত হয়েছে তাতে পারিজাত হয়ে। তাই রূপ ঐশ্বর্য্য যেন উপচে পড়ছে। এই উপচে-পড়া রূপকে বক্ষোবাসে বন্দী করে রাখতে গিয়ে একেবারে অপরূপ করে তোলা হয়েছে। ....

যে সৌন্দর্য্যের বর্ণনা এখানে করলাম, বর্ণনায় যে ভাষা ব্যবহার করলাম, এ দৃষ্টি ও এই বর্ণনা আজকের। সেদিনকার সেই দুর্ঘটনা যদি আজকে ঘটতো, হয়তো এমনিভাবেই সেই শিহরণময় দুর্ঘটনার নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতাম। কিন্তু সেদিন, সেই ১৯৩৪ সালের অপরাহ্নে প্রায় সমবয়সী যুবতীর দেহস্পর্শে কোনো চাঞ্চল্যই যে অনুভব করিনি, দৃঢ়তার সঙ্গে তা ঘোষণা করতে পারি। রেণুর সঙ্গে যতই খুনসুটি ও মান-অভিমান করি না কেন, যতই ভালোবাসি না কেন তাকে, কোনওদিন কখনও এক মুহূর্তের জন্যেও মনে পড়েনি সে নারী আর আমি যুবক! তাকে মনে করেছি বোন, ক্রীড়াসঙ্গিনী, হয়তো বন্ধু কিংবা অন্য কিছু। কিন্তু নারী নয়।

এর পর অনেক কথা হলো দু'জনে। বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেই রেণু যেন পাগল হয়ে উঠলো : সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না দাদা! এমনি ভোলা লোকের পাল্লায় পড়েছি! রোজই একটা-না-একটা নিয়ে কল্‌-এ যেতে সে ভুলে যাবেই। ষ্টেথেসকোপ্‌ নেবে তো ভুলে যাবে থারমোমিটার, আবার থারমোমিটার নিলে ভুলে যাবে ষ্টেথেসকোপ্‌। কোনো কোনো সময় দু'টোই ভুলে গিয়ে শুধু ওষুধের বাক্সটা নিয়েই রোগীর বাড়ীতে হাজির হলেন

ডাঃ চক্রবর্ত্তী। তারপর মনে হলোঃ ঐ যাঃ ষ্টেথেসকোপ্‌?······আর রাত্রে কিছুতেই সে কল্‌-এ যাবে না। বলে গ্রামের পথ চলতে ভয় করে।

বলে হি হি করে হেসে উঠলো রেণু। আরও কী বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ফুলবৌদি এলো মুড়ি নিয়ে। সমুখের টেবিলের ওপর বাটিটা রেখে বললোঃ তোমাদের দু'জনের।

একই বাটি থেকে দু'জনে মুড়ি খেতে খাবা ভালো লাগছিল! ফাঁকে ফাঁকে মুখরোচক পরিহাস কাজ করছিল নুণ ও ঝালের। বেলা কখন যে একেবারে শেষ হয়ে এসেছে, টেরই পাইনি তা।

অকস্মাৎ এক সময় ওদের চাকর এসে হাজির। সংবাদঃ রেণুর খোকা কাঁদছে।

বিশ্রী বাধা পেলাম। আপ্রাণ চেষ্টা করলাম রেণুকে আটকে রেখে ওর খোকাকে আনাতে। কিন্তু সে বললোঃ না দাদা, তা হয় না। নৌকো করে ওরা আনতই পারবে না। সে আমার ভারী ভয় করে! আজ যাই, কাল আবার আসবো, কেমন?

শেষ চেষ্টা করলামঃ জানিয়ে রাখছি, আমি দুঃখ পাব তুমি এখনই চলে গেলে! প্রায় দু'বছর পর দেখা। কত কথা আছে, যা এখনো বলিনি তোমায়। এর পরও যদি—

ঘরের বাইরে গলা বাড়িয়ে রেণু দেখলো চাকরটা নৌকোয় চলে গেছে কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে কাছে এসে একেবারে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আমার স্কন্ধে একখানা হাত রেখে বললোঃ ভারী মুশকিলে ফেললে তুমি দাদা! বল, যাই?

চুপ করে রইলাম বসে মুখ ফিরিয়ে। একটু অপেক্ষা করে জোর করে আমার মুখ দু'হাতে ঘুরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলো রেণুঃ বল, অনুমতি দাও!

কথা কইলাম না। সুযোগ যখন এসেছে, আজ একটা পরীক্ষাই হয়ে যাক, কে তার কাছে প্রিয়তর, খোকা, না আমি? মাত্র এক বছর হলো যে এসেছে তার জীবনে, সেই কি প্রিয়তর হবে সারা জীবনের বন্ধুর চাইতে?······

কিন্তু মেয়েদের বেলায় বোধহয় তাই। খোকার বাবার কথা বলছি না, খোকার মায়ের কাছে খোকার চাইতে মিষ্টি বোধহয় আর কিছুই নেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে!—তাই দেখলাম, খুব গম্ভীর হয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাবার পূর্ব্বে

রেণু আমার একখানা হাত টেনে নিয়ে শুধু তার গালে একবারটি চেপে ধরলো। তারপর মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল।

ঘাট থেকে নৌকো ছেড়ে যেতেই সমস্ত শরীর আমার অবসন্ন হয়ে গেল। অবশিষ্ট মুড়িগুলো মনে হতে লাগলো পাথরের কুচি।

দেখা গেল, ছেলেদের আকর্ষণ করবার দু'টি সহজ পন্থা আছে—খেলাধুলো আর নাটক। দু'টোতেই ছিলাম সিদ্ধহস্ত। সুতরাং ঢাকা থেকে কুড়ি টাকা ব্যয় করে চমৎকার একটি ক্যারম বোর্ড আনা হলো আর বর্ষার শেষে শীত পড়তেই থিয়েটার হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

ক্যারম খেলার মাধ্যমে নিত্য নতুন ছাত্র আসতে লাগলো স্কুলের ছুটির পর। আশ্বাস দিলাম শীগ্‌গিরই প্রতিযোগিতা সুরু হবে। দক্ষিণের কোঠায় পুরো দমে যখন খেলা সুরু হয়ে যায়, তখনই হয়তো খগেন একটি ছেলেকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তারপর নৌকোয় উঠে সুমুখের পুকুরটাতেই ঘুরে বেড়ায় কিছুক্ষণ। খেলার কথার মধ্য দিয়ে এসে পড়ে সিরিয়াস কথায়। এই আমাদের দেশ! এই দেশের ওপর গত দু'শো বছর ধরে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে শয়তান বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট। সুতরাং দেশের সুসন্তান যারা, তারা এই গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধনের ব্রত গ্রহণ করবেই। কংগ্রেস যে পথে চেষ্টা করছে, সেটা আবেদন-নিবেদনের পথ, কাকুতি-মিনতির পথ। কিন্তু সর্ব্ব-দেশের ইতিহাসে এর সমর্থন মেলে না। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়। ঢিল মারবার জবাবে চিরকালই এসেছে পাটকেল। তাই কংগ্রেসের শান-বাঁধানো রাস্তায় না এগিয়ে যাঁরা পদক্ষেপ করেছেন বিপ্লবের বন্ধুর পথে, কুশাঙ্কুর ও কালফণির প্রাণান্তকর ঝুঁকি নিয়ে যাঁরা শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে, তাঁদেরই উদাত্ত আহ্বান এসেছে তোমার দ্বারে······এমনি করে বোঝানো হয় তাকে। একদিন, দু'দিন, তারপরই তাকে একদিন পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় আমার সঙ্গে।

গ্রামের চৌকিদার তমিজদ্দী যখন-তখন এসে হাজির হয় আমাদের বাড়ীতে। আমায় না পেলে মা'র কাছে জিজ্ঞেস করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে—কোথায় গেছি আমি, কার সঙ্গে গেছি, কখন ফিরবো ইত্যাদি। আর আমার সঙ্গে দেখা হলেই

অকস্মাৎ বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে আমার স্বাস্থ্যের কথা, জেলের দৈনন্দিন জীবন যাপনের কথা এবং বাজে প্রসঙ্গে খানিকটে সময় কাটিয়ে যায়। রাত্রে পাহারাতে বেরিয়ে সে দক্ষিণ দিকে এসে হাঁক দিয়ে আমায় একবার জাগাবেই এবং যথারীতি জানিয়ে যাবেঃ হুঁশিয়ার থাইকেন।

চালাকি বুঝতে দেরী হলো না। দারোগা বা আই বি'র নির্দেশ অনুসারেই যে ব্যাটা এমনি প্রকাশ্যভাবে চরগিরি সুরু করেছে, তা বুঝলাম। উপেক্ষা করে করে যখন দেখলাম ব্যাটার তড়পানি একেবারে সীমা ছাড়িয়ে উঠেছে, তখন বাধা দেয়াই সিদ্ধান্ত করা হলো। চৌকিদার গ্রামেরই অধিবাসী! বহু পুরুষ ধরে ওরা এখানে বাস করছে। আর আমাদের গ্রামের শতকরা আশী জনই মুসলমান।

কিন্তু এই অবস্থায় অপরে যা করে বা করতে পারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঝাণ্ডা উচে তুলে ধরে শান্ত মনে তারা যা ভাবে, আমি ভাবি ও করি তার বিপরীত। গ্রামের শয়তানদের শায়েস্তা করতে হলে আমি মনে করি, প্রয়োজন ভীতি সৃষ্টির। আতঙ্ক সৃষ্টি করতে না পারলে এই বিভীষণদের ঠাণ্ডা রাখা যাবে না। ঠাণ্ডা লজিক নয়, ক্রুদ্ধ চোখরাঙ্গানিই এদের দাওয়াই। মুগুর হাতে না নিলে এই কুকুরদের ঘেঁৎকানি থামবে না। অতএব—

একদিন বিকেলে ছেলেদের ক্যারম খেলা যখন পুরো দমে চলছে দক্ষিণের কোঠায় আর আমি দক্ষিণ-পুব কোণের শিউলি গাছের নীচে ইজিচেয়ারে বসে খবরের কাগজখানার পাতা ওলটাচ্ছি, এমন সময় যেই ধূমকেতুর মতো চৌকিদার তমিজদ্দী এসে হাজির, অমনি অনাথ এসে সেই সংবাদটি জানিয়ে দিল আমায়।

তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠালাম তমিজদ্দীকে।

কোনো ভূমিকা নয়, কোনো ভদ্রতা নয়, ভাষার মোলায়েমত্ব সৃষ্টির জন্য কোনো চেষ্টা নয়, একেবারে সহজ শাণিতভাবে জানিয়ে দিলাম আমার আদেশঃ তোমার মতলব বুঝতে আমার দেরী হয়নি। তাই বলে দিচ্ছি, সাবধান, আমাদের বাড়ীর ত্রিসীমানায় এসো না কখনও। আর এই গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের পেছনেও যদি লাগ, তাহলে কিন্তু তোমার জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি আর নিতে পারবো না, তমিজদ্দী!

থতমত খেয়ে গেছে ব্যাটা। জিজ্ঞেস করলোঃ কী কইসেন কর্তা?

আবার বললাম যা বলেছি। জলের মতো করে বুঝিয়ে দিলাম যে, ছুরি-ছোরা

বা গোলা-গুলীর ভয় থাকলে এ পথ যেন সে ত্যাগ করে।......সত্যিই যেন গোটা কয়েক ছুরির ঘা খেল তমিজদ্দী। কিছুই বললো না। বৈঠা হাতে নীরবে গিয়ে তার নৌকোয় উঠলো। বিপদভঞ্জন ঠিক তখনই আর একখানা নৌকো থেকে নামছিল।

জিজ্ঞেস করলো: কি চৌকিদার, গাঙ্গুলী বাড়ীতে কি রোজই নেমন্তন্ন থাকে তোমার?

কেন?

এই যে প্রায়ই দেখি তোমায় আসতে। বলি, বর্কশিশ ফর্কশিশ ঠিকমতো পাও তো, না সেখানেও শালা আই বি বাকির কারবার চালায়?

তমিজদ্দার মাথায় খুন চেপে গেল। আমার আঘাতেই তার রক্ত ঝরিয়ে দিচ্ছে, তার ওপর আবার বিপদভঞ্জনের ছুরি একেবারে হাড়ে গিয়ে ঠেকলো!

সে ফস্ করে অবমাননাকর কী একটা কথা উচ্চারণ করেই দ্রুত নৌকো ভাসিয়ে দিল। বিপদভঞ্জনও সোজা এসে নালিশ করলো আমার কাছে: চৌকিদার বাপ্ তুলে গাল দিয়েছে!

এমনি সাহস? জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গেই শত্রুতা? আন্দাজ করতে পারেনি চৌকিদার আমাদের ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা! আমাদের বেহিসাবী পদক্ষেপের পরিচয় যখন সে পায়নি, তখন টের পাইয়ে দেয়া যাক্ এর ভয়াবহতা! হুকুম হলো: আজ রাত্রেই—

দিন শেষ হয়ে এলো সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পর রাত, তারপর এলো মধ্যরাত্রি। স্তিমিত জ্যোৎস্নারাত। মৃদু হাওয়ায় ধান গাছগুলি দোল খাচ্ছে। গ্রাম একেবারে নিস্তব্ধ! পশ্চিম দিকের সদর জলপথে দু'একখানা বৃহদাকার নৌকো চলছে আর তার মাঝির কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে ভাটিয়ালী গানের এক-আধটা কলি।

ধীরে ধীরে একখানা নৌকো এসে লাগলো তমিজদ্দী চৌকিদারের বাড়ীর পেছন দিকে অর্দ্ধনিমগ্ন কুল গাছটার পাশে। ছায়ার মতো নিঃশব্দে ক'জন নেমে এলো নৌকো থেকে। জ্যোৎস্নারাতে পাহারা দিতে হয় না, সুতরাং নিশ্চয়ই চৌকিদার আজ আরামে নিদ্রামগ্ন।

অনেকগুলো ন্যাকড়া কেরোসিন তেল ঢেলে ভিজিয়ে তমিজদ্দীর ঘরখানার চারিদিকে বেড়ায় গুঁজে দেয়া হলো। তারপর ফস্ করে একটা মশাল

জ্বালিয়ে সেটা চারিদিকে ছুঁইয়ে দেনা হলো লঙ্কায় পবননন্দনের মতো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। জ্বলে উঠলো তমিজদ্দীর ঘরখানা। আগুনের শিখা গাছের মাথায় গিয়ে ঠেকলো।

নিঃশব্দে যে নৌকোখানা এসেছিল, দ্রুতবেগে অথচ নিঃশব্দেই তা সোজা ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেড়া আগুনে পড়েও কিন্তু মরলো না তমিজদ্দী, কারণ অন্যান্য ঘরের লোকেরা সময়মতো জেগে গিয়ে ছুটোছুটি করে বেরিয়ে এসে বালতি বালতি জল ঢেলে আগুন নিবিয়ে ফেললো। কিন্তু এতেই কাজ হলো আশাতিরিক্ত। পরদিনই সকালবেলা এসে হাজির তমিজদ্দী আমার বাড়ীতে।

অভ্যর্থনা জানিয়ে বললাম: এসো, এসো চৌকিদার! ওখানে কল্‌কে আর তামাক আছে, খাও সেজে। হ্যাঁ, তোমায় একটু প্রয়োজনও ছিল আমার। থানায় কাল আর যেতে পারবো না মনে হচ্ছে। শরীরটা ভাল নেই। রসিক কবিরাজ দেখছে, ওষুধ দিয়েছে। কিন্তু হাজিরা না দিলেও তো চলে না। তাই ভাবছি একখানা চিঠি তোমার হাত দিয়ে থানায় দোব পাঠিয়ে। তুমিও অবশ্য বলো আমার অসুখের কথা, বুঝলে?—ও কি, বসো না টুলটায়, উঠছো কেন?

তমিজদ্দী একেবারে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়লো: আমারে মাপ করেন কর্ত্তা!

মাপ? কিসের জন্য?—একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম।

তমিজদ্দী কেঁদে ফেলার মতো স্বরেই বললো: এই কানমলা খাই কর্ত্তা, আর আমি আপনাগোর পিছনে লাগুম না।

প্রশ্ন করলাম: কেন, কী হয়েছে?

সে কোনো কথা বললো না আর। দু'হাতে আমার পা জড়িয়ে ধরে এবারে একেবারে হাঁউমাউ করে কেঁদে ফেললো তমিজদ্দী। সরকারী প্রতিনিধি হলেও সে কেয়টখালী গ্রামেরই চৌকিদার।

মর্ম্মে মর্ম্মে টের পেয়েছে চৌকিদার যে, সরকারী চাকরির অপেক্ষা নিজের জীবন, ছেলেমেয়ের জীবন অনেক বেশী মূল্যবান! চাকরি গেলে আবার চাকরি মিলতে পারে, কিন্তু জীবন?……

বত্রিশ

কিন্তু গ্রামে তো শুধু একটি চৌকিদারই নেই। হয়তো এমনভাবে প্রকাশ্যে সরকারী হুকুম তামিল করবার উৎকট উৎসাহ একা তমিজদ্দীরই ছিল এবং নিশ্চিতভাবে বোঝা গেল, জীবনে সে আর এমনিভাবে আমাদের পথে বাধার সৃষ্টি করতে সাহস করবে না। কিন্তু এমনি ধূর্ত আরও আছে, যারা গোপনে এক টুকরো সংবাদ সংগ্রহ করে রং চং দিয়ে, ফুল লতাপাতা দিয়ে সাজিয়ে, ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করে থাকে ঢাকা শহরের আই বি পুলিশ সুপার গ্র্যাসবি সাহেবের শ্রীপাদপদ্মে! তারপর আরো আছে কিছু সংখ্যক আধুনিক যুধিষ্ঠির, যাঁরা জীবনের প্রতিপদে অসংখ্য অসত্যের প্রশ্রয় দিলেও আই বি বা দারোগার কাছে হয়ে ওঠেন একেবারে সত্যের অবতার, যাঁরা 'অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ' উচ্চারণেও নারাজ। ঠগ বাছতে গিয়ে কি শেষটায় গ্রামই উজোড় করে দিতে হবে?

সুতরাং সর্ব্বক্ষেত্রেই কেরোসিন তেল প্রযোজ্য নয়, ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে বসে শান্ত মনে নীতি নির্ণয় করা গেল। চরদের তালিকা প্রস্তুত করে তাদের ওপর চরবৃত্তি করবার জন্য নিয়োগ করা হলো কিছু ছেলেকে, কিছু ছেলে আমাদের গ্রামের চতুর্দ্দিকের সীমানার ওপর গোপনে রাখতে লাগলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সীমান্তরক্ষীর মতো, সন্দেহজনক আগন্তুক কেউ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলেই এদের অদৃশ্য লগ বুকে তা নোট করা হতো এবং যথাবিহিত ব্যবস্থা করা হতো, তৃতীয় একদল যুক্তিবাদী তার্কিক ছেলেকে নিয়োগ করা হলো এইসব আধুনিক যুধিষ্ঠিরদের তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করে যুক্তির খড়্গাঘাতে এদের একে একে ধরাশায়ী করবার জন্য! এইসব আয়ুধের কোনোটাই যেক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব নয় বা যেখানেই লক্ষ্যভেদে এরা অসমর্থ, সেখানেই শুধু স্থির হলো প্রয়োগ করা হবে কড়া দাওয়াই।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, তমিজদ্দী আমাদের গ্রামের আদি অধিবাসীদের একজন আর আমাদের গ্রামের শতকরা আশীজনই মুসলমান। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যও তখন জমির কারিগর। সুতরাং এই ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক কালো রং লাগিয়ে একেবারে বিকট করে তোলার কাজে কতকগুলো গুণ্ডাশ্রেণীর

লোক আত্মনিয়োগ করলো। আমি কিন্তু এসব থোড়াই গ্রাহ্য করে চলতাম আর যারা আমার আশে-পাশে চলাফেরা করতো আমারই ছায়ার মতো, তারাও মর্ম্ম দিয়ে জানতো ঃ

জন্মিলে মরিতে হবে.
অমর কে কোথা কবে ?…

একদিন সকালবেলাই এসে হাজির বছিরদ্দী। ওর ছইওয়ালা একমাল্লাই নৌকো সবাই চেনে। সারা বর্ষাকালই অর্থাৎ আষাঢ় মাস থেকে সুরু করে একেবারে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ঐ বিশেষ নৌকোখানা যে সময়ে ও অসময়ে অসংখ্যবার গাঙ্গুলী বাড়ীর ঘাটে এসে ভিড়বে, পাড়ার ও গ্রামের সবাই তা দেখে থাকে। কিন্তু কোথায় সে গেল আমায় নিয়ে, কোন্ গ্রামে, কার বাড়ীতে, সেখানে কি-কি কাজ হলো, একথা—ব্যাটাকে ফাঁসীতে লটকে দিলে জিভ বেরিয়ে পড়বে সত্য, অথচ কথা যে বেরুবে না একটিও—এ আমি নিশ্চিতভাবে জানি, যেমন করে জানি আমার নিজেকে !……

মা ঘাটে গিয়েছিলেন কী কাজে। দক্ষিণের কোঠায় বসে আমি কি একখানা বই পড়ছিলাম, শুনতে পেলাম মার কণ্ঠ ঃ কি, এই সকালেই আবার কোথায় যাওয়া হবে ?

বছিরদ্দী অশেষ বিনয় প্রকাশ করে বললো ঃ না না জ্যাঠাইমা, যাওনের লেইগা না। দাদার লগে আইছি একটু জরুরী কথা কইতে।

মা-বললেন ঃ যা, দক্ষিণের কোঠায় আছে। কিন্তু তুই জেনে রাখ বাছা, এবার তোকেও ধরে নিয়ে যাবে পুলিশ !

বাছা মুসলমান জবাব দিল ঃ তা জ্যাঠাইমা, দাদাগোর মতন লোকে যদি জেলে-জেলেই জীবনটা কাটাইতে পারে, তা হইলে আমাগোর মতন চাষাভুষার জীবনের কী আর দাম ? কী হইবো আর এই জীবনটা গেলে ?

মা হেসে বললেন ঃ তোকেও দেখছি পটিয়ে ফেলেছে।

বছিরদ্দী আমার কাছে এসে যা বললো হাত পা নেড়ে ও ফিস্ ফিস্ করে, তা এই ঃ তমিজদ্দী জমির কারিগরের সহায়তায় সারা গ্রামে প্রচার করে বেড়িয়েছে যে, হিন্দুরা মুসলমানদের এই গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করছে। তাই

সেদিন চৌকিদারদের ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে। আর এই দুষ্কার্য্যের পশ্চাতে যে গাঙ্গুলী বাড়ীর কর্ত্তাই আছে, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুতরাং—

বছিরদ্দী বললো: সেদিন রহিম স্যাখ আর আকবর খলিফা জুইতা লইয়া ওৎ পাইতা বইসা আছিল ম্যাম্বর সাহেবের বাড়ীর পচ্চিমে। আপনি গেছিলেন না থানায় হাজিরা দিতে? এই পথে ফিরলেই ওরা জুইতা দিয়া আপনারে গাইথা ফালাইয়া একেবারে আইড়ল বিলে যাইয়া ভাসাইয়া দিয়া আসবো, এই আছিল ওগো মতলব।

তারপর?

বছিরদ্দী দু' হাত একত্রে কপালে ঠেকিয়ে বললো: খোদায় যারে রাখবো, তারে মারবো কোন্ শালা? আপনি সেদিন নাকি আগে গেছিলেন বীরতারার দিকে, তাই ওরা লাগুড় পায় নাই। পাগইরা বাড়ী হইয়া ঢুকছেন গেরামে।

বললাম: কিন্তু রোজই ত আর বীরতারা যাবো না, লাগুড় যদি একদিন পেয়েই যায়?

হঃ কর্ত্তা, কি যে বলেন!—বলে বছিরদ্দী ফোকলা মুখ অবজ্ঞার হাসিতে উদ্ভাসিত করে তুললো।

তারপর বিজ্ঞের মতো বললো: আমিও কইয়া দিছি ওগো—যাইস্, কর্ত্তার গায়ে হাত তোলতে যাইস্। খালি হাত দেখস্, দেইখা, কর্ত্তার কোমরে থাকে একখান পিস্তল। গোটা দশেক তো আগে ধুপ্পুর ধুপ্পুর পইড়া যাবি, তারপর যদি পাস্ তার লাগুড়!

প্রশ্ন করলাম: পিস্তল!

বছিরদ্দী মহা উৎসাহে জবাব দিল: হ, কমু না? শালারা করবো কি? থানায় যাইবো? কউক যাইয়া বড় দারোগার কাছে। তল্লাশী কইরা পাইলে তো?—আবার তার ফোকলা মুখে হাসি দেখা গেল।

বললাম: তুই ব্যাটা আস্ত গাধা। পিস্তল দেখেছিস কখনো আমার কাছে? তবে না দেখে বললি কেন যে আমার পিস্তল আছে? ওরা থানায় জানিয়ে দিলে আমায় গ্রেপ্তার করে তো নিয়ে যেতে পারে, কয়েক মাস মুন্সীগঞ্জের হাজতেও তো রেখে দিতে পারে।—ব্যাটা পাতি নেড়ে!

বছিরদ্দী লজ্জা পেয়ে গেছে। বাহাদুরী নেবার জন্য সে যে গাল-গল্প

ছেড়েছে, তা যে ফিরে এসে তীর হয়ে আমারই বুকে বিঁধতে পারে, তা আদৌ ভাবতে পারেনি সে।

সত্যিই সে পাতি নেড়ে, সরল বোকা মুসলমান।

সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জ্জর এ যুগের মন নিয়ে বিচার করলে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যেতে হয় যে, সে যুগে এমনি নাঙ্গা ভাষায় কথা বলেও কী করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন থাকতো অক্ষুণ্ণ! অথচ সে যুগে মন ছিল সংকীর্ণ, চিন্তার সরীসৃপ বেলোয়ারী কাঁচের রঙীন গণ্ডীর মধ্যেই ঘোরাফেরা করতো। ব্রাহ্মণের বিধবা মুসলমানের ছায়া পর্য্যন্ত ছুঁতেন না। মুসলমান প্রজারা এসে দপ্তরে বসতো নীচু টুলে, পৃথক্ কল্কেতে নিজের হাতে তামাক সেজে খেতো, পুজো-পার্ব্বণে মুসলমান ছেলে মেয়েরা নতুন জামা পরে দেউড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে সমারোহ দেখতো।

কিন্তু আশ্চর্য্য, সে যুগেই আবার দেখা গেছে মুসলমান লাঠিয়াল হিন্দু জমিদারের জন্য প্রাণ দিয়েছে, সে যুগেই আকবর সর্দ্দার রমার সম্পত্তি রক্ষার জন্য লাঠির আঘাত মাথা পেতে নিয়েছে, রহিম ও রামের এমনি সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে গড়ে ওঠা বন্ধুত্বই সে যুগের সমাজকে গড়ে তুলেছে, তার বনিয়াদ করে তুলেছে দৃঢ়, তাকে শক্তিমান করে তুলেছে!......

আর আজ আচারে ও বিচারে আমরা যেখানে জাতিভেদের সংকীর্ণতার শেষটুকুও নিঃশেষে মুছে ফেলে দিয়েছি, অগ্রগামী চিন্তাধারায় আলোকিত মন নিয়ে আমরা যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের আচরণের আলোচনা করছি, সেখানে কেন এত মনোমালিন্য, কেন এত হানাহানি? শুধু সম্প্রদায় বা বসতি নয়, দেশগত পার্থক্যের গণ্ডীও ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে সখ্যের আলিঙ্গনে বাঁধবার উদ্যোগ করতে গিয়ে কেন আজ দেখতে পাই ক্ষুদ্র স্বার্থের বীভৎস রূপ, কেন আজ হিংসায় মন আমাদের হয়ে উঠেছে উন্মত্ত?

সে যুগে বছিরদ্দীকে পাতি নেড়ে বলে পরিহাস করায় যেমন সাম্প্রদায়িকতার বিষ উদ্গারিত হতো না, তেমনি ভাতের এঁটো নিয়ে আমাদেব বাড়াবাড়িকে ওরা ঠাট্টা করলেও আমরা তা সহজভাবেই গ্রহণ করতাম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বন্দরালী বা সত্তু খালাসীর মতো সর্দ্দার লাঠিয়ালদের যেমন চাচা বলে সম্বোধন করতো, তেমনি মুসলমান তাঁতীরা বাবাকে শুধু জ্যাঠামশাই বলেই ডাকতো না, হিন্দুর মতোই পদধূলি গ্রহণ করতে এগিয়ে আসতো। মুসলমানরা

মুসলমানই ছিল, হিন্দুরা হিন্দু। সম্প্রদায়গত সংস্কার বা আচরণ পরিহার না করেই একে অপরের সুখদুঃখের ভাগ নিতো। আসল কথা, সে যুগে বাহ্যিক ব্যবধানের মধ্য দিয়ে ছিল অন্তরের যোগাযোগ। জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়হীন প্রাণের দেবতাকেই সম্মান দেখানো হতো।

আর এ যুগের যান্ত্রিক সভ্যতা আমাদের সীমাহীন সতর্ক ও সপ্রতিভ করে দিয়ে আবেগের শেষ বিন্দুটুকুও শুকিয়ে দিয়েছে। তাই সম্প্রীতি আমাদের আলঙ্কারিক শব্দবিন্যাসে মুখর, অন্তঃসলিলা প্রেম-ফল্গুর উৎস সেখানে শুষ্ক! Dialectic materialism-এর পুজারী আমরা, অন্তরের আবেগকে করি তাচ্ছিল্য। ছক-কাটা ধারা-উপধারায় কন্টকিত চুক্তিপত্রের আক্ষরিক স্বর্ণপিঞ্জরে বন্দী আমাদের মন, পান থেকে চুন খসে পড়া সম্পর্কে অতিমাত্রায় সজাগ, অথচ অভিমানের তরঙ্গাঘাতে কোথায় যে বন্ধনের ভিত্তি চাপের পর চাপ ভেঙ্গে পড়ছে বর্ষাকালে পদ্মানদীর মতো, সে সম্পর্কে একেবারে উদাসীন!......কিন্তু, যাক্‌গে সে কথা।

বিক্রমপুরে বর্ষাকাল মানে যে কী, তা তাঁরাই জানেন, যাঁরা সেখানকার অধিবাসী। চতুর্দ্দিক শুধু জলে-জলাকার নয়, মাঝে মাঝে সে জলের গভীরতা আঠারো থেকে বিশ ফুট পর্য্যন্ত হবে। আমাদের গ্রাম একেবারে আড়িয়ল বিলের প্রান্তে হওয়াতে সেখানে জল এত বেশী হয়ে থাকে যে, পুরো বর্ষার সময় প্রায় প্রতি বৎসরই জল একেবারে যে উঠোন পর্য্যন্ত উঠে আসে, তাই নয়, ঘরের মধ্যেও প্রবেশ করে। তখন একঘর থেকে অপর ঘরে যাবার জন্য বাঁশের সাঁকো তৈরী করা হয়। উঠোনে হয়তো ছোট ছোট মাছের দল মনের খুশীতে ছুটোছুটি করে এবং সূক্ষ্ম জাল দিয়ে কিছু কিছু ধরাও যায়। কিন্তু সর্ব্বত্র জলে ডুবে যাবার ফলে বিছে, শুঁয়োপোকা, আরশলা, ইঁদুর, ব্যাং এবং সাপগুলো এসে আশ্রয় খোঁজে একেবারে ঘরের মধ্যে, হয়তো খাটের তলায়, হয়তো কুলুঙ্গির মধ্যে, হয়তো বালিশের পাশে! হ্যাঁ, বালিশের নীচে! এবং প্রায়ই এইসব সাপ বিষধর হয়ে থাকে। যেগুলো বিষহীন, ফণাহীন, তুর তুর করে জলে ঘুরে বেড়ায় ছোট ছোট মাছ ধরে গলাধঃকরণ করবার প্রত্যাশায় এবং ডাঙ্গায় হানা দেয় পোকামাকড় কিংবা ক্ষুদ্রাকার একটি ভেকের সন্ধানে, সেই সাপগুলো প্রায়ই

খুব স্মার্ট, কর্ম্মঠ। তাই এরা কখনো বেশীক্ষণ একই স্থানে থাকে না। সারাদিন পরিশ্রমের পর রাতের অন্ধকারে সন্তর্পণে এসে হয়তো আপনার তরিতরকারি রাখবার ডালাটির নীচেই একটু নিঃশ্বাস ফেলছে, এমন সময় ভোর হয়ে গেল! আপনার ভোরের তাগিদ থাকলেও সে বেচারার হয়তো সবে তন্দ্রা আসছিল, সুতরাং বিরক্তি বোধ তার হবেই। তাই যেই আপনি ডালাটি তুললেন, অমনি হকচকিয়ে উঠে সে প্রথমটা মাথা তুলে বিক্ষোভ প্রকাশের চেষ্টা করলো। কিন্তু হায়, ফণা নেই আর নেই দাঁতের গোড়ায় বিষের থলে! সুতরাং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা ব্যতীত পথ কোথায়? তবে হ্যাঁ, কোনো-কোনোটি আবার মরিয়া হয়ে উঠে হয়তো অকস্মাৎ আপনার পায়ের আঙ্গুলটিই গপ করে কামড়ে ধরলো যেমন করে ওরা ব্যাং ধরে বা ইঁদুরের বাচ্চা ধরে ফেলে। অবশ্য এতে বিশেষ কিছুই হয় না, সামান্য একটু ক্ষত ব্যতীত।

বিষধর সাপগুলোর কথা পৃথক্। তারা বনিয়াদী পরিবারের বড় কর্ত্তার মতো গদাইলস্করী চালে চলে, সামান্য খুঁটিনাটির প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের। সহ্য করবার শক্তি এদের প্রশংসনীয়, ডিসপেপসিয়া রোগীর মতো মেজাজ এদের আদৌ খিটখিটে নয়। ফলে যা হয় তাই হয়েছে। আপনার খুনসুটি, আপনার সুড়সুড়ি, আপনার দু'টো-একটা খোঁচাখুচিও এরা বিনা প্রতিবাদে হজম করবে অনেকক্ষণ। তারপর প্রথমটা দু'একবার নিঃশ্বাসের ঝড় তুলে জানাবে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ। তাতেও যদি ফল না হয়, তাহলেই তারা হাতে তুলে নেয় হাতিয়ার। কিন্তু কোনোক্রমে একবারটি যদি এরা এদের অধর ছুঁইয়ে দেয় আপনার হাতে বা পায়ে বা শরীরের যে কোনো স্থানে, ব্যস্, তা'হলেই সুরু হয়ে যাবে তার বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া, যার মারাত্মক জের কোথায় গিয়ে যে শেষ হবে, কেউ তা বলতে পারে না!

বর্ষাকালে বিক্রমপুরে সর্পাঘাতে কিছু লোক প্রতি বৎসরই মৃত্যুমুখে পতিত হলেও বিক্রমপুরবাসী গোখরো, শঙ্খিনী, কোবরা, দারাস্, ঘনে প্রভৃতি বিষাক্ত সাপগুলিকে দেখে অন্ততঃ আতঙ্কে যে মূর্চ্ছা যায় না তা সত্যি।

বর্ষার জলে ডুবে-যাওয়া গাছের যে অংশ জলের ওপরে থাকে, বর্ষাকালে সাপ প্রায়ই আশ্রয় নেয় সেইসব গাছের কোটরে বা শাখায়। রাত্রে এমনি কোনো গাছে নৌকো বেঁধে রাখলে কখনো কখনো সাপ গাছ ছেড়ে এসে নিরাপদ ও উৎকৃষ্ট আশ্রয় খোঁজে নৌকোর পাটাতনের নীচে।......

সাপের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে কী করে বারকয়েক সাপের হাতে আমি পড়েছিলাম এবং প্রতিবারই রক্ষা পেয়েছিলাম কোনোক্রমে। হয়তো ভাগ্যের জোরে। তবে কোনোবারই বর্ষাকালে সাপের কবলে পড়তে হয়নি আমায়।

একবারের কথা বলছি। সেটা চৈত্র মাস হবে, বিক্রমপুরে তখনো বর্ষার জল প্রবেশ করেনি। আমাদের গ্রামের ফুটবল খেলবার ছোট মাঠটি ছিল আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে শ' তিনেক গজ দূরে।

একদিন বিকেলে ঐ মাঠে খেলাধূলার পর সুশীল আর আমি তৎক্ষণাৎ বাড়ী গেলাম না। আমার সঙ্গে ছিল কর্ণার্জ্জুন নাটকখানা আর তখন গ্রামে কর্ণার্জ্জুন নাটকাভিনয়ের তোড়জোড় চলছে। সবাই একে একে চলে গেলেও আমি ঘাসের ওপর আধ-শোয়া অবস্থায় সুর করে নাটকখানা পাঠ করা সুরু করলাম, সুশীল সম্মুখে বসে অভিনিবেশ সহকারে তা শুনতে লাগলো।

পাঠ যখন বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় মনে হলো আমার কোমরের কাছে কি যেন অত্যন্ত মৃদুভাবে স্পর্শ করলো। প্রথমটা ভাবলাম সুশীল বোধহয় আমার হাণ্টারটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করছে, তাই লেগে গেছে অসাবধানতায়। সুতরাং আবার কর্ণের অংশ সুর করে পাঠ সুরু করলাম।

তখন চারিদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। পুব দিকের মাঝিবাড়ীতে দুটো-একটা আলোও জ্বলে উঠেছে। দেখা যাচ্ছে গাছপালার ফাঁক দিয়ে তার আভা। একটু পরেই মজুমদার বাড়ীতে কর্ণার্জ্জুন নাটকের মহলা সুরু হবে উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। কর্ণের ভূমিকায় আমাকেই নামতে হবে। সুশীলের কোনো ভূমিকা নেই। ষ্টেজে দাঁড়াতে তার পা কাঁপে, গলা শুকিয়ে যায়, সমস্ত কথাই ভুলে যায়, স্মারকের একবর্ণও তার কানে প্রবেশ করে না। তাই সে উৎসাহী কর্ম্মী মাত্র। বিশেষ করে আমার অভিনয়ের সে একজন অন্ধ স্তাবক। বহুবার সে আমায় পরামর্শ দিয়েছে কলকাতায় গিয়ে কোনো সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করবার।

অকস্মাৎ অনুভব করলাম, সুশীল আমার হাণ্টারটা আমার কোমরের ওপর দিয়ে বুকের ওপর ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু কেন? পাশে তাকিয়ে দেখি হাণ্টারটা তো আমার সুমুখেই ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে। তবে?

বুকের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখি একটা প্রকাণ্ড সাপ আমার গা বেয়ে উঠছে !!

তৎক্ষণাৎ একটা পালটি খেয়ে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। সুশীল ও আমি কয়েক হাত দূরে সরে এসে দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখলাম সেই আবছা অন্ধকারে বিষধর সর্পটি বিরাট ফণা উচ্চে তুলে দোল খাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ফোঁসফোঁসানি !

সুশীল বললো ঃ গোখরো সাপ। টেরই পায়নি যে, কোনো মানুষ। তোকে এক টুকরো কাঠ মনে করে ওটা বেয়ে উঠছিল ওপরে।—ইস্, কামড়ালে বাঁধবার জায়গাও থাকতো না রে। একেবারে বুকের পাঁজরায় !

দেখলাম, সাপটা খানিকক্ষণ ফোঁস ফোঁস করে ক্রোধ প্রকাশ করলো, তারপর ফণা নামিয়ে এঁকেবেঁকে ঢুকলো গিয়ে পাশের ঝোপে।

এমনি আরো কয়েকবার। প্রতিবারই এমনি কানের পাশ দিয়ে ফাঁড়া কেটে গেছে যে, শেষ পর্য্যন্ত সাপের ভয় আমার আর ছিল না। কেন যেন আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে. বিধাতা সর্পাঘাতে মৃত্য আমার জন্য বোধ হয় ব্যবস্থা করেননি।

তেত্রিশ

মাণিকের মৃত্যুতে আমার দক্ষিণ হস্ত ভেঙ্গে যাবার পর তা জোড়া দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম প্রাণপণ করে। যেখান থেকে যাকে পেতাম, তার মধ্যেই খুঁজে বেড়াতাম আমার হারানো মাণিককে। ইন্দু সরকার মারফৎ নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হলো এবং রীতিমতো সেখান থেকে লোক যাতায়াত স্নুরু করলো আমাদের এখানে। বিক্রমপুরের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই কোনো-না-কোনো সূত্রে প্রবেশ করতে সমর্থ হলাম, প্রায় প্রত্যেক স্কুলেও। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বা গভীর রাত্রে গ্রামের সবাই নিদ্রামগ্ন হলে বছিরদ্দীর একমাল্লাই নৌকোখানা সন্তর্পণে এসে ভিড়তো আমাদের দক্ষিণ দিকের ঘাটে। জানালায় সাংকেতিক টোকা পড়লেই উঠে পড়তাম আমি। প্রস্তুত হয়ে নিয়ে পাশের ঘর থেকে চুপি চুপি ডেকে তুলতাম ফুলবৌদিকে। ফুলদা' কিংবা তিনি উঠে দরজা বন্ধ করে দিতেন আর আমি এসে উঠতাম নৌকোয়। ফুলদা'কেই শুধু জানিয়ে যেতাম গন্তব্যস্থানের কথা। কারণ জরুরী অবস্থায় যাতে অনায়াসে আমার কাছে তিনি যেতে পারেন, তার পথ খোলা রাখা দরকার ছিল।

সারারাত কাজ করে ভোর হবার পূর্ব্বেই আবার বছিরদ্দীর নৌকো এসে আমায় নামিয়ে দিয়ে যেত। টের পেতেন ফুলবৌদি ও ফুলদা'। কারণ তাঁরাই দিতেন দরজা খুলে।

যেখানে গেছি, সেখানেই খুঁজেছি মাণিক। হারানো রতনকে খুঁজে বার করবার জন্য ক্ষ্যাপা যেমন করে বেড়িয়ে বেড়াতো। ভালো ছেলে অনেক পেয়েছি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সাহস যাদের অতুলনীয়, সামান্য সঙ্কেতে সব-কিছু ত্যাগ করে নিমাইয়ের মতো বেরিয়ে আসার জন্য যারা পাগল, কিন্তু তবু মাণিকের দেখা পেলাম না। ভাঙ্গা হাত জোড়া দেবার চেষ্টা কি তবে বিফল হবে?

আশা যখন প্রায় চিরদিনের জন্য ত্যাগ করছিলাম, এমন সময় অকস্মাৎ পেলাম এক নতুন মাণিককে। আজ তার কথা মনে পড়ে। স্বীকার করতে এতটুকু দ্বিধা নেই যে, সে সময় মাণিকের অভাবটা পূর্ণ করে দিয়েছিল স্নুবোধ চক্রবর্ত্তী। তন্তর গ্রামের স্নুবোধ চক্রবর্ত্তী।

তার প্রতি আমার যে আদেশ যখনি দেয়া হয়েছে, তখনই সে বিনা প্রতিবাদে, বিনাবাক্যে তা সমাধান করেছে এবং তা সুষ্ঠুভাবে। তাকে বলেছিলাম প্রতি রবিবারে একটি করে নতুন ছেলে নিয়ে আসতে আমার সঙ্গে পরিচয়ের জন্য। আমার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্ব্বেকার কাজগুলো নিখুঁতভাবে শেষ করে সত্যিই প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর সে একটি করে ছেলে নিয়ে আসতো। এমনি নিয়ম সে পালন করে চলেছিল অনেক কাল, বোধহয় পুরো দেড় বৎসর। তারপর আরও বৃহত্তর প্রয়োজনের তাগিদে সুবোধকে আত্মনিয়োগ করতে হয়।

গর্ব্বভরে আজ স্মরণ করি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মারফৎ সুবোধের দেশসেবার কথা। বেয়াল্লিশের আন্দোলন সুরু হবার প্রাক্কালে গ্রেপ্তার করে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের প্রায় সবাইকে যখন নিরাপত্তা বন্দীরূপে বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ রাখা হয়েছে, সেই সময় একা এই সুবোধ চক্রবর্ত্তীই ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত পলাতকভাবে বাংলা, বিহার ও আসামে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের যে সব গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলে এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সেই সব সংগঠন কীভাবে যোগদান করে, ফাঁসীর ঝুঁকি নিয়ে কীভাবে তারা মিত্রশক্তির পরাক্রমশালী গোয়েন্দা বিভাগের শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে আরাকানের পথে বর্ম্মায় সংগ্রামরত আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সেই অমর কাহিনী আজও লিপিবদ্ধ করা হয়নি। নেতাজীর ভারত ত্যাগের সঙ্গে এই বি ভি বিশেষভাবে জড়িত, আফগানিস্থানের সীমান্ত পার করে দিয়ে আসবার পরও নেতাজীর সরাসরি গোপন যোগাযোগ ছিল এই বি ভি-র সঙ্গে ততদিন, যতদিন না জার্ম্মাণী রাশিয়া আক্রমণ করে বসে, তারপর আবার এই যোগসূত্র স্থাপিত হয় নেতাজী সিঙ্গাপুরে আসবার পর।

কিন্তু একা সুবোধ সে যুগে কতখানি করেছিল পুলিশের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করে পলাতকভাবে, তার খানিকটে আভাস দেবার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারছিনে। আমার আত্মস্মৃতির সঙ্গে সুবোধের ইতিবৃত্ত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমার সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্বের বিষয় এই যে, এই সুবোধ চক্রবর্ত্তীকে আমিই নিয়ে আসি প্রথম বিপ্লবী দলে।

সেটা ১৯৩০ সাল। জ্যৈষ্ঠ মাস। বিক্রমপুরে তখনো বর্ষার জল প্রবেশ করেনি। ছোট ভাই রঙ্গলালকে নিয়ে আমি গিয়েছিলাম বেড়াতে ইছাপুরা

গ্রামে ফুলবৌদির বাপের বাড়ীতে। গরীব হলেও এই পরিবারটির আদরযত্নের মধ্যে পাওয়া যেত অন্তরের স্পর্শ, তাই মাঝে মাঝে যেতাম সেখানে। অবশ্য প্রমোদভ্রমণে নয়, সংগঠনের অভিসন্ধি নিয়ে। বিক্রমপুরে ইছাপুরা বৃহৎ গ্রামগুলির অন্যতম। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় সকলেই শিক্ষিত ও সচেতন। সচেতন শুধু দেশের সংবাদ রাখবার বেলায় নয় অথবা সরকারী ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনার ক্ষেত্রে নয়, স্বার্থ সম্বন্ধেও এরা অত্যধিক সচেতন বলে ঐ গ্রামের অধিবাসীরাই বলতেন। ফলে স্থঁচ হয়ে এই গ্রামে প্রবেশের সুযোগও পারছিলাম না সৃষ্টি করে নিতে। চেষ্টা চলছিল শুধু।

মনে পড়ে সেদিন দুপুরবেলা রান্নাঘরে রনু আর আমি পাশাপাশি খেতে বসেছি আর ফুলবৌদি করছেন পরিবেশন। নানারকম কথাবার্ত্তার মধ্যে অকস্মাৎ রনু বললো যে, নাটকে স্ত্রী-ভূমিকার জন্য আর ভাবতে হবে না। স্ত্রী-ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করতে পারে, এমনি একটি ছেলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। নাম মনু, তস্তর গ্রামে বাড়ী।

আমি উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, ওকে একদিন সংবাদ দিয়ে কেয়টখালীতে নিয়ে আসতে। রনু তৎক্ষণাৎ জবাব দিল: আজ সে এই গ্রামেই এসেছে দাদা! ডেকে আনবো?

প্রশ্ন করলাম: এখানে, কেন?

রনু জবাব দিল: আজ যে এখানে নিখিল বঙ্গ পোষ্টাল সম্মেলন, না কি একটা সম্মেলন হবে, তাতে মিশরকুমারী নাটক অভিনয় হবে। মনু সেই নাটকে সায়ার ভূমিকায় নামবে।

বললাম ডেকে আনতে।

বিকেলের দিকে অনেক খোঁজাখুজি করে রনু ধরে নিয়ে এল মনুকে। দেখলাম বছর পনেরো বয়স হতে পারে। গায়ের রং ফরসা বলা যায় না, স্বাস্থ্যও তেমন ভালো নয়; কিন্তু সর্ব্ব অবয়বে যেমন আছে একটা লালিত্য, তেমনি বুদ্ধির ছাপ। ভালোই লাগলো।

আলাপ করলাম। জানা গেল, ইছাপুরা গ্রামে সে আরও অনেকবার নাটকাভিনয় করেছে। প্রতিবারই সুখ্যাতি হয়েছে তার। সিংপাড়া হাই স্কুলে ক্লাস এইটে-এ পড়ে!

প্রথম দিনের আলাপ হলো একান্ত ব্যক্তিগত······বাবা, মা, ভাই, বোনের

কথা, আর্থিক অবস্থার কথা, সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা, ম্যাট্রিক পাশ করে সে কি করতে চায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা।

একদিন কেয়টখালী আমাদের বাড়ীতে আসতে বলে দিলাম ছেলেটিকে। সে ফস্ করে প্রশ্ন করে বসলো : কেন ?

বললাম : আমরাও একটা নাটক শীগ্গিরই করবো, তাতে তোমায় একটা পার্ট দোব।

প্রশ্ন করলো সুবোধ : পারবো কিনা না দেখেই পার্ট দেবেন কেন ?

এই কেন-র জবাব এড়িয়ে গেলাম কৌশলে। শুধু নাটকের নায়িকা করবার জন্যই যে তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি না, এর পশ্চাতে আছে একটি বৈপ্লবিক পরিকল্পনা, আদৌ প্রকাশ করলাম না তা।

নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুবোধ চক্রবর্ত্তী এল আমাদের বাড়ীতে। অল্প দিনের মধ্যেই সে ধরা দিল এবং একেবারে আমাদের পরিবারেরই একজন হয়ে পড়লো মা, বাবা, বৌদি সবার সঙ্গে মিলে-মিশে।

কাজের উৎসাহ দেখেছি তার একেবারে সীমা-পরিসীমাহীন। এমনি অত্যন্ত সরল ও হাসিখুশী হলে কি হবে কাজের বেলায় তাকে দেখেছি কঠোরতম সিরিয়াস্ কর্ম্মী ও সংগঠক।

১৯৪১ সালে সে ছিল ঢাকা জেলা ফরোয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক। মেজর সত্য গুপ্ত প্রমুখ বি ভি-র প্রায় সবাইকেই তখন গ্রেপ্তার করে নিরাপত্তা বন্দীরূপে বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ঢাকা শহরে ফরোয়ার্ড ব্লক অফিসে পুলিশ হানা দেবার পূর্ব্বক্ষণে সুবোধ গা ঢাকা দিল এবং পুলিশের হুলিয়া প্রথমটা অত্যন্ত জোরালো থাকে জেনে সে সোজা চলে গেল আসামে। সেখানে বন্ধু জ্যোতিলালের সাহচর্য্যে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তার মারফৎ জনসাধারণের সঙ্গে মেশবার সুযোগ গ্রহণ করে সুবোধ যুদ্ধবিরোধী সংগঠন সুরু করে দেয়। সেখান থেকে সে আসে ময়মনসিংহে, সেখান থেকে ঢাকায়, বিক্রমপুরে, ফরিদপুরে এবং অবশেষে বিহারেও গিয়ে সে হাজির হয়।

এদিকে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের পলাতক এই নেতার জন্য গভর্ণমেন্ট পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। নেতাজী তখন ভারত ত্যাগ করেছেন। কেন করেছেন, তা দেশের মধ্যে যাঁরা জানতেন, তাঁদের মধ্যে সত্যরঞ্জন বক্সীও একজন। কিন্তু বাইরে কেউ নেই, নিরাপত্তা বন্দীর শৃঙ্খল গভর্ণমেণ্ট সবাইকে

পরিয়ে দিয়েছেন। অতএব বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সর্ব্বময় কাজের ভার স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে সুবোধ চক্রবর্ত্তী ও আরো ক'জনের ওপর।

দ্বিধাহীনভাবে বলবো এবং জোর গলায় বলবো, সুবোধ সে দায়িত্ব প্রাণপণে পালনের চেষ্টা করেছে। কতখানি কৃতকার্য্য সে হয়েছিল, সে বিচার এখানে নয়; এখানে উল্লেখযোগ্য, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার এগিয়ে আসার সাহস। ওজর দেখিয়ে অনায়াসে সরে পড়তে পারতো সে। কৈফিয়ৎ তলব করবার জন্যও বাইরে কেউ ছিল না। কিন্তু সে যে সেই জগতের ছেলে, যারা দায়িত্বের মূল্য দেয় নিজেদের জীবনের চাইতে বেশী।

বাংলা, বিহার ও আসামের বিভিন্ন স্থানে পলাতকভাবে ঘুরে বেড়াতো সে এবং প্রত্যেক শহরে পৌঁছেই সে সেখানকার পুলিশ সুপারের নামে একখানা চ্যালেঞ্জ-পোষ্টকার্ড ছেড়ে দিতো: হ্যাল্লো মিঃ সুপার, আমি আজ এই শহরে এসেছি। যদি পার গ্রেপ্তার কর।

এমনিভাবে চ্যালেঞ্জ করে ঘুরতে ঘুরতে সে অকস্মাৎ ধরা পড়ে যায় ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে। বিক্রমপুরে বর্ষার জল প্রবেশ করলেও তা তখনো মাঠ-ঘাট ডুবিয়ে দেয়নি। সাহেবী পোষাক পরে সুবোধ যাচ্ছিল লৌহজং ষ্টেশনে। নৌকোর মধ্যে পোষাক পরেই সে শুয়ে রয়েছে। মাথার কাছে একটি টিনের সুটকেশ। তার ওপর স্তূপীকৃত কাগজপত্র ও তার ওপর একটি দেশলাই।

তখন সবে ভোরের আলো পূবের আকাশ দ্যুতিময় করে তুলেছে। গাছে-গাছে সদ্য-জাগা পাখীর কিচির মিচির শব্দ শোনা যাচ্ছে। দু'ধারে উঁচু খালের মধ্যে দিয়ে সুবোধের নৌকো এগিয়ে চলেছে। এসে পড়েছে কিন্তু সে একটি মারাত্মক স্থানে। শ্রীনগর থানার দক্ষিণের খালের বাঁকটা ঘুরতেই একেবারে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সম্মুখে পড়ে গেল দারোগার নৌকো। দারোগা তাকে ভালো করে লক্ষ্যই করেননি, করলেও হয়তো তৎক্ষণাৎ সাহেবটিকে চিনতে পারতেন না। কিন্তু সঙ্গে ছিল মতি দফাদার। সুবোধদের তন্তর গ্রামের দফাদার। শৈশবকাল থেকে তাকে সে চেনে। সে হঠাৎ বলে উঠলো: আরে, মনুবাবু না?

দারোগা প্রশ্ন করলেন: মনুবাবু কে রে?

আমাগো গেরামের—বলে সে আরো কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু দারোগা

বাধা দিয়ে চীৎকার করে উঠলেন : আরে, মনু মানে সুবোধবাবু, সুবোধ চক্রবর্ত্তী ? তন্তরের সুবোধ চক্রবর্ত্তী—এই মাঝি, সাবধান ! আমাদের নৌকোর সঙ্গে লাগা নৌকো, তা নইলে তোকে আজ আস্ত খেয়ে ফেলবো !

তার প্রয়োজন ছিল না। খাল ওখনো এতখানি সঙ্কীর্ণ যে, দারোগার নৌকোর সঙ্গে গা ঠোকাঠুকি না করে সুবোধের বেরিয়ে যাবার উপায় ছিল না। গ্রেপ্তার অবধারিত জেনে সে তৎক্ষণাৎ দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলে দিল এবং সহাস্যে ছইয়ের বাইরে এসে কোটটা গায়ে দিতে দিতে বললো : হ্যাল্লো হারাণবাবু, এত ভোরে কোথায় গিয়েছিলেন ?

হারাণ দারোগা খুব হুঁশিয়ার ব্যক্তি। তিনিও রিভলভার-আঁটা বেল্টটা কোমরে জড়াতে জড়াতে হেসেই জবাব দিলেন : আর বলবেন না দুর্ভোগের কথা। হলদিয়ায় ডাকাতি হবার সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলাম। সারাটি রাত থাকলাম ওৎ পেতে বসে। কোথায়, ডাকাতের নাম গন্ধ নেই। সারাটি রাত অনর্থক জেগে এলাম একটা ভুয়ো সংবাদের ওপর।—তারপর সুবোধের নৌকোয় অকস্মাৎ লাফিয়ে পড়ে সুবোধের কাঁধে সস্নেহে একখানা হাত রেখে সহাস্যে বললেন : তবু যা হোক, আপনাকে পেয়ে পরিশ্রমটা সার্থক হলো বলা যায়। শালা আই বি-রা বার বার এসে ধমকে যায় আমাদের যে, আপনি নাকি বিক্রমপুরেই ঘোরা-ফেরা করেন, অথচ মুর্খ আমরা ধরতে পারিনে।

সুবোধ হেসে বললো : তা আমায় আই বি যে খুঁজছে, সে কথাটা একবার একটু কষ্ট করে জানিয়ে দিলেই তো আমি নিজে গিয়ে ঢাকায় হাজির হতাম ওদের অফিসে। পালিয়ে বেড়াবার প্রয়োজন কী বলুন ?

সে আমি জানি !—বলে বিজ্ঞের মতো হেসে উঠলেন দারোগাবাবু। বললেন : চলুন, থানায় যাই।

সবাই থানায় এসে উঠলো। বারান্দায় সশস্ত্র একজন প্রহরী বুটের আওয়াজ তুলে দারোগাকে স্যালুট করলো।

দারোগা তাকে ইশারায় ডেকে নিয়ে অপর প্রান্তে গিয়ে এক মিনিট কি বলতেই সে আবার বুটের আওয়াজ তুললো। অর্থাৎ শীকারটি যে আর কেউ নয়, স্বয়ং সুবোধ চক্রবর্ত্তী আর তার মূল্য যে নগদ পাঁচ হাজার রৌপ্যমুদ্রা, সেই খোশ খবরটাই জানিয়ে দিলেন বন্দুকধারীকে। তারপর ঘরে প্রবেশ করে

ফাইলপত্র টেবিলের ওপর রেখে দারোগা বললেনঃ সুবোধবাবু, Please excuse me, সারাটি রাত এক মিনিট ঘুমোতে পারিনি। আপনি একটু বসুন, আমি চোখমুখ ধুয়ে আসছি। এখুনি আসবো, কেমন ?

অত্যন্ত সহজভাবে বললো সুবোধঃ কিন্তু আমার সুটকেশ ও আমার দেহ-তল্লাশীর বিদঘুটে কাজটি সেরে গেলেই ভালো হতো না কি ? তা'হলে আমিও এই বিদেশী পোষাক ছেড়ে ধুতি পরতে পারতাম।

সান্ত্রীর প্রতি একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে তাচ্ছিল্যভরে বলে উঠলেন দারোগাঃ আরে রেখে দিন তল্লাশী! কাগজপত্র যা ছিল তা তো দেখলাম চোখের সমুখেই পুড়িয়ে ফেললেন। আর কিছু নেই। থাকলে তার সদ্‌গতি না করে পুলিশের হাতে ধরা দেবার পাত্র অন্ততঃ তন্তর গ্রামের সুবোধ চক্রবর্ত্তী যে নয়, এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে।—আসছি, Please don't mind—

হারাণ দারোগা সহাস্যে গৃহাভিমুখে চলে গেলেন। সুবোধও হাসলো মনে মনে। তার পকেটে তখন একটি গুলী-ভরা ছ'-ঘরা রিভলভার!···

সেদিন শ্রীনগরের হাটের দিন। সকালেই হাট বেশ জমে যায়। ঘরের মধ্যে বসে পেছনের জানালা দিয়েই দেখা যাচ্ছে কত লোক ফিরছে আনাজ-তরকারি নিয়ে, দুধ, মাছ নিয়ে আর কত লোক যাচ্ছে সওদা করতে। দূরে খালের যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে, সেখানে নৌকোর পর নৌকো এসে থামছে আর নামছে হয় ব্যবসাদার, নয় খরিদ্দার।

বাইরের বন্দুকধারী সিপাইটা নিশ্চিন্ত মনে বারান্দায় একজন দফাদারের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। আজ বুঝি ওদের হাজিরা দিবস। তাই দলে দলে থানা-প্রাঙ্গণে এসে জমায়েৎ হচ্ছে দফাদার আর চৌকিদার। গ্রাম্য সরকারী চাকুরে, জানে না এরা যে, তাদেরই মহামান্য সরকার একেবারে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন এমন একটি ব্যক্তির গ্রেপ্তারের জন্য, গত দু'বছর যাবৎ যে তাদের ফাঁকি দিয়ে সফর করে বেড়াচ্ছিল সারা বাংলা দেশ, বিহার ও আসামে এবং শান্তশিষ্ট সুবোধ বালকের মতো এখন যে বসে আছে তাদেরই সম্মুখে।

কিন্তু সুবোধ বালকের মতো বিনা প্রতিবাদে ধরা দেবে সুবোধ চক্রবর্ত্তী ? হারাণ দারোগা চা ও জলখাবার খেয়ে এসে টেবিলে বসে একটি কলমের আঁচড়েই তৈরী করবে পুরো পাঁচ হাজার টাকার বিল ? সুড়সুড় করে ঢুকবে সে হাজতে ? কিন্তু রিভলভার ? এতক্ষণ ভদ্রতা করলেও হাজতে ঢোকাবার

পূর্ব্বে দেহতল্লাশী করতে গিয়েই তো বেরিয়ে পড়বে তা। সুবোধ বালকের মতো তুলে দেবে এই অমূল্য আগ্নেয়াস্ত্রটি হারাণ দরোগার হাতে? বেনীর মতো আদৌ করবে না দুরন্তপনা?

বন্দুকধারী সিপাইটি দরজার কাছে নিশ্চিন্ত মনে পায়চারি করছে। মাঝে মাঝে চৌকিদার বা দফাদারের সঙ্গে মিঠে দু'একটা কথাও বলছে ও হাসছে।

রিভলভারের একটি গুলীতেই সিপাইটাকে ধরাশায়ী করা যায়! কিন্তু যে শব্দ হবে, তাতে ব্যারাকের সিপাইগুলো সহজেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলবে এবং চৌকিদাররাও, পথচারীরাও……তাতে কয়েকটা খুন করা যাবে, কিন্তু পলায়নের পথ সুগম হবে না। যতখানি সম্ভব, নীরবে কাজ হাসিল করাই উচিত।……হারাণ দারোগা মুখ ধুতে গেছেন প্রায় দশ মিনিট। ফিরে আসবার সময় হয়ে এল। ফিরে আসবার পূর্ব্বেই যা করবার করতে হবে……এলে আর হবে না।——দেয়াল-ঘড়ির দোলকটা টিক্ টিক্ করছে, থানার কক্ষ একেবারে নির্জ্জন…হাটের কোলাহল বেড়ে চলেছে…সিপাইটা বন্দুক ভর করে দাঁড়িয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছে মতি দফাদারের সঙ্গে…ব্যারাকের সিপাইরা বোধহয় তাস খেলা সুরু করেছে…শোনা যাচ্ছে—আঠারো?—আছি।…বিশ?—আছি।…বাইশ?—পাস এ্যাণ্ড ডাবল্…ডিক্লেয়ার।

—অকস্মাৎ সশস্ত্র সিপাইটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচণ্ড এক মুষ্ঠ্যাঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে বারান্দা থেকে রেলিং টপকে একেবারে প্রাঙ্গণে লাফিয়ে পড়লো সুবোধ। প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল চৌকিদার ও দফাদারের দল। কিন্তু আর-এক ঘুষিতে মতি দফাদারের নাক ফেটে গিয়ে যখন রক্তের ধারা নামলো তার ঠোঁট বেয়ে, তখনই তারা বুঝতে পারলো আসল ব্যাপারটা। ডিক্লেয়ার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব্যারাক থেকে লাফিয়ে পড়লো জনকতক সাদা পোষাকধারী সিপাই। ছুটলো হাটের দিকে প্রাণপণে, সঙ্গে যোগদান করলো চৌকিদার ও দফাদারের দল! সান্ত্রী ততক্ষণে পাউচ খুলে রাইফেলে বুলেট ভরে নিয়েছে। কিন্তু চিড়িয়া ভাগ গিয়া!…

সুবোধ ততক্ষণে একেবারে হাটের ভিড়ে এসে মিশে গেছে। তা'হলেও নিশ্চিন্তে গা-ঢাকা দেওয়া যাবে না এখানে। পেছনের দল 'চোর' 'চোর' করে চীৎকার করছে। এখনই এসে পড়বে হাটে। অতগুলো লোক ঠিক ধরে ফেলবে তাকে, সাহেবী পোষাক-পরা পলাতক আসামীকে।

অকস্মাৎ সুবোধও হল্লা সুরু করলো 'চোর' 'চোর' বলে, সঙ্গে সঙ্গে আরও কণ্ঠ এসে যোগদান করলো : চোর, চোর!

সুবোধ বলে উঠলো : কোথায় যাচ্ছেন মশাই? ঐ দিকে গেছে ব্যাটা পকেট মেরে। ঐ পশ্চিম দিকে, ঐ বাবুদের বাড়ীর দিকে। ঐ দিকে ধাওয়া করুন, শালা যাবে কদ্দূর? শালা চোর—

সবাই ছুটলো বাবুদের বাড়ীর দিকে।

শালা চোর কিন্তু ততক্ষণে এসে হাজির পূব দিকে খালের পাড়ে। বহু নৌকো বাঁধা রয়েছে লগিতে। কোনোটাতে কেউ আছে, কোনোটা শূন্য। অত্যন্ত শান্তমনে দড়ি খুলে নিয়ে সুবোধ উঠে পড়লো একখানা ছোট নৌকোয়। প্রাণপণে বৈঠা চালাতে লাগলো।

বাবুদের বাড়ীর দিকে ধাওয়া করছিল যারা শালা চোরকে গ্রেপ্তার করতে, কনেষ্টবল, চৌকিদার ও দফাদারের দল এসে পড়তেই সে ভুল ভাঙলো তাদের এবং বুঝতে আদৌ দেরী হলো না যে, সাহেবী পোষাক-পরা যে লোকটি চোরের সন্ধানে যেতে বলেছিল পশ্চিম দিকে, সে-ই শালা চোর, গেছে পূব দিকের খালে।

—প্রাণপণে বেয়ে চলেছে সুবোধ। হাটে এতক্ষণে নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে গেছে, হল্লা সুরু হয়েছে, হুলিয়া বেরিয়ে পড়েছে, হারাণ দারোগা হয়তো রিভলভার ছেড়ে রাইফেল নিয়েই নৌকো ভাসিয়েছেন···জ্যান্ত না পারলেও, অন্ততঃ লাস নিয়ে গ্র্যাসবি সাহেবের শ্রীচরণে নিবেদন করতে পারলেও···কিন্তু ও কি, পেছনে দূরে দেখা যাচ্ছে একখানা বড় নৌকো, ছুটে আসছে তার দিকে, একটা লাল পাগড়িও দেখা যাচ্ছে!—ঐ তারা আসছে, কথাও এক-আধটা শোনা যাচ্ছে যেন—

কতক্ষণ আর পারবে সুবোধ! সে একা, আর ওরা একাধিক। গলা শুকিয়ে আসছে তার, সর্ব্বশরীরে তীব্র ব্যথা—জলের মধ্যে বৈঠা আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়ে তোলা ভারী কষ্টকর! কিন্তু সংজ্ঞা হারিয়ে পাটাতনের ওপর বা জলের মধ্যে পড়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত সে চালাবেই এই চেষ্টা।

পশ্চাতের নৌকো শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে আসছে বোঝা যাচ্ছে। মধ্যকার ব্যবধান প্রতি সেকেণ্ডে কমে আসছে···ওদের উল্লাসধ্বনি স্পষ্ট কানে আসছে··· সুবোধ একবার হাত দিয়ে অনুভব করলো—হ্যাঁ ঠিক আছে। ধরা যদি দিতেই হয়, তা'হলে অন্ততঃ দু'জনকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় করে দিয়ে তারপর···

অকস্মাৎ চমকে উঠলো সুবোধ। অদূরে একখানা ছোট নৌকোর মাঝি চীৎকার করে উঠলো: ডর নাই, ডর নাই কত্তা। আসেন, ফাল্ দিয়া আসেন আমার নৌকায়। বৈঠাডা লইয়া আসেন। কলিমদ্দী বাইচা থাকতে ধরবো আপনারে? অখনো মরি নাই—

বলতে বলতে লোকটা একেবারে সুবোধের নৌকোর গায়ে নৌকো লাগিয়ে দিল। কে এ? কী করা যায়? মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে যদি পুলিশেরই হাতে তুলে দেয়?···কিন্তু ভাববার অবসর নেই, এক-একটি মুহূর্ত্ত—

লাফিয়ে পড়লো সুবোধ কলিমদ্দীর ছোট নৌকোয়। কলিমদ্দী উৎসাহ দিল: হ্যান্, মারেন তো কয়ডা খ্যাও ঠাকুর ঠাকুর কইরা। শালাগো কলিমদ্দীর কবজির জোর দেই দেখাইয়া, হ্যান্—

মিথ্যে বলেনি মুসলমান মাঝি। তীর বেগে ছুটে চললো নৌকো ঘোলঘর বাজারের দিকে। কলকল ছলছল শব্দ। জল কেটে নয়, জলে তরঙ্গ তুলে। সম্মুখে নুঁয়ে পড়ে বৈঠাখানা আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিচ্ছে কলিমদ্দী, প্রাণপণে জল টানছে। আবার ডোবাচ্ছে, আবার টানছে। ঝপাঝপ বৈঠার শব্দ। আঘাতে আঘাতে উৎক্ষিপ্ত জল কালো শরীর ভিজিয়ে দিচ্ছে। সকালের নরম রোদ জলজ্বল করছে। কোনোদিকে দৃক্পাত নেই কলিমদ্দীর। যেন অক্স্ফোর্ড ক্যাম্ব্রিজের নৌকা বাইচ!······পশ্চাতের নৌকো এবার ধীরে ধীরে পেছিয়ে পড়তে লাগলো। আর শোনা যায় না ওদের আনন্দকলরব, লাল পাগড়ি আর দেখা যায় না।

ঘোলঘর বাজারে শ্রান্তদেহে অবতরণ করে সুবোধ কলিমদ্দীর হাতে একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিতেই সে এক গাল হেসে বলে উঠলো: চিনলেন না কত্তা আমারে?

চমকে উঠলো সুবোধ: না তো। মনে তো পড়ছে না—

ভুইলা গেছেন।—কলিমদ্দী হেসে বলতে লাগলো: হ, দুইবার কি তিন বার গেছি আপনারে লইয়া কেয়টখালী গাঙ্গুলী বাড়ীতে। ক্যান্, এই তো সেইবার গেছিলাম দুপইর রাত্তিরে বীরতারার মজুমদার বাড়ীর কারে জানি লইয়া—

ও—মনে পড়েছে সুবোধের। তার মনে না থাকলেও কলিমদ্দী ভোলেনি তাকে।··· কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পেলো না সুবোধ। আরও একখানা

নোট তার হাতে দিয়ে বললো: তুমিই ভাই বাঁচিয়েছ আমায়! নইলে একা সাধ্যি ছিল না আমার। ধরা পড়ে যেতাম।

কলিমদ্দী বিজ্ঞের মতো হেসে বললো: হ, হ, বুঝছি, বুঝছি। স্বদেশীগো পলাইয়াই বেড়াইতে হয়। লাগুড় পাইলে পুলিশ ছাড়বো ক্যান্? কিন্তু আমি নৌকা বাই আউজগা তিরিশ বচ্ছর। আমার লগে তোরা শালারা পারবি ক্যান্ রে? যাউক, তবু তো পারছি আপনারে বাঁচাইতে। স্যালাম কত্তা, স্যালাম।

প্রত্যুত্তরে স্যালাম জানানোই ইচ্ছে ছিল সুবোধের। অবজ্ঞাত এমনি কত লোক যে কতভাবে বিপর্য্যয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে সে যুগের বিপ্লব-আন্দোলনকে, কোথাও লেখা নেই তার ইতিহাস। অপরিচয়ের কুজ্ঝটিকার পুরু আস্তরণে চিরদিনের জন্য এরা সমাধিস্থ, দৃশ্যমান জগতের স্মৃতিপট থেকে অবলুপ্ত!······মনে মনে অসংখ্য প্রণাম জানালো সুবোধ নিরক্ষর এই গ্রাম্য মুসলমানকে! বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সকে সেদিন কতখানি সাহায্য করেছিল এই দরিদ্র মাঝি, তা প্রকাশের ভাষা আজও সৃষ্টি হয়নি!

চৌত্রিশ

আমি তখন কলকাতায় দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকার বার্তা ও সিনেমা-সম্পাদক। দীর্ঘ ছয় বৎসরের অধিককাল রাজবন্দী জীবন যাপনের পর ১৯৩৮ সালে মুক্তিলাভ করে সহ-রাজবন্দী বিশ্বেশ্বর চৌধুরীর চেষ্টায় 'কৃষকে' যোগদান করি অন্যতম সহ-সম্পাদকরূপে। তারপর বার্তা সম্পাদক কেশব সেনের আকস্মিক মৃত্যুর পর আমিই বার্তা ও সিনেমা সম্পাদক নিযুক্ত হই। বৈপ্লবিক রাজনীতি থেকে চিরদিনের মতো অবসর গ্রহণ করে সংসার-নীড় রচনার কাজে করেছি আত্মনিয়োগ, সারা জীবনে আর জীবনের ঝুঁকি নেবার বেহিসাবী পরিকল্পনাকে মনের কোণেও স্থান দিই না, এমনি একটা ছদ্ম-মনোভাব ব্যক্ত করে এবং চলাফেরায় রাজনীতি সম্পর্কে একটা ছদ্ম উদাসীনতা দেখিয়ে পত্রিকার অফিসে আমি এই চাকরি গ্রহণ করি! থাকি ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে মনোজ্ঞা লেনে। চাকরি আরও একটা করছিলাম তখন একটি ব্যাঙ্কে। সকাল দশটায় ডালহৌসী স্কোয়ারে ব্যাঙ্কে যেতাম, বিকেল পাঁচটায় সেখান থেকেই সোজা চলে যেতাম ক্রীক রো-তে।

ক্রীক রো-তে 'কৃষকে'র অফিস। পত্রিকার কর্মকর্তা রমেশ বসু বন্ধুস্থানীয় বলে প্রায় প্রতিদিনই রাত বারোটা পর্য্যন্ত আমাকেই অফিস থেকে সব কিছু গুছিয়ে নৈশ সম্পাদকের হাতে বাকি রাতটুকুর দায়িত্ব তুলে দিয়ে বাসায় ফিরতে হতো।

১৯৪২ সালের গণবিপ্লব সুরু হয়ে গেছে তখন পূর্ণোদ্যমে! ১৪৪ ধারা অমান্য করে কলকাতার পথে পথে বেরুচ্ছে প্রতিদিনই অগণিত শোভাযাত্রা, পার্কে পার্কে শুধু নয়, মোড়ে মোড়ে চলছে বিরামহীন সভা ও অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা, শোভাযাত্রীদের শ্লোগানে শ্লোগানে একই অনড় দাবীর প্রতিধ্বনি: কুইট্, কুইট্ ইণ্ডিয়া!······ ভারতের উর্ব্বর ভূমিতে যে একবার পা রাখতে পেরেছে, লাল কেল্লার শীর্ষে উড়িয়ে দিয়েছে ইউনিয়ন জ্যাক, গত দু'শো বছর ধরে যারা ভারতের প্রতিটি শিরা ও উপশিরায় মুখ লাগিয়ে রক্ত চুষে খাচ্ছে অগস্ত্য মুনির মতো, 'কুইট ইণ্ডিয়া'র হুমকিকে যে তারা ভয় করবে না, লাঠিচালনা, কাঁদুনে-বোমা নিক্ষেপ ও গুলীবর্ষণের মধ্য দিয়ে যে তারা তাদের অনিচ্ছা ও অস্বস্তি প্রকাশ করবে, এ তো জানা কথা!

…কিন্তু তথাপি, ১৯৪২ সালে গণসংগ্রামের যে মহাতরঙ্গ সমগ্র ভারতে শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল প্রকাণ্ড অজগরের মতো, আঘাত হানবার উদ্যত আবেগে যার প্রশ্বাসে জেগে উঠেছিল ১৩২৬ সনের ঝড়, চক্‌চকে চক্ষু দুটিতে যার মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল বিসুভিয়াসের নৃশংসতা, সেই গণজাগরণের তরঙ্গাঘাতে যখন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ইস্পাতের বনিয়াদ টলটলায়মান হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেইসময় বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের যারা তখনো জেলের বাইরে ছিল, তারা এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিপ্লবকে ঠিক পথে পরিচালনার বিপজ্জনক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করলো।

ঢাকা থেকে গোপনে কলকাতায় এল চঞ্চল গাঙ্গুলী। ধর্ম্মতলার এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-অধ্যুষিত একখানি নোংরা দোতলা বাড়ীর দোতলায় একটি কক্ষে সে আশ্রয় গ্রহণ করলো। ফেরারী চঞ্চলকে গ্রেপ্তারের জন্য তখন কয়েক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে আর যুদ্ধকালীন নিষ্প্রদীপের যুগে হায়েনার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে চতুর্দ্দিকে আই বি ও এস বি-র দল শিকারের সন্ধানে। কিন্তু বিপদের হিসেব করলে আর বিপজ্জনক কাজ করা চলে না। তাই চঞ্চলকে চাকরি দেয়া হলো আমাদেরই ‘কৃষক’ অফিসে অন্যতম নৈশ সহ-সম্পাদকরূপে। নামকরণ হলো তার কানু রায়। প্রতিদিনই রাত দশটায় কানু রায় অফিসে আসতেন এবং অফিসে বসে দু’চার লাইন লিখবার পরই একে একে এসে হাজির হতেন বাংলা ও বাংলার বাইরের কর্ম্মীরা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে। প্রায় সারারাত বসে চলতো পরিকল্পনা—সৈন্যবাহী কোন্ ট্রেণখানা উল্টে দেবে ফিসপ্লেট সরিয়ে, কোন্ সাহেবী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের টাকার ভ্যানখানা আটক করবে, কোন্ ঘুষখোর সামরিক অফিসারের কাছ থেকে ক্রয় করবে গোটাকতক রিভলভার ও ষ্টেন গান, কোন্ প্রেসে ছাপিয়ে লক্ষ লক্ষ হ্যাণ্ডবিল ছেড়ে দেবে ডালহৌসী স্কোয়ারে…

মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী চট্টগ্রামের উগ্র জাতীয়তাবাদী বিশিষ্ট মুসলমান নেতাদের অগ্রদূত বলা যায়। এই সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে আমাদের পত্রিকার সম্পাদক, আমার ব্যক্তিগত বন্ধু সিরাজউদ্দীনের মারফৎ। অদ্ভুত মনোবলসম্পন্ন অথচ অত্যন্ত স্বল্পভাষী এই বৃদ্ধ। এঁরা এমনি ধরনের লোক, যাঁরা সভায় বা কোনো প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের ব্যাক বেঞ্চে এসে চুপি

চুপি বসে থাকেন ভালো মানুষটির মতো। হঠাৎ চোখে পড়লে অনেকেই পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন অতি সাধারণ বা তার চাইতেও নিম্নস্তরের অনুল্লেখযোগ্য কাউকে মনে করে। তারপর হঠাৎ চিনতে পারলেও বক্তৃতা-মঞ্চে এসে এঁরা নিজের পরিচয় দিতে সীমাহীন সঙ্কোচ বোধ করেন, প্রস্তাব উত্থাপন বা সমর্থনের ঝামেলা এড়িয়ে এঁরা শুধু প্রয়োজনের সময় হস্ত উত্তোলনেই কাজ শেষ করে ফেলতে চান। এঁরা চলেন রাজপথ এড়িয়ে অলি-গলি দিয়ে, সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে লোকচক্ষুর অন্তরালে। পরিচিতির গাল-ভরা বুলি উচ্চারণ করে এঁরা নিজেদের ঢাক পেটান না, এঁদেরই কাছে আসে এবং কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অসংখ্য অনুসন্ধিৎসু, জিজ্ঞাসুর দল, যেমন করে অপেক্ষায় থাকে ভক্তের দল মন্দিরের দরজায় ভক্তিভরা মন নিয়ে।

উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, শুভ্র শ্মশ্রু ও কেশ এই বৃদ্ধ মুসলমানকে প্রায়ই আমার মনে হয়েছে প্রাচীন কালের ঋষির মতো। অনেকবার গেছি তাঁর বাসায়, মৌলালীর মোড়ের প্রকাণ্ড বাড়ীখানার দোতলায়, অনেক দিন অনেক কথাই আলোচনা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। নেতাজীর প্রসঙ্গ এসে পড়লেই দেখেছি তাঁর ফরসা মুখখানা উত্তেজনায় একেবারে লাল হয়ে উঠতো। তারপর যা বলতেন, তা সমাধিস্থ ব্যক্তির আপন মনে উচ্চারিত অন্তর্বাণীর মতো। বলতেন : নেতাজীকে ঠাঁই দিতে না পারার লজ্জা আমাদের রাখবার স্থান নেই। কংগ্রেসী কূটনৈতিক চালে এই নেতাকে কোণঠাসা করে রাখবার ষড়যন্ত্র যখন প্রকাশ পেল, কেন দেশবাসী তখন হাতিয়ার হাতে রুখে দাড়ালো না, বলতে পারেন ?···কিন্তু যৌবনজলতরঙ্গ রুধিবে কে ? তাই গেছেন তিনি জার্ম্মাণীতে। এই বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ভারত থেকে বৃটিশকে চিরদিনের মতো বিতাড়িত করে দেবার পরিকল্পনা তাঁর দেশ যখন গ্রহণ করলো না, তখন গেলেন তিনি বিদেশে সেই পরিকল্পনা কার্য্যে রূপান্তরিত করবার মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে।— বিশ্বাস করুন দ্বিজেনবাবু, বিজয়ীর বেশে একদিন ফিরে আসবেন আমাদের নেতাজী, আমি হয়তো সেদিন পর্য্যন্ত বেঁচে থাকবো না। কিন্তু আজ তাঁকে রুখবার জন্য দেশের মধ্যে যাঁরা গলাবাজি সুরু করেছেন, শত্রুপক্ষের হাতে হাত মিলিয়ে যাঁরা জনযুদ্ধের বুলি আওড়াচ্ছেন, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করে যাচ্ছি, একদিন এঁরাই এগিয়ে যাবেন সর্ব্বাগ্রে সেই বিজয়ী নেতাজীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। সেদিন বেশী দুরে নয়।······

ইসলামাবাদীর এই ভবিষ্যদ্বাণী কতখানি সফল হয়েছিল বা হয়নি, সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

এই ইসলামাবাদীর সঙ্গে কানু রায়ের পরিচয় করিয়ে দিলাম। কানু রায় অত্যন্ত বুদ্ধিশালী ও কৌশলী। অল্প দিনের মধ্যেই উভয়ের বয়সের বিরাট ব্যবধান ভেঙ্গে দিয়েই ইসলামাবাদীর সঙ্গে চঞ্চলের স্থাপিত হলো এমনি নিবিড় বন্ধুত্ব যে, প্রায়ই চঞ্চল কানু রায়ের নৈশ চাকরি শেষ করে গভীর রাত্রে গিয়ে হাজির হতো ইসলামাবাদীর দোতলার কক্ষে। চলতো সেখানে মারাত্মক সলাপরামর্শ!

অকস্মাৎ একদিন গ্রেপ্তার হয়ে গেল চঞ্চল। 'কৃষক' অফিসের সঙ্গে তার যোগাযোগ কী করে পুলিশ জেনে গেছে। তাই রমেশ বোসকে ডেকে নিয়ে গেল তারা ইলিসিয়াম রো-তে। রমেশ বোস আমাদের ব্যাঙ্কে টেলিফোন করে আমায় জানিয়ে দিল যে, কানু রায় গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। বস্তুতঃ, চঞ্চলের সঙ্গে আমার যোগাযোগের ব্যাপারটা এতই গুপ্ত ছিল যে, রমেশও তা টের পায়নি। চঞ্চল গ্রেপ্তার হবার পর বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সমস্ত কাজের ভার গিয়ে পড়ে মুষ্টিমেয় যে ক'জনের ওপর, সুবোধ চক্রবর্ত্তী তাদের অন্যতম। সুবোধ তখন পলাতক এবং পলাতক অবস্থাতেই সে বাংলা, বিহার ও আসামের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে, প্রত্যেক গুপ্তকেন্দ্রে গিয়ে সেখানকার কাজকর্ম্মের তদারক করছে, সংগঠনের কাজও চালিয়ে যাচ্ছে অক্লান্তভাবে।

কিছুদিন পর নেতাজীর দুদ্ধর্ষ আজাদ হিন্দ ফৌজ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করে বসে, রেঙ্গুণের ওপর ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়িয়ে দিয়ে তারা 'দিল্লী চলো' ধ্বনি তুলে এগিয়ে আসে ভারতের দিকে ইম্ফলের পথে। রেঙ্গুণে আজাদ হিন্দ ফৌজের গুপ্তচর শিক্ষালয়ের পরিচালক-প্রধান নিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ট্রেনিং-এ যাঁরা এই বিপজ্জনক কার্য্যে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেন, তাঁদের জনকতককে ভিন্ন ভিন্ন দলে নেতাজী সাবমেরিন-যোগে গুপ্তভাবে পাঠান ভারতবর্ষে। বেয়াল্লিশের আন্দোলন তখন পুরোমাত্রায় চলছে! গণজাগরণ ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়িত, বিমথিত করে তুলেছে এমনিভাবে যে, সমগ্র ভারতে তখন চলেছে কার্য্যতঃ সামরিক শাসন, সমগ্র ভারতই তখন এক প্রকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেছে! নেতাজীর প্রেরিত গুপ্ত পত্র এসে পৌছোয় বক্সা বন্দীনিবাসের

রাজবন্দী মেজর সত্য গুপ্তের কাছে। বক্সা থেকে সেই সংবাদ হিজলী ও বাংলার অন্যান্য জেলে প্রেরিত হয়ঃ নেতাজীর নির্দ্দেশ—আজাদ হিন্দ ফৌজ ইম্ফলের পথে আসামে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিকামী বন্দী বিপ্লবীরা সদলবলে কারাগার ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়বে ও সমগ্র বাংলায় গণসংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে! বাংলা যদি একবার অধিকার করে নেয়া যায়, তাহলে দিল্লী পৌঁছোবার পথে বৃটিশ সেনা আর কতখানি বাধা পারবে সৃষ্টি করতে?

এই সময় মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর সঙ্গে সুবোধের পরিচয় ঘটে। সুবোধের সঙ্গে আলাপে বৃদ্ধ এতটা মুগ্ধ হন যে, শেষ বয়সে তিনি একটা চরম ঝুঁকি নেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। সুবোধকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে যান তাঁর দেশ চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের পাহাড়পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে, ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আরাকানের পথে নেতাজীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনই ইসলামাবাদী ও সুবোধের লক্ষ্য। কিন্তু সীমান্তে সতর্ক প্রহরা; আরও, আরাকান আজাদ হিন্দ ফৌজের দখলে যাবার পর এখানকার সতর্কতা যেন একেবারে সীমাহীন! কী করা যেতে পারে—বৃদ্ধ খানিকটে চিন্তা করলেন, তারপর স্বাভাবিক ধীর ও শান্ত কণ্ঠে বললেনঃ সুবোধবাবু, আমার জীবনের মাত্র কয়েক দিন বাকী। তাই চরম ঝুঁকি নেবার অসুবিধে আমার আদৌ নেই। আপনি এখন যুবক, প্রশস্ত জীবনের পথ আপনার সম্মুখে, অনেক আশা ও সম্ভাবনা আছে। বরং আপনি পেছিয়ে যান পরদার আড়ালে, আমিই প্রত্যক্ষ-ভাবে এগিয়ে যাই। যদি কিছু হয়—

বাধা দিয়ে সুবোধ বললোঃ যদি কিছু হয়, তাহলে আমার ওপর দিয়েই হোক্ তা। যদি কিছু হয়—সে চিন্তা তো কোনো দিন আমরা করিনি, মৌলবী সাহেব! অভ্যস্ত নই। আজও করতে চাই না। বিশেষ করে নেতাজী—আমাদের নেতাজীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কাজে মৃত্যুকে গ্রাহ্যই করি না। নিজের জন্যে চিন্তা-ভাবনার দায়িত্ব আর যে-ই নিক, আমরা কোনোদিন নিয়েছি বলে কেউ আমাদের বদনাম দিতে পারে না। বিনয়, বাদল, দীনেশ, কানাই, প্রদ্যোৎ এঁরা আমাদেরই শিক্ষাগুরু ছিলেন, মৌলবী সাহেব!

ইসলামাবাদী দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন সুবোধকে।

কিছুদিন পর দেখা গেল, ভারত-আরাকান সীমান্তে সৈন্যদের ও গ্রাম-বাসীদের সুবিধার জন্য গোটাকতক সস্তা রেস্তোরাঁ স্থাপিত হয়েছে গোটা

কয়েক শানকী, কাঁচের গ্লাস ও একখানা লম্বা টেবিল ও একখানা বেঞ্চ নিয়ে, আর সেই রেস্তোরাঁয় বয় হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের নীরেন রায় ও অজিত রায়। আরও দেখা গেল, পার্ব্বত্য পথে গামছা ও লুঙ্গি ফেরি করে বিক্রয় করে বেড়াচ্ছে জনকতক দরিদ্র মুসলমান—উপেন সরকার, জগদীশ ভৌমিক প্রভৃতি। ভারতীয় সেনারা এই সব রেস্তোরাঁয় বেশ আড্ডা জমিয়ে ফেললো এবং সস্তা গোমাংস ও চাপাটি খেয়ে তারা মনের আনন্দে সীমান্ত পাহারা দিতে লাগলো। আনন্দের আতিশয্যও যে ঘটলো না কখনও, তা নয়। অসতর্ক মুহূর্ত্তে সেই আনন্দ যে গোমাংস, চা ও চাপাটির সহযোগে একেবারে বীভৎস হয়ে উঠতে পারে, সে ধারণা পুরোমাত্রায় ছিল ঐ রেস্তোরাঁর বয়দের —সেনাদের নয়। তাই বীভৎস আনন্দের প্রাবাল্যে হয়তো একদিন সৈন্যেরা যখন হুল্লোড় সুরু করে কোনো মিঠে ঠুংরীর একটি কলি সবাই মিলে একই সঙ্গে ভাঁজতে সুরু করেছে, ঠিক তখন চৌকার পাশে ঝোপে ছোট্ট একটি শব্দ শোনা গেল। বেরিয়ে গেল রেস্তোরাঁ-বয় নীরেন রায়। একটু পরই ফিরে এসে জানালো, ইসলামাবাদীর জামাই সাহেব এসেছেন। অজিত তখন সিপাইদের গরুর মাংস পরিবেশনে ব্যস্ত ছিল। তার হাত থেকে কাজ নিয়ে ব্যস্ততার মাত্রা সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে দিয়ে নীরেন চোখের ইশারায় অজিতকে রওনা হতে বললো।

বাইরে ঝোপের আড়ালে জামাই সাহেব অপেক্ষা করছিলেন। বললেন : এই সুযোগ! এই সময়টা ওরা খানাপিনায় এত মত্ত থাকে যে, হাতী গলে গেলেও টের পায় না। বোধহয় পেতে ইচ্ছেও করে না!

তারপর দু'জনে পাহাড়ের সর্পিল ঘুর-পথে বহু চড়াই ও উৎরাই পেরিয়ে, পাথর থেকে পাথরে উল্লম্ফনে ধেয়ে-চলা পার্ব্বত্য ঝরনা অতিক্রম করে এসে হাজির হলেন একেবারে চট্টগ্রাম সীমানার শেষ প্রান্তে। সেখান থেকে বিদায় নিলেন জামাই সাহেব। তারপর একাই রওনা হলো অজিত রায় সেই বিপদ-সঙ্কুল পথে,......তারপর কী করে আজাদ হিন্দ ফৌজের সিপাইদের সাক্ষাৎ লাভ করে এবং অবশেষে একেবারে নেতাজীর কাছে গিয়ে পৌঁছে বাংলার সঙ্গে আরাকানের পার্ব্বত্য পথে গুপ্ত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে, সে প্রসঙ্গ এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

শুধু এইটুকুই আমি বলতে চাই এবং জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে, সে যুগে

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের যেসব সদস্য নেতাজীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে এবং শেষ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হয়, সেই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সর্ব্বদায়িত্ব তখন যাদের স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল, সুবোধ চক্রবর্ত্তী তাদের একজন।……

কিন্তু ১৯৪৫ সালে এক দুর্য্যোগের রাতে এই সুবোধ চক্রবর্ত্তী সত্যিই ধরা পড়ে যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তখন শেষ অধ্যায় রচিত হচ্ছে। ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করে পশ্চিম দিক্ থেকে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে আসছে মিত্রবাহিনী, পূব দিক্ থেকে বার্লিনের দ্বারদেশে আঘাত হানছে কালান্তক যমের মতো রুশবাহিনী আর স্রোতের মুখে তৃণের মতো ইতালীকে ভাসিয়ে দিয়ে, নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে দক্ষিণ দিক্ থেকে এগিয়ে আসছে মার্কিন বাহিনী। তিন দিকের ক্রমবর্দ্ধমান চাপে রাইখষ্ট্যাগ তখন টলটলায়মান। হিটলারের চোখে নিদ্রা নেই, নেই তিলেকের অবসর। উনচল্লিশে যে সোনার স্বপ্ন রঙীন ফানুসের মতো ইয়োরোপের আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল, পঁয়তাল্লিশের কালবৈশাখীর ঝাপটায় তা ছিঁড়ে গেছে, চুপসে গেছে, এক টুকরো তুচ্ছ কাগজের মতো ধুলোয় গড়িয়ে পড়েছে! রাইখষ্ট্যাগের মাটির নীচে বসে হিটলার অন্তিম দিনের প্রতীক্ষা করছেন!…

ঠিক এমনি সময়ে জুন মাসের এক রাত্রে সুবোধ সন্তর্পণে এসে আরোহণ করলো ফুলবাড়ী ষ্টেশনে অপেক্ষমান ট্রেণের একটি নির্জ্জন কামরায়। নারায়ণগঞ্জে যাবে সে। সেখান থেকে মুন্সীগঞ্জ। সেখান থেকে বিক্রমপুর সফরে।

ব্ল্যাক আউটের যুগ! দীর্ঘ কামরায় আলোর সংখ্যাই শুধু কমানো হয়নি, যেটি আছে, সেটিও মিটমিটে প্রদীপের মতো এবং তাও যত্ন করে ঢাকা। আলোরেখা যাতে জানালার বাইরে গিয়ে না পড়ে। প্ল্যাটফরমেও তাই। আলো নেই, আলোর আভা। একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, দমকা হাওয়া মাতামাতি করে গেছে। এখনও চলছে তার জের টিপিটিপি করে। ষ্টেশন প্রায় জনশূন্য, ট্রেণও তাই! ভালোই হলো—মনে মনে উচ্চারণ করলো সুবোধ।

ভালোই হলো—মনে মনে উচ্চারণ করলো ঐ লোকটি, বিশ্রামাগারে টিকিট-জানালার পাছে বসে যে নিদ্রার ভান করে ঝিমোচ্ছিল। ভালোই হয়েছে—মনে মনে প্রতিধ্বনি তুললো রাস্তার ওপারে পানের দোকানের একজন খরিদ্দার।

ভালোই হয়েছে—ইশারায় সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ রমনার দিকে সাইকেলে ছুটলো একজন লুঙ্গিপরা মুসলমান। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের পলাতক নেতার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কী যে ভালো ফাঁদ রচিত হলো, তার খানিকটে আভাস পাওয়া গেল ট্রেণখানা চলতে সুরু করতেই।

হঠাৎ একটা লোক উঠে এল দরজা খুলে, প্লাটফরমের শেষ প্রান্ত থেকে আর একজন এবং পাশের কামরা থেকে পাদানীর ওপর দিয়ে আর একজন। একজন বসে পড়লো ওদিকের দরজার পাশে, আর একজন ওপাশের জানালায় আর তৃতীয় ব্যক্তি এসে ঝপ্ করে বসে পড়লো প্রায় সুবোধের পাশেই।

ভালো লাগলো না সুবোধের।

লোকটা রুমাল দিয়ে ভালো করে মুখমণ্ডল মার্জ্জনা করে বলে উঠলো: উঃ, কি বিশ্রী বৃষ্টি নেমেছে দেখেছেন? আর একটু হলেই ট্রেণটা ফেল করেছিলাম! সব ভিজে গেছে। নারায়ণগঞ্জে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে বলতে পারেন?

ভালো লাগলো না সুবোধের। খুব অনিচ্ছার সঙ্গে জবাব দিল সে: তা এগারোটা হতে পারে।

হয়েছে!—মহা ভাবনায় পড়ে গেল লোকটা: অত রাত্রে আর এই বর্ষার মধ্যে যদি ঘোড়ার গাড়ী না পাওয়া যায়? ভারী মুশকিলে পড়বো তো তাহলে—আচ্ছা, আপনি কি নারায়ণগঞ্জেই যাবেন?

জবাবটা এড়িয়ে গেল সুবোধ: গাড়ী যদি না পান আর যদি হেঁটে না যাওয়া যায়, তাহলে ষ্টেশনেই থাকবেন শুয়ে।

লোকটা জিজ্ঞেস করলো: আপনি কোথায় যাবেন জানতে পারি কি?

ভালো লাগলো না সুবোধের। বিরক্ত হয়ে জবাব দিল: ওখানেই যাবো।

ওখানেই থাকেন বুঝি? র‍্যালী ব্রাদার্সে কাজ করেন?—লোকটার প্রশ্নগুলি অর্থবোধক মনে হলো। কিন্তু সে জবাবের প্রত্যাশায় না থেকে বলে যেতে লাগলো: আর মশায়, ব্ল্যাক আউটের চোটে কি আর কিছু দেখবার উপায় আছে, না চেনা যায়? র‍্যালীতে কাজ করে আমার এক বন্ধু, আমি তো ভেবেছিলাম আপনিই বুঝি সে।—বলে লোকটা হা-হা করে হাসতে লাগলো;

তারপর বললো : মাপ করবেন, মশাই। কিছু মনে করবেন না, কিন্তু মশাইয়ের নামটি জানতে পারি কি ?

ভালো লাগলো না সুবোধের। এ ঔৎসুক্য কেন ? গায়ে পড়ে আলাপ জমাবার আগ্রহ কেন ?···সে চট্ করে জবাব দিল : রবীন্দ্রনাথ দত্ত।

একটুখানি নিস্তব্ধতা। ওপাশের লোকত্ব'টো এদিকের বেঞ্চে এসে বসেছে। উদাসীনভাবে তাকিয়ে রয়েছে জানালার বাইরে অপসৃয়মান নিবিড় অন্ধকারের পানে ভাল মানুষের মতো।···ট্রেণের গতি বেড়ে গেছে। শব্দ হচ্ছে। হুইসেল শোনা যাচ্ছে। ছ্যাকড়া ট্রেণে ঝাঁকুনি লাগছে বেশ।···কিন্তু কিছু ভালো লাগছে না সুবোধের। নিশ্চয়ই তিন জনের যোগাযোগ আছে।—তাহলে কি শেষ পর্য্যন্ত ধরা পড়লো সে ?

হঠাৎ ভালো করে পরখ্ করবার জন্যই সুবোধ বলে উঠলো : আমি এই দোলাইগঞ্জেই নামবো, বুঝলেন ?

সে কি, এই বৃষ্টির মধ্যে !—লোকটা ভদ্রতায় একেবারে গলে পড়লো : না, না, তা কি হয় ? নারায়ণগঞ্জেই চলুন না। গাড়ী না পেলে আপনার ওখানেই না হয় যাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় লোকটি প্রশ্ন করলো : নারায়ণগঞ্জেই আপনার বাড়ী বুঝি ?—বলতে বলতে কাছে এগিয়ে এল সে।

চাকরি, না ব্যবসা ?—প্রশ্ন করলো তৃতীয় ব্যক্তি এবং সেও এগিয়ে এল কাছে।

না, না, আদৌ ভালো লাগছে না সুবোধের। বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রইলো না আর যে এরা তাকে সহজে ছাড়বে না। দুঃখের বিষয় সঙ্গে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র নেই তার। থাকলে একাই মহড়া নেয়া যেত এই তিন জনের ! ওদের জামার নীচে কী আছে, সে হিসেব কোনোদিনই করেনি সুবোধ, কোনোদিনই করেনি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স !···তবে কি চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়বে ?··· বোঝা গেল দোলাইগঞ্জে এরা নামতে দেবে'না তাকে। তবু চেষ্টা করতে হবে।

ট্রেণের গতি মন্থর হয়ে এল। দোলাইগঞ্জ ষ্টেশন। সুবোধ উঠতে যেতেই অকস্মাৎ খচাং করে কামরার দরজা খুলে গেল, হুড়হুড় করে প্রবেশ করলো দশ-বারো জন সশস্ত্র পুলিশ, সঙ্গে খোলা রিভলভার নিয়ে একজন দারোগা। মুহূর্ত্তে সুবোধকে ঘিরে ফেললো তারা। দারোগা বললো : রিভলভার আছে

কিনা, দেখে নাও ভালো করে।—তারপর বিনয় প্রকাশ করলো: I am extremely sorry Subodh Babu—

দ্বিতীয় লোকটি বলে উঠলো সমর্থন করে: সত্যিই দুঃখিত সুবোধবাবু—না, না, রবিবাবু। কিন্তু দোলাইগঞ্জেই তো আপনি নামবেন বলছিলেন না, চলুন, এখানেই নামবেন।......

অর্থাৎ সুবোধ চক্রবর্ত্তী ধরা পড়ে গেল। সে যুগে আই বি ও পুলিশের টেরর্ সুবোধ চক্রবর্ত্তী! দীর্ঘকাল পুলিশকে চ্যালেঞ্জ করে পালিয়ে বেড়িয়েছে যে!

ঢাকা থেকে সুবোধকে গোয়ালন্দ নিয়ে আসা হলো পরদিনই। কিন্তু মোমেণ্ড বা আফগান ষ্টীমারের ইণ্টার ক্লাস নয় কিংবা জন দুই সশস্ত্র গাড়োয়ালী সেনা আর একজন আই বি অফিসার নয়। সুবোধের জন্য কাজে লাগানো হলো স্বয়ং ঢাকার পুলিশ সুপারের ব্যক্তিগত মোটর লঞ্চখানি—'ফেয়ারী গ্রীণ!' সাহেবের সুসজ্জিত কামরায় স্থান গ্রহণ করলো পলাতক আসামী সুবোধ চক্রবর্ত্তী আর কামরার বাইরে অতন্দ্র পাহারায় সজাগ হয়ে রইলো বারোজন গুরখা সৈন্য ও একজন হাভিলদার। জন দু'য়েক আই বি অফিসারও চললেন চলনদার হয়ে। পুলিশ সুপারের লঞ্চ বুড়িগঙ্গা পেরিয়ে এসে পদ্মার বুকে ভেসে চললো ময়ূরপঙ্খীর মতো!......

গোয়ালন্দেও এমনি অভিনব ব্যবস্থা! সুবোধ চক্রবর্ত্তীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে ঘাটে একদল সশস্ত্র গুরখা আর প্লাটফরমে অপেক্ষমান স্পেশ্যাল ট্রেণ।—হ্যাঁ, স্পেশ্যাল! মাত্র একখানা বগী পেছনে বেঁধে হিসহিস করে ষ্টিম ছাড়ছে লৌহ-দানব।

সদলবলে সুবোধ গিয়ে আরোহণ করলো সেই স্পেশ্যাল ট্রেণে। ট্রেণ সোজা এসে হাজির হলো শিয়ালদা ষ্টেশনে। সেখান থেকে সোজা নিয়ে যাওয়া হলো তাকে আই বি অফিসে লর্ড সিংহ রোডে, তারপর প্রেসিডেন্সি জেলে নিরাপত্তা বন্দীরূপে। আর শ্রীমান্ সুবোধ সেখানে পৌঁছেই সোজা আমার কাছে একখানা চিঠি লিখে বসলো রাজসাহী জেলে।—

'দ্বিজেনদা', মাত্র পরশুদিন আমি এখানে এসেছি। জেল গেট-এ আই বি অফিসার জিজ্ঞেস করেছিলেন একটি মাত্র প্রশ্ন, আপনাকে আমি চিনি কি না। আমি জবাব দিলাম: সুবোধ চক্রবর্ত্তী আর দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে আপনি যদি

চিনে থাকেন, তাহলে এ প্রশ্ন আর করতেন না। তাদের পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা অচ্ছেদ্য!......’

রাজসাহী জেলে আমি তখন নিরাপত্তা বন্দী। ডুয়ার্সের মেটেলীতে ছিলাম একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। সেই শাখা অফিসটি একক আমারই প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে। কলকাতার উত্তাপ পরিহার করে পার্ব্বত্য অঞ্চলের ঠাণ্ডায় বেশ নিশ্চিন্ত মনেই দিন কেটে যাচ্ছিল। ব্যাঙ্কটি ওখানে এমনিভাবে জমিয়ে ফেলেছিলাম যে, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে সুরু করে শিলং পর্য্যন্ত মোট চব্বিশটি শাখা অফিসের ম্যানেজারদের মধ্যে আমার মাইনেই ছিল সবার চাইতে বেশী। জনপ্রিয়তাও কম অর্জ্জন করিনি। মেটেলী কালীবাড়ীতে আমারই প্রচেষ্টায় নতুন করে ড্রামাটিক ক্লাব গড়ে ওঠে ও পর পর কয়েকটি নাট্যাভিনয় হয়। প্রথম গঠিত মেটেলী মার্চ্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের আমিই ছিলাম সভাপতি। পাশেই নাগেশ্বরী চা বাগানের মাঠে আমারই উদ্যোগে নক্ আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চারিদিকে চৌদ্দটি বিদেশী-চালিত চা বাগানের ইংরেজ ম্যানেজার ও ম্যানেজার গৃহিণীরা আমার ব্যাঙ্কে এসেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মেরে যেত।

এই নিশ্চিন্ত জীবনে অকস্মাৎ একদিন সকালবেলা জলপাইগুড়ির আই বি এসে হানা দেয়। ইন্স্পেক্টার রহমান বললেন যে, সত্যিই তাঁদের খাতায় আমার নামগন্ধ নেই, কোনোদিন আমার ওপর নজর দেননি তাঁরা, আমায় একেবারেই চেনেন না। কিন্তু—বলতে বলতে জরুরী ‘তার’ দেখালেন রহমান: কলকাতা থেকে ডি আই জি হুকুম করেছেন আমায় অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে জলপাইগুড়ি জেলে পাঠাতে।

সুতরাং জলপাইগুড়িতে এলাম এবং কনফার্মড্ হয়ে সিকিউরিটি বন্দী হিসেবে বদলি হয়ে এলাম রাজসাহী সেনট্রাল জেলে।

আমি সংসারী, সাধু-সজ্জন, স্বদেশীওয়ালাদের সঙ্গে আদৌ নেই যোগাযোগ—ভাবাবেগ দিয়ে এই কথাগুলি এমনিভাবে বলেছিলাম রাজসাহী জেলের অফিসে আই বি ইনস্পেক্টার প্রমোদ দাশগুপ্তকে যে, সহবন্দীরা আশা করছিলেন আমার সুদিন বেশী দূরে নয়। সংবাদ পাঠানো হয়েছে মেজর সত্য গুপ্তকে বক্সা বন্দীশিবিরে—যাতে বন্ধুরা কেউ আমার সঙ্গে পত্রালাপ না করে।

মুক্তির আশায় দিন গুনছিলাম গুড বয়ের মতো, এমন সময় সুবোধের

চিঠিখানি একেবারে বোমার মতো এসে পড়লো! জলপাইগুড়ির খগেন দাশগুপ্ত ডেকে বললেন: কি মশাই, যান, এবার বাড়ী যান। চার বছরের পলাতক আসামী ধরা পড়ে জেলে এসেই স্মরণ করেছেন আপনাকে! আপনার রিলিজ আর ঠেকায় কে?

কমলেশ এসে বললো: দাদা, এবার?

কালীপদ এসে বললো: আমরাই তো সব দুষ্টু ছেলে, কিন্তু সুবোধদা'?

সরল গুহ বললো: আর রক্ষে নেই দ্বিজেনদা', আরো তিন বচ্ছর!······

পঁয়ত্রিশ

পূর্ব্বেই বলেছি, অভিনয়ে আমার দক্ষতা ছিল সর্ব্বজনস্বীকৃত। স্বগৃহে অন্তরীণে এসে সেই দক্ষতা পুরোপুরি কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুরু হলো সীতা ও ষোড়শী নাটকের মহলা। সুবোধকে দেয়া হলো উর্ম্মিলা ও ষোড়শীর ভূমিকা। একদিকে যেমন পাড়ার ও গ্রামের ছেলেদের মধ্যে তীব্র উৎসাহেব সঞ্চার হলো, তেমনি আমদানী করা হতে লাগলো নিকটবর্ত্তী গ্রামের ছেলেদের—কাউকে শিল্পীরূপে, কাউকে সংগঠকরূপে আবার কাউকে কর্ম্মকর্ত্তার সাহায্যকারী হিসেবে। উদ্দেশ্য এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সংগঠন। আমাদের বাড়ীর পূব দিকে আমাদেরই জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদের বাড়ী ছিল এককালে। তারপর তাঁরা কুমিল্লার দিকে কোথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। টিনের ঘরগুলো প্রায় সবই বিক্রী করে দেবার পর প্রাঙ্গণটি বেশ প্রশস্ত হয়ে উঠলো এবং সেখানে এক প্রান্তে আমাদের রঙ্গমঞ্চ খাড়া করা হলো।

কিন্তু নাটকের রাত্রে আর এক বিভ্রাট! দুর্ম্মুখের ভূমিকায় রসিক কবিরাজ এতকাল মহলা দিয়ে অকস্মাৎ নাটকের দিন সে অনুপস্থিত। তার ভাই অবশ্য সংবাদ দিয়ে গেল যে, তার দাদা নাকি একটা জরুরী মামলার ব্যাপারে অকস্মাৎ গেছেন মুন্সীগঞ্জে, রাত সাতটার মধ্যে অবশ্য এসে পৌঁছোবেন বলে গেছেন।

আর সাতটা! দশটা বাজতে চললো, অথচ রসিক কবিরাজের দেখা নেই। বর্ষাকাল হলে কী হবে, ওদিকে নৌকোযোগে দর্শক এসে জমায়েৎ হয়েছেন

প্রায় হাজারখানেক! মিনিট গুনে বিজ্ঞাপিত সময়ে অভিনয় আরম্ভ করবার রেওয়াজ শহর থেকে গ্রামে গিয়ে তখনো পৌছোয়নি, তাই রক্ষে। নইলে ড্রপসিনের আর অস্তিত্ব থাকতো কিনা সন্দেহ। ডে লাইটগুলোও নিশ্চিহ্ন হতো! গ্রামদেশে সে যুগে সন্ধ্যায় সুরু হবে জানলে সবাই নৈশ আহার শেষ করে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে, অবশেষে হেলতে দুলতে এসে হাজির হতেন অভিনয় দেখতে। ওতে দোষ নেই, এমন কি, তেমন তীব্র আপত্তিও জানাতেন না দর্শকেরা। কিন্তু রাত দশটা পর্য্যন্ত যাঁরা ঠায় বসে আছেন, পর-পর খানকতক ঐক্যতান বাদন শুনিয়েও তাঁদের নীরবে আরও একটু ধৈর্য্য ধরবার অনুরোধ জানাবার মুখ আর নেই। তাই অবশেষে স্থির করা হলো যে, আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির কথা দর্শকদের কাছে পূর্ব্বাহ্ণেই সরলভাবে নিবেদন করে নোব। বলে নোব যে, আজকের সীতা নাটকে দুর্ম্মুখের ভূমিকায় একজন একেবারে আনকোরা নয়া শিল্পীকে নামাচ্ছি জোর করে। তিনি এই ভূমিকায় জীবনে অভিনয় করেননি, মহলাও দেননি। অতএব, তাঁর অভিনয়—অভিনয় বলে যেন গণ্য করা না হয়।

স্পষ্ট মনে পড়ে, আমি, ফুলবৌদি আর তাঁর গ্রামের দূর-সম্পর্কীয় একটি বোন সে সময় আমাদের দালানের মাঝের কোঠায় খাটে শুয়ে শুয়ে নাটকের এই নাটকীয় বিভ্রাট নিয়ে আলোচনা ও অন্যান্য এলোমেলো হাসিঠাট্টা করছিলাম। আমি মাঝখানে, আমার একপাশে ফুলবৌদি ও অপর পাশে সেই মেয়েটি—নাম রেবা। রেবার সঙ্গে আমার কেন, ফুলবৌদিরও কোনো নিকট-আত্মীয়তা নেই। না থাকলেও সে প্রায় বারই ফুলবৌদির সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসতো এবং বাড়ীর মেয়ের মতো প্রায়ই একাদিক্রমে দু'চার সপ্তাহ পর্য্যন্ত থেকে যেত। তাই আমাদের পরিবেশে তার সঙ্কোচ দূর হয়ে গেছে। রেবার বয়স ষোলোর কাছাকাছি হবে। খুব ফর্সা রং, চোখা-চোখা গড়ন, আর কথাগুলো ভারী মিষ্টি। ভালো যে লাগতো তাকে, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

রসিক কবিরাজের যখন টিকিটিরও আর দেখা নেই আর দর্শকদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার আশঙ্কা যখন প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে, তখন চরম ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যেই ষ্টেজের দিকে যাবো, ফুলবৌদি বাধা দিলেন: দাঁড়াও, না খেয়ে যেতে হবে না। নাটক সুরুই হলো না, শেষ হতে

কত রাত হবে কে জানে! মাছের ঝোল দিয়ে খাও দুটি। পরে আর হবে না জানি।

সত্যিই দুটি খাবো।—বললাম ফুলবৌদিকে। আর দুটিই খেতাম আমি নাটকের রাত্রে। পেট ভরে খেলে আমি অভিনয় করতে পারতাম না। কেমন আই-ঢাই করতো আর শ্রান্তিতে চোখ বুজে আসতো। স্মারকের একটি কথাও কানে আসতো না। উইংসের পাশে বসে রেবা তখন মুচকি মুচকি হাসতো আর মঞ্চ থেকে প্রস্থান করে তার কাছে এলেই বলতো: খোকাবাবুর ঘুম পেলো নাকি? বিছানা পেতে দোব ষ্টেজে? আমি অবশ্য তাকে মুখ ভেংচে গ্রীণ-রুমের দিকে সরে যেতাম। তবুও শ্রান্তি যেন আর কাটতে চাইতো না। বিছানার কথা সত্যিই মনে পড়তো।

ফুলবৌদি রান্নাঘরের দিকে গেলেন খাবার দিতে। আমিও তাঁর যাবার একটু পরেই উঠতে যাবো, এমন সময় অকস্মাৎ রেবা দু'হাতে আমায় বেষ্টন করে অনুচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো: আমি তোমায় চাই, দ্বিজুদা'!

চমকে উঠলাম! আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না এমনি অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য!……অডিটোরিয়ামে অমার্জ্জনীয় বিলম্বের জন্য মৃদু গুঞ্জন তখন সুরু হয়ে গেছে। জানাজানি হয়ে গেছে যে, একজন অভিনেতা নাকি তখনো এসে পৌঁছোয়নি। সেই জন্যই রং-চং মেখে, পোষাক পরিচ্ছদ পরে এদিকে ওদিকে নির্লিপ্তভাবে ঘোরাঘুরি করছেন লক্ষ্মণ, বাল্মীকি, সীতা ও অষ্টাবক্র। স্বয়ং রামরূপী আমি বাড়ীতে ফুলবৌদি ও রেবার সঙ্গে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজ নিচ্ছিলাম রসিক কবিরাজের, লোক পাঠাচ্ছিলাম বার বার তার বাড়ীতে।

এমনি চিন্তাভারাক্রান্ত মন নিয়ে যখন বিপদের বার্ত্তা,—তা সে যতই অপ্রিয় ও বিস্বাদ ঠেকুক না কেন দর্শকের কাছে—সকলের সমক্ষে যথাসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত করে দেবার সঙ্কল্প করেছি দুর্ম্মুখের মতো, ঠিক সেই অসময়ে আবার অকস্মাৎ এ কী বিভ্রাট!……রেবা শুধু আমার দিকে ফিরে শোয়নি, সে আমায় একখানা হাত দিয়ে রীতিমতো জড়িয়ে ধরেছে। ষোলো বছরের সুডৌল হাতখানি মাধবীলতার মতো পোষাক-আঁটা আমার বুকের ওপর দিয়ে ক্রস্‌ করে এপাশে এসেছে। আমার কাঁধে রামের কুঞ্চিত কেশদামের মধ্যে সুন্দর মুখখানি তার গুঁজে দিয়েছে, যেমন করে ভীরু পায়রা ঠোঁট

গুঁজে দেয় নিজের পালকের মধ্যে। এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ষোলটি বসন্তের ইন্দ্রজাল স্পর্শে বসরাই গোলাপের মতো ফুটে-ওঠা তার শরীর আমার পাশে এসে ঠেকেছে।

ভাবলাম, হয়তো রেবা ঠাট্টা করছে, যেমনি ঠাট্টা ও হরদম করে থাকে আমার সঙ্গে বৌদির বোন হয়ে। তাই এক মুহূর্ত ফিরে চাইলাম তার মুখের দিকে, তার চোখের দিকে। কিন্তু আজো মনে পড়ে এবং স্পষ্ট মনে পড়ে, সেদিন, ঘরের সেই আবছা আলোয় রেবার মুখে দেখেছিলাম শ্রীরাধিকার মতো তনুমনপ্রাণ অকুণ্ঠভাবে সমর্পণের নিরুদ্ধ আবেগের অভিব্যক্তি, আমার পানে চেয়ে-থাকা তার পলকহীন চোখে দেখেছিলাম ডেসডিমোনার অতলস্পর্শ প্রেমের সমুদ্র! ভাষাহীন সেই আবেদন সংবেদনশীল মনে সহজেই তরঙ্গ তুলে থাকে। যে গ্রহণ করে সেই ফুলের মালা, বসরাই গোলাপের সেই ফুটন্ত সম্ভার, মনে হয় সেই হয় ধন্য! ··

আমি কিন্তু রেবাকে তার আবেগচঞ্চল আবেদনের জবাবে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করে বসলাম: আমাকে চাও মানে?

সে জবাব দিল: চাই মানে তোমায় বিয়ে করতে চাই।

বিয়ে?···একটু চিন্তা করলাম। সিনেমার রূপালী পর্দায় চলমান ছবির মতো অনেকগুলো চিত্র পর পর মনের পরদায় ঝলকে উঠলো। বিয়ে? বিয়ের কথা ভাববার অবসর কোথায় আমাদের? সরকারী বুদ্ধি-বিভাগ যে বুদ্ধি ব্যয় করে আমায় পাঠিয়েছে স্বগৃহে অন্তরীণ করে, তা যে তাদের কী মহাঅপব্যয় হয়েছে, সেটাই তো প্রমাণ করে দিতে হবে আমাকে। সুকঠিন সেই কাজে অহর্নিশি ব্যস্ত থাকার পর আর কি সময় আছে ভাববার কোথায় ফুল ফুটলো, কার মনে জেগে উঠলো বেলোয়ারী তরঙ্গ, কিউপিডের সোনার তীর কার কোমল বুকে এসে অলক্ষ্যে ঘা দিয়ে বসলো!...

তবু চেষ্টা করে নির্দ্দয় হলাম না এবার। কাঠখোট্টার মতো নীরস ভাষায় শ্লেষের প্রত্যাঘাত হেনে বীরত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা না করে সমস্ত বুদ্ধিটুকু নিয়ে এলাম একেবারে হাতের মুঠোয়। বললাম: আমায় বিয়ে করে যে তুমি নিজেই বিপদে পড়বে, রেবা! স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য আমার থাকতে পারে, কিন্তু রোজগার করিনে আমি একটি পয়সাও। তারপর কী অনিশ্চিত আমাদের জীবন, তাও তো তুমি জানো, তুমি বোঝ। আজ তোমার পাশে শুয়ে গল্প করছি, হৈ চৈ

করে থিয়েটাব করছি, কালই হয়তো কোথাকার এক ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিশ দিল আমায় জড়িয়ে, আর হয়ে গেল আমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, এমন কি, ফাঁসীও—

রেবা আরও শক্ত কবে জড়িয়ে ধরলো আমায়। বললো : ওসব অলক্ষুণে কথা বলো না, দ্বিজুদা' !

বাধা অগ্রাহ্য কবে বলে যেতে লাগলাম : তার চাইতে আমি শুনেছি কোন্ এক ব্যাবিষ্টারের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা চলছে। শুধু কুলের দিক্ থেকে তারা একটু খাটো বলেই নাকি তোমার বাবা মত দিচ্ছেন না। আমি বরং তোমাব বাবাকে বুঝিয়ে মত করাবার ভার নিচ্ছি। কি বল রেবা ?

রেবা কোনো জবাব দিল না, বোধহয় জবাব দিতে পারলো না। শুধু অনুভব করলাম, সে যেন আরও নিবিড়ভাবে চেপে ধরলো আমায়।

এমন সময় বক্ষা কবলেন ফুলবৌদি। অকস্মাৎ এসে হাজির : তোমায় খাবাব দিয়েছি, ঠাকুরপো !

চল বেবা, আমাব সঙ্গে খাবে চল।—বলে ওকেও তুলে নিলাম সঙ্গে করে। তারপব একসঙ্গে বসে খেলাম। খাওয়া শেষ হবার পূর্ব্বেই সংবাদ এল দুর্ম্মুখ এসে গেছে। রসিক কবিরাজ মুন্সীগঞ্জ থেকে সোজা নৌকো করে চলে এসেছে আমাদেব ঘাটে।

আশ্বস্ত হলাম। রেবাকে বললাম : ব্যস্, দুর্ম্মুখ এসে গেছে। জানকীরে দিতে হবে নির্ব্বাসন।—চল, দেখাচ্ছি এবাব বামেব কেবামতি।

রেবা মুখ ভ্যাংচালো।

প্রায়ই আমি বেরিয়ে যেতাম বছিরদ্দীর নৌকো কবে। সন্ধ্যাব পর হলে তো সোজাই ছিল, দিনেব বেলাতেও তেমন কঠিন কিছু ছিল না। কারণ বছিরদ্দী নৌকোব দু'দিকে ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে ঢেকে নিয়ে আমায় তার বিবিতে রূপান্তরিত কবতো এবং এমনি নির্লিপ্ত ও নিশ্চিন্তভাবে বৈঠা বেয়ে জারী গানের কলি ঐ হেঁড়ে গলায় ভাঁজতে ভাঁজতে চলতো যে, কারুর সাধ্যি ছিল না যে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করে।

কিন্তু, সর্ব্বত্রই আর বছিরদ্দীকে নিয়ে যাওয়া চলে না, তা সে যতই

বিশ্বাসী ও কর্ম্মঠ হোক্! তাই মাঝে মাঝে নিজেরাই বেরিয়ে পড়তাম নৌকো ভাসিয়ে। খগেন, বিপদভঞ্জন, অনাথ, সুবোধ এরা সব সাজতো মাঝি, আর আমি কখনো পুলিশের পোষাকে, কখনো দর্জিপাড়ার নতুনদা'র ফিনফিনে পরিচ্ছদে নৌকোয় বসে থাকতাম। সারা রাত নৌকো চলতো। কেয়টখালী থেকে তন্তর হয়ে আবিরপাড়া, রাজদিয়া হয়ে মধ্যপাড়ার মধ্য দিয়ে কোনো-দিন চলে গেছি হয়তো একেবারে ফুরসাইল অর্থাৎ তালতলায়। তারপর ফিরে আসবার সময় আরও অনেকগুলো গ্রাম ঘুরে ভোরের আলো পূবের আকাশে ফুটে ওঠবার পূর্ব্বেই এসে পৌঁছে যেতাম ঘরের ছেলে ঘরে।

আমার সোনাদা' বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বছর দুই মধ্য প্রাচ্যে কাটিয়ে যখন ফিরে আসেন, তখন নানারকম সামরিক পোষাকে তাঁর বাক্স ভর্ত্তি ছিল। আমি এবার সেগুলোর সদ্ব্যবহারে মনোযোগী হলাম। ব্রিচেজের ওপর চড়িয়ে দিলাম সামরিক গলাবন্ধ কোট। কাঁধের ওপর গোটা কয়েক ষ্টারও দিলাম এঁটে, মাথায় বারান্দাওয়ালা টুপী আর পায়ে পট্টি ও ব্রাউন বুট। তারপর একদিন রাত্রে খোলা ছিপ জাতীয় সরু নৌকোয় উঠে বসতেই মাঝি খগেন অনুচ্চকণ্ঠে অপর মাঝি দু'জনকে "হাফিজ" হুকুম দিল। নৌকো আমাদের ঘাট ছেড়ে, গ্রামের সীমারেখা অতিক্রম করে ছুটে চললো তাজপুরের দিকে।

শ্রাবণ মাস। পুরো বর্ষাকাল। চতুর্দ্দিক জলে-জলাকার। ধানগাছগুলি অবশ্য জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাথা উঁচু করে জলের ওপরেই গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সোজাসুজি ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে নৌকো চালিয়ে দিলে ধানগাছের কোনো ক্ষতি হতে পারে মনে করেই আমাদের নৌকো ক্ষেতের আইল ঘুরে একটু ঘুরপথে এগিয়ে চলেছে। সামরিক কোনো বিশিষ্ট অফিসারের মতো মুখের ভাবখানা করে আছি আমি একেবারে মাঝখানে। নাকের নীচে স্পিরিট গাম্ দিয়ে আঁটা সরু গোঁফটা মাঝে মাঝে আঙ্গুল দিয়ে অনুভব করে দেখছি ঠিক আছে কি না। দু'একখানা নৌকো আমাদের বিপরীত দিক্ থেকে এসে আমাদের অতিক্রম করে যাচ্ছে, কিন্তু নির্ভীকভাবে চলেছি আমরা। মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছি আমি ক্ষুদ্র টর্চ্চের আলোয়—দশটা বাজতে তখনো বিশ মিনিট বাকী।

তাজপুরের পশ্চিম দিকের গ্রামে প্রবেশ করে কিন্তু আমাদের পথ ভুল হয়ে

গেল। খাল মনে করে যেপথে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম পরম নিশ্চিন্তে, অকস্মাৎ দেখলাম সেটা খাল নয়, আমরা এসে পড়েছি একটি পুকুরের মাঝখানে। এদিক ওদিক চেষ্টা করে পথ আর ঠাওর করা গেল না এবং মাঝি খগেন একসময় হতাশভরে বলে ফেললো: আজ ধরা পড়তেই হবে।

বললাম: দাঁড়াও, জীবনে ধরা পড়িনি। যদি পড়ি, তাহলে রাজনৈতিক কাজের ইতিহাসে এই হবে আমার প্রথম বিচ্যুতি।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, অন্ধকার এতই গাঢ় যে, যে ভুল পথে আমরা প্রবেশ করে বসেছি এই পুকুরে, এখন ফিরে যাবার সেই পথটাও আর খুঁজে পাচ্ছি না। পুরো বর্ষায় গাছপালা সব ডুবে গিয়ে শুধু চতুর্দিকে দেখা যাচ্ছে তাদের মাথাগুলো আর নিবিড় অন্ধকারে সেগুলো যেন তুলে ধরেছে অনতিক্রম্য কালো যবনিকা। এমনি অবস্থায় বার বার জলমগ্ন গাছের ডালে আমাদের ডিঙ্গি ঘা খেতে লাগলো। বড় পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ একটা আছে বটে, কিন্তু এখন জ্বালানো কি নিরাপদ? এমন কি, ক্ষুদ্র টর্চটাও জ্বালিয়ে আর ঘড়ি দেখতে পারছি না। ওদিকে তাজপুরে মণীন্দ্র হয়তো সব রেডি করে বসে আছে। একটি মিনিটি দেরী আমি জীবনে করিনে। কী ভাববে সে!

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল, একখানা বাড়ী থেকে জন দুই মহিলা অনেক-গুলো বাসন নিয়ে এসে জলের ধারে বসলেন। তাঁদের সঙ্গে স্তিমিত কেরোসিনের ডিবা। এই গাঢ় অন্ধকার ওতে যেন গাঢ়তর হয়ে উঠলো এবং আমাদের পথ যেন হয়ে উঠলো আরও ভয়াবহ! দেখলাম, খগেন, অনাথ ও বিপদভঞ্জন নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বৈঠা চালাচ্ছে বটে, কিন্তু উৎসাহ যেন শেষ হয়ে এসেছে তাদের। বোধহয় নিশ্চিন্তভাবে জেনে বসে আছে যে, আজ আর উপায় নেই।

আমি কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নই। বললাম: মাঝি, চল তো ঐ ঘাটের দিকে, মহিলারা যেখানে বাসন ধুচ্ছেন।

স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা কইতে বোধহয় ওরা চমকে উঠলো এবং আমার প্রস্তাব শুনে বোধ হয় প্রমাদ গুনলো।......নৌকো মহিলাদের প্রায় কাছাকাছি আসতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম: দেখুন, কিছু মনে করবেন না। বলতে পারেন আপনাদের গাঁয়ের চৌকিদার-বাড়ী কোন্ দিকে?

এই প্রশ্নের তাৎপর্য্য আমার সহকর্ম্মী মাঝিরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো কি না জানিনে। মহিলাদের মধ্যে একজন বললেন যে, ঐ বাড়ীটিই চৌকিদারের।

এগিয়ে গেলাম আরো ঘাটের দিকে। আমার পোষাকের পিতলের বোতামগুলো ও চোখের চশমা কেরোসিনের ডিবার আলোয় চক্‌চক্ করে উঠলো।

প্রশ্ন করলাম : কোথায় সে ?

সভয়ে জবাব এল : সে তো বাবু খাওয়া-লওয়া করছে। অখনই বাইর হইবো পাহারায়।

ডাকুন তাকে।—আদেশ জারী করে ঘাট থেকে একটু দূরে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। মাঝি খগেন, অনাথ ও বিপদভঞ্জনকে অন্ধকারে ঠিক দেখতে না পেলেও ওদের বিস্ময়ের সীমা যে অনেকক্ষণ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তা মনে মনে অনুভব করতে পারছিলাম।

একজন মহিলা কাজ অর্দ্ধসমাপ্ত রেখেই ছুটে গেলেন বাড়ীতে এবং দেখা গেল, একটু পরেই এক হাতে লম্বা বল্লম ও অপর হাতে একটি হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে ত্রস্তপদে এগিয়ে আসছেন চৌকিদার-পুঙ্গব। এসে পাড় থেকেই বার-কয়েক স্যালাম জানিয়ে ছুটে এসে উঠলো তার ডিঙ্গি নৌকোয় এবং নৌকো বেয়ে চলে এল আমাদের নৌকোর গায়ে।

বুঝলাম, সে ভেবেছে তার সেরাজদীঘা থানার দারোগা আমি। তাতে অবশ্য আপত্তি ছিল না আমার, কিন্তু নিজের থানার দারোগাকে সে চেনে নিশ্চয়ই। সুতরাং—

প্রথমেই পরিচয় দিলাম : আমি আসছি ঢাকার পুলিশ সাহেবের দপ্তর থেকে। কী নাম যেন তোর ?

আইগা, বরকত আলী।

হাঁা, ঠিক মনে পড়েছে। তোর নামেই নালিশ আছে অনেকগুলি। তুই পাহারা দিস্ তো রোজ ?

আইগা, হ।

তবে নালিশ যায় কেন ? গ্রামের সবাই তোমার দুষমন বলতে চাও নাকি ? কেন তারা বলে যে তুমি প্রায়ই নাকে তেল দিয়ে দিব্যি ঘুমোও। তোর বউ কয়টা ?

গভীর লজ্জায় এঁকে-বেঁকে বরকত আলী জবাব দিল: আইগা তিনটা।

ছোটটার বয়স কত?

আইগা, বছর বারো তো হইবোই।

ঝাঁঝিয়ে উঠলাম: বছর বারো তো হইবোই।—শালা, বদমাস্ কোথাকার! বারো বছরের খুকিকে সাদি করেছ তুমি বেয়াল্লিশ বছরের বুড়ো? আর সেটাকে নিয়ে সারারাত পড়ে থাকলে পাহারা দেবে তোমার কোন্ চাচা আর ফুফারা, তাই শুনি! এই গ্রামে যে কেউ তোমায় দেখতে পারে না কেন, তা বুঝলাম। কিন্তু চাকরি তো থাকবে না তোর। কিছুতেই থাকতে পারে না।

বরকত আলী পারে তো আমারই নৌকোয় উঠে এসে একেবারে আমার পায়ের ওপরে লুটিয়ে পড়ে, এমনি ভাবখানা দেখিয়ে কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে বললো: হুজুর, তাইলে খামু কি? আষ্টটা পোলা মাইয়া যে না খাইয়া মরতে লাগবো, হুজুর!

ধমক দিলাম: হুজুরের পয়সা খুব সস্তা কিনা, তাই শালা তুমি বৌ নিয়ে থাকবে সারাটা রাত আর গ্রামে প্রত্যেক রাত্রেই দু'চারটে চুরি হতে থাক্। বল্ শালা, কাজে আর কামাই করবি কি না!

বরকত আলী নাক-কান মলা খেয়ে আল্লার নামে ও অন্যান্য পীর-পয়গম্বরের নামে জিভ কেটে শপথ করলো হাজারো বার যে, আর একটি রাত্রিও সে কামাই দেবে না, এবারটা তাকে রেহাই দেওয়া হোক্।

বললাম: এবারটা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু শালা, বলে রাখছি তোকে, যদি আর একখানা দরখাস্ত যায় আমাদের ওখানে, তাহলে মহিম চক্কোত্তির হাতে তোর মরণ আছে রে শালা! বুঝলি, হারামজাদা?

হারামজাদা ও শালা মর্ম্মে মর্ম্মে যে অনুভব করেছে, তা বোঝা গেল। অকস্মাৎ নরম সুরে আবেদনের ভাষায় বকরত আলী বললো: আইবেন না হুজুর বাড়ীতে, পান তামুক—

বললাম: না, সময় নেই। আবার তাজপুরের চৌকিদার ব্যাটার ওখানে যেতে হবে।—এই ব্যাটা, চল্ তো, তাজপুরের পথটা আমায় দেখিয়ে দিবি।

মহানন্দে বরকত আলী তার ডিঙ্গি ভাসিয়ে এগিয়ে চললো আমাদের অনুসরণ করতে বলে। গ্রামের বাইরে এসে তাজপুরের রাস্তা আমার মাঝিকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নেবার প্রাক্কালে সে আবার বার কয়েক সবিনয় স্লালাম

জানিয়ে ও ভবিষ্যতে আর ত্রুটি না-হবার প্রতিশ্রুতি ও গ্যারান্টি উচ্চারণ করে যখন তার গ্রামের দিকে নৌকো ভাসিয়ে দিল, আমার মনের হাসি তখন মুখেও ফুটে উঠেছে।

বরকত আলীর নৌকো দূরে সরে যেতেই খগেন প্রশ্ন করলো : তাহলে মহিম দারোগা সাহেব, কোন্ চৌকিদারের বাড়ী যামু এ্যাল ?

তাজপুর সরকার বাড়ীর পূব দিকে একটি বিরাট দীঘি, সেই দীঘির উত্তর দিকে অন্যান্য গাছের মধ্যে আছে একটি কাঁঠাল গাছ, সেই গাছের নীচের অন্ধকারে মণীন্দ্র আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। দূরে থাকতেই একবার টর্চটা জ্বালিয়ে বার তিনেক আন্দোলিত করতেই ওখান থেকে তেমনি ক্ষুদ্র টর্চের আন্দোলন দেখা গেল।

কাছে যেতেই সে এগিয়ে এল। প্রশ্ন করলাম : সব রেডি ?

সব রেডি।

কোথায় বসছি আমরা ?

ঐ মন্দিরের মধ্যে।

মন্দিরের মধ্যে! ঠাকুর-বিগ্রহ কিছু নেই ওর মধ্যে ?

না।

নৌকো থেকে নিঃশব্দে নেমে মণীন্দ্রকে অনুসরণ করলাম। মাঝিরা সবাই নিঃশব্দে নৌকোতেই অপেক্ষা করতে লাগলো। পুকুরের পূব দিকে মন্দির। মন্দিরের কাছাকাছি এসে মণীন্দ্র বললো : আপনি গিয়ে বসুন। ভেতরে মাদুর পাতা আছে। আমি লীলাকে নিয়ে আসছি।

একটু পরেই দরজা নিঃশব্দে খুলে লীলা প্রবেশ করলো। মণীন্দ্র গলা বাড়িয়ে বলে গেল : আমাদের দাদা আর আমার বোন লীলা।—বাইরেই অপেক্ষা করছি আমি। তিনবার টোকা দিলেই দরজা খুলবেন।—নিশ্চিন্তে কথা বলুন আপনারা, পাড়ার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই মন্দিরের মধ্যে রইলুম শুধু লীলা আর আমি আর জমাট অন্ধকার! অনুভব করে লীলাকে কাছে টেনে নিলাম।

তারপর শুরু হলো আমাদের আলাপ। ছক-কাটা পথেই এগিয়ে যেতে লাগলাম, সামান্য ও লঘু আলোচনার মধ্য দিয়েই এসে পড়লাম গুরুগম্ভীর প্রসঙ্গে : স্বাধীনতার সংগ্রামে সীতারামের মতো ছেলেরা যেমন যোগদান

করবে, তেমনি শ্রীর মতো তাদের সাহায্য করবে দেশের মেয়েরা। সীতারামের কামানের গোলা মাথায় করে এনে দিয়েছিল শ্রী। ঠিক তেমনি তোমাদেরও অনেক কাজ করবার আছে, লীলা। জননী হবে সন্তান পালন করবে, সুসন্তান তৈরী করবে, এমনি প্রসপেক্টের জৌলুসে আমাদের আস্থা কম, কারণ পরাধীন দেশে সুসন্তান কাকে বলে সেটাই একটা দারুণ প্রশ্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জ্জন করে মোটা মাইনের চাকরি করে বংশের মুখ যারা উজ্জ্বল করে তোলে, তারা ভালো ছেলে হতে পারে, কিন্তু আমরা তাদের সুসন্তান বলি না, লীলা। নিজের চিন্তা ভাবনা ও ক্ষমতা যার পরিবারের চারখানা দেয়ালের মধ্যেই আটকে রেখে চলে পরাধীন দেশের সুসন্তান তারা নয়। জননী বলতে আমরা জানি শুধু দেশজননীকে। তাদেরই আমরা বলি তাঁর সুসন্তান, যারা তাঁর শৃঙ্খল মোচনের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করেছে, শিকলভাঙ্গার গান যাদের কণ্ঠে ধ্বনিত। আমরা গ্রহণ করেছি ভাঙ্গনের ব্রত। গতি চাই, চাই বেহিসাবী পরিকল্পনা ও তা কার্য্যে রূপান্তরিত করবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা। তাই জননী হয়ে তথাকথিত সুসন্তান তৈরী করবার জন্য অপেক্ষা না করে আমরা চাই বোন হয়ে এগিয়ে এস তুমি—ভাইয়ের পাশে পাশে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, জীবনের সর্ব্বসম্ভাবনা ও রঙীন ভবিষ্যৎ পশ্চাতে ফেলে রেখে। পারবে না লীলা?

লীলা আমার হাতে হাত রেখে বললো: ছোড়দা'র কাছে সবই শুনেছি দাদা। সব কিছুই বিলিয়ে দেবার সঙ্কল্প নিয়েই তো এসেছি তোমার কাছে।

প্রায় এক ঘণ্টা কথা হলো। এমনি অন্ধকারে লীলার সঙ্গে পরিচয় ও অন্তরঙ্গ আলোচনা হলো, অথচ সে দেখতে পেলো না আমার মুখ। দিনের বেলা কোথাও দেখলে চিনতেও পারবে না আমায়। বিপ্লবী দলের রিক্রুটমেণ্ট এমনি কঠিন সতর্কতার সঙ্গেই হতো।

সেই অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে প্রণাম করে এক সময় বিদায় নিল লীলা আমায় আবার আসবার অনুরোধ জানিয়ে।

ফিরে এসে নৌকোয় যখন উঠলাম, তখন রাত প্রায় একটা। আকাশ মেঘে একেবারে সমাচ্ছন্ন। একেই নিবিড় অন্ধকার, তার ওপর সেই অন্ধকারে জমাট মেঘগুলো যেন বিরাটকায় দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। বাতাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। থমথমে ভাব, আক্রমণের পূর্ব্বক্ষণের মতো। বৃষ্টি হবেই।

কিন্তু তাই বলে একটি মিনিট'ও বিলম্ব করা চলে না। আকাশের অবস্থা দেখে তারপর যাত্রা করবার মতো সহজ কাজে তো আমরা বেরোইনি। কিংবা যাত্রা স্থগিতের কথাও ওঠে না। যে কাজে বেরিয়েছি, কাল-বৈশাখীর ঘনঘটা তাতে বাধা সৃষ্টি করতে পারলেও সে বাধাকে আমরা গ্রাহ্য করি না। শুধু তাই নয়। সর্বত্র ঠিক সময়মতো পৌঁছে ঠিক কাজটি শেষ করে এগিয়ে চলবো আমরা আমাদের লক্ষ্য পথে। বাধা এলে ধরবো তাকে চেপে দু'হাতে, করবো তার সঙ্গে লড়াই। তারপর হয় বিজয়মাল্য পড়বে আমাদের গলায়, নয় মৃত্যুর তুহিনশীতল বক্ষে এলিয়ে পড়বো নেল্‌সনের মতো।······

চড়চড় করে বৃষ্টিও সুরু হলো। মণীন্দ্র চেনে আমাকে, তাই অপেক্ষা করবার নিষ্ফল অনুরোধ আর উচ্চারণ করতে সাহস করলো না। মাঝি খগেনকে শুধু একবার স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, আড়াইটেতে আর একটা এনগেজমেন্ট আছে। বৈঠা তুলে নিয়ে সে প্রস্তুত হয়ে বললো: Let us start······

আমাদের ডিঙ্গি নৌকো তাজপুরের ঘাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। গ্রামের আঁকাবাঁকা খাল পেরিয়ে বাইরে মাঠে এসে পড়তেই মুষলধারে বর্ষণ সুরু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে পাগলা হাওয়া। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বেশ বড় আর তীরের মতো এসে বিঁধতে লাগলো গায়ে।

মাঝিদের খালি গা, কষ্ট হতে লাগলো তাদেরই বেশী। ডিঙ্গি নৌকোয় ছই থাকে না, তাই ঠায় ভেজা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। মাঝখানে পাটাতনের ওপর বসে রইলাম আমি আর ওরা প্রাণপণে বেয়ে চললো। আকাশ ভেঙ্গে তখন বর্ষা নেমেছে। মাঝে মাঝে আকাশ চিরে চিরে বিদ্যুতের সর্পিল চমক্। এলোপাথাড়ি বইছে বাতাস। একহাত দূরের কিছুও দেখা যায় না। দেখবার জন্য চোখ খোলা যায় না, এমনি বৃষ্টি ও বাতাসের তোড়! নৌকোয় জল জমে যাচ্ছে মুহুর্মুহুঃ আর আমি অর্থাৎ মহিম দারোগা বার বার সেঁওতি দিয়ে সেই জল ছেঁচে ফেলছি। সামরিক পোষাক ভিজে গেছে, ঘড়ি ভিজে গেছে, আমার কৃত্রিম গোঁফ কোথায় ভেসে গেছে কে জানে, একেবারে খোলা মাঠের মাঝখানে বৃষ্টি ও বাতাসের তোড়ে আমাদের ডিঙ্গি টলমল করে উঠছে!

তথাপি, তথাপি, তথাপি বেয়ে চলেছি আমরা অবিশ্রামভাবে সেই নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ভেদ করে। পৌঁছুতে হবে কেয়টখালী গ্রামে ঠিক আড়াইটের মধ্যে। সেখানে কদমতলায় অপেক্ষায় বসে থাকবে সুবোধ—সুবোধ চক্রবর্ত্তী।

একটি মিনিট নষ্ট করবার উপায় নেই।

ছত্রিশ

বীরতারকর কাছাকাছি যখন এসে পৌঁছোলাম, বর্ষণ তখন থেমে গেছে বটে, কিন্তু গর্জ্জনও থামেনি আর থামেনি বিদ্যুতের চোখ-ঝলসানো তির্য্যক দ্যুতি! সময় আর কতটুকু আছে, এইবার দেখা উচিত। কোট ও রুমাল দিয়ে জড়িয়ে অতি সাবধানে পাটাতনের একখানা কাঠ দিয়ে সযত্নে ঢেকে-রাখা আমার হাত-ঘড়িটা সন্তর্পণে বার করলাম। দেখা গেল. দুটো বাজবার পূর্ব্বেই ঘড়ির অপমৃত্যু হয়েছে। শুধ্ ঘড়ি নয়, টর্চ্চ লাইট দুটোও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে। মনে মনে হিসাব করলাম, যে গতিতে আমরা নৌকো চালিয়ে এসেছি, তাতে আড়াইটের মধ্যেই নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবো আমাদের গ্রামে।

ছয়গাঁওয়ের মধ্য দিয়ে কেয়টখালীব পুব পাড়ার বাঁড়ুয্যে বাড়ীর দক্ষিণে এসে পড়লাম। কি তিথি ছিল, আজ আর তা মনে নেই। কিন্তু মনে পড়ে, বর্ষণ ক্ষান্ত হলেও আকাশের পুঞ্জীভূত মেঘের ভার এতটুকু লাঘব হয়নি। সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে জমাট অন্ধকার। কয়েক হাত দূরের কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় না। সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে থেকে থেকে বিদ্যুতের ঝলকানিতে নিমেষের জন্য চারিদিকটা আলোকিত হয়ে উঠছিল আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছিল মেঘের কর্ণপটহ-বিদারী নির্ঘোষ। তীক্ষ্ণনখ থাবার মধ্যে শিকারকে আটকে নিয়ে রক্তলোলুপ দৈত্য তার পানে চেয়ে মাঝে মাঝে যে আগ্নেয় হাসি হেসে থাকে, বিজলীর চমকানিতে যেন দেখতে পেলাম সেই হাসির ছুরি! পরক্ষণেই বজ্রনির্ঘোষে সেই চাপা মারাত্মক হাসি যেন সহস্র ধমকে খান্ খান্ হয়ে ফেটে পড়ছিল।

বোঝা গেল, এমনিভাবে বিশ্ব চরাচর ডুবিয়ে দিয়েও তার তুষ্টি নেই এতটুকু, দ্বিতীয় বার সর্ব্বাত্মক অভিযানের জন্য চলছে তার দ্রুত প্রস্তুতি।

দূরে বিপদভঞ্জনের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের পুকুরপাড়ের প্রকাণ্ড কদম গাছটা ঠাওর করা গেল। পরক্ষণেই বিদ্যুতের ঝলকানিতে দেখা গেল, ঠিক তার তলায় একখানি নৌকো বাঁধা আছে, ছইয়ের দুটি দিকই বেশ ভালো করে বন্ধ।

নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে সুবোধ। কিন্তু খগেন বললোঃ যদি সুবোধদা' না হয় দ্বিজেনদা'?

অনাথ যোগ দিলঃ যদি অপরের বা কোনো পুলিশেরই নৌকো হয়, তাহলে?

বিপদ বললোঃ এও তো হতে পারে, কোনো দৈব দুর্ঘটনায় সুবোধদা' আসতে পারেননি। এদিকে শ্রীনগর থেকে এসেছে বড় দারোগা বা ঢাকা থেকে এসেছে অবিনাশ দারোগা লুকিয়ে আমাদের ফলো করতে। আপনাকে বাড়ীতে না পেয়ে হয়তো দুর্ভাগ্যক্রমে রাত কাটাচ্ছে ব্যাটা ঠিক ঐ কদম গাছটার নীচেই। আর বর্ষার জন্য ব্যাটা ছইয়ের দরজা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে!—না জেনে শুনে হঠাৎ গিয়ে ওঠা কি যুক্তিসঙ্গত হবে?

খগেন বললোঃ ওসব পুলিশ টুলিশ না হয়ে গ্রামেরই কেউ যদি হয়, তাহলে সেও তো জেনে যাবে যে, বাড়ীতে অন্তরাণ হয়েও দাদা পুলিশের পোষাকে রাতে বাইরে ঘুরে বেড়ান। এমন জানাজানি কি ঠিক হবে দাদা?

বিপদ বললোঃ এক কাজ করা যাক। আমাদের বাড়ীরই তো পুকুর। আমি যেন দুপুর রাতে বাইরে যাবো বলে বেরিয়ে এই নৌকোখানা দেখেছি —এমনিভাবে এসে নৌকোয় উঠে একটু ডাকাডাকি করি যে, এত রাত্রে কে এই নৌকোতে এবং কি চায় সে। তাহলেই তো ব্যাপারটা জানা যাবে। আপনারা বরং পুকুরের ঘাটলায় গিয়ে একটু বসুন।

ওদের আশঙ্কা ও নিশ্চিত হবার প্রস্তাব বেশ যুক্তিপূর্ণ, সুতরাং তা ঠেলে ফেলবার উপায় ছিল না। আমাদের নৌকো খুব ধীরে চুপি চুপি এসে ওদের শান-বাঁধানো ঘাটলার কাছে লাগলো। কিন্তু সুবোধও কি আর ঘুমিয়ে পড়েছে?······দেখা গেল, ধীরে ধীরে ঐ নৌকোর পেছন দিকের ঢাকনি খুলে

কে যেন বাইরে এল এবং আমাদের শুনিয়ে অথচ বেশ অনুচ্চকণ্ঠে ছইয়ের ভেতরে উপবিষ্ট কার সঙ্গে কথা কইতে লাগলো : তুই জানিসনে রাখাল, এ হচ্ছেন দ্বিজেনদা।'—দ্বিজেন গাঙ্গুলী, কথা যাঁর একচুল এদিক ওদিক হয় না। নিশ্চয়ই এসে পড়বেন।......কী বললি, আড়াইটে বেজে গেছে? দু'মিনিট পার হতে চললো? হতভাগা, তাহলে দেখবি, তিনিও এসে পড়বেন।

ব্যস্, সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ওদের সবাইকে বিপদদের বাড়ীতে গিয়ে তৎক্ষণাৎ ভিজে জামা কাপড় বদলে নেবার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে আমি সেই গায়ের সঙ্গে লেপটানো পোষাক পরেই সুবোধের নৌকোতে এসে উঠলাম।

ছইয়ের মধ্যে ঢুকেই প্রশ্ন করলাম : রাখাল কে হে?

সুবোধ হেসে জবাব দিল : রাখাল গরুর পাল লয়ে গেছে মাঠে।

স্তিমিত-শিখা কেরোসিনের ডিবা জ্বলছে। মুষলধার এই বর্ষণ ছইয়ের অসংখ্য ছিদ্রপথে পাটাতনের সর্ব্বত্র চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। অর্থাৎ নিজেকে রক্ষা করবার উপায় না দেখে সুবোধ দাঁড়কাকের মতো ঠায় বসে বসে ভিজছে এই রাত আড়াইটে পর্য্যন্ত। নৌকোর তলায় যখন বেশ জল জমে গেছে, তখন পাটাতন তুলে সেঁওতি করে যে জল তুলে ফেলেছে ছইয়ের ক্ষুদ্র জানালা-পথে, তা বোঝা গেল।

বললাম : একেবারে ঠায় বসে ভিজেছো? তোমার শরীর তো ভাল নয়। এই জল সইবে কেন? বিপদের ঘরে গিয়েও তো তুমি আশ্রয় নিতে পারতে?

সুবোধ জবাব দিল : মাঝিকে সেখানে পাঠিয়েছি। কিন্তু আপনি কোথাও গিয়েছিলেন নাকি? একেবারে যে ভিজে জল হয়ে গেছেন।

বললাম : হ্যাঁ, কয়েক মাইল দূরে।

তার পরের কথা ও কাজ সংক্ষিপ্ত। ঐ কদমতলা থেকেই বিদায় নিল সুবোধ। একটা ছোট প্যাকিং কেস হাতে করে আমি বিপদের ঘরে এসে সুবোধের নিদ্রিত মাঝিকে ডেকে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু আমার মাঝিদের কাজ তখনো শেষ হয়নি। খগেনই ওদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যবান। বৈঠা তুলে নিয়ে সে বললো : চলুন দাদা, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। বিপদকে বললাম, প্যাকিং কেসটা পরদিনই ভোরে অনাথের হাতে সুবোধ গুহের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে।

কারিগর বাড়ীর পাশে এসে একটি ডুবন্ত গাছের ডালপালার মধ্যে সন্তর্পণে

নৌকোখানা ঢুকিয়ে দিয়ে আমরা বিদ্যুতের ঝলকানির অপেক্ষা করতে লাগলাম শ্মশানে রাজা হরিশ্চন্দ্রের মতো! আকাশ তখন অনেকটা হাল্কা হয়ে এসেছে। জমাট মেঘের স্তরে বোধহয় ভাঙ্গন ধরেছে, কারণ দু' একটা মিটমিটে তারা অকস্মাৎ তার আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকিও মারছিল।

বাড়ীর কাছে এসে এমনিভাবে অপেক্ষা করবার পক্ষে যুক্তি আছে। প্রথম-রাতে বেরিয়ে পড়ে ফিরলাম রাত শেষ করে। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্বগৃহে অন্তরীণ রাজবন্দীকে পরিদর্শন করবার জন্য আসতে পারেন হয়তো সরকার তরফের কোনো অফিসার। বাড়ীতে আমায় না পেয়ে—হতে পারে, হয়তো তিনি ওৎ পেতে বসে আছেন সাক্ষীসাবুদ নিয়ে আমারই অপেক্ষায়। একবার ফিরে এলেই হয়!……

তাই যদি হয়, তাহলে আমার কাজ হবে খগেনকে ঐ গাছের ডালেই ছেড়ে দিয়ে একেবারে সরল সুবোধ বালকের মতো বৈঠা চালিয়ে সশব্দে বাড়ীতে ফিরে যাওয়া এবং এমনিভাবে অভিনয় করা যে, যেন মাত্র খানিকটা পূর্ব্বে মলত্যাগের জন্যই আমি নৌকো ভাসিয়ে পাশেই কোথাও গিয়েছিলাম—ম্যান্দার বাড়ী বা ভুঁইমালী বাড়ী। বিক্রমপুরে বর্ষাকালে এই অত্যাবশ্যক কার্য্যটি প্রায়ই যে নৌকোযোগেই সারতে হয়, সে কথা বিক্রমপুরবাসী সকলেই স্বীকার করবেন। আর অভিনয়ে আমার দক্ষতা সর্ব্বজনস্বীকৃত; সুতরাং সাক্ষীদের মনে, এমন কি অফিসারটির মনেও তখন খটকা বাধিয়ে দেওয়া কঠিন কিছুই হবে না।

কিন্তু সে সব কৌশলের আর প্রয়োজন হলো না। হরিশ্চন্দ্রের অনুকূলে বিজলী আর একবার ঝলসে উঠলো এবং দেখা গেল আমাদের দক্ষিণ দিকের ঘাটলা শূন্য। বাড়ীও নীরব, নিশ্চয়ই সবাই নিশ্চিন্ত নিদ্রায় অচেতন। অতএব, আশঙ্কার হেতু নেই।

বাড়ী এসে পোষাক ত্যাগ করে দক্ষিণের ঘরে শুয়ে পড়লাম। একটা রিভলভার ও গোটা পঞ্চাশেক কার্ত্তুজ একখানা রুমালে বেঁধে রেখে দিলাম হাতের কাছে আমার টেবিলের ওপরই।……

ভোর হতে-না-হতেই আর এক বিভ্রাট! ডাকাডাকি, হাঁকাহাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার ঘরের বাড়ীর ভিতর দিক্‌কার দরজা ভেজানো থাকতো।

ছোট ভাই রঙ্গলাল উত্তরের ভিটের টিনের দোতলা ঘরের ওপরের তলায় শুতো মায়ের কাছে। ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে চোখ মেলে চেয়ে দেখি রঙ্গলাল আমায় ডাকছে। সংক্ষেপে অনুচ্চকণ্ঠে সে যা বললো, তার মর্ম্মার্থ এই যে, পুলিশ বাড়ী ঘিরে ফেলেছে, তল্লাশী হবে।

তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে টেবিলের ওপরকার রুমালটি হস্তগত করতে যাবো, এমন সময় অকস্মাৎ শোনা গেল যতীন দারোগার বিনীত কণ্ঠ: দ্বিজেনবাবু, দ্বিজেনবাবু জাগেন নাকি? আবার এসেছি আমরা। উঠুন।—বলে যতীন টেবিলের কাছেই খোলা জানালা-পথে আমাদের পানে চেয়ে রইলেন।

কী করা যায়? কী করে, কোন্ উপায়ে রুমাল-বাধা রিভলভারটি সরিয়ে ফেলা যায়? অবশেষে রিভলভার নিয়ে ধরা দেবো এদের হাতে?……চিন্তা হলো, কিন্তু সে মুহূর্ত্ত মাত্র। দরজা খুলে না দিলে ওদের সন্দেহ দৃঢ় হবে।……আমি রঙ্গলালের পানে চাইলাম, সেও চাইলো আমার পানে। আমাদের চোখে চোখে কিসের ইঙ্গিত যে ঝলক মেরে গেল, টেরও পেলেন না যতীন দারোগা।

আমি খাট থেকে নামলাম। দু'চারটে অতিরিক্ত হাই তুলে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে ওঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললাম: এক মিনিট যতীনবাবু! জামাটা গায়ে দিয়ে নিই। সেই সন্ধ্যে থেকে ঘুমোতে ঘুমোতে ঘুম যেন আর ছাড়তে চাইছে না।

বলতে বলতে ব্র্যাকেটের কাছে গেলাম মন্থর গতিতে। একটা পাঞ্জাবী নিয়ে গায়ে চড়াতে গিয়েই থেমে গেলাম এবং মহা বিরক্তি প্রকাশ করে বলতে লাগলাম: আর বলবেন না মশাই, এই পিঁপড়ের জ্বালায় একেবারে অস্থির হয়ে গেলাম। তেলের গন্ধে শিয়রের বালিশ তো রাত্রে এরা আক্রমণ করবেই, তার ওপর ব্র্যাকেটে ঝোলানো জামাও যদি এরা রেহাই না দেয়, তাহলে যাই বলুন তো কোথায়?—বলে জানালার সম্মুখে গিয়ে পাঞ্জাবীটা মেলে ধরে ঝাড়তে সুরু করলাম।

তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে যতীন বললেন: ও মশাই, আমার বাসাতেও তাই। এক কৌটা গুড়, চিনি বা মিষ্টি কোথাও রাখবার উপায় নেই। এই বর্ষাকালে শালারা যেন একেবারে স্বরাজ পায়!—বলে এক গাল হেসে ফেললেন।

এদিকে কাজ আমার হাঁসিল হয়ে গেছে ততক্ষণে। জানালা আড়াল করে

পাঞ্জাবীটা ঝাড়বার সুযোগে রঙ্গলাল চট্‌ করে টেবিলের ওপর থেকে রুমালটা তুলে নিয়ে চলে গেছে বাড়ীর মধ্যে এবং তা চালান করে দিয়েছে একেবারে বোন হেনার ব্লাউজের মধ্যে।

দরজা খুলে দিলাম। যতীন দারোগা জনকয়েক সিপাইসহ ঘরে এসে উপবেশন করলেন। তল্লাশী সুরু হলো এবং তা তন্ন তন্ন করে। তল্লাশীকে আমি পরোয়া করছিলাম না, কারণ রিভলভার ও কার্তুজগুলো খুব নিরাপদ স্থান লাভ করেছে। কিন্তু প্যাকিং কেসটা যে সকালবেলাতেই অনাথের নিয়ে যাবার কথা শেখরনগর গ্রামের সুবোধ গুহের বাড়ীতে। দারোগার সঙ্গে আলাপে জানা গেল, আমার বাড়ীর তল্লাশী শেষ করে ওরা পুব পাড়ার দিকে যাবে অন্য ব্যাপারের একখানা নাকি আর্জ্জির তদন্ত করতে।

বিশ্বাস নেই এই সাপের দলকে। হয়তো ডাহা মিথ্যে কথা বললো এবং হয়তো অনাথদের বাড়ীতেই গিয়ে উঠবে তল্লাশী করতে।......সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে এদের সঙ্গে নানা বাজে আলাপ আলোচনার ফাঁকেই এক মিনিট সরে এসে রঙ্গলালের সঙ্গে দুটো কথা হয়ে গেল। কাজের কথা!

কিন্তু রঙ্গলাল বাড়ী ছেড়ে যাবে কী করে? তল্লাশীর সময় কারুকে যেতে দেবে না ওরা, আসতেও দেবে না। এই-ই হচ্ছে রীতি! কিন্তু কৌশল বার করে ফেললাম একটা! অব্যর্থ কৌশল!

তল্লাশী যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এবং আপত্তিজনক কিছুই না পেয়ে যতীন দারোগা যখন মিঠে হাসি হেসে এই অনর্থক তকলিফের জন্য আই বি-দের বাপান্ত করে গালাগাল দিয়ে আমার ন্যায় বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ভদ্রলোকের ছেলের এই মিথ্যে হয়রানির জন্য অজস্র সহানুভূতি প্রকাশে গদগদ হয়ে উঠেছেন, ঠিক তখন আমি অকস্মাৎ ব্যস্ত হয়ে হেনাকে ডেকে বললাম: হেনা, চা দিলিনে দারোগাবাবুকে? তোরা বড্ড ভুলে যাস্।—বসুন দারোগাবাবু! কাজ শেষ, এবার একটু চা হোক্।

বারকয়েক গররাজী হয়ে পরে যতীন নিমরাজী হয়ে বসতেই আমি রঙ্গলালকে বললাম: যা তো রঙ্গু, হেনাকে বলে আর একটা মামলেট করে দিতে।

রঙ্গলাল বাড়ীর মধ্যে গিয়েই ফিরে এসে দুঃসংবাদ জানালো, একটিও ডিম নেই!

কেন?—প্রশ্ন করলাম চোখ কপালে তুলে।

রঙ্গলাল জবাব দিল : তোমার কালকে সকালের কেনা ছ'টা ডিমের মধ্যে দু'টো খারাপ বেরিয়েছে আর চারটে খাওয়া হয়ে গেছে কাল রাত্রেই।

যতীন বলে উঠলেন : থাক্, থাক্। মামলেট আর লাগবে না। চা এক কাপ হলেই চলবে। আর রাজবন্দীদের বাড়ীতে কিছু খাওয়াই নাকি বেআইনী। শালা আই বি-রা—বলতে বলতে আর একবার তিনি সরকারী বুদ্ধিজীবী বিভাগের উদ্দেশে চোখা চোখা কটূক্তি বর্ষণ করলেন।

তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বললাম : তা কি হয় ?—যা, এখ্খুনি যা, কারিগর বাড়ী থেকে এক ডজন ডিম কিনে নিয়ে আয় গে। মামলেটহীন চা নুনহীন মাংসের মতো।

আবার যতীন বাধা দিলেন, আবার আমি তাড়া দিলাম। রঙ্গলাল এই ফাঁকে ব্যস্ততার ভান করে মহাদেবকে সঙ্গে করে আমাদের ছোট নৌকো ভাসিয়ে দিল এবং কারিগর বাড়ীর মোড় ঘুরে সে অদৃশ্য হয়ে যেতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমি বললাম : যতীনবাবু, এবার নিয়ে তো বোধহয় বার দশেক সার্চ হলো আমাদের বাড়ী। পেলেন তো না কিছুই—

বাধা দিয়ে যতীন আবার আই বি কে গালাগাল দিয়ে বললেন : ও শালারা কী বলে জানেন ? বলে, সব সময় একটা রিভলভার নাকি আপনার সঙ্গেই থাকে। বাজারে গেলেও নাকি রিভলভারটা সঙ্গে থাকে আর ঘুমোবার সময় রাখেন ওটা হাতের কাছেই, হয়তো বালিসের তলায় কিংবা টেবিলের ড্রয়ারে। আর আপনার বাড়ীতে তো রিভলভারের কারখানা আছে। যেই আমরা রিপোর্ট দিই যে, nothing found incriminating, অমনি শালারা বলে বসে, তোমাদের সার্চের খবর সে পূর্ব্বেই পেয়ে বসে আর সব কিছু সরিয়ে ফেলে।—কী মশাই, জানতেন আপনি যে আজ সার্চ হবে আপনাদের বাড়ী ?

মোটেই না।

কিন্তু ডিম কিনে রঙ্গলাল তখনো ফিরছে না। বুঝলাম, সে দ্রুত নৌকো চালিয়ে চলে গেছে একেবারে বিপদদের বাড়ীতে। সেখানকার বিপদ তো কাটাতে হবে ! তারপর অনাথদের বাড়ী !·· ···

হেনা চা নিয়ে এল। মামলেটের জন্য আর একবার সুগভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে ও রঙ্গলালের অহেতুক বিলম্বের জন্য সুতীব্র বিরক্তি প্রকাশ করে অবশেষে কাপটি এগিয়ে দিলাম যতীনবাবুর হাতে।

দারোগা কাপে চুমুক দিতে লাগলেন।

সাঁইত্রিশ

আমার ছোট ভাই রঙ্গলাল আমার কাজে শুধু সহকারী নয়, সহযোগী ছিল বলা যায়। ছেলেরাও তাকে ডাকতো রনুদা' বলে। আমার অনুপস্থিতিকালে রঙ্গলালের কথাই ছিল সবার ওপরে। বস্তুতঃ, বিক্রমপুরের প্রায় সব অঞ্চলেরই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের তখনকার সমস্ত গুপ্ত কার্য্যের ভার ছিল আমার ও রঙ্গলালের ওপর। দলে আমার নীচেই রঙ্গলালের স্থান হলেও পুলিশকে দেখেছি বার বারই তাকেই গ্রেপ্তার করতে। সারা বিক্রমপুরে শুধু নয়, প্রায় গোটা ঢাকা জেলার যেখানে যত বৈপ্লবিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়েছে, প্রত্যেকটা ব্যাপারেই পুলিশ এসে হানা দিত আমাদের বাড়াতে, জোর তল্লাশী হতো এবং তল্লাশীশেষে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে সবিনয়ে দারোগাবাবু নিবেদন করতেন আমার কাছে যে, রঙ্গলালবাবুকে একবার থানায় যেতে হবে। এমন সব স্থানের এমন সব ডাকাতি, বন্দুক চুরি বা পুলিশ হত্যা সম্পর্কে পুলিশ এসে আমাদের বাড়ীতে হাজির হয়েছে যে, আমরা একেবারে অবাক্ হয়ে যেতাম। সেই কাজ তো দূরের কথা, সেই জায়গাই চিনিনে আমরা।

এমনি নিরর্থক তল্লাশী করতে করতে শ্রীনগর থানার পুলিশও বেশ শ্রান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। প্রথম প্রথম তারা কঠিন নিষ্ঠা দেখিয়ে আমার সম্মুখে এসে দু'হাত শূন্যে তুলে আত্মসমর্পণের মতো বলতোঃ নিন মশায়, আগে আমার শরীর তল্লাশী করে নিন। এই দেখুন, আমার পকেটে এই নোট বুক, এই মানিব্যাগ, এই পেন্সিল আছে আর কোমরে আছে রিভলভার। ছ'টা ঘরই ভর্ত্তি, কিন্তু আর বেশী কার্তুজ নেই। আর আছে তল্লাশীর জিনিসের তালিকা করবার এক শীট ফরম্ আর এই হচ্ছে সার্চ্চ ওয়ারেণ্ট।

তারপর সুরু করতো গোটা পনেরো পুলিশ মিলে তল্লাশী। অসুবিধা তাতে আমার কিছুই হতো না, কারণ বহরমপুর শিবিরে থাকাকালীন সরকারী ব্যয়ে আমি যে আটাশ ইঞ্চি চামড়ার সুটকেসটি কিনেছিলাম, ঐটি ব্যতীত এবং ওর মধ্যে দু'চারটে জামা কাপড় ব্যতীত আমার নিজস্ব জিনিষপত্র আর কিছুই ছিল না। বারকয়েক সার্চ্চের পর ওঁরা আই বি-র হারুণ-অল্-রশীদের গাঁজাখুরি গল্পের অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করে এবার থেকে এসে বেশ জমিয়ে

বসতেন আমারই ঘরে। যেন এসেছেন আড্ডা দিতে কোনো বন্ধুর বাড়ীতে! চা ও সঙ্গে সঙ্গে মুখরোচক নানারকম গল্প হতো ঘন্টাখানেক। জমাদার ও সিপাইদের বলে দেয়া হতো ঘরগুলোতে একবার ঘুরে আসতে। তারপর প্রকাণ্ড তল্লাশী-তালিকার ফরমখানা বার করে দারোগা অভিনিবেশসহকারে লিখতেন: Found nothing incriminating আর নীচে সাক্ষীরা স্বাক্ষর করে দিতেন একে একে। এমনি করে তল্লাশী-পর্ব্ব শেষ হতো। তল্লাশীর বেলায় যতই গোজামিল চলুক না কেন, গ্রেপ্তারের হুকুম থাকলে তা তো তামিল করতে হবেই। তবুও সেটা এমনিভাবে হতো যেন ঢাকা শহরের বোনাল্ডশে শীল্ডের ফাইনাল খেলা দেখবার জন্য আমন্ত্রণ এসেছে!······এসেই দারোগা অত্যন্ত আবেদনের সুরে বলতেন: রঙ্গলালবাবুকে আজ কিন্তু একবারটি সঙ্গে যেতে হবে দ্বিজেনবাবু। যেন তা নইলে ফাইনাল খেলা দেখার টিকিটখানা নষ্ট হয়ে যাবে।

বেশ, ভালো কথা। সবাই আমার ঘরে বসে ঘণ্টাখানেক চা ও গল্পের শ্রাদ্ধ এবং তল্লাশী কার্য্য সমাপ্ত করলেন। ইতিমধ্যে রঙ্গলাল স্নানাহার করে নিল, কোনো কোনোবার হয়তো কারিগর বাড়ী থেকে কয়েকটা ডিম আনিয়ে ডালনা রান্না করে দিলেন ফুলবৌদি। দারোগা এ্যাণ্ড কোম্পানী সেজন্য খুশী মনে অপেক্ষা করলেন আরও কিছুক্ষণ।

কিন্তু আমায় কিছুই না বলে রঙ্গলালকে গ্রেপ্তার করবার পশ্চাতে আই বি-র একটা যে উদ্দেশ্য ছিল, তা বুঝতে দেরী হলো না আমার। স্বগৃহে অন্তরীণ করবার পরই যে আমি আবার গুপ্ত কার্য্য সুরু করবো, তা তারা ভালোভাবেই জানতো এবং কাজ যে সুরু করেছি পুরোদমে, তাও ওরা অন্ততঃ ধারণা করে নিয়েছে। আমার তৎপরতায় একেবারে ছেদ না টেনে ওরা ঠিক আমার প্রুরের লোকটিকেই বার বার গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে তার কাছ থেকে কথা আদায় করে নেবে—এই ছিল ওদের নীতি। এতে আমার কাজও চলবে অব্যাহতভাবে ও তার ফলে জলের তলায় যেখানে যত ট্যাংরা বা শিঙ্গি মাছ আছে, সব মনের আনন্দে ভেসে উঠবে জলের ওপর আলো ও হাওয়া পানের আশায় এবং তাদের খুঁটিনাটি সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়ে সময় ও সুযোগ বুঝে জাল নিক্ষেপ করলেই—ব্যস্, বিক্রমপুর থেকে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের ঘাঁটি একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া

যাবে। সর্ব্বশেষে টুক্ করে আবার আমায় কোনো বন্দীশিবিরে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেই চলবে। এতখানি বুদ্ধি ব্যয়ের জন্য কর্ত্তাদের শুধু তারিফ নয়, প্রমোশন, বেতন বৃদ্ধি ও পুরস্কারও হয়তো মিলবে—এই ছিল যোগীনী বসুর ও জিতেন ধরের মনের আশা।

কিন্তু I. B. proposes and B. V. disposes—এই ছিল আমাদের কথা। বুদ্ধির কসরতে ওদের সঙ্গে চিরকাল পাল্লা দিয়ে চলেছি আমি। জোর গলায় যদি বলি ওরা কোনোদিনই আমায় পরাজিত করতে পারেনি, তাহলে অবিশ্বাস করবেন না আপনারা। অবশ্য, আমারই মতো ডঙ্কা বাজিয়ে অথচ সতর্কতার সঙ্গে ওদের নাকের ডগার ওপর দিয়ে ঘোরাঘুরি করে সারা রাজনৈতিক জীবনে একটি বারও হাতে-নাতে ধরা পড়েননি, এমনি কর্ম্মী সে যুগে আরও অনেক ছিলেন, এ যুগেও অনেক আছেন। তবে হয়তো আমার কর্ম্মজীবনে বেহিসাবী পদক্ষেপ ছিল অসংখ্য বার, লুক্ একেবারেই না করে লিপ্ দেবার ঘটনা হামেশাই ঘটতো, তাই বোধহয় ঝুঁকিও ছিল একটু বেশী। আহত হয়ে কোনো প্রেমজর্জ্জর আয়েষার সেবা-শুশ্রূষায় সুস্থ হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা ছিল না, শ্মশান থেকে বহন করে নিয়ে গিয়ে কোনো মহানুভব ধর্ম্মদাস নাগারই মৃতদেহে পুনর্জ্জীবন সঞ্চারের আশা ছিল না। শীতের প্রাদুর্ভাবে টপ টপ করে গাছের পাতা ঝরে পড়বার মতো যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন গুলীবিদ্ধ সৈনিকের দেহ ধূলিশায়ী হয়, ঠিক তেমনি একদিন, একেবারে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবেই হয়তো চিরবিদায় গ্রহণ করবো এই পৃথিবী থেকে, এই নির্ম্মম আশঙ্কা স্বীকার করে নিয়েই আমি এগিয়ে চলতাম!······

মিঃ ব্লেকের কানের পাশ দিয়ে অসংখ্য বার গুলী বেরিয়ে যাবার ঘটনা পাঠ করেছিলাম, বুক পকেটের ইস্পাতে নির্ম্মিত তাঁর সিগারেট কেস্‌এ প্রতিহত হয়ে রিভলভারের গুলী ফিরে এল, এও লিখেছিলেন সে যুগের গ্রন্থকার। নায়ক নায়িকার মৃত্যু হলে সিনেমার আখ্যায়িকা পঙ্গু হয়ে পড়ে, এমনি শ্লেষোক্তি এ যুগে বহুবার শুনেছি। তাই দেখেছি অগ্নিদগ্ধ, খঞ্জ বা চক্ষুহীন অশোককুমার বা দিলীপকুমার নার্গিশ বা মধুবালার হাত ধরে টুক্ টুক্ করে হেঁটে হেঁটে চিত্রনাট্যের একেবারে শেষ দৃশ্য পর্য্যন্ত এসে উপনীত হয়েছেন গল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য। ঠাট্টা যতই

করি না কেন, অবাস্তব ও আজগুবি বলে ব্লেক, মোহন অথবা সিনেমার উপাখ্যান রচয়িতাকে যতই বিদ্রূপ করি না কেন, আমার জীবনেই সেই কাল্পনিক কাহিনী যে বহুবার সত্যে পরিণত হতে দেখেছি, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

শ্রীনগর থানার তিনজন দারোগার যে-কেউ সরকারী কোনো কাজে আমাদের গ্রামে এলে বা আশেপাশের গ্রামে এসে অথবা উত্তর দিকে হাঁসাড়া ছাড়িয়ে কোনো গ্রামে গেলেও ফেরবার পথে একটিবার হানা দিতেনই আমাদের বাড়ীতে। কি দিনে, কি রাত্রে। ঢাকা থেকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপার অথবা মুন্সীগঞ্জের মহকুমা হাকিম থানা পরিদর্শনে এলেই অসময়ে অর্থাৎ সন্ধ্যার পর একবার এসে পদধূলি দিয়ে যেতেন। ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে সমগ্র বিক্রমপুর পরগণার স্থানে স্থানে যে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল, সশস্ত্র সেই গোরা বাহিনীর একটি স্কোয়াড বাঙালী একজন দারোগাকে সঙ্গে করে প্রায়ই গভীর রাত্রে রাজবন্দীদের পরিদর্শন করবার জন্য এসে উপস্থিত হতো। পরে জানতে পারা গেছে যে, এর পরেও একেবারে সোজা ঢাকা থেকে এসে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে অনেক বার, একাদিক্রমে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত আশেপাশে ঝোপজঙ্গলে ওৎ পেতে বসে আমাদের বাড়ীর ওপর লক্ষ্য রেখেছেন হয় যোগিনী বসু, নয় জিতেন ধর, না হয়তো অপর কোনো ধুরন্ধর অফিসার। শত্রুপক্ষের এতখানি তৎপরতায় এটাই বোঝা যেত যে, তাদের নিদ্রা টুটে গেছে, সমাপ্ত হয়েছে টেবিলে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা জটলা আর বুক ঠুকে ঘোষণা করা : We have controlled all activities of the Terrorists…কিন্তু আশ্চর্য্য এবং বোধহয় বিশ্বের আশ্চর্য্যতম সত্য যে, যখনই এসেছে, তখনই তারা শান্ত ও সুবোধ বালকের মতো আমায় উপস্থিত পেয়েছে আমাদের বাড়ীতেই! কি দিনে, কি রাত্রে। বিরক্ত হয়ে অনেকে প্রশ্নই করে বসতো : সে কি মশাই, দিনের বেলাও কি আপনি বাইরে যান না? রাতেই না হয় নিষেধ আছে, কিন্তু দিনের বেলায়?

আলমারী ভর্ত্তি গ্রন্থরাজি দেখিয়ে উদাস কণ্ঠে বলতাম : ওরাই এখন আমার সঙ্গী।

আমার উদাস কণ্ঠে আদৌ আস্থা ছিল না তাঁদের, তা জানতাম।

একদিন রসুনিয়া, সেরাজদীঘা ও রাজদিয়া গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ শেষ করে ইছাপুরায় ফুলবৌদিদের বাড়ীতে এসে যখন উঠলাম, তখন রাত প্রায় ন'টা। রাতের আহারাদি শেষ হয়ে গেছে তাঁদের। কিন্তু অসময়ে অকস্মাৎ এসে তাঁদের ওপর বহু উৎপাত করতাম আমি। আরও বিশেষ করে ফুলবৌদি তখন ওখানে। সুতরাং আবার কাঠের উনুন ধরানো হলো এবং ডাল ও চাল একসঙ্গে করে চাপিয়ে দিয়ে ফুলবৌদি একান্তে প্রশ্ন করলেন: চলে যে এসেছ, ওদিকে ওরা যদি গিয়ে হাজির হয় বাড়ীতে?

হেসে বললাম: হবে না।

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন বৌদি: হবে না! সব তোমার বোনাই কি না, তাই আসবার সংবাদ তোমায় জানিয়ে আসেন!—একাদন ধরাই পড়বে তুমি। এমনি পালিয়ে ঘোরা—

বললাম: সেই একদিন আর এ জীবনে আসবে না বৌদি!

ওঘর থেকে তাঐমশাই হাঁক দিলেন: নে, আর গল্প করিস নে, পিকু। ওকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দে।

গরম গরম খিচুড়ী আর আলু-পেঁয়াজ ভাজা। ভালোই হলো নৈশ আহার। রান্না ঘরের কোণে মুখ হাত ধুয়ে সবে বড় ঘরে উঠেছি, এমন সময় দুরে গাছপালার মধ্য দিয়ে দেখা গেল লণ্ঠন নিয়ে কে যেন অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে। কাছে এলে দেখা গেল তারা দু'জন। বাড়ীতে এসে উঠতেই দেখা গেল ফুলদা' আর বছিরদ্দী। ফুলদা'র হাতে লণ্ঠন।

ফুলদা'র ভাবাবেগ চিরদিনই উগ্র। তাই ধরা গলায় হাঁফাতে হাঁফাতে তিনি যা বললেন, তার মর্ম্ম এই: বিকেলের দিকে এস. ডি. ও. কালীপদ মৈত্র এসে খোঁজ করে যাবার পর সন্ধ্যার একটু আগেই এসেছিল আবার যতীন দারোগা। হেনা অবশ্য বলে দিয়েছে যে, তুই মোহনগঞ্জ হাটে গেছিস। রঙ্গলালের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে চলে যাবার সময় বলে গেছে, রাত্রেও আবার আসতে পারে। তারপর প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে ফুলদা' বললেন: শীগ্‌গির চল্‌। এতক্ষণে ওরা এসে গেছে কি না কে জানে!

বছিরদ্দী সায় দিল: হ, চলেন কর্ত্তা, জলদি চলেন। কওন যায় না ঐ হালাগো কথা। আইসা পড়তে পারে।

এটা কিন্তু ফুলদা'রই শ্বশুরবাড়ী। শ্বশুর আছেন, শাশুড়ী আছেন এবং বৌদিও আছেন। তাঐমশাই ওঘর থেকে বললেন: ও জামা জুতো পরুক, ততক্ষণ তোমরা ঘরে এসে বস, জিতেন।

মাঐমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন: খেয়ে দেয়ে তো বোধহয় বার হওনি। পিকু, যা তো, আবার ডালে চালে দুটো চাড়িয়ে দে। খেয়ে যাও।

ফুলদা' একেবারে জ্বলে উঠলেন: না, না, না। এখন খিচুড়ী খাবার সময় নেই আমার। ওদিকে কী কাণ্ড হয়ে গেছে কে জানে!—এই, চল্, চল্, আর এক মিনিটও দেরী করিসনে।

বললাম: চলুন যাচ্ছি! কিন্তু কাণ্ড যদি কিছু হয়েই থাকে, তাহলে আমি গেলে কি আর তা কিছু হাল্‌কা হবে? বাড়ীতে আমায় না পেলেই আইন ভঙ্গ হয়ে গেছে, তারপর দেরীতে বাড়ীতে গেলে সে ভাঙ্গা আর জোড়া লাগবে না।

আমার ধীর অচঞ্চল কণ্ঠে ফুলদা' একেবারে অধীর হয়ে উঠলেন, বললেন: নে, রাখ, তোর আর যুক্তি দেখাতে হবে না! তাড়াতাড়ি গেলে ওরা আসবার পূর্ব্বেই পৌঁছে যেতে পারি—চল্।

ফুলদা' ঘরেও এলেন না, বৌদিও আর মাঐমার কথামতো খিচুড়ী চড়াতে পারলেন না, তাঐমশায়ের কথাও আর মানলেন না তিনি। শার্টটা কাঁধে ফেলেই রওনা হলাম। ইছাপুরা গ্রামের মাঝে মাঝে বাঁশের সাঁকো পার হয়ে এসে বাজারের কাছে যখন বছিরদ্দীর নৌকোয় উঠলাম, ফুলদা' তখন একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন: বছিরদ্দী, এইবার তোর কাজ। প্রাণপণে বেয়ে চল।

তীরবেগে ছুটলো নৌকো। বছিরদ্দী আমায় বসিয়ে দিল হালে আর ফুলদা' ও সে দু'খানা বৈঠা দিয়ে নৌকো বাচ দেবার মতো করে অতি দ্রুত জল টানতে লাগলো। বর্ষার জল তখন সবে বিক্রমপুরে প্রবেশ করেছে, ধান গাছগুলো তখনো পুরু ও ঘন হয়ে ওঠেনি। আমাদের নৌকো তাই আঁকাবাঁকা আইল বা খাল ধরে না গিয়ে ক্ষেতের মধ্য দিয়েই সোজা ছুটে চললো। আর ঘুরপথে যাবার বিলাসিতা করবার সময়ও ছিল না। আকাশে সরু চাঁদ। তার স্তিমিত আলোয় দেখছিলাম ফুলদা' ও বছিরদ্দীর বৈঠা ঘন ঘন উঠছে আর পড়ছে। বৈঠা চালনার মধ্য দিয়েই বেশ অনুভব করছিলাম ফুলদা'র তীব্র উত্তেজনা।

বছিরদ্দী তার মুসলমানী মাংসপেশীর পরাক্রম দেখাচ্ছিল আর শ্রান্তিহীন বিরামহীন বৈঠা ক্ষেপণের মাঝে আমি অনুভব করছিলাম তার মুসলমানী tenacity .....

বাড়ী এসে তো একেবারে অবাক্ হয়ে গেলাম আমরা। সবাই দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছেন! বাবা, মা, রঙ্গলাল সবাইকে ফুলদা' ডেকে তুললেন উত্তেজনার আতিশয্যে একেবারে হল্লা করে এবং যখন জানতে পারলেন যে, পুলিশ আর আসেনি, তখন আনন্দের আতিশয্যে হল্লা করেই বাড়ী মুখরিত করে তুললেন। সোনাবৌদির কাছে সংবাদ নিয়ে জানা গেল, ওবেলার ইলিস মাছের ঝোল আছে আর ভাত যা আছে, তাতে আমাদের তিন জনের হয়ে যাবে। খিচুড়ী ততক্ষণে জল হয়ে গেছে, তাই আমিও বছিরদ্দী আর ফুলদা'র সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লাম।

পুলিশ অবশ্য এল আবার, কিন্তু পরদিন সকালে। যতীনবাবু বললেন: আরে মশাই, জ্বালিয়ে মারলে! বললাম, আমি একবার দেখে এসেছি, দিনের বেলায় না থাকলেও রাত্রে দ্বিজেনবাবু বাড়ীতে ফিরে আসবেনই! না, তা শুনবেন না! এস. ডি. ও. জিজ্ঞেস করলেন, মোহনগঞ্জ হাটে সে যায় কেন? বললাম, স্যার, ওটা যে তাঁর এলাকার মধ্যেই। তবুও হুকুম করলেন আর একবার রাত্রে এসে আপনাকে দেখে যেতে। বলে তো কর্তা মুন্সীগঞ্জ চলে গেলেন সন্ধ্যার দিকে। বাঁচা গেল। আমিও দিব্যি ঘুমিয়ে ভোরে চা-টা খেয়ে এই আসছি। রাত্রে এসে আর আপনাকে বিরক্ত করা ঠিক মনে করলাম না। —বলে হেসে প্রশ্ন করলেন: কি মশাই, বাড়ীতে ছিলেন তো কাল রাত্রে?

হেসেই জবাব দিলাম: রাত্রে এলেই পারতেন। মাংস আর পোলাউ হয়েছিল। স্বয়ং মা রান্না করেছিলেন। অনেক রাত পর্যান্ত রান্না হলো। পাড়ার দু' একজন ভদ্রলোক খেলেন। আপনি এলে বেশ তাস খেলা যেত জমিয়ে। এঃ, 'আপনি কি হারাইলেন', জানেন না।—বলে হেসে উঠলাম।

মহা দুঃখ প্রকাশ করে যতীনবাবু বললেন: এ হে, ভারী loss হয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু মনে রাখবেন, এর পর যেদিন হবে, সেদিন যেন খবর পাই দ্বিজেনবাবু!

ফস্ করে জিজ্ঞেস করলাম রঙ্গলালকে: এই ছাখ না, মাংস আর আছে কি না? থাকলে নিয়ে আয় না একখানা প্লেটে করে। চায়ের সঙ্গে মন্দ হবে না।

হুকুম পেয়ে রঙ্গলাল তৎক্ষণাৎ বাড়ীর মধ্যে চলে গেল এবং একটু পরই ফিরে এসে সীমাহীন লজ্জা প্রকাশ করে বললো: ছিল দাদা, কিন্তু রেণু এসেছিল বেড়াতে, তাকে সবটা খাইয়ে দেয়া হয়েছে!

থাক্, থাক্, তাতে আর কি হয়েছে।—বলতে বলতে যতীন দারোগা চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে লাগলেন।

আটত্রিশ

আমাদের কেয়টখালী অতি ক্ষুদ্র একটি গ্রাম। দৈর্ঘ্যে মাইল দেড়েক আর প্রস্থে এক মাইলের মতো হবে। এই গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা প্রায় আশীজনই মুসলমান। নেই হাট-বাজার, নেই হাই স্কুল, নেই দাতব্য চিকিৎসালয়। ষোলঘর গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ড এলাকায় হলেও অপর পার্শ্বের হাঁসাড়া গ্রাম আমাদের হাট-বাজার, স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের অভাব পুরণ করে। হাট না থাকলেও হাঁসাড়ায় বাজার বসে প্রতিদিন সকালে, হাঁসাড়া হাই স্কুলেই আমাদের গ্রামের সবাই পড়ি, ১৯২৬ সালে এই হাঁসাড়া হাই স্কুল থেকেই আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করি। হাঁসাড়ার পাশে কেয়টখালী এত ক্ষুদ্র ও নগণ্য যে, বিদেশে আমাদের গ্রামকে কেউ ঠিক চিনতে পারবে না মনে করে অনেক সময়ই আমরা বলে দিতাম যে, আমাদের বাড়ী হাঁসাড়ায়।

বিশেষ করে, আমার কর্ম্মক্ষেত্র মুখ্যতঃ ছিল হাঁসাড়া। তারপর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে গ্রাম পরিত্যাগ করলে তা স্থানান্তরিত হয় ঢাকা ও কলকাতায়। হাঁসাড়া গ্রামের সবাই আমায় চেনে। কেউ চেনে ভাল ছাত্র হিসেবে, কেউ চেনে ভালো মঞ্চাভিনেতারূপে, আবার কেউ সমাদর করে নামজাদা ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে। স্কুলের মাষ্টাররা আমায় খুব স্নেহ করতেন। শিক্ষাক্ষেত্র ত্যাগ করে কী করে যে আমি এই স্বদেশীদের দলে যোগদান করলাম, এ কথা আলোচনা করে তাঁরা নিজেরাই যে শুধু দুঃখ প্রকাশ করতেন, তাই নয়, অনেক সময় আমার বাবার কাছে এসে জটলা করতেন। স্বগৃহে অন্তরীণে এলে যখন তাঁরা শুনলেন যে, এতকাল পর আমি আই-এ পরীক্ষা দেবার সময় পেয়েছি বহরমপুর বন্দীশিবির থেকে, ভারী খুশী হলেন

তাঁরা। সেই পুরোনো কথা তুলে একদিন মাষ্টার যোগেশ গাঙ্গুলী মহাশয় আবার একবার আমায় অনুরোধ জানালেন গুপ্ত সমিতি থেকে নাম কাটিয়ে নেবার জন্য।

ছাসাড়ায় কংগ্রেস অফিস ছিল এবং সে সময় সেই প্রাথমিক কংগ্রেসের স্বনামধন্য সম্পাদক ছিলেন মৃণাল সোম। বনিয়াদী সোমের বাড়ীর লোক। কংগ্রেসের অহিংস পথে আমাদের গতিবিধি না থাকলেও কংগ্রেসের নিন্দা কোনোদিন করিনি আমি। সমাজকল্যাণকর কাজে কংগ্রেসের উপযোগিতা আমি সর্ব্বদাই স্বীকার করেছি। কিন্তু ছাসাড়া গ্রামের ঐ প্রাথমিক কংগ্রেসের সম্পাদক মৃণাল সোম কংগ্রেসের নামে সংগৃহীত চাঁদা ও তণ্ডুলের অধিকাংশই নির্ব্বোধের মতো প্রায় প্রকাশ্যেই এমনিভাবে সরিয়ে ফেলতো যে, শুধু ছাসাড়ায় নয়, আশেপাশের গ্রামেও তাই নিয়ে তীব্র আলোচনা চলতো। লোকটা স্বল্পভাষী, গ্যাটাপারচার ফ্রেমের চশমার ওপর দিয়ে তাকায়, চিরকালই তার দাড়ি দিনসাতেক পূর্ব্বে কামানো হয়েছে বলে মনে হয়। ময়লা খদ্দরের ফুল শার্ট, ময়লা খদ্দরের ধুতি আর ছেঁড়া স্যাণ্ডেল। মাথায় তার কোনোদিন গান্ধীটুপী দেখেছি মনে পড়ে না। এই হচ্ছেন কংগ্রেস সেক্রেটারী মৃণাল সোম। আর ইনিই হচ্ছেন—শুনে বিস্মিত হবেন না যে, ওদিককার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী গোয়েন্দা বা টিকটিকি। এই বিষকুম্ভ পয়োমুখকে প্রথমটা চিনতে পারিনি আমি আরো দশজনের মতো। গ্রামের কল্যাণকর প্রত্যেকটি কার্য্যে মৃণাল সোমকে সর্ব্বাগ্রে না হলেও অগ্রবর্ত্তীদের মধ্যেই দেখেছি, রোগীর সেবায় রাত জাগবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহে, ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর সঙ্গে লড়াইয়ে কুইনাইন বিতরণে, বদ্ধ জলার কচুরীপানা পরিষ্কার করবার কাজে. দরিদ্রনারায়ণ সেবায় মৃণালকে দেখেছি সীমাহীন তৎপর। কিন্তু এরই ফাঁকে ফাঁকে সে কখনো নিজেই ঢাকা চলে যেতো কাজের ছুতোয় অথবা পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখলে অপর কোনো বিশ্বাসী অনুচর মারফৎ সংগৃহীত সংবাদগুলি প্রেরণ করতো।...... একেবারে কংগ্রেসের সম্পাদককে দলে টানতে পারার জন্য একদিকে যেমন আই-বি-দের পারদর্শিতার তারিফ না করে পারা যায় না, তেমনি এই দু'মুখো সাপদের দেশ ও জাতির প্রতি জগৎশেঠী বিশ্বাসঘাতকতায় লজ্জায় ও ঘৃণায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে আমাদের।

মৃণাল সোম ব্যতীত আমাদের স্কুলের মাষ্টার দীপেন ব্যানার্জ্জী ছিলেন

একজন স্পাই। আরও ছিলেন নীরেন ঘোষাল, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ডাঃ পলাশ সাহা এবং আরো অনেকে। এঁদের একেবারে পরিহার করে চলা আমার নীতি ছিল না, খুব কৌশলে সরলতার ভান করে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করতাম এদের সাথে, সব কথাই আলোচনা করবার অভিনয় করতাম নিখুঁতভাবে, কিন্তু ঠিক সময়টিতে এঁদের অলক্ষ্যে ও অজানতে নিজের কাজটি হাসিল করে ফেলতাম।······

১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মেদিনীপুরের তৃতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ্জ সাহেব খেলার মাঠে নিহত হয়েছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেল। কিন্তু মেদিনীপুরের এই গুপ্ত দলের সংগঠন যে ঢাকার বি ভি কর্ম্মীরাই করেছিল, পুলিশ তা জানতো; তাই বার্জ্জ হত্যার সাত দিনের মধ্যেই আমাদের বাড়ী আবার তল্লাশী হলো এবং এবার অতিরিক্ত লোক লাগিয়ে কোদাল দিয়ে আমাদের বাড়ীর উঠান একেবারে চষে ফেলা হলো।

যতীন দারোগা গলদঘর্ম্ম হয়ে দক্ষিণের ঘরে এসে আমার চেয়ারে হাত পা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ে বলে উঠলেন: নাঃ, পেলাম তো এক হাজার রিভলভার?

বিস্মিতমুখে প্রশ্ন করলাম: মানে?

মানে আর কি? আপনার বাড়ীতে নাকি রিভলভারের কারখানা আছে একটা। সেখানে নাকি রিভলভার তৈরী হয় আর কোথাও পাঠিয়ে না দেয়া পর্য্যন্ত মাটির তলায় তা লুকিয়ে রাখা হয়।

বিস্ময় আরো বেড়ে গেল: রিভলভার তৈরী হয়? কারখানা আছে? বলেন কি যতীনবাবু?

আরে মশাই, একি আর আমি বলি, বলেন যোগিনী বসু আর জিতেন ধর।

হেসে বললাম: এক হাজার রিভলভার তৈরী হয়ে গেছে? ফোর্ড কোম্পানীকেও যে ফেল পড়িয়ে দেবে যতীনবাবু!

আপনার তৈরী রিভলভার দিয়েই নাকি বার্জ্জ সাহেবকে হত্যা করা হয়েছে।

অ্যাঁ, বলেন কি?—একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম।

যতীনবাবু হাসিতে ফেটে পড়লেন।

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি মাসিক এ্যালাউন্সের জন্য যে আবেদন-পত্র পাঠালাম, সদাশয় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দপ্তর থেকে খুব শীগগিরই তার জবাব

এল যে, তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যত সহজে এটা দমিয়ে দিতে চাইলেন, তত সহজে দমে যাবার পাত্র আমি নই। তাই এর পর বাবাকে দিয়ে একখানা দরখাস্ত করালাম যে, বিদেশ থেকে ছেলেরা মাসোহারা পাঠায় আর সারাটি মাস সেই মাসোহারার টাকায় সংসার চলে। যে যুবক কোনো কাজ না করে বসে বসে খেতে চায়, ছেলেরা তার খাওয়াপরার জন্য একটি কপর্দকও দিতে নারাজ। আর স্বগৃহে অন্তরীণ করবার পূর্ব্বে রাজবন্দীর খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া পুলিশের পক্ষে উচিত ছিল। কারণ, দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে স্বগৃহে অন্তরীণ কর, অমনি কোনো আর্ত্তনাদ আমরা সরকারকে জানাইনি এবং তাকে কেয়টখালীতে প্রেরণের পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকেও বাড়ীর কর্ত্তাদের কারুর মতামত গ্রহণ করা হয়নি। সুতরাং হয় তাকে মাসিক ভাতার সুবিধে দাও, না হয় কেয়টখালী থেকে যেখানে খুশী নিয়ে যাও।

এর ক'দিন পর আমি লিখলাম যে, এ বাড়ীতে আমাকে কেউ খেতে দিতে চায় না ; সুতরাং আমায় জেলেই নিয়ে যাও। তারপর একদিন লিখলাম : কাল আমি খাইনি।

ধাপে ধাপে পরিস্থিতিটা এমনি কৌশলে ক্লাইমেক্সে এনে ফেলেছিলাম শুধু পত্রাঘাত করেই যে, অকস্মাৎ একদিন ঢাকা থেকে জনৈক আই বি অফিসার আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির হলেন এবং গভর্ণমেণ্টের এক নয়া আদেশ জারী করে আমার চলাফেরার পরিধি একেবারে হ্রাস করে শুধু কেয়টখালী গ্রামটুকু সীমাবদ্ধ করে দিয়ে গেলেন। এতে দুঃখ পেলাম না এতটুকুও এইজন্য যে, আই বি এবার বুঝেছেন যে, রশি আলগা করে দিয়ে গভীর জলের মাছ শিকার তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ভালোয় ভালোয় আমাকেই ভাল করে আটকে রাখবার নীতি তাঁরা গ্রহণ করলেন।

ওঁদের আদেশগুলো প্রকাশ্যভাবে এমনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলতাম যে, তাতে অতি বড় সরকারী কর্ম্মচারীও লজ্জা পেত ! যখন প্রায় গোটা বিক্রমপুর ছিল আমার চলাফেরার পরিধি, তখন নানা গ্রামে ফুটবল খেলতে যেতে হতো আমায়, কখনো নিজেদের গ্রামেরই পক্ষে, কখনো-বা অপর গ্রামের পক্ষে। কিন্তু যার পক্ষেই যাই না কেন, বিকেলে ছ'টার মধ্যে আমি বাড়ী ফিরে আসতাম। আমায় নিয়ে খেলতে হলেই সেদিন খেলা সুরু হতো সাড়ে চারটেতে

পরিচালনা কমিটির বিশেষ অনুমোদনে। ঠিক সাড়ে চারটেতে সুরু হলে অবশ্য সাড়ে পাঁচটায় খেলা শেষ করে ত্রস্তপদে ফিরে আসতে অসুবিধে হতো না। আর যেখানেই খেলা সুরু হতে দু'দশ মিনিট দেরী হয়ে যেত, সেখানেই খেলা শেষ হবার পূর্ব্বেই মহামান্য সম্রাটের একান্ত অনুগত প্রজার মতো ঠিক সাড়ে পাঁচটায় মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তাম আমি।

লোক-দেখানো নিষ্ঠা ধরবার বুদ্ধি সরকারী বুদ্ধি বিভাগের ঘটে ছিল না। দর্শকদের মধ্যেই থাকতো আমার এজেন্ট ঘড়ি নিয়ে। সাড়ে পাঁচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আমায় আহ্বান জানাতো চীৎকার করে: দ্বিজেনদা' টাইম আপ!

হাজার হাজার দর্শকেরা তা শুনতে পেতেন এবং অকস্মাৎ দেখতেন রেফারির অনুমতি নিয়ে খেলা ছেড়ে বেরিয়ে আসছি আমি। খেলায় আমার সুনাম ছিল, তাই যাঁরা আমায় হারালেন, তাঁরা হেরে গেলে যে একান্তভাবে আমার বিহনেই হারলেন, এ কথা জোর গলায় প্রচার করে বেড়াতেন। ফলে, লোকের মুখে মুখে কথাটা গিয়ে পৌঁছোতো শ্রীনগর থানার বড় দারোগার দপ্তরে এবং পরে ঢাকার আই বি অফিসে। তাঁরা আমার নিষ্ঠায় আস্থা স্থাপন করতেন।

আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম, ঐ সময়টাই কিছু কাজ করবার সময়। মাঠ ছেড়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে এসে খেলোয়াড়ের পোষাকটাও আর পরিবর্ত্তন করবার যেন ফুরসুৎ পেলাম না, সোজা এগিয়ে চললাম কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে। মনে করুন, এমনিভাবে আসছি হাঁসাড়ার মুন্সী বাড়ীর মাঠ থেকে। কালীকিশোর সেনের বাড়ীর ওপর দিয়ে সোজা চলে এলাম হাঁসাড়া হাই স্কুলে। তারপর সেখান থেকে রওনা হলাম পশ্চিম দিকে মাঠের মধ্য দিয়ে। ডেপুটি ঘোষের বাড়ীর দক্ষিণ দিক্ দিয়ে এগিয়ে এসে নলিনী চক্রবর্ত্তীর বাড়ী বাঁয়ে রেখে বাজারের কাঠের পোলটার ওপর ওঠবার সময় ডান দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলাম আমাদের ভূতপূর্ব্ব মাষ্টার দীপেন ব্যানার্জ্জী বাইরে পুকুরধারে এসে বসেছেন কিনা। যদি দেখি, তিনি যথারীতি ওখানে মাদুর বিছিয়ে বসে কোনো বই পড়ছেন খালের ধারের তপস্যারত বক-ধার্ম্মিকের মতো, তাহলে গুড বয়ের মতো সোজা বাজারে এসে দাতব্য চিকিৎসালয়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলাম সোজা বাড়ীর পথে। আর যদি দেখি লাইন ক্লিয়ার আছে, এ্যাকসিড্যান্ট হবার আশঙ্কা কম, তাহলে

বাজারের মধ্য দিয়ে সোজা চলে এলাম পশ্চিম দিকে। সেখান থেকে সুবোধ গুহের বাড়ী আর কত দূর ?……

আমি জানি এবং নিশ্চিতভাবে জানি, খেলার মাঠে যে সততা দেখিয়ে বেরিয়ে আসি আমি, তাকে পুলিশ আখ্যা দেবে ভীরুতা বলে; সুতরাং তার পরই আর কেউ লাগানো প্রয়োজন বলে মনে করবে না অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টা।

চলাফেরার পাহারা কমে গিয়ে যখন মাত্র কেবটশালী গ্রামে এসে দাঁড়ালো, তখনও আমার কাজে বিশেষ অসুবিধা কিছু হলো না। এর প্রধান কারণ আমার ডেপুটিরা ছিল খুব বিশ্বাসী ও কর্ম্মঠ। এদের নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলাম আমি। তারা আজ সবাই কোথায় তা আমার জানা নেই। কিন্তু স্পষ্টভাবে এবং গর্ব্বের সঙ্গে স্বীকার করতে এতটুকু দ্বিধা নেই আমার যে, স্বগৃহে অন্তরীণকালে আমার কর্ম্মতৎপরতা যতটুকু সাফল্যই লাভ করেছে, তা প্রায় সবটাই সম্ভব হয়েছে আমার এই অনুগামীদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অবিচল ঐকান্তিকতা ও অটল নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্য। কুঠার চালিয়ে যারা জঙ্গল পরিষ্কার করে, কোদাল চালিয়ে যারা মাটি কাটে, খোয়া ভেঙ্গে তৈরী করে পাকা রাস্তা, মোটর হাঁকিয়ে সে পথে ছুটে যাবার সময় আমরা এদের কথা একবারও ভেবে দেখি কি ? তাজমহল নির্ম্মাণ করেছে যে কারিগর, যে শ্রমিক, যে দিনমজুর, কে তাদের চেনে, কে তাদের মনে রেখেছে ? এর প্রস্তর-ফলকের স্বচ্ছতায় মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে সম্রাট সাজাহানের যে অমর কীর্ত্তি, মমতাজের প্রতি তাঁর যে সুনিবিড় প্রেম অবিনশ্বর হয়ে রয়েছে তাজমহলের স্ফটিক স্তম্ভে, দশটি মুখে আমরা তারই স্তুতিগানে আত্মহারা হই।……

আমি কিন্তু আমার সহকর্ম্মীদের একটি দিনের তরেও ভুলতে পারিনে। ত্রুটি যে তাদের আদৌ ছিল না তা নয়, কিন্তু সে ত্রুটিকে মিথ্যে যুক্তির কাঁচা রংয়ে রাঙ্গাতে না গিয়ে অকপটে স্বীকার করবার হিম্মৎ ছিল তাদের সবার। সাংসারিক কঠিন দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হলেও নিষ্ঠার ঐকান্তিকতা তাদের কমেনি এতটুকুও; বরং তাতে করে সাহস যেন তাদের বেড়ে গেছে শতগুণ হয়ে। সম্ভাবনাময় জীবনের বাঁধানো পাকা রাস্তা ত্যাগ করে তারা অবলীলাক্রমে এসে নেমেছে আমার সঙ্গে বিপদসঙ্কুল পথে! পারিবারিক সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই হয়তো নির্ভর করতো কারুর ওপর, ফাটল-ধরা

সংসারের ইমারতখানা কেউ হয়তো একদিন স্তম্ভের মতো মাথায় তুলে নেবে, এ-ই ছিল বাপ-মায়ের পরিকল্পনা, অভাব অনটনের দাবদাহে ঝলসানো গৃহের ওপর উত্তরকালে একখানি ছায়া-শীতল ছাতা মেলে ধরবার কঠিন দায়ীত্ব হয়তো ছিল কারুর স্কন্ধে ন্যস্ত, কিন্তু সমস্ত আশা, সকল পরিকল্পনা, সর্বপ্রকার নির্ভরতা হেলায় তুচ্ছ করে বেরিয়ে পড়েছে এই সুকুমার কিশোরদের একটি দল, যেমন করে ঝাঁপ থেকে বেরিয়ে আসে ফণিমনসা সাপুড়িয়ার মোহন বাঁশী শুনে। কোনো দ্বিধা নেই, জড়তা নেই, প্রশ্ন নেই, কোনোদিকে ফিরে চাইবার কূটকৌশল নেই।......আজ মাঝে মাঝে অকস্মাৎ শিউরে উঠি এই ভেবে যে, ওদের জীবনের সাবলীল গতিপথে আমিই কি একটা দুরতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করেছিলাম ওদের সবাইকে গুপ্ত সমিতিতে নাম লিখিয়ে? মাঝে মাঝেই এই বেয়াড়া প্রশ্নটা সারা অন্তরে সাময়িক আলোড়ন সৃষ্টি করে তোলে! এবং তা আজও।......

এক বৃহস্পতিবার থানায় হাজিরা দিতে গেলাম না আমি। চৌকিদার মারফৎ লিখে পাঠালাম: বর্ষাকাল, নৌকো ব্যতীত থানায় যাওয়া যেতে পারে না। বাড়ীর নৌকো বাবা আমায় ব্যবহার করতে দেবেন না বলে দিয়েছেন আর নৌকো ভাড়া করে যাবার মতো সঙ্গতি কোথায় আমার?—সুতরাং প্রয়োজন এবং অবিলম্বে প্রয়োজন মাসিক ভাতার ও বর্ষাকালে নৌকো ভাড়া বাবদ কিছু টাকার। দয়া করে তার সত্বর ব্যবস্থা করতে আজ্ঞা হয়।

গ্র্যাহ্ম সাহেব তখন ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট। অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস.। পূর্ববঙ্গের বিপ্লবীদের শায়েস্তা করবার প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েই তিনি অবসর-জীবনের আরাম ত্যাগ করে বিনাশায় চ ড়ুষ্কৃতাম্ সুদূর বিলাত থেকে ফিরে এসে ঢাকা জেলার ভার নিয়েছেন ভারত গভর্ণমেন্টের আহ্বানে। খুব সত্বরই জবাব এল তাঁর কাছ থেকে: Your petition is rejected অর্থাৎ বাজে আর্জি পেশ করো না। কিন্তু বৃটিশ steel prestigeএর আদবকায়দা বেশ ভাল করেই রপ্ত ছিল আমার। তাই সাধনা সুরু করলাম পত্রযোগে শাক্যসিংহের মতো। কথা কেউ না কইলেও, সবাই মুখ ঘুরিয়ে থাকলেও, সবাই ভয় করলেও আমার মনের কথা আমি বলেই যেতে লাগলাম প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একটিবার। অর্থাভাবের কথা বার বার বিবৃত করতে করতে এমনি অবস্থায় এসে পড়েছি বলে যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর জানালাম যে,

প্রায়ই আহার মেলে না আমার, নৌকো ভাড়া করে থানায় হাজিরা দেবার মতো পয়সা নেই আমার, তার ওপর মা বাবার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, তিরস্কার· ···· আর কত সয় ?

কিছুদিন পর থানায় যাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিলাম। দারোগার ক্ষমতা ছিল না আইন অনুযায়ী আমায় গ্রেপ্তার করবার। রাজবন্দীরা গভর্ণমেণ্টের আদেশ লঙ্ঘন করলে থানার দারোগার কর্ত্তব্য হবে কালবিলম্ব না করে বিশেষ বার্ত্তাবহ মারফৎ জেলা পুলিশ সুপারকে সেই অভাবনীয় কাণ্ডের বিবরণ পাঠানো। তারপর সুপার যদি ভালো বোঝেন, তবে দারোগাকে নির্দ্দেশ দেবেন রাজবন্দীকে গ্রেপ্তার করবার। এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত থানার দারোগা পদাহত সর্পের মতো ফোঁসফোঁসাতে পারেন, পায়ে গুলী-খাওয়া খ্যাক শিয়ালের মতো দাঁত খিঁচোতে পারেন কিংবা লগুড়াহত ঘিয়ে-ভাজা কুকুরের মতো দু’ পায়ের ফাঁকে লেজ ঢুকিয়ে দিয়ে কেঁউ কেঁউ করতে পারেন এবং খুব বেশী হলে গ্রেপ্তারের পাঁয়তারা কষতে পারেন। আমার ব্যাপারে যতীনবাবু বিশেষ বার্ত্তাবহ একবার নয়, বারকয়েক পাঠিয়েও সুপারের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গাতে পারলেন না !······

তার পরের ঘটনাবলী বেশ চমকপ্রদ !

এই চরম ব্যবস্থা অবলম্বনে মা’র কিন্তু সমর্থন ছিল না আদৌ। দাদারা বিদেশ থেকে মাসোহারা যা পাঠাতেন, তা ছাড়াও কিছু জমিজমা আছে আমাদের, দু’চারটে পুকুরও আছে, কয়েকশো ঘর মুসলমান প্রজাও আছে। তাই হেলায় ফেলায় না হলেও একরকম করে চলে যেত। গভর্ণমেণ্টের কান ধরে ভাতা আদায়ের নীতি সমর্থন করলেও দাদা বা মা বাবা খেতে দেন না, এমনি নির্জ্জলা ফাঁকি দেয়া মা’র ভাল লাগতো না। আর এই ঘোষণার অন্তরালে কোথায় যেন একটা কাঁটার খোঁচা অনুভব করতেন মা। খুব চাপা ছিলেন আমার সঙ্গে ব্যবহারে, তাই মনের বেদনা মনে রাখতেন চেপে যত দিন সম্ভব।

একদিন সকালবেলা তেল-মুড়ি খাচ্ছি আর নিষিদ্ধ ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র পাতা ওলটাচ্ছি, এমন সময় ধীরে ধীরে আমার ঘরে এসে প্রবেশ করলেন মা।

বললেন ঃ আজ বৃহস্পতিবার।

বললাম ঃ হ্যাঁ, তা তো জানি। তোমার লক্ষ্মীপুজো আছে।

মা বললেন : তার জন্য তোমার ব্যস্ত হবার কারণ নেই। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, আজও কি থানায় যাবিনে ?

মৃদু হেসে জবাব দিলাম : না গিয়ে তো ভালোই আছি মা। চৌকিদারের হাতে না যেতে পারার একটা কৈফিয়ৎ দিলেই যদি থানায় যাবার হাঙ্গামা চুকিয়ে দিতে পারা যায়, তাহলে মন্দ কি ?

না, মন্দ আর কি! তবে সরকারী আদেশ অমান্য করলে তার ফলাফল নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার ?

গ্রেপ্তার ? গ্রেপ্তার তো হয়েই আছি।—হেসে জবাব দিলাম : হয়তো এখান থেকে আবার নিয়ে যাবে উল্টো দিকে—গ্রামে বা কোনো বন্দিশিবিরে। তা নিক্, ঐখানে যেমন পদে পদে আইনভঙ্গ হবার আশঙ্কা আছে, বন্দী শিবিরে আর তা আদৌ থাকবে না। তখন বি. এ. পরীক্ষার পড়াটাও ভালো করে করতে পারবো। এ ব্যবস্থা ভালো নয় মা ?

মা টেবিলের পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন : তোর প্ল্যানমতো সরকার সব কাজ করবে বলে তুই ভাবলেও তারা তা না-ও করতে পারে। থানায় না যাবার জন্য হয়তো তারা করলো মামলা, আর দিল দু'বছর জেল। সাধারণ কয়েদীর মতো কাটাতে হবে তখন। ঘানি ঘোরাতে হবে, ডাল ভাঙ্গতে হবে, আরো কি কি যেন করায় ?—বলে মা হেসে উঠলেন।

কাগজখানা বন্ধ করে রাখলাম। মা'র আশঙ্কা যে নিরর্থক না-ও হতে পারে, তা বুঝিয়ে বললাম। তারপর বললাম : একেবারে মুক্তি না পাওয়া পর্য্যন্ত ওদের সঙ্গে আমার আপস-রফার কোনো কথাই উঠতে পারে না মা!

জানি না কথাটা রূঢ় শোনালো কিনা, কিন্তু আজও মনে পড়ে এর পর মা আর একটি কথাও বলেননি। নিরর্থক পত্রিকাখানার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনতে পেলাম কি ? .....

সত্যিই, মা'র আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তা জানা গেল দিনকতক পরই।

সর্ব্বশেষে যে পত্রখানা গভর্ণমেণ্টের সমীপে পাঠিয়েছিলাম আমি, তাকে একেবারে চরম পত্র বলা যায়! লিখেছিলাম : যে বাড়ীতে আমার খাদ্য মেলে না, শোবার স্থান পাই না, সেখানে থাকা আমার কেন, কারুর পক্ষেই

সম্ভব নয়! সুতরাং চাকরি একটা খুঁজে নিতে হবে আমায় পেট চালাবার জন্য। এর মধ্যে কলকাতায় একটা চাকরির সন্ধান পাওয়া গেছে। অতএব, হে বৃটিশরাজ, আগামী মার্চ মাসের পনেরো তারিখে আমি কলকাতা রওনা হচ্ছি। যাচ্ছি হাঁটা-পথে ঘোলঘরের বাজার হয়ে, শ্রীনগর থানা ডাইনে রেখে, বাড়িখাল গ্রামের স্কুলের পাশ দিয়ে একেবারে কাদিরপুর ষ্টেশনে। রওনা হবো দুপুরে খাওয়া-দাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে।

প্রস্তুতি চললো আমার এবং বুঝলাম ও-পক্ষেও প্রস্তুতি চলেছে সতর্কতার সঙ্গে। গ্র্যান্ট সাহেব কোনোই জবাব দিলেন না, মহকুমা হাকিম কালীপদ মৈত্র বোধহয় চরম পত্রখানা বাজে কাগজের ঝুড়িতেই দিয়েছেন ছুঁড়ে ফেলে, যতীনবাবু এক-আধবার পরিদর্শনে এলে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখলাম তাঁর মুখ।

সংঘর্ষ অনিবার্য মনে হলো! আমিও এবার আর কৌশল নয়, একেবারে নীতি হিসাবে গ্রহণ করলাম এই চ্যালেঞ্জ। সত্যিই পনেরো তারিখে রওনা হবার জন্য রেডি হলাম।

বাবা খানিকক্ষণ রাগারাগি করলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে দাগা দেয়াই যে আমার মতো বুদ্ধিমান ছেলের উদ্দেশ্য, শেষ দিয়ে বার বার একথা উচ্চারণ করলেন। মা অত্যন্ত নীরব, প্রতি কার্যে তার গাম্ভীর্য প্রকট দেখা যেতে লাগলো। বৌদিরা কাঁদতেও থামলেন না, কারণ তারা দেবরের সংকল্পের দৃঢ়তার পরিচয় বহুবার পেয়েছেন পারিবারিক জীবনে। সমিতির ছেলেরা এমনি প্রতিকূল অবস্থা স্বীকার করে নিয়েই তো নেমেছে এই সাংঘাতিক পথে! তাই মনের কোণে একটা কাঁটা বিঁধলেও মুখের রেখায় সে বেদনার বিন্দুমাত্র আভাসও দেখা গেল না তাদের।…যাত্রা করবার দিনটি অতিদ্রুত এগিয়ে আসতে লাগলো।

অকস্মাৎ বারোই মার্চ আমাদের বাড়ী তল্লাশী হলো। নামমাত্র তল্লাশী। শেষে যতীনবাবু জানালেন যে, থানায় হাজিরা না দেবার জন্য আমায় গ্রেপ্তার করা হলো।

চমৎকার! এর জন্যই প্রস্তুত ছিলাম। ধাপে ধাপে উত্তেজনার সৃষ্টি করে যে কাহিনী অতি দ্রুত ক্লাইমেক্স-এর শিখরে উঠতে চলেছে, এমনি একটা কিছু না হলে তা মনোজ্ঞ হবে কেন?…চলে এলাম শ্রীনগর থানায়। সেখান থেকে

পরদিনই গিয়ে হাজির হলাম মুন্সীগঞ্জ সাব জেলে। প্রথম শ্রেণীর বিচারাধীনে আসামীর পর্য্যায়ে বাস হলো আমার।

পরদিন অপরাহ্নে নির্ধারিত জেল পরিদর্শনে এসে কালীপদ মৈত্র আমার দীর্ঘ জুলপী দেখিয়ে বললেন হেসে: এই দেখ, যুগান্তর দলের চিহ্ন, কানের ডগা পর্য্যন্ত জুলপী।—আর কলার তোলা হাফ শার্ট দেখিয়ে বললেন: আর এই হচ্ছে বেঙ্গল ভলান্টিয়াসের পতাক—Don Dare Devil—মারাত্মক। অন্য রিভলভার যেন উঁচিয়েই রেখেছে—অ্যা!—বলে হো হো করে হেসে উঠলেন, সঙ্গী মহকুমা পুলিশ অফিসারও যোগ দিলেন তাঁর সঙ্গে।

ঊনচল্লিশ

সে যুগে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ক্ষুদ্রাকার জেলে (যাকে সহজ ভাষায় বলা হয় সাব জেল) পদার্পণের সৌভাগ্য জীবনে যার একটিবার হয়েছিল, নিশ্চয়ই আজও তার স্মৃতিপটে প্রস্তর ফলকে লেখার মতো খোদিত হয়ে আছে অবিস্মরণীয় একটি ব্যক্তির কথা, তিনি আর কেউ নন—জেলের কেরাণীবাবু। তিনি কেরাণী, তিনি এ্যাকাউনটেন্ট, তিনি কিচেন-ম্যানেজার, তিনি ষ্টোর কীপার, তিনি জেলার এবং কার্য্যতঃ তিনিই সাব জেলের প্রবল পরাক্রান্ত সুপারিনটেনডেন্ট। কাগজে কলমে অবশ্য মহকুমা হাকিমই মহকুমা জেলের সুপার, কিন্তু এই শিখণ্ডীর আড়ালে থেকে বেশ নিশ্চিন্ত মনে শাসন চালাচ্ছেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ কেরাণীবাবু মহাভারতের অর্জ্জুনের মতো। আপনার কোন যুক্তিই যুক্তি নয় যদি মহামান্য কেরাণীবাবু তার মর্ম উপলব্ধি করতে না পারেন। আপনার কোনো সকরুণ আর্জি বা বাকস্তমান আবেদন কোনোদিনই হাকিমের দরবারে প্রবেশাধিকার পাবে না, যদি না চার্জ অব এ্যাফেয়ার্স কেরাণীবাবু তাতে স্বাক্ষর করে পাসপোর্ট প্রদান করেন। দশটি দুয়ার পার হয়ে তবে সুপারের দেওয়ান ই আমে প্রবেশ করা যায়। কিন্তু প্রত্যেকটি দুয়ারে বিভিন্নরূপে প্রহরায় রত এই কেরাণীবাবু। কেরাণীবাবুর বিনয়াবনত ও অনড় ঔদাসীন্যে মরিয়া হয়ে উঠে যদি কোনোদিন কোনো মাহেন্দ্রক্ষণে আপনি ছয়শো অশ্বারোহীর লাইট ব্রিগেডের মতো অপরিমিত দুঃসাহস দেখিয়ে সোজাসুজি স্বয়ং হাকিমের সম্মুখেই আপনার বক্তব্য পেশ করে

বসেন, তাহলে আপনার ভাবাবেগের বন্যা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠবার পূর্ব্বেই স্মার্ট মহকুমা হাকিম মিষ্টি করে দুটি হাল্‌কা কথা বাতাসে ছেড়ে দেবেন : কেরাণীবাবু, নোট করুন তো !

খুশী হয়ে উঠলেন আপনি এই ভেবে যে, এতদিন পর তবু লাট সাহেবের কান পর্য্যন্ত পৌঁছোলো আপনার আকুতি, হয়তো উৎফুল্লও হয়ে উঠলেন এই আশায় যে, এইবার নিশ্চয়ই একটা নিরপেক্ষ তদন্ত হয়ে সুবিচার পাবেন আপনি আগামী দু'চার দিনের মধ্যেই। কিন্তু কেরাণীবাবুর নোট বইয়ের পাতা প্রতিদিনই দু'চারখানা করে এগিয়ে চলে, পেছন ফিরে তাকায় না তারা উনিশশো পাঁচ সালের বিপ্লবী বাংলার মতো। তাই ফুরিয়ে-যাওয়া নোট বইটি একদিন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে কাগজের ঝুড়ির মধ্যে চিঠি বার-করে-নেয়া এনভেলপের মতো, আর একদিন জমাদার তাকে নিয়ে গিয়ে বিসর্জ্জন দেয় কোনো ডাষ্টবিনে, কোনো ডোবায় বা কোনো আঁস্তাকুড়ে। সুতরাং একদিন নয়, দু'দিন নয়, দশ দিনও নয়, মাসের পর মাস প্রতীক্ষা করতে হবে আপনাকে বিরহিণী যক্ষ প্রিয়ার মতো। সে প্রতীক্ষার আর নেই শেষ।···এমন কি, আপনার অস্তিত্বের ঝুঁকি নিয়ে এরই মধ্যে যদি আবার একদিন কম্পিতপদে এগিয়ে এসে ভীতি-ভগ্ন কণ্ঠে অধীনের বিনীত নিবেদনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন মহকুমা হাকিমকে, তাহলেও এবং তার অনেক—অনেকদিন পরেও অনন্তকাল ধরেই হাকিমের শ্রীমুখে শুনতে পাবেন সেই একই অমৃতবাণী বন্ধ-হয়ে-যাওয়া ঘড়ির বারোটা বেজে-থাকার মতো : কেরাণীবাবু, নোট করুন তো !

নোট বই সর্ব্বদাই তাঁর সঙ্গে থাকে এবং তাতে বাজারের তেল-নুন-ডালের হিসেব থেকে সুরু করে বাৎসরিক ব্যালান্স সীট সবই টুকে রাখা আছে। কিন্তু ঠিক যে অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে তিনি হুজুরের হুকুম তামিল করেন নোটবুকে নোট করে, ঠিক তেমনি উৎকট উৎসাহের সঙ্গেই তিনি নোট-করা কথাগুলো একেবারে কবরস্থ করে ফেলেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠার চাপে। যেন আর-একটি মিশরের মমী তৈরী করবার গুরুভার কাঁধে নিয়েছেন সাব জেলের কেরাণীবাবু ! ······শুধু রেকর্ড ঠিক রাখবার জন্যই মহকুমা হাকিম সারাটি দিন আদালতে হাজারো মামলার ঝামেলা সইবার পর গৃহে প্রত্যাগমনের পথে প্রতিদিন অপরাহ্নে একবার এই সাব জেলের গরীবখানায় আসেন হাতীর পা ফেলে নগণ্য-বাসিন্দাদের ধন্য করে দেবার জন্য। যত কিছু অভিযোগই করা যাক্, যত

আবেদনই জানানো হোক্, সবার জবাবে ঐ একই বাণী শোনা যায় তাঁর মুখে : কেরাণীবাবু, নোট করুন তো !......

সে সময় কেরাণীবাবুর এই লোভনীয় উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন, যত দূর মনে পড়ে, সুরেন মৈত্র। মহকুমা হাকিম কালীপদ মৈত্র। এই দুই বারেন্দ্র মৈত্রের নিবিড় মিত্রতার ফলে মুন্সীগঞ্জ সাব জেলের সাধারণ কয়েদীদের তখন দুর্দ্দশার আর অবধি ছিল না। এবং যে দু'চার জন বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন, তাঁরাও খুব অবমানিত বোধ করতেন।

বাইরে থেকে কোনো বন্দী প্রথম জেলে এলেই অথবা এখানকার কোনো বন্দী সারাদিন আদালতে কাটিয়ে দিনের শেষে ফিরে এলেই প্রহরারত সিপাই তার দেহ তল্লাশী করতো একেবারে তাকে উলঙ্গ করে। স্বদেশী আসামী হলেও বড একটা রেহাই দেয়া হতো না। আর সাধারণ বিচারাধীন আসামীদের এরা নিশ্চিন্তে খাটিয়ে নিত তাদের মামলার ফলাফল বেরুবার পূর্ব্বেই। রান্নার জল টানা, রান্না করা, তরকারি কাটা, মাছ কাটা, মশলা বাটা, কয়লা ভেঙ্গে উনুন ধরানো সব কাজই এদের করতে হতো। আবার পান থেকে চুন খসলেই চলতো সিপাইদের হাতে বেদম প্রহার। যে ক'জন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদী ছিল, তাদের মেথর, ধোপা, নাপিত ও ঝাড়ুদারের কাজ করতে হতো আর প্রায় সময়ই হাকিম বা কেরাণীবাবুর বাড়ীর কাজে এরা ব্যস্ত থাকলে এদের কাজগুলোও এসে পড়তো বিচারাধীন আসামীদের স্কন্ধে। বিচারে নিরপরাধ সাব্যস্ত হয়ে এদের মধ্যে যারা ঘরে ফিরে যেত, তাদের অনেকেরই পিঠে কালশিরের চিহ্ন সহজে মিলিয়ে যেত না।

একটিমাত্র বৃহৎ কক্ষ সর্ব্বশ্রেণীর পুরুষ কয়েদী ও আসামীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট, তারপর সুউচ্চ দেয়ালের ওপারে জেনানা ফাটক অর্থাৎ নারী আসামীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্রাকার কক্ষ। স্বদেশী বন্দীদের সাধারণ কয়েদীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখবার জন্যই রাখা হয় ঐ জেনানা ফাটকে। স্বদেশীরা বসন্ত রোগে আক্রান্ত রোগীর মতো ব্যবহার পেতো কেরাণীবাবুর হাতে। সাধারণ কয়েদী, এমন কি, বিচারাধীন আসামীদেরও তাঁদের ধারে ঘেঁষতে দিতে চাইতেন না তিনি। বসন্ত রোগ বড্ড ছোঁয়াচে, বলা যায় না !···কিন্তু নারী আসামী থাকলেই এই রেসপেকটেবল্ ডিসট্যান্স আর রক্ষা করা সম্ভব হয় না, স্বদেশীদের বাধ্য হয়ে স্থান করে দিতে হয় ঐ বৃহৎ কক্ষেই, সবার

সঙ্গেই। তখন কেরাণীবাবুর আর এক রূপ দেখা দেয়—আই বি-গিরি। স্বদেশীদের ওপর শ্যেনদৃষ্টি রাখতে হয় স্পাই মারফৎ এবং সুযোগ ও সাধ্যমতো নিজেকেই। আর জল পরিমাপকারী ষ্টীমারের খালাসীর মতো ঘন ঘন রিপোর্ট পেশ করতে হয় হাকিমকে, নয় তো ঢাকায় বুদ্ধি বিভাগের অফিসে আর নয় তো উভয়কেই।

আমি যখন এলাম মুন্সীগঞ্জের সাব জেলে, তখন একটি নারী আসামী ছিল বলেই আমার স্থান নির্দ্দিষ্ট হলো সেই একমাত্র ও অদ্বিতীয় বৃহৎ কক্ষে সবার সঙ্গে।

কিন্তু বোধহয় তৃতীয় দিনেই সুরেন মৈত্রের সঙ্গে আমার বেশ এক পশলা বচসা হয়ে গেল।

জেলের মধ্যেই ক্ষুদ্র একটি সবজি বাগান, তাতে কিছু কিছু তরকারি ফলেছে। বেশ বড় বড় বেগুন, টমেটো, ওলকপি ফলেছে, আলুর গাছ বেশ সতেজ হয়ে উঠেছে। একদিন বিকেলে গাছে জল দেবার সময় একজন আসামী একটি লাল টমেটো ছিঁড়ে খায়। সবাই শপথ করে যে, এই দুর্ঘটনা তারা কোনোক্রমেই বেফাঁস হতে দেবে না। সহকর্ম্মী ও রুম-মেটকে তারা কেরাণীবাবুর কোপাগ্নি থেকে রক্ষা করবেই। কিন্তু পরদিনই তা কেরাণী-বাবুর কানে পৌঁছে যায় এবং বিচারকরূপে অপরাধীকে "কম্বল ধোলাই" দণ্ডে দণ্ডিত করে জেলের জল্লাদরূপে কেরাণীবাবু নিজেই এলেন বিচারকের হুকুম তামিল করতে।

বাধা না দিয়ে পারলাম না। বললাম: কেরাণীবাবু, আপনার হুকুম প্রত্যাহার করতে হবে।

চমকে উঠলেন ঔরংজেব যশোবন্ত সিংহের ঔদ্ধত্যে: কেন দ্বিজেনবাবু?

কারণ অতি সহজ, আপনার আদেশ বে-আইনী!

বিস্মিত হলেন কেরাণীবাবু: বে-আইনী!

জবাব দিলাম: আজ্ঞে হ্যাঁ। বিচারাধীন আসামী আর দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীদের মধ্যে যে পার্থক্য অনেক, তা তো আপনার অজানা নয়, কেরাণী-বাবু! বিচারাধীন আসামী আপনার এখানে কয়েদীতে পরিণত হয়েছে দেখছি। তাদের দিয়ে দিব্যি মেহনতি কাজ করিয়ে নেয়া হচ্ছে। সেটাই আপনার বে-আইনী কাজ। তারপর যে গাছগুলোকে জন্ম থেকে

তারা এত বড় করে তুললো জল দিয়ে পরিচর্যা করে, সেই গাছের একটি ফলও তারা ছুঁতে পারবে না, আপনাদের এই আদেশ অমানুষিক ও বর্ব্বরোচিত ! এই আদেশ না মানাই উচিত।

চমকে উঠলেন চাণক্য মহারাজ নন্দের স্পর্দ্ধায় : বলেন কি দ্বিজেনবাবু !

আমাদের চারিদিকে ততক্ষণে দু'চার জন আসামী এসে দাঁড়িয়ে গেছে। দু'একজন কয়েদীও বার বার তাকিয়ে দেখছে উত্তাপের পারা কতখানি ঠেলে ওঠে! আমি বললাম ক্রুদ্ধকণ্ঠেই : এমনিই আমরা বলে থাকি কেরাণীবাবু। উঁচু দেয়ালের আড়ালে আপনারা নিরীহ ও নিরপরাধ লোক-গুলোর ওপর কী অত্যাচারই না করেন, আমরা তার প্রতিবাদ জানাই। আসামীই হোক্, আব কয়েদীই হোক, তার গায়ে হাত তোলবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে? কেন আপনার সিপাইগুলো যখন-তখন ওদের চড়-চাপড় দেয়?

একটু চঞ্চলতা দেখা দিল। কেরাণীবাবু আশেপাশে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে পরিস্থিতি উপলব্ধি করে কণ্ঠস্বর মোলায়েম করবার চেষ্টা করে বললেন : যাক্, শাস্তি না-হয় আমি না-ই দিলাম, কিন্তু গাছের ফল এমনিভাবে যদি ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে, তাহলে ক্ষতি তো ওদেরই। ওদের জন্যই তো এই বাগান।

কয়েদী রহমৎ খুনের দায়ে জেল খাটছে। দীর্ঘদিনের মেয়াদী বন্দী অবশ্য সাব-জেলে থাকে না, ডিষ্ট্রিক্ট জেলেও রাখবার নিয়ম নেই। তারা থাকে সেনট্রাল জেলে। তবে বহমৎকে করুণা করেছেন সদাশয় সরকার তার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুবিধার জন্য সাময়িকভাবে মুন্সীগঞ্জে এনে। আবার চলে যাবে সে ঢাকা সেনট্রাল জেলে। জীবনেরই যে পরোয়া করে না, কেরাণীবাবু তো তার কাছে মেষশাবক! হঠাৎ সে বলে উঠলো : মিছা কথা কন্ ক্যান বাবু? বাগান আমাগো লইগা, না আপনাগো লইগা? তরিতরকারি যা হইবো, তার সবটাই তো যায় হয় হাকিমের বাড়ী নয় তো আপনার বাড়ী।

কেরাণীবাবু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন : অ্যাঁ, বলিস কি রে হারামজাদা?

রহমৎ ওতে দমবার পাত্র নয়। বললো : হারামজাদা কন আর যাই কন্ বাবু, এই বাগানের তরকারি আমাগো ভাইগ্যে জোটে না। তাই কি করুম চুরি কইরাই খাওনের সাধ মিটাইতে হয়। হারাণ খাইছে একটা, আমি খামু দশটা!

এবার জমাদার এগিয়ে এল হুজুর কেরাণীবাবুর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য। বললো রহমৎকে : এই শালা, হাঠ হিঁয়াসে। যা, লম্বরমে যা, নাই তো মারতে মারতে ইট বানাইয়ে দিব।

বললাম : কেরাণীবাবু, বাগানের তরকারি নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কয়েদীদের জন্য খরচা লিখে হিসাব খাতায় একটা মোটা অঙ্ক ব্যয় দেখানো যায়, তা আমি জানি। কিন্তু এই প্রতারণা আর চলবে না। এখানে যখন এসেই পড়েছি, তখন এর শেষ একবার দেখবোই।—রহমৎ, কাল এই বাগানের বাঁধাকপির তরকারি হবে আর টমেটোর চাটনী আর আলু দিয়ে ওলকপির ডালনা···দেখা যাক্, কালীপদ মৈত্র কী করতে পারে। রাজী সবাই ?

রহমৎপ্রমুখ সকলে হল্লা করে আনন্দ প্রকাশ করলো। কেরাণীবাবু মুখখানা হাঁড়ি করে বেরিয়ে গেলেন বেগতিক দেখে।

রাত্রে আমাদের কক্ষে রীতিমতো একটা সভা বসে গেল। রাজনৈতিক বন্দী মাত্র আমরা দু'জন—সত্যেনবাবু আর আমি। পরদিনের অভিযান সম্পর্কেই আলোচনা হলো। যারা দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদী, তারা একবাক্যেই মত দিল বাগানের তরকারি খাবার অধিকার তাদেরই। যারা বিচারাধীন অর্থাৎ যাদের ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত, দেখা গেল তাদের মধ্যেই কিছু মতভেদ আছে। নিরীহ ও নির্বিরোধী যারা, তারা গভীর আশা পোষণ করে যে, বিচারে তারা নির্দোষ সাব্যস্ত হবেই ; সুতরাং ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবার সম্ভাবনা যখন প্রবল, তখন মিছেমিছি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদ করে লাভ কি ? আর একদল আছে, এমনি দল বোধহয় সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালের রাজনৈতিক দলগুলিতেই দেখা গেছে ও দেখা যাবে, যারা সবাইকে এগিয়ে দেবার বেলায় যেমন সর্ব্বাগ্রে নেমে আসে রাস্তায়, তেমনি প্রথম বুলেটের শব্দ শুনেই তারা সর্ব্বাগ্রে গিয়ে আশ্রয় নেয় নিরাপদ কোটরে। যুদ্ধের প্রস্তাব এরা শুধু সমর্থন করে না, অনেক সময় তা উত্থাপন করে এবং যুদ্ধ সমর্থন করে এদের ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা গমকে গমকে একেবারে পঞ্চমে ওঠে এবং সভাস্থলে অগ্নিদ্রাব ছড়িয়ে ছড়িয়ে যেন শ্রোতাদের মনে জাগিয়ে দেয় হত্যার নেশা···কিন্তু তারপর সত্যিই যখন একদিন রণতূর্য্য বেজে ওঠে, শিবিরে শিবিরে সাজো-সাজো রব পড়ে যায়, হ্রেষারবে ও বৃংহণে আকাশ বাতাস হয়ে ওঠে প্রতিধ্বনিত, নায়কের গুরুগম্ভীর আদেশবাণী শোনা যায়, তখন এদের আর খুঁজেও পাওয়া যায় না।······পলাশী প্রান্তর-

প্রান্তে সিরাজউদ্দৌলার শিবিরে আসে দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদ—কেউ অসুস্থ, কেউ অন্যত্র সাংঘাতিক ব্যস্ত, কেউ গোপনে পলায়িত, কেউ হয়তো শম্বুকের মতো নিজের মধ্যেই অন্তর্হিত !……

সেই রাত্রে কিন্তু ফ্লোর নিল একা রহমৎ, 'বি' ক্লাস কয়েদী। অত্যন্ত ধারালো ভাষায় সে তার বক্তব্য এমনিভাবে উচ্চারণ করলো যে, অকস্মাৎ মনে হয় সে বুঝি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক সভায় সত্যিই জনৈক যুক্তিবাদী বক্তা। বললো : কোদালি চালাইয়া মাটি কাটছি আমরা, বীজ ছড়াইছি, এতটুকু চারা গাছে জল দিয়া-দিয়া এতটা বড় করছি, সেই গাছে ফলছে টমেটো। খাউক—হাকিম খাইতে চায়, কেরাণীবাবু খাইতে চায়, খাউক, কিন্তু তাই বইলা আমরা কি একটাও খাইতে পারুম না? এ ক্যামন বিচার রে মশয়? আপনাগো মনে কি আছে খোদা জানে। আমি তো কাইল সকাল হইতেই আগে গোটাকয়েক কফি আইনা ফালাইয়া দিমু গাঙ্গুলী কর্ত্তার পায়ের কাছে, তারপর যা হয় হোক্। সাত বছর তো থাকতে হইবোই, না-হয় থাকুম আরও দুই-চাইর মাস!

শ্রোতাদের মধ্যে কে যেন প্রশ্ন করলো : সিপাইরা যদি লাঠি চালায়, যদি বন্দুক লইয়া আইসে, তাহলে ?

রহমৎ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল : আরে, ও হারামীর বাচ্চাদের ঠাণ্ডা করনের দাওয়াই আমার লগেই আছে। বিশ্বাস হয় না, দ্যাখবেন ?—বলেই সে একটা ম্যাজিক দেখিয়ে দিল। গলায় একটা আঙুল প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বমি করবার মতো বারকয়েক শব্দ করলো তারপর মুখের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে টেনে বার করলো একটি সোনার বিছে হার, বললো : একটা না, এমনি তিনটা আছে। ছিড়া টুকরা টুকরা কইরা শালাগো হাতে দিলেই, বন্দুকের গুলী আর ছুটবো না, বোঝছেন ?—বলে রহমৎ মনের আনন্দে হা-হা করে হাসতে লাগলো। কিন্তু হারছড়া সে বেশীক্ষণ আর বাইরে রাখলো না, আবার মুখে পুরে গিলে ফেললো।

গিলে ফেললেই হারছড়া কিন্তু গলার মধ্য দিয়ে সোজাপথে গিয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে না। এদের গলার মধ্যে বোধহয় জিহ্বার গোড়ার দিকে টনসিলের কাছাকাছি স্থানে একটি গর্ত্ত থাকে, যাকে এদের ভাষায় বলা হয়, খোপর। শোনা যায়, চোরের দলে নাম লেখাতে এলেই শিক্ষকদের প্রথম পাঠ হয় খোপর তৈরী। মার্ব্বেলের মতো সাইজের একটি সীসের বল গলার মধ্যে রেখে রেখে ওখানটা খইয়ে ফেলা হয়, ধীরে ধীরে ওটা নরম মাংসের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরী

করে। প্রায় চার ইঞ্চি গভীর গর্ত তৈরী হবার পর সীসের বল ফেলে দেয়া হয়। হাত সাফাই করে টাকাপয়সা, আংটি, দুল, লকেট, নাকছাবি, এমন কি, একটি গোটা হার বা একটা ফাউনটেন পেনও ঐ গর্তে লুকিয়ে ফেলা যায়। জেলের মধ্যে নানারূপ অতিরিক্ত সুবিধে আদায়ের জন্য পাকা কয়েদীরা খোপরে ভরে টাকা, পয়সা বা সোনার টুকরো নিয়ে আসে। রহমৎও এনেছে। টাকা দিলে যে সাপকেও বশ করা যায়, বন্দীরা তা জানতো। তাই রহমতের কথায় ও সদ্য সদ্য হারের প্রদর্শনীতে তারা বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

পরদিন সকালবেলা কেরাণীবাবু বেশ একটা চাল চাললেন। তিনি এলেন না, এল হেড জমাদার, বললো, হাকিমবাবু নাকি আমায় তাঁর বাড়ীতে চা খাবার নেমন্তন্ন করেছেন। অনায়াসেই সে-নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম, কিন্তু কালীপদ মৈত্রের মুখোমুখি ঝগড়া করে কিছু সুবিধে আদায় করা যায় কিনা, দেখবার জন্যই যাওয়াই স্থির করলাম। রহমৎকে বলে গেলাম আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আইন অমান্য স্থগিত রাখতে। রেডি থাকবে, কিন্তু আমি ফিরে এসে সুইচ্ অন্ করবো!

মুন্সীগঞ্জ সাব জেলের পাশেই একটি বহু প্রাচীন দুর্গ আছে, তার নাম, যতদূর মনে পড়ে, ইদ্রাকপুর ফোর্ট। কোন্ কালে কে তৈরী করেছিলেন জানিনে। শুধু দেখেছিলাম, এর প্রধান ইমারতটি গোলাকার ও তার একাংশ একেবারে মাটির নীচে বসে গেছে। সেই গোলাকার ইমারতের ছাদে কালীপদ মৈত্রের সুদৃশ্য বাংলো ধরনের গৃহ। অত্যন্ত প্রশস্ত অনেকগুলো সোপান বেয়ে ওপরে উঠে আসতেই ভ্যালেট স্বয়ং কেরাণীবাবু এসে অভ্যর্থনা জানালেন আমায়ঃ আসুন, আসুন দ্বিজেনবাবু,—এই ঘরে বসুন। সাহেব এলেন বলে।

বেশ সাজানো ঘর। সোফাসেট, টিপয়, কাঁচের আলমারীভর্ত্তি বই, ফুলদানী, দরজা জানালায় রঙীন ফুল-আঁকা পরদা।

কিন্তু সাহেবের আসতে দু'চার মিনিট দেরী হওয়াতে কেরাণীবাবু আমায় আপ্যায়িত করতে চেষ্টা করলেনঃ রাত্রে বোধহয় আপনার খুব কষ্ট হয় দ্বিজেনবাবু, তাই না? যে মশা—

হ্যাঁ, তা হয়।—জবাব দিলাম।

কেরাণীবাবু বলতে লাগলেনঃ তার ওপর আবার ঐ নোংরা লোকগুলোর

সঙ্গে থাকা, সে এক ভীষণ ব্যাপার! ভদ্রলোকের পক্ষে সেটা একেবারেই সম্ভব নয়। কিন্তু কি আর করা যায়, মেয়ে আসামীটাই তো বিভ্রাট বাধিয়ে দিলে। নইলে ওদিকের ঘরটা চমৎকার! সত্যেনবাবু আর আপনার পক্ষে গ্র্যাণ্ড হতো।

কী হতো আর কী হতে পারলো না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্য আমি এখানে আসিনি। তাই চুপ করেই রইলাম। কেরাণীবাবু কিন্তু চুপ করে থাকলেন না, বলে যেতে লাগলেন: তা আমি হাকিম সাহেবকে বলেছি, মেয়েটার মামলা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলুন হুজুর, ওটাকে ঢাকায় পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হই। নইলে জামিনেই ছেড়ে দিন। দ্বিজেনবাবুদের একটু সুবিধে করে দিই। আপনিও একটু বলুন না দ্বিজেনবাবু! আপনার অনুরোধ হুজুর না রেখে পারবেন না।

বললাম: আমি তো আপনার হুজুরকে কোনো অনুরোধ জানাতে এখানে আসিনি কেরাণীবাবু! চা খাবার নিমন্ত্রণ তো একটা অছিলামাত্র! কেন ডেকেছেন, সেটা আপনার জানা থাকলে আপনিই বলে ফেলুন না। ওদিকে রান্নাবান্নার সব বেড়ি যে!

না, না, অছিলা কেন, সাহেব নিজে বলেছেন আমায়।—কেরাণীবাবু গায়ের জোরে বললেন, কিন্তু কথাটা যে আদৌ উপাদেয় লাগলো না তাঁর, তা তাঁর মুখের চেহারাতেই স্পষ্ট বোঝা গেল। কি করবেন স্থির করতে না পেরে যখন দিশেহারার মত হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় স্লিপিং স্যুট পরে কক্ষে প্রবেশ করলেন স্বয়ং কালীপদ মৈত্র। রক্ষা পেলেন সুরেন মৈত্র। তিনি দ্বারপ্রান্তে সরে গেলেন। আমি হোষ্টের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করলাম।

চুলের বিপুলতা এই প্রৌঢ় বয়সে অনেকখানি কমে এলেও বেশ বোঝা যায় যৌবনে তাতে ঢেউ খেলতো। এখনো দু'-এক গুচ্ছ তাজা সাপের মতো বেঁকেই আছে। গোলগাল মুখমণ্ডল, ক্লিন সেভ্‌ড্‌। শুধু মুখমণ্ডলই নয়, দুই কানের ওপরটাও এবং ঘাড়ের দিক্‌টাও। জুলপীর চিহ্নমাত্র নেই। তাই বুঝি জুলপী-ওয়ালা ছেলেদের ওপর তাঁর অবিমিশ্র বিতৃষ্ণা। পরনে, আজ্ঞে হ্যাঁ, সিল্কের পায়জামা ও সিল্কের চাইনিজ পাতলা কোট। চওড়া নীল স্ট্রাইপ। শ্রীচরণে ঘাসের লপেটা। বিশ্বকর্মা এই বারেন্দ্র পুতুলটি তৈরী করে বোধহয় ব্রহ্মতালুতে একটা থাবড়া মেরেছিলেন। তাই কেমন গোবদা-গাবদা বেঁটে-খাটো শরীর,

ভুঁড়িটাও একটু মাথা চাড়া দিয়েছে। দেখলে মনে হয় হাবা-গোবা গোছের মানুষ। কিন্তু, আজ্ঞে না, আপনার ধারণা একেবারেই ভুল। সামান্য কানুনগো থেকে মুন্সীগঞ্জের মতো বিপজ্জনক মহকুমার এস ডি ও-র সিংহাসনে বসেছিলেন তিনি এবং অকপট রাজভক্তির ফলেই উত্তরকালে সরকারী কৃপা-কণা বর্ষিত হয়েছিল এই মহকুমা হাকিমের শিরেই। মিষ্টার কালীপদ মৈত্র হয়েছিলেন রায় কে পি মৈত্র বাহাদুর। বাহাদুরকা খেলই জানতেন বটে!

প্রত্যুষে রেস্তোরাঁয় সংবাদপত্র খুলে বসে মৌজ করে চা পানের সময় মনটা যেমন হয়ে ওঠে হালকা এবং তারপর প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার থেকে সুরু করে একেবারে মুচীরাম গুড়ের সম্বন্ধে নানাবিধ মুখরোচক আলোচনায় যেমন চায়ের কাপে তোলা যায় মেদিনীপুরের ঝড়, অমিতবিক্রম কালীপদ মৈত্র তাঁর ড্রয়িং রুমটিকে যেন তেমনি একটি চাচার হোটেলে পরিণত করে বসলেন এবং হাকিমী খোলসটা একেবারে পরিত্যাগ করে হাসি পরিহাসে ও ঠাট্টাতামাশায় একেবারে উত্তাল হয়ে উঠলেন।

বুঝতে দেরী হলো না আমার যে, কালক্ষেপই এই বারেন্দ্র যুগলের একমাত্র উদ্দেশ্য। ওদিকে আইন অমান্য করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে অস্ত্রহীন অক্ষৌহিণী, একটিমাত্র অঙ্গুলি হেলনে তারা বাগান আক্রমণ করবে অহিংস-ভাবে। উত্তেজনা টগবগ করে ফুটছে তপ্ত কটাহে তেলের মতো। ঠিক এই সময় প্রয়োগকর্ত্তাকে কৌশলে যদি অকুস্থল থেকে সরিয়ে রাখতে পারা যায়, তাহলে দপ্ করে জ্বলে-ওঠা আগুন থপ্ করে নিভেও যেতে পারে, এই এঁদের পরিকল্পনা। কিন্তু ফাঁদে গলা বাড়িয়ে দেবার মতো নিরীহ গোবেচারা আমি নই। তাই আসল কথাটা এবার নিজেই বলে ফেলতে কসুর করলাম না: শুনুন, গল্প করবার জন্যই যদি আমায় ডেকে থাকেন, তাহলে অন্য সময় আসবো, আরও বেশীক্ষণ থাকতে পারবো। এখন আমি আর সময় নষ্ট করতে পারছি না। চলি।

বলে উঠতে যেতেই প্রায় হাত ধরে অনুনয়ের সুরে বললেন হাকিম মৈত্র: আরে বসুন, বসুন দ্বিজেনবাবু! চা না খেয়ে যাবেন, সে কি একটা কথা হলো? তারপর আসল কথাটাই এখনো হয়নি আপনার সঙ্গে। শুনুন। কাল আপনার ভাই রঙ্গলাল এসেছিল আপনার মামলার খবর করতে। বললাম, দাদাকে নিয়ে যাও সামান্য একটা জামিনের ব্যবস্থা করে। রঙ্গলাল আপনাকে

জিজ্ঞেস না করে কিছু বলতে পারে না, বললো। আমি বললাম তখনই এসে আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে। এল না, বললো, ওর নাকি অনেক কাজ আছে, সময় হবে না। অবশ্য আমি আজও রঙ্গলালকে বলে দিয়েছি আমার সঙ্গে কোর্টে দেখা করতে। তা কি বলবো তাকে?

স্পষ্ট জবাব দিলাম: জামিন তো আমি চাইনি মিঃ মৈত্র! আইন ভঙ্গ করবার আলটিমেটাম দিয়েছিলাম, আপনারা তার পূর্ব্বেই আমায় নিয়ে এলেন এখানে। আমার দাবীর তো কোনো ফয়সালা হয়নি, তাই বাইরে গেলে যে আবার আমি কলকাতা রওনা হবো।

হে-হে করে বিশ্রীভাবে হেসে উঠলেন কালীপদ মৈত্র। কিন্তু কথা কইলেন কেরাণীবাবু: আরে মশাই, কেন এমনি মশার কামড় খাবেন বলুন তো! মশারি আছে, টাঙ্গাবেন না। কারণ, আর কারুর মশারি নেই। ঐ ছোটলোক বদমায়েসদের জন্য এই মমতার কোনো মানে হয়, আপনিই বলুন না। আজ ওরা আপনাকে মাথায় করে নাচছে, কাল বাইরে গিয়ে আপনারই ঘরে সিঁদ কাটতে ওদের এতটুকু চক্ষুলজ্জা হবে না।

জবাব দিলাম না এসব কথার, দেবার প্রয়োজন বোধ করলাম না। বললাম: আচ্ছা চলি তাহলে।

কিন্তু চা—

চা আর আমি খাবো না।

তবু আবার বাধা দিলেন কালীপদ: কিন্তু আর আপনাকে চাকরির জন্য কলকাতায় যেতে হবে না, গভর্ণমেণ্টই আপনার চাকরির ব্যবস্থা করেছেন।

মানে?

মানে, আপনারই জেদ বজায় রয়েছে। গভর্ণমেণ্ট আপনার পনেরো টাকা মাসিক ভাতা মঞ্জুর করেছেন। And you are the only Detenue interned at home throughout Vikrampore, who is granted a monthly allowance—খুশী হলেন তো?

আমি খুশী হলেও কালীপদ মৈত্র যে আদৌ খুশী হওয়া দূরে থাক্, অত্যন্ত অবমানিত বোধ করেছেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রাঙ্গের এই অহেতুক উদারতায়, তা নিশ্চিতভাবে বোঝা গেল তাঁর ললাটের কুঞ্চিত রেখায়! মনের ক্রোধ অনেক কষ্টে ঢেকে রাখতে হচ্ছে তাঁকে।

খুব অল্প কথায় কালীপদের প্রশ্নের জবাব দিলাম: হ্যাঁ, হলাম। কিন্তু সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। আমাদের পিকনিকের রান্নাও এখনো চড়েনি বোধ হয়। সিপাইকে ডাকুন, কেরাণীবাবু, আমি এখন যাবো।

বলে আর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করলাম না। বাইরে আসতেই জনৈক প্রহরী আমার সঙ্গ নিল এবং জেলের গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। রহমতের নেতৃত্বে গোটা আটেক ফুলকপি তখন তোলা হয়ে গেছে, কিছু টমেটো, ওলকপি আর সের পাঁচেক আলু। আমি জামাটা খুলে ফেলে কোমরে গামছা জড়িয়ে নিয়ে কাজে লেগে গেলাম।

কিন্তু আশ্চর্যভাবে এইসব উত্তেজনাকর মুহূর্তগুলি কূটনীতিবিদ্ বৃটিশ বা তাদের প্রতিনিধি ম্যানেজ করে থাকে। বাধা তারা আদৌ দিতে এল না, কারণ বেশ জানে বাধা কেউ মানবে না আর বাধা দিয়ে আটকানোও যাবে না। তাই তারা তাচ্ছিল্য করলো এই অভিযানকে এবং তারই মধ্য দিয়ে ফুটে উঠলো অভিযানকারীর প্রতি অবিমিশ্র ঘৃণা ও অবাঙ্ময় তিরস্কার! আমরা বাগানের তরকারি সেদিন পেট ভরে শুধু খেলাম না, দিনের শেষে আমাদের আরো গোটাকতক দাবী যোগ দিয়ে আর একখানা আবেদনপত্র পাঠালাম হাকিম সাহেবের কাছে এবং স্পষ্টভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলাম, আমাদের দাবী পুরোপুরি পূরণ না হলে দশদিন পরেই অনশন শুরু করা হবে অহিংস সত্যাগ্রহী হিসেবে।

কিন্তু সে সত্যাগ্রহ অর্থাৎ অনশন আর শুরু করা সম্ভব হলো না ঐ কালীপদ মৈত্রেরই কূটনৈতিক চালে। জামিনে মুক্তি দেবার টোপ তো তিনি ইতিমধ্যে ফেলেই দিয়েছিলেন রঙ্গলালের মারফৎ। রঙ্গলাল কালীপদের কাছে খুব মেজাজ দেখিয়ে চলে এলেও বাড়ীতে এসে মাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতেই মা তাকে বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি শুরু করলেন জামিনের ব্যবস্থা করবার জন্য। রঙ্গলালের সমস্ত যুক্তি মায়ের আবেগ ও উৎকণ্ঠার বন্যার স্রোতের মুখে তৃণের মতো ভেসে গেল। মুন্সীগঞ্জে ফিরে এল রঙ্গলাল এবং আমাদের পারিবারিক মোক্তার যতীন চক্রবর্তী তৎক্ষণাৎ জামিনের আবেদন পেশ করলেন হাকিমের দরবারে।

সেদিন আমার মামলার তারিখ ছিল। মামলায় যে কি হবে, তা তো জানাই ছিল। যে মাসিকভাতা নিয়েই এত গণ্ডগোল, আলটিম্যাটাম ও আইন অমান্যের আয়োজন, সেই ভাতাই যখন মঞ্জুর হয়ে গেছে, তখন মামলার উত্তাপও যে

অনেকখানি কমে গেছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবুও বৃটিশ ক্রাউনের আত্মম্ভরিতার ইস্পাতে পাছে বিন্দুমাত্রও দাগ লাগে, বুদ্ধির পাশাখেলায় পাণ্ডবদের মতো সে একটি দানও হেরে গেছে বলে পাছে কারুর মনে সন্দেহ হয়, তাই বাইরের ঠাট সে যথারীতি বজায় রেখেই চলবে, এ আমার অজানা ছিল না। তাই সেদিনকার মামলার তারিখে কোনোরূপ গুরুত্ব না দিয়েই আমি আদালতের পুলিশ অফিসে এসে উপস্থিত হলাম দেহরক্ষীসহ। কিন্তু দেখা গেল, কোর্টে হাজির করবার উৎসাহ যেন এদের একেবারেই নেই। ব্যাপার কি, ঠিক ঠাহর করতে না পেরে দারোগাবাবুকে ও কোর্ট ইনসপেক্টরকে জিজ্ঞেস করাতে তাঁরা উত্তরটাকে একেবারে পাশ কাটিয়ে গেলেন। বিকেলের দিকে অকস্মাৎ রঙ্গলাল এসে হাজির। বিস্ময়ের অবধি রইল না।

কি রে, তুই এসেছিস যে ?

তোমায় নিয়ে যেতে।

নিয়ে যেতে !

হ্যাঁ, নিয়ে যেতে। তোমার জামিন হয়ে গেছে।

ক্রুদ্ধ হলাম ঃ জামিনের দরখাস্ত করলি কেন আমায় জিজ্ঞেস না করে ?

রঙ্গলাল জবাব দিল ঃ কী করি, মাকে বোঝানো গেল না। আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে ছেড়েছেন যে, আগে জামিনের দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়ে তারপর তোমার সঙ্গে দেখা করবো, নইলে নাকি রাজী হবে না তুমি জামিনে বাইরে আসতে।

আরো রাগ হলো ঃ যা, দরখাস্তখানা ছিঁড়ে ফেলগে, আমি যাবো না।

রঙ্গলাল বলে উঠলো ঃ বল কি, দরখাস্ত মঞ্জুর হয়ে গেছে বললাম যে !

কত টাকা ?

মাত্র একশো। ইতিমধ্যেই দরওয়াজা অর্থাৎ হাজতের দ্বাররক্ষী সিপাই এসে দরজা খুলে দিল। অর্থাৎ শুধু হুকুম নয়, হুকুম তামিল করা সুরু হয়ে গেছে ! বাইরে এলাম। রঙ্গলাল বললো ঃ কালীপদ মৈত্র বললেন জেলের মধ্যে নাকি তুমি ভারী গণ্ডগোল সুরু করেছ ? Hunger strike করবে বলে নাকি ordinary কয়েদীর সঙ্গে জোট পাকিয়েছ ?

জবাব দিলাম না এসব প্রশ্নের। কালীপদ মৈত্রকে একটা শিক্ষা দেবার সুবর্ণ সুযোগ হারিয়ে গেল !……

চল্লিশ

সুবোধ ছেলের মতো বাড়ী ফিরে এলেও দুরন্ত রাজবন্দীর মতো আবার ডুবে গেলাম গুপ্ত সমিতির কাজে। মাসিক ভাতায় সুবিধে হলো খানিকটে আর্থিক দিক্ থেকে। এর সঙ্গে গোটা দুই টিউশনিও নিলাম জোগাড় করে, ফলে মাসিক আয় দাঁড়ালো মোট পঁয়তাল্লিশ টাকা। অর্থাৎ যাকে বলে উপার্জ্জনশীল রাজবন্দী।

যতদূর মনে পড়ে, ২০শে মার্চ্চ ফিরে এলাম বাড়ীতে আর ২৬শে মার্চ্চ আবার তল্লাশী হলো আমাদের বাড়ী। যথারীতি আপত্তিজনক কিছুই না পেয়ে দারোগা যখন তল্লাশী মালের জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরমখানা পূরণ করছিলেন, তখন মৃদুস্বরে জানালেন আমায় যে, রঙ্গলালকে একবার থানায় যেতে হবে। রঙ্গলাল বাড়ীতে ছিল না তখন, কোথায় গেছে তা জানি না বলে দিলাম। কিন্তু তমিজদ্দী চৌকিদার তাকে নাকি বাজারে দেখে এসেছে এই একটু আগেই। সুতরাং দুটো সাদা পোষাক-পরা পুলিশ নিয়ে মহা উৎসাহে সে হাঁসাড়া বাজার অভিমুখে যাত্রা করলো। এইবার সে কাজ দেখাবেই!

রঙ্গলাল তখন বিপদভঞ্জনের সঙ্গে বাজারের সওদা খরিদে ব্যস্ত ছিল, এমন সময় তমিজদ্দী এসে হাজির। সঙ্গী পুলিশদের পোষাক সাদা হলেও আমাদের সাদা চোখেই ধরা পড়তো তারা! সুতরাং ব্যাপারটা অনুধাবন করতে ওদের একটুও বিলম্ব হলো না। তমিজদ্দীর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই দু'জনের চোখের কোণে একটা ইশারা ঝলসে গেল। বিপদভঞ্জন তৎক্ষণাৎ নাটকীয় অভিনয়ের মতো কণ্ঠস্বরে ভাবাবেগের বন্যা বইয়ে দিয়ে বলে উঠলো: দাদা, আবার কত কালের জন্য চলেছেন আমাদের অসহায় করে, নিঃসম্বল করে, আমাদের অকূল সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে, কে বলবে? যদিও বয়সে আপনি দাদার মতো, তথাপি কাজের মধ্য দিয়ে সত্যিই আপনাকে পেয়েছিলাম আমরা একেবারে একান্তভাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। প্রতিদিনকার মেলামেশায় হয়তো কখনো কখনো ক্ষুণ্ণ হয়েছে, আশা করি, সেজন্য ক্ষমা করবেন আমাদের ছোট ভাই মনে করে। বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে চলুন, তবু একসঙ্গে বসে একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিই আপনাকে!

শেষদিকে আবেগে বিপদভঞ্জনের কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল!

বোধহয় আর একটু হলেই তার চোখে অশ্রু দেখা দেবে, এমনি অবস্থায় সে রঙ্গলালের হাত ধরে নিয়ে এসে উঠলো মহেন্দ্র ঘোষের মিঠাইয়ের দোকানে। দরজা পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এল তমিজদ্দীরাও। দোকানের উত্তরদিকেই খাল আর খালের উত্তরেই শান্তি সোমের বাড়ী। সুতরাং দোকানের পেছনদিকে, যেখানে উত্তপ্ত প্রকাণ্ড কড়াইতে রসগোল্লাগুলো সন্তরণ করছিল মনের আনন্দে, সেখানে এসে উপস্থিত হলো দু'জনে এবং অনুচ্চকণ্ঠে বললো বিপদভঞ্জন: এইটুকু পারবেন তো সাঁতরে পার হতে? ওপারে উঠে শান্তিদা'র বাড়ীতে লুকিয়ে পড়লে শালা তমিজদ্দীর বা পুলিশের বাবারও ক্ষমতা হবে না—

রঙ্গলাল বললো: যাক্. কয়েকটা রসগোল্লা খাওয়া যাক তো, নইলে দোকানের পেছনে আসা নিয়ে ব্যাটা সন্দেহ করতে পারে।

রসগোল্লা চললো এবং সঙ্গে চললো সুযোগের প্রতীক্ষা। পকেটে টাকা পয়সা যা ছিল, ইতিমধ্যেই হাত সাফাই করে রঙ্গলাল তা ভরে দিয়েছে বিপদের পকেটে। আয়োজন সম্পূর্ণ, রঙ্গলাল খালে নিঃশব্দে নেমে পড়বে। ঠিক এমন সময় বোধহয় কিছু একটা সন্দেহ করেই তমিজদ্দী অকস্মাৎ এসে হাজির হলো একেবারে রসগোল্লার কড়াইয়ের পাশে!

প্রমাদ গুনলো ওরা দু'জন। তবুও চেষ্টা করতে দোষ কি? বিপদ বলে উঠলো: এ কী, এখানে যে চৌকিদার?

সবিনয়ে নিবেদন করলো তমিজদ্দী: না—এমনি। গরম রসগোল্লা কি ভালো লাগবো কর্ত্তা? সেবখানেক লইয়া চলেন, থানায় বইসা খাইবেন 'খনে। আমরাও পামু দুই চাইরডা—

আর রসগোল্লা! সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। রসগোল্লা বিপদের কাছে একেবারে নীরস ময়দার গোলা মনে হতে লাগলো।

রঙ্গলালকে নিয়ে যাবার পর দু'এক দিনের মধ্যেই সংবাদ পেলাম, সেবাজদীঘা গ্রামে আমাদেরই জনৈক সদস্যের বাড়ী ঐদিনই তল্লাশী করে কিছু রিভলভারের কার্ত্তুজ পাওয়া গেছে এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এতে কিন্তু আদৌ চিন্তিত হলাম না। কাজে নিযুক্ত থাকাকালে কে কোথায় ছিটকে পড়ে গেল, কার ওপর নেমে এল হাজতবাসের দুর্দ্দিন, আই বি অফিসে কার তলব পড়লো, সে হিসাব রাখতেন তাঁরা, মোটা পরদার অন্ধকার অন্তরালে বসে যাঁরা দলীয় কর্ম্মতৎপরতার কল টিপতেন

কিন্তু দু'চার দিন পরই মুক্তি পেয়ে ফিরে এল রঙ্গলাল। জানতে পারলাম তার মুখে অমানুষিক অত্যাচার চলেছিল তার ওপর। কোনো কৌশল, কোনো ভদ্রতা, কোনোরূপ বিচার না করে নির্ব্বিবাদে হান্টার চালিয়েছে তার সর্ব্বশরীরে আই বি-র দারোগা মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী। নামটি আমার মনে দাগ কেটে বসে গেল পাথরে লেখার মতো।......

মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী! দি স্কাউণ্ড্রেল!

এর দু'এক দিন পরই অকস্মাৎ একদিন বিকেলে মণীন্দ্র হন্তদন্ত হয়ে আমার এখানে এসে হাজির। ব্যাপার কি?

ব্যাপার সংক্ষেপে সে যা জানালো, তা হচ্ছে এই: নান্টু ঘোষ, মতিলাল মল্লিক আর মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় দু'একটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ নারায়ণগঞ্জ শহরের অনতিদূরে দেওভোগ গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় জনকতক মুসলমান কৃষক তাদের সম্মুখীন হয়। কৃষকদের নানারূপ প্রশ্নের স্বাভাবিক জবাব তারা ঠিকই দিয়ে যাচ্ছিল এবং আশা করছিল এবার তারা রেহাই পেয়ে যাবে।

কিন্তু অকস্মাৎ ওদের মধ্যে একজন বলে উঠলো: সে যাই হোক্, আপনাদের আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। চারিদিকে এত ডাকাতি হচ্ছে যে, কে যে ডাকাত নয়, তা বলা শক্ত। কাজেকাজেই চলুন আমাদের বাড়ীতে, সকাল হোক্, পাড়ার আরো দশজন আসুক, তারপর তাদের সঙ্গে কথা বলে আপনাদের যেতে দোব।

চট্ করে মাথায় রক্ত উঠলো মধুর! কোটর থেকে বেরিয়ে-আসা বড় বড় তার চক্ষুদুটিতে অগ্নিকণা চক্ চক্ করে উঠলো। দেরী করা নিরর্থক মনে করে সে কোটের পকেটে হাত দিতে যেতেই নান্টু বাধা দিল, মুসলমানকে সম্বোধন করে বললো: শোন ভাই, অনর্থক তোমরা হায়রানি করছো আমাদের। আমাদের শহরে যেতে দাও। ডাকাত বলে বৃথাই সন্দেহ করছো আমাদের।

কিন্তু যুক্তির ধার ধারে না মুসলমান চাষী। সে তার গোঁ ছাড়তে নারাজ আর তার ওপর সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্থনও পেয়েছে আশেপাশে সবার কাছ থেকে। সুতরাং স্পর্দ্ধা তার উত্তাল হয়ে উঠলো। সে হুকুম করে বললো একজনকে: এই, দাঁড়িয়ে না থেকে এই তিনজনকে ধর, ধরে নিয়ে যা আমার বাড়ী, বৈঠকখানায় আটকে—

কথা তার শেষ হতে পারলো না। অকস্মাৎ গর্জ্জে উঠলো মতিলালের রিভলভার এবং তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হলো সেই মুসলমান কমাণ্ডার-ইন-চীফ। বেঁচে আছে কিনা বোঝা গেল না। মধুও গুলী চালালো, বোধহয় তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

তাড়া করলো ওরা এদের তিনজনকে। ছুটে পালাতে গিয়ে হেঁাচট খেয়ে পড়ে গেল মতিলাল। ধরা পড়লো চাষীদের হাতে। অবশিষ্ট দু'জনের জন্য আর তওটা উৎসাহ নেই ওদের। মতিলালকেই সবাই মিলে ধরে নিয়ে গেল।

ছুটে পালাতে গিয়ে নান্টু তার চশমা হারিয়ে এসেছে। কোথায় পড়ে গেছে। আর পশ্চাদ্ধাবনরত চাষীরা যে ইষ্টকবৃষ্টি করছিল, তার একটি এসে পড়েছে একেবারে নান্টুর চোখের উপর। মণীন্দ্র বললো: নান্টুদা'র চোখটা লাল হয়ে ভয়ানকভাবে ফুলে গেছে। আদৌ ভালো হবে কিনা কে জানে। আর চশমা তাঁকে জোগাড় করে দিতে হবেই দু'এক দিনের মধ্যেই। নইলে, সর্ব্বদাই যে পুরু কাঁচের চশমা ব্যবহার করতেন, তাঁকে চশমাহীন অবস্থায় দেখলে এবং চোখে আঘাত লেগেছে দেখতে পেলে লোকের মনে নানা প্রশ্ন জাগতে পারে।

খাল সাঁতরে নান্টু আর মধু এসে উঠেছে মণীন্দ্রের বাড়ীতে। দু'চার দিনের জন্য ওদের থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে। দেওভোগের উত্তেজনা না কমে যাওয়া পর্য্যন্ত এবং এর জের কতদূর যায়, তা না দেখে তো আর এরা দু'জন প্রকাশ্যে বার হতে পারে না! নান্টু মণীন্দ্রের ওখানেই থাকবে, কারণ সেরাজদীঘাতেই একজন বিশ্বাসী চশমাবিক্রেতা আছে, যার কাছ থেকে সে চশমা নিতে পারবে বাড়ীতে ডাকিয়ে এনে। শুধু মধুর একটা থাকবার ব্যবস্থা—

তৎক্ষণাৎ বললাম: আমাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যাও।

বিস্মিত মণীন্দ্র প্রশ্ন করলো: আপনার এখানে?

হেসে জবাব দিলাম: তাই তো ভালো। সব চাইতে সেফ। দারোগারা এসে দেখে যায় শুধু আমায়, ভেতরে কোনো পলাতক আসামী থাকতে পারে, এ তারা ধারণাও করতে পারে না। শুধু তল্লাশী। তা সে-সময় ওকে পেছন-দিক্ দিয়ে সরিয়ে ফেলা যাবে। যাও, মধুকে নিয়ে এসো এখানে।

কিন্তু মতিলালের জন্য মণীন্দ্রের মন খচখচ করছিল, তা বুঝতে পারলাম। সে বললো: কিন্তু মতির কী দশা হলো, কে জানে! বি ভি-র আর একটি কর্ম্মীকে বোধহয় হারাতে হলো।

দৃঢ়স্বরে বললাম: এই পথটাই এমনি মণীন্দ্র যে, দেনা-পাওনার হিসেব করে এতে চলা যায় না। পাওনার ঘরে যখন শূন্য, একেবারে শূন্য থাকে, তখন দেনার ঘর তুলতে হয় ফাঁপিয়ে। খালি দিয়েই যেতে হয়! যা দিয়েছো, যা দিচ্ছ, যা দেবে, তারও কোনো হিসেব থাকে না। নিশিদিন শুধু দিয়েই যেতে হয় তিলে তিলে, আপনাকে খইয়ে, দুমড়ে, মুচড়ে একেবারে নিঃশেষ করে। তবুও মনে হয়, যা দেবার তা বোধহয় দিতে পারলাম না। পাওনার সংবাদ নিয়ে তো আর বিপ্লবের পথে পা বাড়াওনি মণীন্দ্র। এটা ব্যবসা নয় যে, লাভের অঙ্কটার একটা হদিস নিতে হবে। একে বলে নিছক্ আত্মবলিদান। দেশের জন্য জীবন বিসর্জ্জন।......তুমি যাও, আর দেরী করো না। সন্ধ্যের পরই মধুকে এনে পৌছে দিয়ে যাবে।

মণীন্দ্রের আশঙ্কা মিথ্যে হয়নি। পরে স্পেশাল ট্রাইবিউনালে মতির বিচার হয় এবং তার প্রতি ফাঁসীর আদেশ হয়!

একদিন আমিও গেলাম তাজপুরে মণীন্দ্রের বাড়ীতে গভীর রাত্রে। নান্টুর চোখ তখন অনেকটা ভালো হয়ে গেছে, চশমাও একটা নেয়া হয়েছে। মতির জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করলো নান্টু। দেওভোগের ঘটনায় পরদিনই ঢাকা শহরে অনেকগুলো বাড়ীতে তল্লাশী হয় এবং হরিপদদের ওখানে পাওয়া যায় একটি আটঘরা অটোমেটিক পিস্তল ও পাঁচটি তাজা কার্তুজ। তবুও সেখানকার ঢেউ ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ রইলো, বিক্রমপুরের দিকে আর এলো না দেখে আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

এইখানেই দার্জ্জিলিং শহরে বাংলার তদানীন্তন গভর্ণর এবং জবরদস্ত গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসনকে হত্যা করবার জন্য বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স যে পরিকল্পনা করেছে, সে সম্বন্ধে নান্টুর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়। পরিকল্পনার মূলে যিনি ছিলেন, তিনি আর কেউ নন, বহরমপুর বন্দীশিবিরের সেই যতীশ গুহ, যিনি অকস্মাৎ সবার আগেই সর্তহীন মুক্তি পেয়ে আমাদের ঠাট্টা করে একখানা দশ টাকার নোট দেখিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তখনই উল্লেখ করেছি যে, তাঁকে মুক্তি দিয়ে সরকারী বুদ্ধি বিভাগ কী নির্ব্বুদ্ধিতার

কাজ করেছিল, ক্রমশঃ তা জানা যাবে। যে নীতির বশবর্ত্তী হয়ে ওরা আমায় স্বগৃহে অন্তরীণ করেছিল, ঠিক সেই ভ্রান্ত নীতির ফলেই যতীশবাবুকে ওরা বিনাসর্ত্তে মুক্তি দেয়। তেমনিভাবে কামাখ্যা রায়কেও। এঁদের সঙ্গে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সম্পর্ক প্রকাশ্যভাবে পুনঃস্থাপিত হলেই যে আই বি-র উদ্দেশ্য সফল হয়, তা জানতো বি ভি-র কর্ম্মীরা। তাই খিড়াক দ্বার দিয়ে চলতো আনাগোনা, গভীর নিশীথে চলতো সলাপরামর্শ।······

নান্টু মোটামুটি জানালো যতীশ গুহের পরিকল্পনা। দার্জ্জিলিং শহরে পৌছে ছেলেরা কোথায় থাকবে, কীভাবে থাকবে এবং কীভাবে লেবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে গভর্ণর যখন ঘোড়দৌড় দর্শনে মত্ত থাকবেন, তখন ভবানী ও রবি···সবই বললো নান্টু। পরিশেষে life for life-এর জন্য জন দুই ছেলে পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞেস করলো আমায়। বলে দিলাম বিপদভঞ্জন ও সুবোধের কথা। নান্টু বললো যতীশবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে সে যথাসময়ে জানাবে আমায়। পরে অবশ্য জানিয়েছিল, এদের আর দরকার হবে না।

সে সময়ে চট্টগ্রামে যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল, তার একটুখানি আভাস দেয়া প্রয়োজন বোধ করছি।

চট্টগ্রামে তখন প্রবল উত্তেজনার আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে! মহানায়ক মাষ্টারদা' জেলের অভ্যন্তরে ফাঁসীর প্রতীক্ষা করছেন, তেমনি তারকেশ্বর দস্তিদারও। সারা বাংলার বিপ্লবীদের চোখে নিদ্রা নেই, মুহূর্ত্তের নেই বিরাম! বিশেষ করে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা একেবারে অধীর হয়ে পড়েছেন। ক্রোধের আতিশয্যে তাঁরা নিজেদের হাত কামড়াচ্ছেন! একটা কিছু করতে হবে!······

১৯৩৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম শহরের দেয়ালে দেয়ালে দেখা গেল লাল ইস্তাহার: হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান আর্ম্মির চট্টগ্রাম শাখা ঘোষণা করছে যে, আজ এই মুহূর্ত্ত থেকে নরনারী নির্ব্বিশেষে শহরের সমস্ত ইয়োরোপীয়দের নির্ব্বিচারে হত্যা সুরু হবে। দয়া-দাক্ষিণ্যের আবেদন বা যুক্তির তারা ধার ধারে না!

৭ই জানুয়ারী ইয়োরোপীয়ান ক্লাবের মাঠে ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে অগণিত দর্শকের সম্মুখে। খেলা পরিদর্শনে মত্ত সবাই লক্ষ্যই করলো না যে

মোটবাহক কুলির ছদ্মবেশে চারজন ভদ্রলোকের ছেলে মাঠে এসে প্রবেশ করলো এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে স্থান গ্রহণ করলো সমবেত ইয়োরোপীয় নরনারীর ঠিক পশ্চাতে। মাঠের পাশেই একটি উঁচু টিলা, খেলা শেষ হলে ইয়োরোপীয়েরা জড়ো হয়েছেন সেই টিলার ওপর, এমন সময় পুলিশ সুপার টিলার পশ্চাৎ দিকের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন মোটরে। অকস্মাৎ সেই নির্জ্জন রাস্তায় দু'জন ভদ্রলোকের ছেলেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখে তাঁর সন্দেহ হলো। মোটর থামালেন তিনি এবং দেহরক্ষীকে আদেশ করলেন ওদের দু'জনের দেহতল্লাশীর জন্য। কিন্তু তাতেও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। নেমে এলেন তিনি নিজে সশস্ত্র ড্রাইভারসহ ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করবার উদ্দেশ্যে।

তৎক্ষণাৎ একজন ছেলে তাঁর প্রতি একটি বোমা নিক্ষেপ করলো এবং ভীষণ শব্দে তা বিস্ফোরিত হলো। কিন্তু আহত হলো না কেউ। প্রত্যুত্তরে সশস্ত্র ড্রাইভারের রিভলভারের গুলী ছেলেটির ফুসফুস ফুটো করে দিল। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তার প্রাণহীন দেহ। ড্রাইভারের আর একটি গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পুলিশ সাহেবের হাতে বিদ্ধ হলো। দ্বিতীয় ছেলেটি পলায়নের চেষ্টা করায় সাহেবের দেহরক্ষী তার পশ্চাদ্ধাবন করলো এবং কিছুতেই তাকে ধরতে না পেরে অবশেষে সে তুলে ধরলো রিভলভার। গুলীবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়লো ছেলেটি এবং সেইদিনই সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হলো।

কিন্তু কুলির ছদ্মবেশে যারা মাঠে প্রবেশ করেছিল, তারা এই দুর্ঘটনার সংবাদ হয় জানতো না, নয় তো জানবার প্রয়োজন ছিল না তাদের। যে কাজের দায়িত্ব নিয়ে এসেছে তারা, তা সম্পূর্ণ করবার জন্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। যদি তাতে দিতে হয় প্রাণ, তবুও। তাই তারা ছুটে এল টিলার সম্মুখে, পর পর ছয়টি বোমা নিক্ষেপ করলো ইয়োরোপীয় নরনারীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু হায়, একটিও বিস্ফোরিত হলো না! বেগতিক দেখে অপরে বেল্ট থেকে টেনে বার করলো রিভলভার, ছ'বার গুলীবর্ষণ করলো ওদের লক্ষ্য করে, কিন্তু আশ্চর্য্য, একটি গুলীও কাউকে আহত করতে পারলো না। ফলে যা হয়, তাই হলো। ধরা পড়লো সবাই।

ঐ দিনই, ঐ ৭ই জানুয়ারী তারিখেই বিপ্লবীরা হানা দিল গৈরালা

গ্রামে নেত্র সেনের বাড়ীতে। এইখানেই ধরা পড়েছিলেন সূর্য্য সেন নেত্র সেনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা তা ভোলেনি, ভুলতে পারে না। যে বিশ্বাসহন্তা স্তূপীকৃত রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে বিনাদ্বিধায় মাষ্টারদা'কে তুলে দিতে পেরেছে ক্যাপ্টেন ওয়াম্‌স্‌লির হাতে, তাকে কি ভুলতে পারে চট্টলের বিপ্লবীরা ?……

নেত্র সেন আহারাদির পর শোবার উদ্যোগ করছিলেন, এমন সময় এল এরা। থানা থেকে বা নিকটস্থ আই বি শিবির থেকে হয়তো কোনো বার্ত্তাবহ নিয়ে এসেছে জরুরী কোনো সংবাদ! মহা উৎসাহে নেত্র সেন প্রাঙ্গণ পেরিয়ে বাড়ীর বাইরে আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়লো এরা তাঁর ওপর— যেমন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মধ্যমপাণ্ডব দুঃশাসনের বুকের ওপর। রিভলভার নয়, বোমা নয়, তীক্ষ্ণধার ভোজালির আঘাতে আঘাতে একেবারে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেললো তাঁর দেহ, ভীম পদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললো তাঁর মস্তক! তারপর যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে অন্ধকারে জঙ্গলের পথে মিলিয়ে গেল তারা সরীসৃপের মতো!……

পরদিনই প্রত্যুষে দেখা গেল বিপ্লবীদের ইস্তাহার চট্টগ্রাম শহরের দেয়ালে দেয়ালে। দেখা গেল কুমিল্লায়, নোয়াখালীতে, চাঁদপুরে। দেখা গেল ঢাকায়, ময়মনসিংহে, মেদিনীপুরে ও মুর্শিদাবাদে, দেখা গেল বাংলার প্রতিটি শহরে সেই একই বিপ্লবী ইস্তাহার। বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল চট্টগ্রাম জেলের সুপারিনটেনডেণ্ট, জেলার ও অসংখ্য জেলরক্ষী, যখন দেখা গেল সেই একই ইস্তাহারের একখানি আঁটা রয়েছে রাজবন্দী ইয়ার্ডের দেয়ালে আর স্বয়ং মাষ্টারদা'র ফাঁসীর ঘরের বাইরে!

মাষ্টারদা'কে বাঁচাবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। আইনের রক্ত-চক্ষু এই মহাবিপ্লবীর অন্তরের পানে ফিরেও চেয়ে দেখেনি, তাঁকে দস্যু, হত্যাকারী নামে অভিহিত করে চরম দণ্ডাদেশ উচ্চারণে এতটুকু কম্পিত হয়নি আইনের কণ্ঠস্বর। মুহূর্ত্তের জন্যও বিজলী চমকের মতো ঝলসে যায়নি তাদের মনে যে, নিপীড়িত জনগণের মুক্তি ও শান্তির জন্যই বিংশ শতাব্দীর ক্রুশে আত্মবলিদানে অগ্রসর হয়েছিলেন এই যীশুখৃষ্ট, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ চক্রহস্তে নেমে এসেছিলেন এই আধুনিক কালের মুরারী!……অনুগামীরা চেষ্টা করেছিল ডিনামাইট দ্বারা জেলের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে তাদের প্রিয় নেতাকে উদ্ধার

করতে, পারেনি। ট্রাইবিউনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছিল, প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। নানাভাবে নানাজন চেষ্টা করেছিলেন তাঁর ফাঁসীর হুকুম মকুব করতে, পারা যায়নি। সর্ব্বজনের সর্ব্বপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর মহাযাত্রী আত্মনিয়োগ করেছিলেন গীতাপাঠে, ধ্যানে ও প্রাণায়ামে !······

কল্পনার চক্ষে ভেসে উঠলো সেই মহাপ্রস্থানের দৃশ্য।

জলহীন কূপের ওপর লোহার মঞ্চ। দু'পাশে দু'টি লোহার খুঁটি। খুঁটির মাথায় মাথায় জোড়া আর-একটি লোহার বার। সেই বার-এর মাঝখানটিতে লোহার হুকের সঙ্গে ঝুলছে এক ইঞ্চি ডায়মেটারের ম্যানিলা রোপ। নাট-বল্টু ও এই রোপের শক্তি বার বার পরীক্ষা করা হয়েছে মাষ্টারদা'র দ্বিগুণ ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে দিয়ে। দেখেছেন পি ডবলিউ ডি-র একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ও জেলের সুপার, জেলার।

ভোর চারটে বাজতেই ঘুম থেকে ডেকে তোলা হলো মাষ্টারদা'কে। জানানো হলো ফাঁসীর সংবাদ এবং প্রস্তুত হবার জন্য সময় দেয়া হলো আধ ঘণ্টা।

মাষ্টারদা' পরিপাটি করে স্নান করলেন, নতুন পোষাক পরলেন, চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ালেন, তারপর কম্বলের আসনে উপবেশন করে গীতা পাঠ সুরু করলেন অচঞ্চল কণ্ঠে :

> জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
> নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥
> সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
> একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলম্‌ ॥

—হে মহাবাহো, যিনি কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, দ্বেষও করেন না, তাঁহাকে নিত্য সন্ন্যাসী জানিও। তাদৃশ রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বশূন্য শুদ্ধচিত্ত অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। অজ্ঞ ব্যক্তিগণই সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগকে পৃথক্‌ বলিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ এরূপ বলেন না। ইহার একটি সম্যক্‌ অনুষ্ঠিত হইলে উভয়ের ফল মোক্ষলাভ হয়।

কক্ষের বাইরে রাইফেলধারী সান্ত্রী। পাথরের মতো অচঞ্চল, বোধহয় অপলক দৃষ্টি। শুধু নিজেই শুনতে পাচ্ছে নিজের হৃদ্‌পিণ্ডের ধ্বকধ্বকানি।

মাষ্টারদা'র কম্বুকণ্ঠ অপরিসর কক্ষ, ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ, জেলের দেয়াল ও রাত্রির শেষ যামের বিষণ্ণ ধূসর আকাশ প্রতিধ্বনিত করে শোনা যাচ্ছে:

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

—সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণ লও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। শোক করিও না।

এমন সময় বাইরে শোনা গেল অনেকগুলি বুটের শব্দ। প্রাঙ্গণে এসে প্রবেশ করলেন সুপারিনটেনডেণ্ট, জেলার, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, সিভিল সার্জ্জেন ও জনকতক ওয়ার্ডার। সান্ত্রীও খট্ করে বুটের আওয়াজ তুললো।

টর্চ্চ জ্বালালেন জেলার, সুপারিনটেনডেণ্ট সেই আলোয় পাঠ করতে লাগলেন স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালের ওয়ারেন্ট। ফাঁসার আসামীকে শোনালেন যে, ট্রাইবিউনালের হুকুম···to be hanged by neck till death······আজ সেই হুকুমই তামিল করছেন সুপারিনটেনডেণ্ট।

অনেকগুলো বুটের আওয়াজ করে আবার তাঁরা বেরিয়ে গেলেন বধ্যভূমিতে। সেখানে অনেকগুলো অতিরিক্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মঞ্চ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বারোজন ওয়ার্ডার। হাতে গুলীভরা রাইফেল, রাইফেলের মাথায় বেয়নেট। মঞ্চের ওপর অপেক্ষায় আছে জহ্লাদ আর লোহার বার-এর ওপর ম্যানিলা রোপটি যেন অপেক্ষমান বৃটিশ পাইথন!

অনেক লোকের সমাবেশ। সবাই জেলের কর্ম্মচারী। সরকারী হুকুমে আসতে হয়েছে। আইন অনুসারে শহরের গণ্যমান্য জনকয়েককে এই দৃশ্যের সাক্ষী থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কেউ আসেন নি।

সদলবলে এসে প্রবেশ করলেন সুপারিনটেনডেণ্ট। দাঁড়ালেন মঞ্চের সম্মুখে। তাঁর একপাশে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, অপর পাশে সিভিল সার্জ্জেন। ওধারের দরজা খুলে গেল। অকম্পিত পদে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন মাষ্টারদা'।

মঞ্চের ওপর ঠিক জায়গাটিতে এসে দাঁড়ালেন।

আলোয় চকচক করছে বেয়নেটগুলো। সুপারের কাঁধের ষ্টারগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। আলোকের আভা ওপরের কালো আকাশকেও দ্যুতিময় করে তুলেছে কি? কে বলে ওটা ম্যানিলা রোপ? কে বলে ওকে বৃটিশ পাইথন?

ও যে বেলফুলের মালা। দেশমায়ের আশীর্ব্বাদী ফুল দিয়ে তৈরী। একটি একটি করে গেঁথেছেন বাংলার বিপ্লবী দল, বাংলার জনসাধারণ।……

জহ্লাদ এগিয়ে এল। কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে দিল। পায়ে দড়ি বেঁধে দিল। গলায় ফাঁসী পরিয়ে দিল। তারপর সুপারিনটেনডেণ্টের সিগন্যাল পেয়ে ত্রস্তে লিভার টেনে ধরলো আর সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের একাংশ অপসারিত হলো।

অদৃশ্য হয়ে গেলেন মাষ্টারদা'। অদৃশ্য হয়ে গেল মানুষ, বুঝি অদৃশ্য হয়ে গেল আকাশ, পৃথিবী, অদৃশ্য হয়ে গেল বিশ্বচরাচর।

মহাকালের অবিশ্রাম গতিতে বাধা পড়লো, ছেদ পড়লো, হোঁচট খেয়ে লুটিয়ে পড়লেন তিনি।……

মাষ্টারদা' চলে গেলেন।

কিন্তু পশ্চাতে যাদের রেখে গেলেন, ইষ্টমন্ত্র কি তারা ভুলে যাবে কখনো? তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার গ্রহণ করবে কি বাংলার বিপ্লবীরা?

ভবিষ্যৎ এর উত্তর দেবে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত